আনন্দমেলা
পূজাবার্ষিকী ১৩৮০

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি : রতীশ সরকার ও রাজর্ষী সরকার

স্ক্যান : মাধব রায়

এডিট : সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষনীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান আভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

ঠাকরসীর
শার্টিং ও স্যুটিং
সব সময় প্রশংসা পায় !
কবীর বেদী "ষ্টার অব দি সেভেন্টিজ"
ঠাকরসীর
ইজিকেয়ার®
৬৭% 'টেরিন' ও ৩৩% কটন
ঠাকরসীর
এভারফ্রেশ®
৬৭% 'টেরিন' ও ৩৩% কটন
ইজিলীন®
৮০% পলিয়েস্টার ও ২০% কটন
ক্রোনেস্টর®
পলিয়েস্টার/কটন
ক্রোনলীন®
পলিয়েস্টার/কটন
TF
ঠাকরসী গ্রুপ অব্ মিল্স
ক্রাউন • হিন্দুস্থান-ইউনিট নং ১ • হিন্দুস্থান (ইণ্ডিয়ান)-ইউনিট নং ২।
সার বিঠলদাস চেম্বার্স, ১৬, বোম্বাই সমাচার মার্গ,বোম্বাই-৪০০০০১।
Dattaram—TG—17
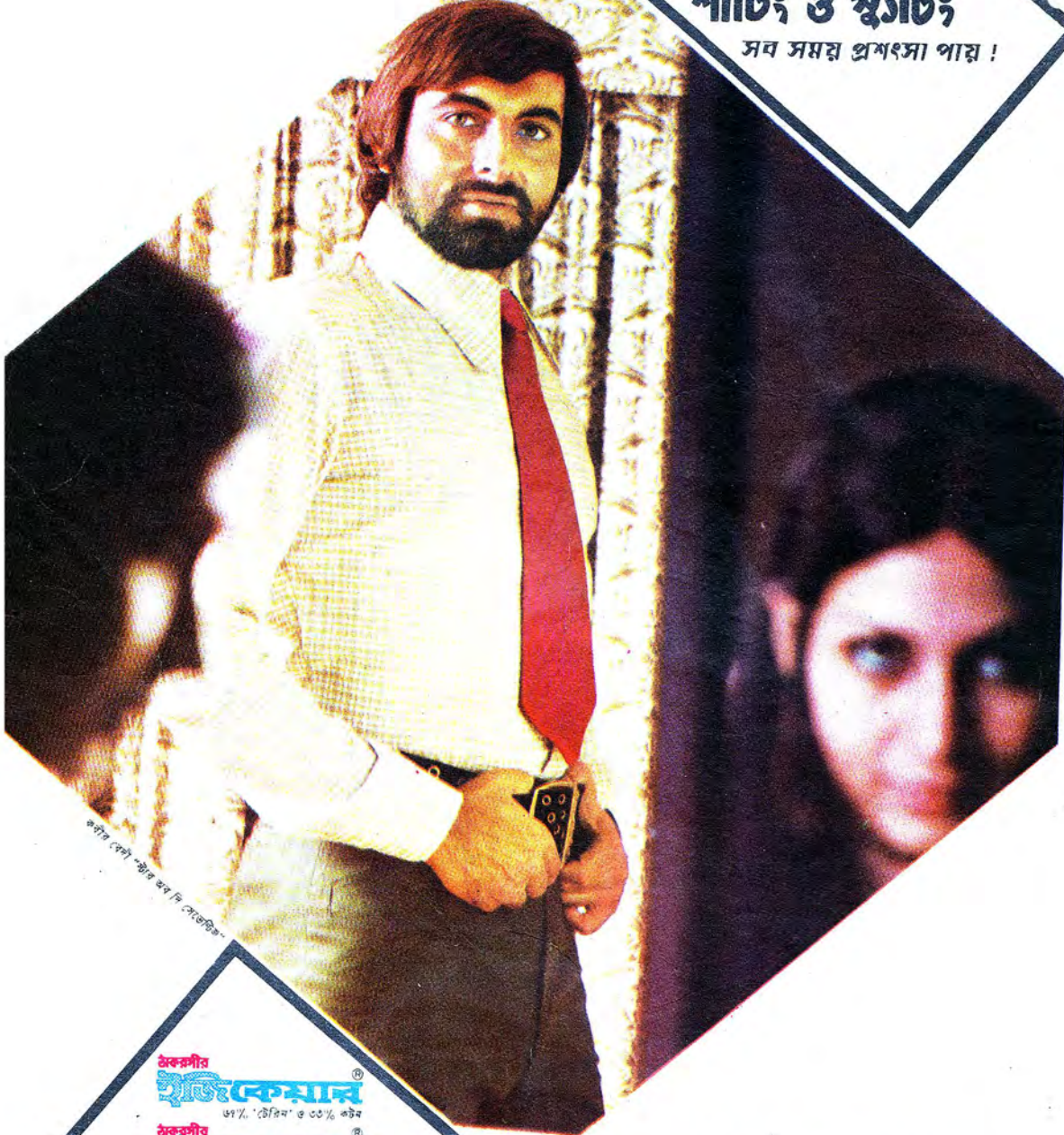
ইতুর ছড়া

সেদিন স্কুল থেকে ফিরেই ইতু জড়িয়ে ধরলে
তার মাকে।
জানো মা, আমার বন্ধু রিন্‌কু, টিন্‌কু,
মিন্‌কুরা সব পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যাচ্ছে
দার্জিলিং। আমরা কোথায় যাব?
মা বললেন, হাজারীবাগ। তোমার মামার
বাড়িতে।
সঙ্গে সঙ্গে ইতুর চোখ বড় বড় করে প্রশ্ন,
সেখানে পাহাড় আছে তো?
ওরা সব কেমন পাহাড়ে চড়বে।
কত উঁচুতে উঠবে। ওদের মত আমাদেরও মজা
না হলে যাবো না।
মা বললেন, আছে।
ইতু অমনি মনের খুশীতে নাচতে লাগল
মুখে মুখে তখুনি একটা ছড়া বানিয়ে—
রেলগাড়ী মামার বাড়ি
পাহাড় আছে সারি সারি

পূর্ব রেলওয়ে

ছড়া

রূপকথা

উপন্যাস

বড় গল্প

গল্প

নাটিকা

খেলা

কমিকস

ধাঁধা

প্রতিযোগিতা

ছবি

শ্রীমান সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমান গোরা সিংহরায়
শ্রীমতী উর্মিলা দে

ছড়া ও কবিতা

শ্রীমতী শম্পা বিশ্বাস **খাওয়া দাওয়া**
শ্রীমতী মুনমুন হালদার **কোথায় গেলে**
শ্রীমান গোপাল বসু **ঘুম পাড়ানি ছড়া**
শ্রীমান দেবব্রত রায়চৌধুরী **ছড়া**
শ্রীমান কুশল মজুমদার **কী করি**
শ্রীমতী কবিতা দাস **মিষ্টি ছড়া**
শ্রীমান অভিজিৎ বিশ্বাস **জগা খিচুড়ি**
শ্রীমান দেবাশিস পুরকাইত **ছড়া**

গল্প

শ্রীমতী মৌসুমী বসু **আড়ির পরে ভাব**
শ্রীমতী তৃণা চট্টোপাধ্যায় **দুইজন তৃণা**
শ্রীমান দেবায়ন ঘোষ **দুষ্টু ছেলেটা**
শ্রীমতী দেবযানী নন্দী মজুমদার **বাবার কথা শুনি নি**
শ্রীমতী শর্মিলা দাশগুপ্ত **আমার ছোটবোন**

প্রচ্ছদঃ অস্মিতা ঘোষাল ৮ বছর

সত্যজিৎ রায়, অলোক ধর, পূর্ণেন্দু পত্রী, সুধীর মৈত্র, মদন সরকার, শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, অসিত পাল, প্রণবেশ মাইতি, সুবোধ দাশগুপ্ত, বিপুল গুহ, তমাল মৈত্র, আলো ঘোষ, সুদীপ্ত সিং, হৈমন্তী গোস্বামী, সরজিৎ ঘোষ, বুলবুল চট্টোপাধ্যায়, চিত্রলেখা বসু, চম্পাকলি ঘোষ, অরুন্ধতী বসু, পরমেশ্বরী রায়চৌধুরী, উপমা পত্রী, সুগত চট্টোপাধ্যায়, মানিক দেব, প্রীতম বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্রুব ভট্টাচার্য

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

দাম ৪·০০

কিছু রঙরূপ এমনও আছে সময় হার মানে যার কাছে!
PEARS
TRANSPAPENT
SOAP
পিয়ার্স—আসল গ্লিসারিন সাবান
পিয়ার্স সময়ের ছায়া পড়তে না দিয়ে আপনার ত্বকের তারুণ্য আর কমনীয়তা বজায় রাখে।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের

তমাল মৈত্র ॥ ৬ বছর
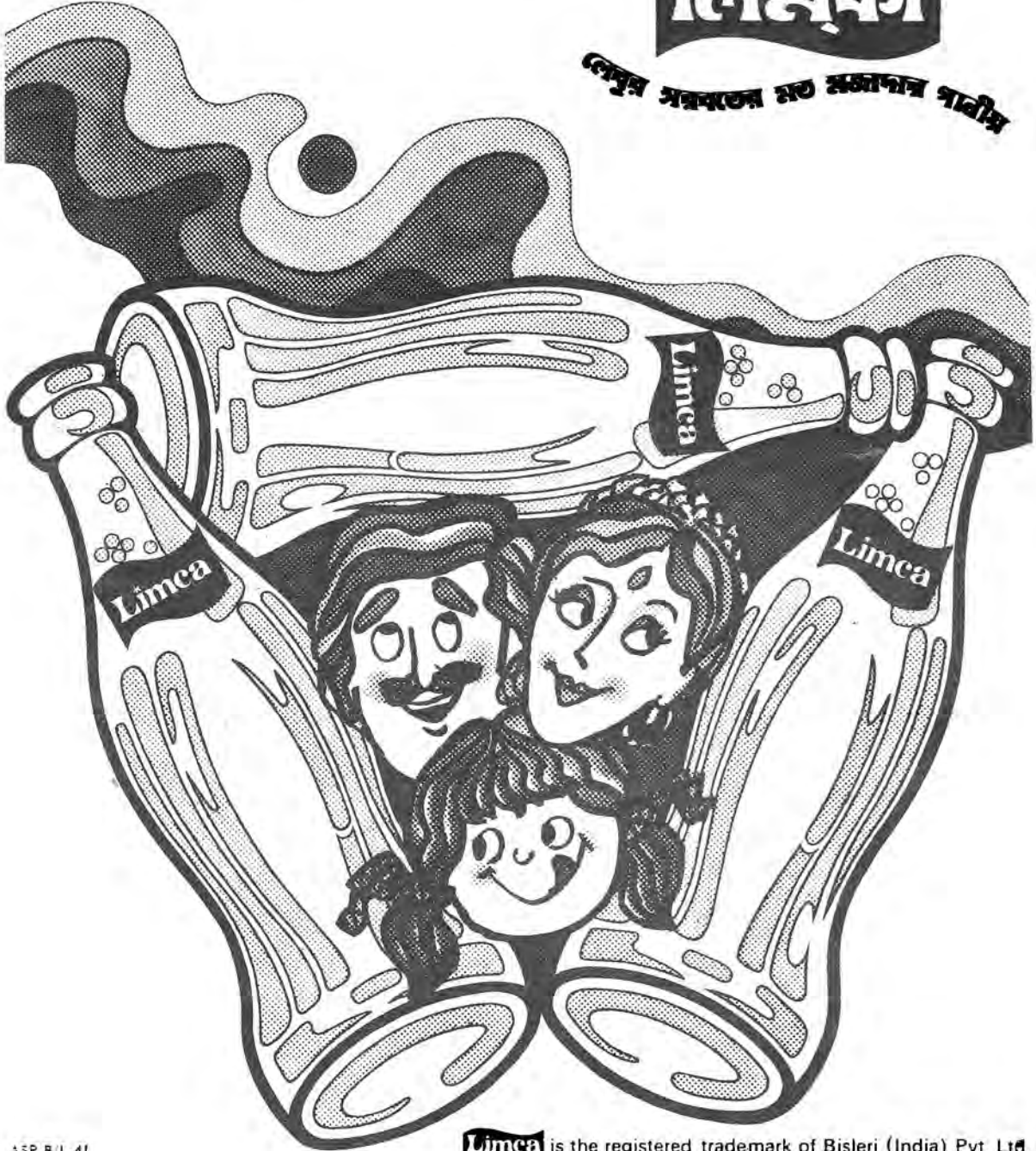
এই ছোকরা!
আলুবোখরা
আখরোট কিসমিস
চার পয়সায়
যা নিয়ে আয়
না আনলে—ডিসমিস!

এক ডজন ছড়া

ভবী কখনো ভোলে?
না।
হাতি কখনো ঢোলে?
না।
বট কখনো দোলে?
না।
জট কখনো খোলে?
না।

আলো ঘোষ ॥ ৯ বছর ৬ মাস

এই খেলাটার নিয়ম এই
তুই আমাকে ধরবি যেই
মারব আমি লাফ।
চুপ চাপ হাপ।
তুইও আমার সঙ্গ নিবি
তেমনি জোরে লম্ফ দিবি
দুপ দাপ দাপ।
চুপ চাপ হাপ।
তখন আমি ডাইনে ঘুরে
লাফিয়ে যাবো অনেক দূরে
ধাপের পর ধাপ।
চুপ চাপ হাপ।
তুইও তখন ডাইনে ঘুরে
লাফিয়ে যাবি অনেক দূরে
ঝাঁপের পর ঝাঁপ।
চুপ চাপ হাপ।
এবার আমি ঘুরব বাঁয়ে
লাফিয়ে যাব এক এক পায়ে
লাগবে পায়ে কাঁপ।
চুপ চাপ হাপ।
তুইও তখন ঘুরবি বাঁয়ে
লাফিয়ে যাবি এক এক পায়ে
ছাড়বি শেষে হাঁফ।
চুপ চাপ হাপ।

শোন তবে কাহিনী
ঘেউ ঘেউ বাহিনী
আশে পাশে থাকে ওরা
বাড়িতে বা রাস্তায়।
কারণ জানে না কেউ
একটা ডাকলে ঘেউ
সব ক'টা ডেকে ওঠে
মাঝ রাতে শোনা যায়।
মাটি হয় কাঁচা ঘুম
ভাবি এ কিসের ধুম
ডাকাত পড়েছে নাকি
আমাদের পাড়াটায়?
মনে হয় আমি উঠি
লাঠি নিয়ে ছুটোছুটি
করে দেখি ডাকাত কি
চোর যাতে না পালায়।
চোর! চোর! রব কোথা?
চার দিকে নীরবতা
জনমানবের সাড়া
কান পেতে মেলা দায়।
তা হলে কি সব ফাঁকি
অকারণ ডাকাডাকি?
ডাকাত বা চোর নয়
ডেকে ওরা সুখ পায়

ভালো লাগে কী কী
শুনবি তো শোন তা
ভালো লাগে টক ঝাল
ভালো লাগে নোনতা।
দুই চক্ষের বিষ
যত সব মিষ্টি
দুই চোখ বুজে তাই
খাই ওই বিষটি।

দু চক্ষের বিষ

সত্যজিৎ ঘোষ ॥ ১০ বছর ৫ মাস

রবিবারে জন্মায়
কবি বলে যশ পায়।
সোমবারে জন্ম
তার হয় ধম্ম।
মঙ্গলবারে জাত
বীর বলে হয় খ্যাত।
জন্ম কি বুধবার?
বুদ্ধিটি ক্ষুরধার।
বৃহস্পতিবারে জাত
বিদ্বান বলে জ্ঞাত।
জন্ম শুক্রুরবার
আলো করে রূপে তার।
শনিবারে জন্মায়
ধনী হয়ে মান পায়।

ভাগ্য

বুলবুল চট্টোপাধ্যায় ॥ ১০ বছর

জাপানেতে যাও যদি

হাসি হাসি তাকাহাসি
বাড়ি তাঁর কিয়োতো
জাপানেতে যাও যদি
খোঁজ তাঁর নিয়ো তো।
হয়তো বা ভুলে গেছি
বাড়ি তাঁর তোকিয়ো
তোকিয়োতে গেলে তুমি
গাড়িটাকে রোকিয়ো।

বুঁচকি, ও বুঁচকি!
তোর ওই পুতুলটা
কেন এত পুঁচকি?
টুকলি, ও টুকলি!
পুতুলের নামে কেন
করছিস চুকলি?

চিত্রলেখা বসু ॥ ৬ বছর
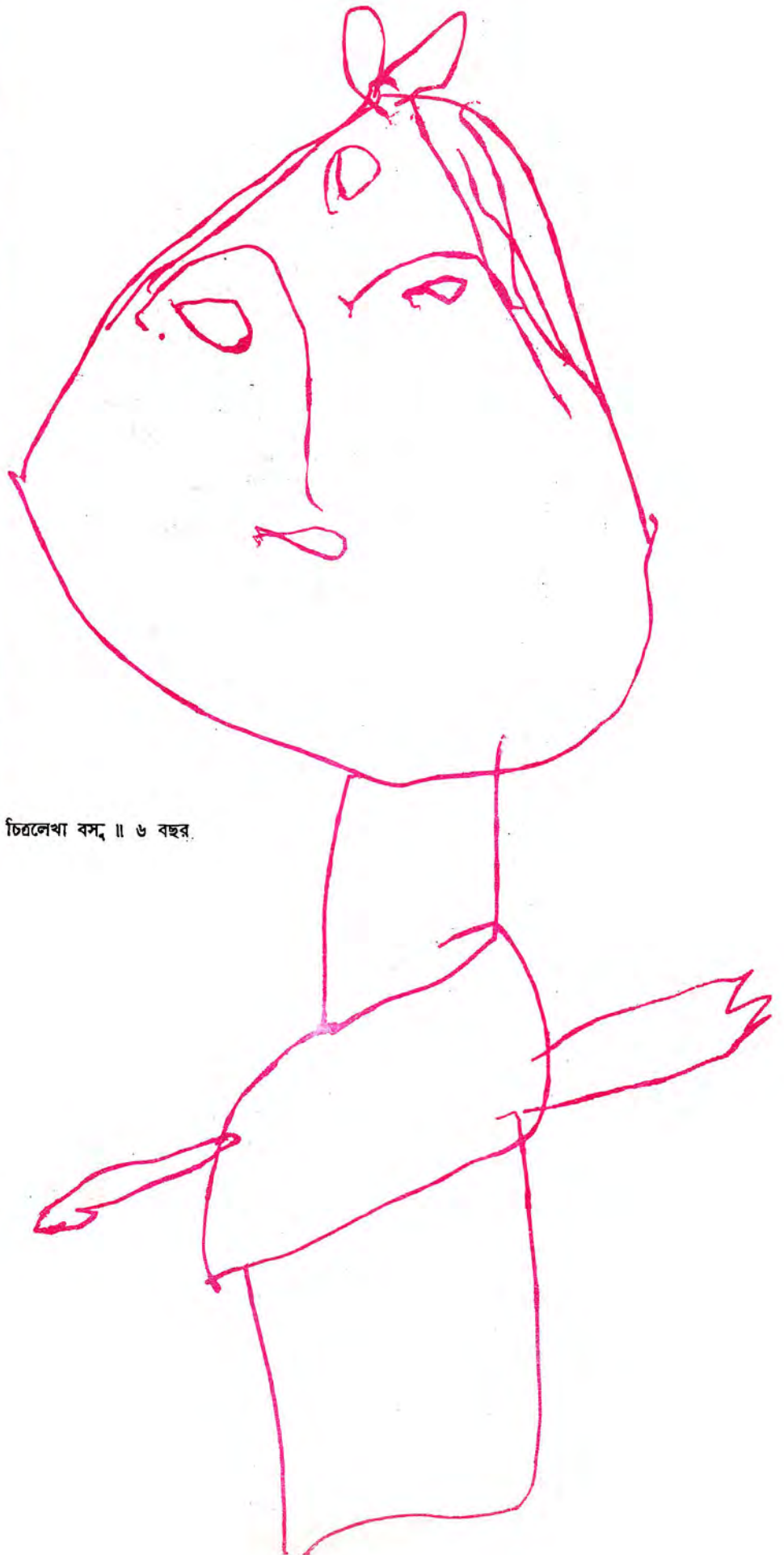
চম্পাকলি ঘোষ ॥ ৯ বছর

ধিক ধিক ধিকারি

মুনু মুনু মুনিয়া!
শিকারী নয় গো ওরা
ওই সব খুনিয়া।
মেরে মেরে করবেই
বাঘহারা দুনিয়া।

বাঘ ছিল ক্ষত্রিয়
বাঘ ছিল শ্রেষ্ঠ
বীরদের মধ্যে
বাঘ ছিল জ্যেষ্ঠ।
মনে ভেবে ব্যথা পাই
বাঘের অদেষ্ট।

চিড়িয়াখানায় গেলে
বাঘ তুমি পাবে না।
সুন্দরবনে আর
বাঘ দেখা যাবে না।
বাঘ শেষ হলে কি গো
কেউ পস্তাবে না?

ধিক ধিক ধিকারি!
খুনিয়া ওদের বলে
ওরা নয় শিকারী।

লাল টুকটুক

লাল টুকটুক ছাতাটি
কালো কুচকুচ মাথাটি
কে যায়? কে যায়?
সোনা রায়।

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপ
পথ চলতে মজা খুব
কে পায়? কে পায়?
সোনা রায়।

ওদিকেতে পা দুটি যে
জলের ছাটে গেল ভিজে
ফিরে আয়! ফিরে আয়!
সোনা রায়।

অরুন্ধতী বসু ॥ ৮ বছর
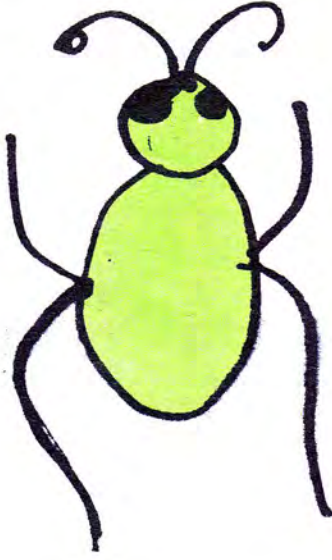
কে যেন বলেছিল, "ঠিক ঠিকই?"
টিকটিকি! টিকটিকি! টিকটিকি!
কার যেন কে ছিল বাবর শা?
মাকড়সা! মাকড়সা! মাকড়সা!
কে যেন চুষে খায় কার খোকা?
ছারপোকা! ছারপোকা! ছারপোকা!
সাবাড় করে কে খেয়ে চাল চুলা?
আরস্‌লা! আরস্‌লা! আরস্‌লা!
ব্যাঙ কাকে বলেছিল, "ঘর নিকা?"
চামচিকা! চামচিকা! চামচিকা!
বর্ষায় কে করে ঘ্যাং ঘ্যাং?
কোলাব্যাঙ! কোলাব্যাঙ! কোলাব্যাঙ!
প্যাঁক প্যাঁক করে কে হাঁসফাঁস?
পাতিহাঁস! পাতিহাঁস! পাতিহাঁস!
ওৎ পেতে কে রয়েছে, ওরে বাপ!
সাআআপ! সাআআপ! সাআআপ!

ধাঁধা

উপমা পত্রী ॥ ১২ বছর

আর একটি তারা

পরমেশ্বরী রায়চৌধুরী ॥ ৯ বছর

পাঁজিতে এক সুদিন দেখে
মহাশূন্যে চলছ কে কে
রকেট চেপে দিচ্ছ কবে পাড়ি?
আমাকে, ভাই, সঙ্গে নিয়ো
ইচ্ছে করে যাই আমিও
বানাই গিয়ে আসমানে এক বাড়ি।
এখানে আর যায় না থাকা
কোত্থাও নেই জায়গা ফাঁকা
গা মেলবার পা ফেলবার ঠাঁই।
রাস্তা ছিল, তাও খোঁড়া
তলিয়ে যাবে গাড়ি ঘোড়া
মাঠ ছিল, তা দালানে বোঝাই।
মহাশূন্যে বানিয়ে ঘাঁটি
বাইরে করে হাঁটাহাঁটি
মাটি বিনাই মহাকাশচারী।
তাই যদি হয় চল না, ভাই,
ফুটবলটাও নিয়ে যাই
বিনা মাঠে ছুটব পিছে তারই।
মহাশূন্য খোলামেলা
মহানন্দে করব খেলা
পদে পদে বাধা দেবে কারা?
এখান থেকে হবে মনে
রাতের বেলা দূর গগনে
বাড়ি যেন আর একটি তারা।

ছবি এঁকেছেন সত্যজিৎ রায়

ক ন্‌ডাক্‌টরের নির্দেশ মতো ‘ডি’ কামরায় ঢ্‌কে বারীন ভৌমিক তাঁর বড় স্যুটকেসটা সীটের নিচে ঢ্‌কিয়ে দিলেন। ওটা পথে খোলার দরকার হবে না। ছোট ব্যাগটা হাতের কাছে রাখা দরকার। চির্‌নি, ব্রুশ, টুথ-ব্রাশ, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, ট্রেনে পড়ার জন্য হ্যাড্‌লি চেজের বই—সবই রয়েছে ঐ ব্যাগে। আর আছে থ্রোট পিল্‌স। ঠান্ডা ঘরে ঠান্ডা লেগে গলা বসে গেলে কাল গান খ্‌লবে না। চট করে একটা বড়ি ম্‌খে প্‌রে দিয়ে বারীন ভৌমিক ব্যাগটাকে জানালার সামনে টেবিলটার উপর রেখে দিলেন।

দিল্লীগামী ভেস্টিবিউল ট্রেন, ছাড়তে আর মাত্র সাত মিনিট বাকি, অথচ তাঁর কামরায় আর প্যাসেঞ্জার নেই কেন? এতখানি পথ কি তিনি একা যাবেন? এতটা সৌভাগ্য কি তাঁর হবে? এ যে একেবারে আয়েশের পরাকাষ্ঠা! অবস্থাটা কল্পনা করে বারীন ভৌমিকের গলা থেকে আপনিই একটা গানের কলি বেরিয়ে পড়ল—বাগিচায় ব্‌লব্‌লি তুই ফ্‌লশাখাতে দিস্‌নে আজি দোল!

বারীন ভৌমিক জানালা দিয়ে বাইরে হাওড়া স্টেশন প্ল্যাট-ফর্মের জনস্রোতের দিকে চাইলেন। দ্‌টি ছোক্‌রা তাঁর দিকে চেয়ে পরস্পরে কী যেন বলাবলি করছে। বারীনকে চিনেছে তারা। অনেকেই চেনে। অন্তত কলকাতা শহরের, এবং অনেক বড় বড় মফস্বল শহরের অনেকেই শ্‌ধ্‌ তাঁর কণ্ঠস্বর নয়, তাঁর চেহারার সঙ্গেও পরিচিত। প্রতি মাসেই পাঁচ-সাতটা ফাংশনে তাঁর ডাক পড়ে। বারীন ভৌমিক—গাইবেন নজর্‌লগীতি ও আধ্‌নিক। খ্যাতি ও অর্থ—দ্‌ই-ই এখন বারীন ভৌমিকের হাতের ম্‌ঠোয়। অবিশ্যি এটা হয়েছে বছর পাঁচেক হল। তার আগে কয়েকটা বছর তাঁকে বেশ, যাকে বলে, স্ট্রাগলই করতে হয়েছে। গানের জন্য নয়। গাইবার ক্ষমতাটা তাঁর সহজাত। কিন্তু শ্‌ধ্‌ গাইলেই তো আর হয় না। তার সঙ্গে চাই কপালজোর, আর চাই ব্যাকিং। ঊনিশ শো সাতষট্টি সালে ঊনিশ পল্লীর প্‌জো প্যান্ডেলে ভোলাদা—ভোলা বাঁড়্‌জ্যে—তাঁকে দিয়ে যদি না জোর করে ‘বসিয়া বিজনে’ গানখানা গাওয়াতেন...

বারীন ভৌমিকের দিল্লী যাওয়াটাও এই গানেরই দৌলতে! দিল্লীর বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে ফার্স্ট ক্লাসের খরচ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের জ্‌বিলী অন্‌ষ্ঠানে নজর্‌লগীতি পরিবেষণের উদ্দেশ্যে। থাকার ব্যবস্থাও অ্যাসোসিয়েশনই করবে। দ্‌দিন দিল্লীতে থেকে তারপর আগ্রা-ফতেপ্‌র-সিক্রি দেখে ঠিক সাতদিন পরে আবার কলকাতায় ফিরবেন বারীন ভৌমিক। তারপর প্‌জো পড়ে গেলে তাঁর আর অবসর নেই; প্রহরে প্রহরে হাজিরা দিতে হবে গানের আসরে, শ্রোতাদের কানে মধ্‌বর্ষণ করার জন্য।

‘আপনার লাঞ্চের অর্ডারটা স্যার...’

কনডাক্‌টার গার্ড এসে দাঁড়িয়েছেন।

‘কী পাওয়া যায়?’ বারীন প্রশ্ন করলেন।

‘আপনি নন-ভেজিটেরিয়ান তো? দিশি খাবেন না ওয়েস্টার্ন স্টাইল? দিশি হলে আপনার...’

বারীন নিজের পছন্দমতো লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে সবে-মাত্র একটি থ্রোকাস্‌লস ধরিয়েছেন, এমন সময় আরেকটি প্যাসেঞ্জার এসে কামরায় ঢ্‌কলেন, এবং ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীর গাড়ি গা-ঝাড়া দিয়ে তার যাত্রা শ্‌র্‌ করল।

নবাগত যাত্রীটির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তাঁকে চেনা মনে হওয়ায় বারীনের ম্‌খে একটা হাসির আভাস দেখা দিয়ে আগন্তুকের দিক থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে ম্‌হ্‌র্তেই মিলিয়ে গেল। বারীন কি তাহলে ভুল করলেন? ছি ছি ছি! এই অবিবেচক বোকা হাসিটার কী দরকার ছিল। কী অপ্রস্তুত! মনে পড়ল একবার রেসের মাঠে একটি ব্রাউন পাঞ্জাবীপরা প্রৌঢ় ভদ্রলোককে পিছন দিক থেকে ‘কী খ্‌খবো-র ত্রিদিবদা’ বলে পিঠে একটা প্রচন্ড চাপড় মারার পরম্‌হ্‌র্তেই বারীন ব্‌ঝেছিলেন তিনি আসলে ত্রিদিবদা নন। এই লজ্জাকর ঘটনার স্মৃতি তাঁকে অনেক দিন ধরে যন্ত্রণা দিয়েছিল। মান্‌ষকে অপদস্থ করার জন্য কত রকম ফাঁদ যে চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে!

বারীন ভৌমিক আরেকবার আগন্তুকের দিকে দৃষ্টি দিলেন। ভদ্রলোক স্যান্ডাল খ্‌লে সীটের উপর পা ছড়িয়ে বসে সদ্য কেনা ইলাস্‌ট্রেটেড উইক্‌লিটা নেড়ে-চেড়ে দেখছেন। কী আশ্চর্য! আবার মনে হচ্ছে তিনি লোকটিকে আগে দেখেছেন। নিমেষের দেখা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশিক্ষণের দেখা। কিন্তু কবে? কোথায়? ঘন ভুর্‌, সর্‌ গোঁফ, পমেড দিয়ে পালিশ করা চুল, কপালের ঠিক মাঝখানে একটা ছোট্ট আঁচিল। এ ম্‌খ তাঁর চেনা। নিশ্চয়ই চেনা। তিনি যখন সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফে চাকরি করতেন তখনকার চেনা কি? কিন্তু এক তরফা চেনা হয় কী করে? ও'র হাবভাব দেখেতো মনে হয় না যে তিনি কস্মিন-কালেও বারীন ভৌমিককে দেখেছেন।

‘আপনার লাঞ্চের অর্ডারটা...’

আবার কনডাক্‌টর গার্ড। বেশ হাসিখ্‌শি হৃষ্টপ্‌ষ্ট অমায়িক ভদ্রলোকটি।

‘শ্‌ন্‌ন’, আগন্তুক বললেন, ‘লাঞ্চ তো হল—আগে এক কাপ চা হবে কি?’

‘সার্টেনলি।’

‘শ্‌ধ্‌ একটা কাপ আর লিকার দিলেই হবে। আমি র’ টী খাই।’

বারীন ভৌমিকের হঠাৎ মনে হল তাঁর তলপেট থেকে নাড়ি-ভুঁড়ি সব বেরিয়ে গিয়ে জায়গাটা একদম খালি হয়ে গেছে। আর তার পরেই মনে হল তাঁর হৃৎপিন্ডটা হঠাৎ হাত-পা গজিয়ে ফ্‌সফ্‌সের খাঁচাটার মধ্যে লাফাতে শ্‌র্‌ করেছে। শ্‌ধ্‌ গলার স্বর নয়, ওই গলার স্বরে বিশেষভাবে বিশেষ জোর দিয়ে বলা শ্‌ধ্‌ একটি কথা—র’ টী—ব্যাস্‌। ওই একটি কথা বারীনের মনের সমস্ত অনিশ্চয়তাকে এক ধাক্কায় দ্‌র করে দিয়ে সেই জায়গায় একটি স্থির প্রত্যয়কে এনে বসিয়ে দিয়েছে।

বারীন যে এই ব্যক্তিটিকে শ্‌ধ্‌ দেখেছেন তা নয়, তাঁর সঙ্গে ঠিক এই একইভাবে দিল্লীগামী ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত কামরায় ম্‌খোম্‌খি বসে একটানা প্রায় আট ঘণ্টা ভ্রমণ করেছেন। তিনি নিজে যাচ্ছিলেন পাটনা, তাঁর আপন মামাতো বোন শিপ্রার বিয়েতে। তার তিন দিন আগে রেসের মাঠে ট্রেব্‌ল টোটে এক সঙ্গে সাড়ে সাত হাজার টাকা জিতে তিনি জীবনে প্রথমবার প্রথম শ্রেণীতে ট্রেনে চড়ার লোভ সামলাতে পারেন নি। তখনও তাঁর গাইয়ে হিসেবে নাম হয়নি; ঘটনাটা ঘটে সিক্সটি-ফোরে—ন’বছর আগে। ভদ্রলোকের পদবীটাও যেন আবছা-আবছা মনে পড়ছে। ‘চ’ দিয়ে। চৌধ্‌রী? চক্রবর্তী? চ্যাটার্জি?...

কনডাক্‌টর গার্ড লাঞ্চের অর্ডার নিয়ে চলে গেলেন। বারীন অন্‌ভব করলেন তিনি আর ওই লোকটার ম্‌খোম্‌খি বসে থাকতে পারছেন না। বাইরে করিডরে গিয়ে দাঁড়ালেন, দরজার ম্‌খ থেকে পাঁচ হাত ডাইনে, ‘চ’-এর দৃষ্টির বেশ কিছ্‌টা বাইরে। কোইন্সিডেন্সের বাংলা বারীন ভৌমিক জানেন না, কিন্তু এটা জানেন যে, প্রত্যেকের জীবনেই ও জিনিসটা বার কয়েক ঘটে থাকে। কিন্তু তা বলে এই রকম কোইন্সিডেন্স?

কিন্তু ‘চ’ কি তাঁকে চিনেছেন? না-চেনার দ্‌টো কারণ থাকতে পারে। এক, হয়ত ‘চ’-এর স্মরণশক্তি কম; দ্‌ই, হয়ত এই ন’বছরে বারীনের চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। জানালা দিয়ে বাইরের চলমান দৃশ্যের দিকে দেখতে দেখতে বারীন ভাবতে চেষ্টা করলেন, তাঁর ন’বছর আগের চেহারার সঙ্গে আজকের চেহারার কী তফাত থাকতে পারে।

ওজন বেড়েছে অনেক, স্‌তরাং অন্‌মান করা যায় তাঁর ম্‌খটা আরো ভরেছে। আর কী? চশমা ছিল না, চশমা হয়েছে। গোঁফ? কবে থেকে গোঁফ কামিয়ে ফেলেছেন তিনি? হ্যাঁ। মনে পড়েছে। খ্‌ব বেশিদিন নয়। হাজরা রোডের সেই সেল্‌ন।

একটা নতুন ছোক্‌রা নাপিত। দুপাশের গোঁফ মিলিয়ে কাটতে পারল না। বারীন নিজে ততটা খেয়াল করেন নি, কিন্তু আপিসের সেই গোপ্‌পে লিফ্‌টম্যান শুকদেও থেকে শুরু করে বাষট্টি বছরের বুড়ো ক্যাশিয়ার কেশববাবু পর্যন্ত যখন সেই নিয়ে মন্তব্য করলেন তখন বারীন মরিয়া হয়ে তাঁর সাধের গোঁফটি কামিয়ে ফেলেন। সেই থেকে আর রাখেন নি। এটা চার বছর আগের ঘটনা।

গোঁফ বাদ, গালে মাংসযোগ, চোখে চশমাযোগ। বারীন খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে আবার কামরায় এসে ঢুকলেন।

বেয়ারা একটা ট্রেতে চায়ের কাপ ও টি-পট 'চ'-এর সামনে পেতে দিয়ে চলে গেল। বারীনও পানীয়ের প্রয়োজন বোধ করছিলেন—ঠান্ডা হোক, গরম হোক—কিন্তু বলতে গিয়েও বললেন না।

যদি গলার স্বরে চিনে ফেলে!

আর চিনলে পরে যে কী হতে পারে সেটা বারীন কল্পনাও করতে চান না। অবিশ্যি সবই নির্ভর করে 'চ' কি রকম লোক তার উপর। যদি অনিমেষদার মতো হন, তাহলে বারীন নিস্তার পেলেও পেতে পারেন। একবার বাসে একটা লোক অনিমেষদার পকেট হাতড়াচ্ছিল। টের পেয়েও লজ্জায় তিনি কিছু বলতে পারেন নি। মানিব্যাগ সমেত চারটি দশ টাকার করকরে নোট তিনি পকেটমারটিকে প্রায় একরকম দিয়েই দিয়েছিলেন। পরে বাড়িতে এসে বলেছিলেন, 'পাবলিক বাসে একগাড়ি লোকের ভেতর একটা সীন হবে, আর তার মধ্যে একটা প্রমিনেণ্ট পার্ট নেব আমি—এ হতে দেওয়া যায় না।' এই লোক কি সেই রকম? না হওয়াটাই স্বাভাবিক; কারণ অনিমেষদার মতো লোক বেশি হয় না। তাছাড়া চেহারা দেখেও মনে হয়, এ-লোক সে-রকম নয়। ওই ঘন ভুরু, ঠোক্কর খাওয়া নাক, সামনের দিকে বেরিয়ে থাকা থুতনি—সব মিলিয়ে মনে হয়, এলোক বারীনকে চিনতে পারলেই তার লোমশ হাত দিয়ে সার্টের কলারটা খামচে ধরে বলবে, 'আপনিই সেই লোক না?—যিনি সিক্সটি-ফোরে আমার ঘড়ি চুরি করেছিলেন? স্কাউন্ড্রেল! এই ন'বছর ধরে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি। আজ আমি তোমার...'

আর ভাবতে পারলেন না বারীন ভৌমিক। এই শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত কামরাতেও তাঁর কপাল ঘেমে উঠেছে। রেলওয়ের রেক্সিনে মোড়া বালিশে মাথা দিয়ে তিনি সটান সীটের উপর শুয়ে পড়ে বাঁ হাতটা দিয়ে চোখটা ঢেকে নিলেন। চোখ দেখেই সবচেয়ে সহজে মানুষকে চিনতে পারা যায়। বারীনও প্রথমে চোখ দেখেই 'চ'কে চিনতে পেরেছিলেন।

প্রত্যেকটি ঘটনা পুংখানুপুংখ ভাবে তাঁর মনে পড়ছে। শুধু 'চ'-এর ঘড়ি চুরির ঘটনা না। সেই ছেলে-বয়েস থেকে যার যা কিছু চুরি করেছেন সব তিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। একেক সময় খুবই সামান্য সে জিনিস। হয়ত একটা সাধারণ ডট পেন (মুকুলমামার), কিম্বা একটা সস্তা ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস (তাঁর স্কুলের সহপাঠী অক্ষয়ের), অথবা ছেনিদার একজোড়া হাড়ের কাফ-লিংক্‌স, যেটার বারীনের কোনোও প্রয়োজন ছিল না, কোনোদিন ব্যবহারও করেন নি। চুরির কারণ এই যে, সেগুলো হাতের কাছে ছিল, এবং সেগুলো অন্যের জিনিস। বারো বছর বয়স থেকে শুরু করে পঁচিশ বছর পর্যন্ত কমপক্ষে পঞ্চাশটা পরের জিনিস বারীন ভৌমিক কোনো না কোনো উপায়ে আত্মসাৎ করে নিজের ঘরে নিজের কাছে এনে রেখেছে। একে চুরি ছাড়া আর কী বলা যায়? চোরের সঙ্গে তফাত শুধু এই যে, চোর চুরি করে অভাবের তাড়নায়, আর তিনি করেছেন অভ্যাসের বশে। লোকে তাঁকে কোনোদিন সন্দেহ করেনি, তাই কোনোদিন ধরা পড়তে হয়নি। বারীন জানেন যে এইভাবে চুরি করাটা একটা ব্যারাম বিশেষ। একবার কথাচ্ছলে এক ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে তিনি ব্যারামের নামটাও জেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু এখন মনে পড়ছে না।

তবে ন'বছর আগে 'চ'-এর ঘড়ি নেওয়ার পর থেকে আজ অবধি এ কাজটা বারীন আর কখনো করেননি। এমন কি করার সেই সাময়িক অথচ প্রবল আকাঙ্ক্ষাটাও অনুভব করেননি। বারীন জানেন যে এই উৎকট রোগ থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন।

তাঁর অন্যান্য চুরির সঙ্গে ঘড়ি চুরির একটা তফাত ছিল এই যে, ঘড়িটায় তাঁর সত্যিই প্রয়োজন ছিল। রিস্টওয়াচ না। সুইজারল্যান্ডে তৈরি একটি ভারী সুন্দর ট্র্যাভেলিং ক্লক। একটা নীল চতুষ্কোণ বাক্স, তার ঢাকনাটা খুললেই ঘড়িটা বেরিয়ে এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অ্যালার্ম ঘড়ি, আর সেই অ্যালার্মের শব্দ এতই সুন্দর যে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে কান জুড়িয়ে যায়। এই ন'বছর সমানে সেটা ব্যবহার করেছেন বারীন ভৌমিক। তিনি যেখানেই গেছেন, সেখানেই সঙ্গে গেছে ঘড়ি।

আজকেও সে ঘড়ি তাঁর সঙ্গেই আছে। জানালার সামনে ওই টেবিলের উপর রাখা ব্যাগের মধ্যে।

'কদ্দুর যাবেন?'

বারীন তড়িৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলেন। লোকটা তাঁর সঙ্গে কথা বলছে, তাঁকে প্রশ্ন করছে।

'দিল্লী।'

'আজ্ঞে?'

'দিল্লী।'

প্রথমবার অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে গিয়ে একটু বেশি আস্তে উত্তরটা দিয়ে ফেলেছিলেন বারীন।

'আপনার কি ঠান্ডায় গলা বসে গেল নাকি?'

'নাঃ।'

'ওটা হয় মাঝে মাঝে। অ্যাকচুয়েলি এয়ার কন্ডিশনিং-এর একমাত্র লাভ হচ্ছে ধুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়া। নাহলে আমি এমনি ফার্স্ট ক্লাসেই যেতুম।'

বারীন চুপ। পারলে তিনি 'চ'-এর দিকে তাকান না, কিন্তু 'চ' তাঁর দিকে দেখছে কিনা সেটা জানার দুর্নিবার কৌতূহলই তাঁর দৃষ্টি বার বার ভদ্রলোকের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু 'চ' নিরুদ্বিগ্ন, নিশ্চিন্ত। অভিনয় কী? সেটা বারীন জানেন না। সেটা জানতে হলে লোকটিকে আরো ভালো করে জানা দরকার। বারীন যেটুকু জানেন সেটা তাঁর গতবারের জানা। এক হল দুধ-চিনি ছাড়া চা-পানের অভ্যাস। আরেক হল স্টেশন এলেই নেমে গিয়ে কিছু না কিছু একটা খাবার জিনিস কিনে আনা। নোন্‌তা জিনিস, মিষ্টি নয়। মনে আছে গতবার বারীন ভৌমিকের অনেক রকম মুখরোচক জিনিস খাওয়া হয়ে গিয়েছিল 'চ'-এর দৌলতে।

এ ছাড়া তাঁর চরিত্রের আরেকটা দিক প্রকাশ পেয়েছিল পাটনা স্টেশনের কাছাকাছি এসে। এটার সঙ্গে ঘড়ির ব্যাপারটা জড়িত। তাই ঘটনাটা বারীনের স্পষ্ট মনে আছে। সেবার গাড়িটা ছিল অমৃতসর মেল। পাটনা পৌঁছাবে ভোর পাঁচটায়। কন্‌ডাক্‌টর এসে সাড়ে চারটেয় তুলে দিয়েছেন বারীনকে। 'চ'-ও আধ-জাগা, যদিও তিনি যাচ্ছেন দিল্লী। গাড়ি স্টেশনে পৌঁছাবার ঠিক তিন মিনিট আগে হঠাৎ ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল। ব্যাপার কী? লাইনের উপর দিয়ে ল্যাম্প ও টর্চের ছুটোছুটি দেখে মনে হল কোনো গোলমাল বেধেছে। শেষটায় গার্ড এসে বললেন, একটা বুড়ো নাকি লাইন পার হতে গিয়ে এঞ্জিনে কাটা পড়েছে। তার লাশ সরালেই গাড়ি চলবে। 'চ' খবরটা পাওয়া মাত্র ভারি উত্তেজিত হয়ে স্লিপিং সুট পরেই অন্ধকারে নেমে চলে গেলেন ব্যাপারটা চাক্ষুষ দেখে আসতে।

এই সুযোগেই বারীন তাঁর বাক্স থেকে ঘড়িটি বার করে নেন। সেই রাত্রেই 'চ'কে দেখেছিলেন সেটায় দম দিতে। লোভও যে লাগেনি তা নয়, তবে সুযোগের অভাব হবে জেনে ঘড়ির চিন্তা মন থেকে দূর করে দিয়েছিলেন। এই মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত ভাবে সে সুযোগ এসে পড়াতে সে-লোভ এমনভাবে

'আপনার কি ঠাণ্ডায় গলা বসে গেল নাকি?'

মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যে, বাঙ্কের উপর অন্য একটি ঘুমন্ত প্যাসেঞ্জার থাকা সত্ত্বেও তিনি ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করেননি। কাজটা করতে তাঁর লাগে মাত্র পনের-বিশ সেকেণ্ড। 'চ' ফিরলেন প্রায় পাঁচ মিনিট পরে।

'হরিবল ব্যাপার! ভিখিরি। ধড় একদিকে, মুড়ো এক-দিকে। সামনে কাউক্যাচার থাকতে কাটা যে কেন পড়ে বুঝতে পারি না মশাই। ওটার উদ্দেশ্য তো লাইনে কিছু পড়লে সেটাকে ঠেলে বাইরে ফেলে দেওয়া!...'

পাটনায় নেমে স্টেশন থেকে বেরিয়ে মেজোমামার মোটরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বারীন ভৌমিকের তলপেটের অসোয়াস্তিটা ম্যাজিকের মতো উবে যায়। তাঁর মন বলে, ঘড়ির মালিকের সঙ্গে এতকাল যে ব্যবধান ছিল—কেউ কারুর নাম শোনেনি, কেউ কাউকে দেখেনি—গত আট ঘণ্টার আকস্মিক সান্নিধ্যের পর আবার সেই ব্যবধান এসে পড়েছে। এর পরে আবার কোনো দিন পরস্পরে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কোটিতে এক। কিম্বা হয়ত তার চেয়েও কম।

কিন্তু এই তিলপ্রমাণ সম্ভাবনাই যে ন'বছর পরে হঠাৎ সত্যে পরিণত হবে সেটা কে জানত? বারীন মনে মনে বললেন, এই ধরনের ঘটনা থেকেই মানুষ কুসংস্কারের জালে জড়িয়ে পড়ে।

'আপনি কি দিল্লীর বাসিন্দা, না কলকাতার?'

বারীনের মনে পড়ল সেবারও লোকটা তাঁকে নানারকম প্রশ্ন করেছিল। এই গায়ে পড়ে আলাপ করার বাতিকটা বারীন পছন্দ করেন না।

'কলকাতা।' বারীন জবাব দিলেন। তাঁর অজান্তেই তাঁর স্বাভাবিক গলার স্বরটা বেরিয়ে পড়েছে। বারীন নিজেকে ধিক্কার দিল। ভবিষ্যতে তাঁকে আরো সতর্ক হতে হবে।

কিন্তু এ কী! ভদ্রলোক তাঁর দিকে এভাবে এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন কেন? সহসা এ হেন কৌতূহলের কারণ কী? বারীন অনুভব করলেন তাঁর নাড়ী আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

'আপনার কি রিসেণ্টলি কোনো ছবি বেরিয়েছে কাগজে?'

বারীন বুঝলেন এ ব্যাপারে সত্য গোপন করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না; ট্রেনে অন্যান্য বাঙালী যাত্রী রয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ না কেউ তাঁকে চিনে ফেললেও ফেলতে পারে। এর কাছে নিজের পরিচয়টা দিলে ক্ষতি কী? বরং বারীন যে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি সেটা জানলে পরে ন'বছর আগের সেই ঘড়ি-চোরের সঙ্গে তাঁকে এক করে দেখা 'চ'-এর পক্ষে আরো অসম্ভব হবে।

'কোথায় দেখেছেন আপনি ছবি?' বারীন পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

বাঃ!
কি মিষ্টি, কি চমৎকার!
রং-বেরং
ক্যাডবেরিস্‌
মিল্ক চকোলেট
জেম্‌স্‌
ফুর্তি কর,
নাচো-গাও
আর ক্যাডবেরিস্‌
জেম্‌স্‌
খাও!
Cadbury's
MILK CHOCOLATE
GEMS
মাত্র
১ টাকা
AIYARS-C.165 BN

'আপনি গান করেন কি?' আবার প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, তা একটু-আধটু...'

'আপনার নামটা...?'

'বারীন্দ্রনাথ ভৌমিক।'

'তাই বলুন। বারীন ভৌমিক। তাই চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল। আপনি তো রেডিওতেও গেয়ে থাকেন মাঝে মাঝে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমার স্ত্রী আপনার খুব ভক্ত। দিল্লী যাচ্ছেন কি গানের ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ।'

বেশি ভেঙে বলবেন না বারীন। শুধু হ্যাঁ বা না-য়ে যদি উত্তর হয়, তবে তাই বলবেন।

'দিল্লীতে এক ভৌমিক আছে—ফিনান্সে। স্কটিশে পড়ত আমার সঙ্গে। নীতীশ ভৌমিক। আপনার কোনো ইয়ে-টিয়ে নাকি?'

ইয়ে-টিয়েই বটে। বারীনের খুড়তুতো দাদা। কড়া সাহেবী মেজাজের লোক, তাই বারীনের আত্মীয় হলেও সমগোত্রীয় নয়।

'আজ্ঞে না। আমি চিনি না।'

এখানে মিথ্যে বলাটাই শ্রেয় বিবেচনা করলেন বারীন। লোকটা এবার কথা বন্ধ করলে পারে। এত জেরা কেন রে বাপু!

যাক্, লাঞ্চ এসে গেছে। আশা করি কিছুক্ষণের জন্য প্রশ্নবাণ বন্ধ হবে।

হলও তাই। 'চ' ভোজনরসিক। একবার মুখে খাদ্য প্রবেশ করলে কথার রাস্তা যেন আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বারীন ভৌমিকের ভয় খানিকটা কেটে গেলেও একটা অসোয়াস্তি এখনো রয়ে গেছে। এখনো বিশ ঘণ্টার পথ বাকি। মানুষের স্মৃতিভাণ্ডার বড় আশ্চর্য জিনিস। কিসে খোঁচা মেরে কোন্ আদ্যিকালের কোন্ স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলবে তার কিছু ঠিক নেই। ওই যেমন 'র'টা'। বারীনের বিশ্বাস ওই বিশেষ কথাটা না শুনলে 'চ' যে ন'বছর আগের ঘড়ির মালিক 'চ' সে ধারণা কিছুতেই ওর মনে বদ্ধমূল হত না। সে-রকম বারীনেরও কোনো কথায় বা কাজে যদি তাঁর পুরোনো পরিচয়টা 'চ'-এর কাছে ধরা পড়ে যায়?

এইসব ভেবে বারীন স্থির করলেন যে, তিনি কথাও বলবেন না, কাজও করবেন না। খাবার পর মুখের সামনে হ্যাডলি চেজের বইটা খুলে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে রইলেন। প্রথম পরিচ্ছেদটা শেষ করে সাবধানে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন যে 'চ' ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্তত দেখলে তাই মনে হয়। ইলাস্-ট্রেটেড উইকলিটা হাত থেকে মেঝেতে পড়ে গেছে, চোখ দুটো হাতে ঢাকা, কিন্তু বুকের ওঠা-নামা দেখে ঘুমন্ত লোকের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ নিশ্বাস বলেই মনে হয়। বারীন জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চাইলেন। মাঠ-ঘাট, গাছ-পালা, খোলার বাড়ি মিলিয়ে বেহারের রুক্ষ দৃশ্য। জানালার ডবল কাঁচ ভেদ করে ট্রেনের শব্দ প্রায় পাওয়াই যায় না। যেন দূর থেকে শোনা অনেক মৃদঙ্গে একই সঙ্গে একই বোল তোলার শব্দ—ধাদ্ধিনাক্ নাদ্ধিনাক্ ধাদ্ধিনাক্ নাদ্ধিনাক্ ধাদ্ধিনাক্ নাদ্ধিনাক্...

এই শব্দের সঙ্গে আবার যোগ হল আরেকটি শব্দ। 'চ'-এর নাসিকাধ্বনি।

বারীন ভৌমিক অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। নজরুলের একটা বাছাই করা গানের প্রথম লাইনটা গুন্-গুন্ করে দেখলেন। সকালের মতো অতটা মসৃণ না হলেও, গলাটা তার নিজের কানে খারাপ লাগল না। এবার বেশি শব্দ না করে গলাটা খাঁক্‌রে তিনি গানটা আবার ধরলেন। এবং ধরেই তৎক্ষণাৎ তাঁকে থেমে যেতে হল।

একটা চরম বিভীষিকাজনক শব্দ তাঁর গলা শুকিয়ে দিয়ে গান বন্ধ করে দিয়েছে।

ঘড়িতে অ্যালার্ম বাজার শব্দ।

তাঁর ব্যাগের মধ্যে রাখা সুইস ঘড়িতে কেমন করে জানি অ্যালার্ম বেজে উঠেছে। এবং বেজেই চলেছে। বারীন ভৌমিকের হাত-পা পেটের মধ্যে সিঁধিয়ে গেছে। তাঁর দেহ কাষ্ঠবৎ। তাঁর দৃষ্টি ঘুমন্ত 'চ'-এর দিকে নিবদ্ধ।

'চ'-এর হাত যেন একটু নড়ল। বারীন প্রমাদ গুনলেন।

'চ'-এর ঘুম ভেঙেছে। চোখের উপর থেকে হাত সরে এল।

'গেলাসটা বুঝি? ওটাকে নামিয়ে রাখুন তো—ভাইব্রেট করছে।'

বারীন ভৌমিক দেয়ালে লাগানো লোহার আংটার ভেতর থেকে গেলাসটা তুলতেই শব্দটা থেমে গেল। সেটা টেবিলে রাখার আগে তার ভিতরের জলটুকু খেয়ে গলাটাকে ভিজিয়ে তিনি খানিকটা আরাম পেলেন। তবু গানের অবস্থায় আসতে দেরি আছে।

হাজারিবাগ রোডের কিছু আগে চা এল। পর পর দু পেয়ালা গরম চা খেয়ে এবং 'চ'-এর কাছ থেকে আর কোনোরকম জেরা বা সন্দেহের কোনো লক্ষণ না পেয়ে বারীনের গলা আরো অনেকটা খোলসা হল। বাইরে বিকেলের পড়ন্ত রোদ আর দূরের টিলার দিকে চেয়ে গাড়ির ছন্দের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে একটা আধুনিক গানের খানিকটা গুনগুন করে গেয়ে আসন্ন বিপদের শেষ আশঙ্কাটুকু তাঁর মন থেকে কেটে গেল।

গয়াতে 'চ' তার ন'বছরের আগের অভ্যাস অনুযায়ী প্ল্যাট-ফর্মে নেমে সেলোফোনে মোড়া দু প্যাকেট চানাচুর কিনে এনে তার একটা বারীন ভৌমিককে দিলেন। বারীন দিব্যি তৃপ্তির সঙ্গে সেটা খেলেন। গাড়ি ছাড়ার মুখে সূর্য ডুবে গেল। ঘরের বাতিগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে 'চ' বললে—

'আমরা কি লেট রান করছি? আপনার ঘড়িতে কটা বাজে'

এই প্রথম বারীন ভৌমিকের খেয়াল হল যে 'চ'-এর হাতে ঘড়ি নেই। ব্যাপারটা অনুধাবন করে তিনি বিস্মিত হলেন, এবং হয়ত সে বিস্ময়ের খানিকটা তাঁর চাহনিতে প্রকাশ পেল। পর-মুহূর্তেই খেয়াল হল 'চ'-এর প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়নি। নিজের ঘড়ির দিকে এক ঝলক দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'সাতটা পঁয়ত্রিশ।'

'তাহলে তো মোটামুটি টাইমেই যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ।'

'আমার ঘড়িটা আজই সকালে...এইচ এম টি...দিব্যি টাইম দিচ্ছিল...চাকরটা বিছানার চাদর ধরে এমন এক টান দিয়েছে যে ঘড়ি একেবারে...'

বারীন চুপ। তটস্থ। ঘড়ির প্রসঙ্গ তাঁর কাছে ষোল আনা অপ্রীতিকর, অবাঞ্ছনীয়।

'আপনারটা কী ঘড়ি?'

'এইচ এম টি।'

'ভালো সার্ভিস দিচ্ছে?'

'হুঁ।'

'আসলে আমার ঘড়ির লাক্‌টাই খারাপ।'

বারীন ভৌমিক একটা হাই তুলে নিজেকে নিরুদ্বিগ্ন প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় ব্যর্থ হলেন। তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অসাড়তা চোয়াল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। মুখ খুলল না। শ্রবণ-শক্তি লোপ পেলে তিনি সবচেয়ে খুশি হতেন, কিন্তু তা হবার নয়। 'চ'-এর কথা দিব্যি তাঁর কানে প্রবেশ করছে।—

'একটা সুইস ঘড়ি, জানেন—সোনার—ট্র্যাভলিং ক্লক—জিনিভা থেকে এনে দিয়েছিল আমার এক বন্ধু—এক মাসও ব্যবহার করিনি...ট্রেনে যাচ্ছি—দিল্লী—বছর আষ্টেক আগে—এই যে আমি-আপনি ট্র্যাভ্‌ল করচি, সেই রকম একটা কামরায় আমরা দুজন—আমি আর একটি ভদ্রলোক—বাঙালী...কী ডেয়ারিং ভেবে দেখুন! হয়তো বাথরুমে টাথরুমে গেছি,

কি স্টেশন এসেছে, প্ল্যাটফর্মে নেমেছি—আর সেই ফাঁকে ঘড়িটাকে বেমালুম ঝেপে দিল! অথচ দেখে বোঝার জো নেই—ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছে, দিব্যি ভদ্দরলোকের মতো চেহারা। খুন-টুন যে করে বসেনি এই ভাগ্যি। তারপর থেকে তো আর ট্রেনেই চড়িনি। এবারও প্লেনেই যেতুম, কিন্তু পাইলটদের স্ট্রাইকটা দিল ব্যাগড়া...

বারীন ভৌমিকের গলা শুকনো, ঠোঁটের চার পাশটা অবশ। অথচ তিনি বেশ বুঝতে পারছেন যে এতগুলো কথার পর কিছু না বললে অস্বাভাবিক হবে, এমন কি সন্দেহজনকও হতে পারে। প্রাণান্ত চেষ্টা করে, অসীম মনোবল প্রয়োগ করে, অবশেষে কয়েকটি কথা বেরোল মুখ দিয়ে—

'আপনি খোঁ-খোঁজ করেন নি?'

'আ-র খোঁজ! এসব কি আর খোঁজ করে ফেরত পাওয়া যায়? তবে লোকটার চেহারা মনে রেখেছিলুম অনেক দিন। এখনো আবছা-আবছা মনে পড়ে। মাঝারি রঙ, গোঁফ আছে, আপনারই মতো হাইট হবে, তবে রোগা। আর একটিবার যদি তার সাক্ষাৎ পেতুম তো বাপের নাম ভুলিয়ে দিতুম। এককালে বক্সিং করতুম, জানেন? লাইট হেভি-ওয়েট চ্যাম্পিয়ন ছিলুম। সে লোকের চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি যে আর দ্বিতীয়বার আমার সামনে পড়েনি...'

ভদ্রলোকের নামটাও মনে পড়ে গেছে। চক্রবর্তী। পুলক চক্রবর্তী। আশ্চর্য! ওই বক্সিং-এর কথাটা বলামাত্র নামটা সিনেমার টাইটেলের মতো যেন চোখের সামনে দেখতে পেলেন বারীন ভৌমিক। গতবারও বক্সিং নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন পুলক চক্রবর্তী।

কিন্তু নামটা জেনেই বা কী হবে? ইনি তো আর কোনো অপরাধ করেননি। অপরাধী বারীন নিজে। আর সেই অপরাধের বোঝা ক্রমেই দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। সব স্বীকার করলে কেমন হয়? ঘড়িটা ফেরত দিলে কেমন হয়? হাতের কাছে ব্যাগটা খুললেই ত—

দূর—পাগল! এসব কী চিন্তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন বারীন ভৌমিক? নিজেকে চোর বলে পরিচয় দেবেন? প্রখ্যাত কণ্ঠ-শিল্পী তিনি, তিনি না বলিয়া পরের দ্রব্য নেওয়ার কথা স্বীকার করবেন? তার ফলে তাঁর নাম যখন ধুলোয় লুটোবে তখন আর গানের ডাক আসবে কোত্থেকে? তাঁর ভক্তের দলই বা কী ভাববে, কী বলবে? ইনি নিজেই যে সাংবাদিক নন, বা সংবাদ-পত্রের সঙ্গে যুক্ত নন, তারই বা গ্যারান্টি কোথায়? না। স্বীকার করার প্রশ্নই ওঠে না।

হয়ত স্বীকার করার প্রয়োজনও নেই। পুলক চক্রবর্তী ঘন ঘন চাইছেন তাঁর দিকে। আরো ষোল ঘণ্টা আছে দিল্লী পৌঁছাতে। কোনো এক বীভৎস মুহূর্তে ফস্ করে চিনে ফেলার দীর্ঘ সুযোগ পড়ে আছে সামনে। আরে, এই তো সেই লোক! বারীন কল্পনা করল তাঁর গোঁফ খসে পড়ে গেছে। গাল থেকে মাংস ঝরে গেছে, চোখ থেকে চশমা খুলে গেছে; পুলক চক্রবর্তী এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে তাঁর ন' বছর আগের চেহারাটার দিকে, তাঁর ঈষৎ কটা চোখের দৃষ্টি ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয়ে আসছে, তাঁর ঠোঁটের কোণে ক্রূর হাসি ফুটে উঠছে। হুঁ হুঁ বাছাধন! পথে এসো এবার! অ্যাদ্দিন বাদে বাগে পেয়েছি তোমায়! ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ ত দেখনি...

দশটা নাগাৎ বারীন ভৌমিকের কম্প দিয়ে জ্বর এলো। গার্ডকে বলে তিনি একটি অতিরিক্ত কম্বল চেয়ে নিলেন। তারপর দুটি কম্বল একসঙ্গে পা থেকে নাক অবধি টেনে নিয়ে তিনি শয্যা নিলেন। পুলক চক্রবর্তী কামরার দরজা বন্ধ করে ছিট্‌কিনি লাগিয়ে দিল। বাতি নেভাতে গিয়ে বারীনের দিকে ফিরে জিগ্যেস করল, 'আপনাকে অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে! ওষুধ খাবেন? ভালো বড়ি আছে আমার কাছে, দুটো খেয়ে নিন। এয়ারকণ্ডিশনিং-এর অভ্যাস নেই বোধহয়?'

খুব সাবধানে চোখের পাতাদুটোকে যৎসামান্য ফাঁক করলেন বারীন।

ভৌমিক বড়ি খেলেন। একমাত্র ভরসা যে ঘড়ি চোর বলে চিনতে পারলেও তাঁকে অসুস্থ দেখে অনুকম্পাবশত পুলক চক্রবর্তী কঠিন শাস্তি থেকে বিরত হবেন। একটা ব্যাপারে তিনি ইতিমধ্যে স্থির করে ফেলেছেন। পুলক তাঁকে চিনতে না পারলেও, কাল দিল্লী পৌঁছবার আগে কোনো এক সুযোগে সুইস ঘড়িটি তার আসল মালিকের বাক্সের মধ্যে চালান দিতে হবে। যদি সম্ভব হয় তো মাঝরাত্রেই কাজটা সারা যেতে পারে। কিন্তু জ্বরটা না কমলে কম্বলের তলা থেকে বেরোন সম্ভব হবে না। এখনো মাঝে মাঝে সমস্ত শরীর কেঁপে উঠছে।

পুলক তাঁর মাথার কাছের রীডিং ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে রেখেছেন। তাঁর হাতে খোলা একটা পেপার-ব্যাক বই। কিন্তু তিনি কি সত্যিই পড়ছেন, না বইয়ের পাতায় চোখ রেখে অন্য কিছু চিন্তা করছেন? বইটা একভাবে ধরা রয়েছে কেন? পাতা উলটোচ্ছেন না কেন? কতক্ষণ সময় লাগে পাশাপাশি দুটো পাতা পড়তে?

এবার বারীন লক্ষ্য করলেন যে, পুলকের দৃষ্টি বইয়ের পাতা থেকে সরে আসছে। তাঁর মাথাটা ধীরে ধীরে পাশের দিকে ঘুরল। দৃষ্টি ঘুরে আসছে বারীনের দিকে। বারীন চোখ বন্ধ করলেন। বেশ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইলেন। এখনও কি পুলক চেয়ে আছে তাঁর দিকে? খুব সাবধানে চোখের পাতা দুটোকে যৎসামান্য ফাঁক করলেন বারীন। আবার তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে নিলেন। পুলক সটান চেয়ে আছে তাঁর দিকে। বারীন অনুভব করলেন তাঁর বুকের ভিতরে সেই ব্যাঙটা আবার লাফাতে শুরু করেছে। পাঁজরার হাড়ে আবার ধাক্কা পড়ছে—ধুক্‌পুক্‌... ধুক্‌পুক্‌...ধুক্‌পুক্‌...ধুক্‌পুক্‌...। দাদ্‌রার ছন্দ। ট্রেনের চাকার গম্ভীর ছন্দের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে সে ছন্দ।

একটা মৃদু 'খচ্‌' শব্দের সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ অবস্থাতেই বারীন বুঝতে পারলেন যে, কামরার শেষ বাতিটাও নিভে গেছে। এবার সাহস পেয়ে চোখ খুলে বারীন দেখলেন যে, দরজার পর্দার ফাঁক দিয়ে আসা ক্ষীণ আলো কামরার অন্ধকারকে জমাট বাঁধতে দেয়নি। সেই আলোয় দেখা গেল পুলক চক্রবর্তী তাঁর হাতের বইটা বারীনের ব্যাগের পাশে রাখলেন। তারপর কম্বলটাকে একেবারে থুৎনি অবধি টেনে নিয়ে পাশ ফিরে বারীনের মুখোমুখি হয়ে একটা সশব্দ হাই তুললেন।

বারীন ভৌমিক টের পেলেন তাঁর হৃৎস্পন্দন ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। কাল সকালে—হ্যাঁ, কাল সকালে—পুলকের ট্র্যাভলিং ক্লক তাঁর নিজের ব্যাগ থেকে পুলকের সুটকেসের জামা-কাপড়ের তলায় চালান দিতে হবে। সুটকেসে চাবি লাগানো নেই। একটুক্ষণ আগেই পুলক স্লিপিং সুট বার করে পরেছে। বারীনের কাঁপুনি বন্ধ হয়ে গেছে। বোধহয় ওষুধে কাজ দিয়েছে। কী ওষুধ দিলেন ভদ্রলোক? নামটা তো জিগ্যেস করা হয়নি। অসুস্থতার ফলে দিল্লীর সংগীত-রসিকদের বাহবা থেকে যাতে বঞ্চিত না হন সেই আশায় অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে পুলক চক্রবর্তীর দেওয়া বড়ি গিলেছেন তিনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে...

নাঃ, এসব চিন্তাকে প্রশ্রয় দেবেন না তিনি। গেলাসের ঠুনঠুনিকে অ্যালার্ম ক্লক ভেবে কী অবস্থা হয়েছিল! এসবের জন্য দায়ী তাঁর অপরাধবোধ-জর্জরিত অসুস্থ মন। কাল সকালে তিনি এর প্রতীকারের ব্যবস্থা করবেন। মন খোলসা না হলে গলা খুলবে না, গান বেরোবে না। বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন...

চায়ের সরঞ্জামের টুংটাং শব্দে বারীন ভৌমিকের ঘুম ভাঙল। বেয়ারা এসেছে ট্রে নিয়ে। চা রুটি মাখন ডিমের অমলেট। এসব তাঁর চলবে কি? জ্বর আছে কি এখনো? না, নেই। শরীর ঝরঝরে হয়ে গেছে। মোক্ষম ওষুধ দিয়েছিলেন পুলক চক্রবর্তী। ভদ্রলোকের প্রতি একটা কৃতজ্ঞতার ভাব জেগে উঠল বারীনের মনে।

কিন্তু তিনি কোথায়? বাথরুমে বোধহয়। নাকি করিডরে? বেয়ারা চলে গেলে পর বারীন বাইরে বেরোলেন। করিডর খালি। কতক্ষণ হল বাথরুমে গেছেন ভদ্রলোক? একটা চান্স নেওয়া যায় কি?

উজ্জ্বল হাসির
মধুর ছটা
খাটাউ
ভয়েলস-এ
দি খাটাউ মাকনজী স্পিনিং অ্যাণ্ড উইভিং কোম্পানী লিমিটেড
হেড অফিস: লক্ষ্মী বিল্ডিং, ব্যালার্ড এস্টেট, বম্বে-১
মিল: হেনস রোড, বাইকুল্লা, বম্বে-২৭
পাইকারী দোকান: মুলজী জেঠা মার্কেট, বম্বে-২
KMS-23/PREM ASSOCIATES

সুটকেশ টেনে বার করার জন্যে নিচু হতে না হতেই...

বারীন চান্সটা নিলেন বটে, কিন্তু সফল হলেন না। ব্যাগ থেকে ঘড়ি বার করে পুলক চক্রবর্তীর সুটকেস টেনে বার করার জন্য নিচু হতে না হতেই ভদ্রলোক তোয়ালে ও ক্ষৌরীর সরঞ্জাম হাতে কামরায় এসে ঢুকলেন। বারীন ভৌমিক তাঁর ডান হাতটা মুঠো করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

'কেমন আছেন? অলরাইট?'

'হ্যাঁ। ইয়ে...এটা চিনতে পারছেন?'

বারীন তাঁর মুঠো খুলে ঘড়ি সমেত হাতটা পুলকের সামনে ধরলেন। তাঁর মনে এখন একটা আশ্চর্য দৃঢ়তা এসেছে। চুরির ব্যারাম তিনি অনেক দিন কাটিয়ে উঠেছেন, কিন্তু এই যে লুকোচুরি, সেটাও তো চুরি, এই ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় কিন্তু-কিন্তু করছি-করব ভাব, এই তলপেট-খালি, গলা-শুকনো, কান-গরম, বুক-ধুক্‌পুক্‌—এটাও ত একটা ব্যারাম। এটাকে কাটিয়ে না উঠলে নিস্তার নেই, সোয়াস্তি নেই।

পুলক চক্রবর্তী হাতের তোয়ালের একটা অংশ তাঁর ডান হাতের তর্জনীর সাহায্যে সবেমাত্র কানের মধ্যে গুঁজেছিলেন, এমন সময় বারীনের হাতে ঘড়িটা দেখে হাত তাঁর কানেই রয়ে গেল। বারীন বললেন, 'আমিই সেই লোক। মোটা হয়েছি, গোঁফটা কামিয়েছি, আর চশমা নিয়েছি। আমি পাটনা যাচ্ছিলাম, আপনি দিল্লী। সিক্সটি-ফোরে। সেই যে একটি লোক কাটা পড়ল, আপনি দেখতে নামলেন, সেই সুযোগে আমি ঘড়িটা নিয়ে নিই।'

পুলকের দৃষ্টি এখন ঘড়ি থেকে সরে গিয়ে বারীনের চোখের উপর নিবদ্ধ হল। বারীন দেখলেন তাঁর কপালের মাঝ-

খানে নাকের উপর দুটো সমান্তরাল খাঁজ, চোখের সাদা অংশটা অস্বাভাবিক রকম প্রকট, ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গিয়ে কিছু বলার জন্য তৈরি হয়েও কিছু বলতে পারছে না। বারীন বলে চললেন—

'আসলে ওটা আমার একটা ব্যারাম, জানেন। মানে, আমি আসলে চোর নই। ডাক্তারীতে এর একটা নাম আছে, এখন মনে পড়ছে না। যাই হোক, এখন আমি একেবারে, মানে, নরম্যাল। ঘড়িটা অ্যাদ্দিন ছিল, ব্যবহার করেছি, আজও সঙ্গে রয়েছে, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—প্রায় মিরাক্‌লের মতো—তাই আপনাকে ফেরত দিচ্ছি। আশা করি আপনার মনে কোনো... ইয়ে থাকবে না।'

পুলক চক্রবর্তী অস্ফুট একটা 'থ্যাঙ্কস' ছাড়া আর কিছু বলতে পারলেন না। তাঁর হারানো ঘড়ি তাঁর নিজের কাছে ফিরে এসেছে, হতভম্ব ভাবে সেটি হাতে নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। বারীন তাঁর ব্যাগ থেকে দাঁতের মাজন, টুথব্রাশ ও দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম বার করে তোয়ালেটা র‍্যাক্ থেকে নামিয়ে নিয়ে কামরার দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে নজরুলের 'কত রাতি পোহায় বিফলে' গানের খানিকটা গেয়ে বুঝলেন যে তাঁর কণ্ঠের স্বাভাবিক সাবলীলতা তিনি ফিরে পেয়েছেন।

ফাইনান্সের এন. সি. ভৌমিককে টেলিফোনে পেতে প্রায় তিন মিনিট সময় লাগল। শেষে একটা পরিচিত গম্ভীর কণ্ঠে শোনা গেল 'হ্যালো'।

'কে, নীতীশদা? আমি ভোঁদু।'

'কীরে, তুই এসে গেচিস? আজ যাব তোর গলাবাজি শুনতে। তুইও একটা কেউকেটা হয়ে গেলি শেষটায়? ভাবা যায় না!...যাক্, কী খবর বল্। হঠাৎ নীতীশদাকে মনে পড়ল কেন?'

'ইয়ে—পুলক চক্রবর্তী বলে কাউকে চিনতে? তোমার সঙ্গে নাকি স্কটিশে পড়ত। বক্সিং করত।'

'কে, ঝাড়ুদার?'

'ঝাড়ুদার?'

'ও যে সব জিনিসপত্তর ঝেড়ে দিত। এর-ওর ফাউন্টেন পেন, লাইব্রেরীর বই, কমন-রুম থেকে টেবিল টেনিস ব্যাট। আমার প্রথম রনসনটা ত ওই ঝেড়েছিল। অথচ অভাব-টভাব নেই, বাপ রিচ ম্যান। ওটা এক ধরনের ব্যারাম, জানিস তো?'

'ব্যারাম?'

'জানিস না? ক্লেপ্‌টোমেনিয়া। কে-এল-ই-পি...'

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে বারীন ভৌমিক তাঁর খোলা সুটকেসটার দিকে দেখলেন। হোটেলে এসে সুটকেস খুলতেই কিছু জিনিসের অভাব তিনি লক্ষ্য করেছেন। এক কার্টন থ্রী কাস্‌লস সিগারেট, একটা জাপানী বাইনোকুলার, পাঁচটা একশো টাকার নোট সমেত একটা মনি-ব্যাগ।

ক্লেপ্‌টোমেনিয়া। বারীন নামটা জানতেন, কিন্তু ভুলে গেছিলেন। আর ভুলবেন না।

RUBY
DUST
Superb Teas
SELECTED
FOR STRENGTH
AND FLAVOUR
RUBY
DUST
স্বাদ আর আমেজে ভরে তুলুন
উৎসবের দিন আর অবসরের মুহূর্তগুলি
LIPTON
লিপটন
বলতেই
ভালো চা
LIPTON'S
RICHBRU TEA
LIPTON'S
RICHBRU
TOP QUALITY LEAF TEA
LIPTON'S
RICHBRU TEA
LGC-135 BEN

ছবি এঁকেছেন শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

পৃথিবী বাড়ল না কেন?

প্রেমেন্দ্র মিত্র

চিত্রার্পিত কথাটা সবাই নিশ্চয়ই জানে।

আমি জানতাম না।

অন্তত অমন চাক্ষুষভাবে মানেটা বোঝবার সুযোগ কখনো পাইনি।

সেদিন পেলাম।

সেদিন মানে, শুভ ২৪শে আষাঢ়* খৃষ্টাব্দ ৯ই জুলাই অ ২৪ আহাব মুং ১৫ জম-য়ল, প্রতিপদ দং ২৫।৩৬।০ ঘ ৩।১৪।৪৯ উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র দং ৪৮।৩০।৫৬ রাত্রি ঘ ১২।২৪।৪৭ ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তারিখটা ত বুঝলাম কিন্তু সালটা কি কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহলে বলব পাঁজি দেখে নিন।

আর মানে জানতে চাইলে অকপটে সত্য কথাটা স্বীকার করব।

মানে আমি কিছুই জানি না এবং বুঝিনি।

শুধু দিনটা পার হয়ে যাবার পর তার আশ্চর্য কাণ্ডকারখানার কারণ কিছু কোথাও পাওয়া যায় কি না খোঁজার চেষ্টায় পাঁজি খুলে ওই সব বুকনি পেয়ে মাথাটা আরো গুলিয়ে গিয়েছিল।

দিনটা সত্যিই অদ্ভুত।

অমন যে বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের দোতালার আড্ডাঘর সেখানেও অমন কাণ্ড বুঝি কখনো হয়নি।

সে কাণ্ড বর্ণনা করতে গেলে প্রথমে ওই চিত্রার্পিত দিয়েই সুরু করতে হয়।

হ্যাঁ আমরা সবাই চিত্রার্পিত।

আমরা মানে আমি শিবু শিশির গৌর ত বটেই, তাঁর মৌরসী আরামকেদারায় স্বয়ং ঘনাদাও তাই।

সবাই মিলে যেন নড়ন চড়ন হীন একটা আঁকা ছবি।

ছবিটা আবার সহজ স্বাভাবিক নয়। যেন একটা সচিত্র রহস্য-গল্পের পাতা খুলে বার করা।

রহস্যটাও যে সাধারণ নয় তা ঘনাদা আর আমাদের সকলের চোখমুখের ভাব থেকেই বোঝবার। আমরা সবাই যেন ভূত দেখেছি।

ঘনাদার চেহারাটাই সবচেয়ে দেখবার মত। চোখগুলো যেন কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসবার যোগাড়। আর মুখটা একেবারে হাঁ।

তা চোখ মুখের আর অপারাধ কি?

ব্যাপার যা ঘটেছে তাতে আর কেউ হলে খানিকটা বেহুঁশ হলেও বলার কিছু থাকত না। ঘনাদা বলেই তাই শুধু চোখ-দুটো ছানাবড়ার বেশী আর কিছু করেননি।

ধানাই পানাই একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে মনে করে যদি কেউ ধৈর্য হারিয়ে থাকেন তাহলে ব্যাখ্যাটা আর চেপে রাখা নিরাপদ হবে না। সবিস্তারে খুলেই বলা যাক ঘটনাটা।

শুক্রবারের সন্ধ্যা, নিচের হেঁশেলে রামভুজ রাতের জন্যে

স্পেশ্যাল মেনুর আয়োজনে ব্যস্ত। বনোয়ারীকেও যখন দেখা যাচ্ছে না তখন সেও সেই বড় ধান্দায় নিশ্চয় কোথাও প্রেরিত হয়েছে ধরে নিতে হবে।

সন্ধ্যের আসর ইতিমধ্যে জমে ওঠবার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। রাত্রের স্পেশাল মেনু আগাগোড়া ঘনাদার নির্দেশ মাফিকই তৈরী হয়েছে। ঘনাদা তাই প্রসন্ন মনে একটু আগে আগেই আমাদের আড্ডাঘরে এসে তাঁর মৌরসী কেদারা দখল করেছেন। আমরাও হাজিরা দিতে দেরী করিনি।

আসল নাটকের যবনিকা ওঠবার আগে যেমন সামান্য একটু অরকেস্ট্রা বাদন, তেমনি রাতের ভুরিভোজের ভূমিকা হিসাবে কিছু টুকিটাকির ব্যবস্থা হয়েছে।

বনোয়ারী অনুপস্থিত। তাই আমরা নিজেরাই পরিবেশনের ভার নিয়েছি। কাঁথামুড়ি টি-পটের সঙ্গে পেয়ালা টেয়ালা ইত্যাদি সাজসরঞ্জাম সমেত ট্রেটা শিশির নিজেই নিয়ে এসেছে বয়ে। ট্রের ওপর এখনো-না-খোলা চোখ-জুড়োনো সিগারেটের টিনটা সাজিয়ে আনতেও ভোলেনি।

শিশির তার ট্রেটা একটা টিপয়ে রাখতে না রাখতে আমি আরেকটা ট্রে নিয়ে এসে হাজির হয়েছি। সিগারেটের টিনটা না আমার ট্রের প্লেটগুলোর দিকে চোখ দেবেন ঠিক করতে না পেরে ঘনাদার তখন প্রায় ট্যারা হবার অবস্থা।

আমি আমার ট্রে থেকে জোড়া ফিশরোলের প্লেটটা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে সে সঙ্কট কিছুটা মোচন করেছি।

তারপর আমরা নিজেরাও এক একটা প্লেট নিয়ে যথাস্থানে বসবার পর বরটর দেবার আগে দেবতাদের মত একটা প্রসন্ন হাসি মুখে মাখিয়ে ঘনাদা তাঁর প্লেট থেকে একটি ফিশরোল সবে তুলতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে—

এমন সময়ে সেই তাজ্জব কান্ড!

হঠাৎ যেন বাইরের বারান্দায় শুনলাম,—অয়মহম ভোঃ!

তারপরের মুহূর্তেই 'তিষ্ঠ' শুনে মুখ ফেরাবার আগেই ঘনাদার দিকে চেয়ে চক্ষু স্থির।

ঘনাদার প্লেটের ফিশরোল তাঁর হাতে নেই, মুখে নেই, তাঁর ঠিক নাকের ওপরে ঝুলছে!

এমন ব্যাপারে একেবারে চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে যা হলাম তাকে চিত্রার্পিত বলে বর্ণনা করা খুব ভুল হয় কি!

এ ঝুলন্ত ফিশরোলের ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে আসর-ঘরের মধ্যে এক নাটকীয় প্রবেশে আমাদের চটকা ভাঙল।

ঘরের মধ্যে যিনি তখন এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁকে বর্ণনা করব কেমন করে সেইটাই ভেবে পাচ্ছি না।

জটাজুটধারী বলে শুরু করে ওইখানেই থামতে হয়। তারপর সন্ন্যাসী আর বলা চলে না। কারণ মাথায় বোটানিক্সের বটের ঝুরির মত জটা আর মুখে একমুখ গোঁফ দাড়ির কঙ্গো থুড়ি 'জা-ঈ'-র জঙ্গল থাকলেও তারপর কৌপীন বাঘছাল কমণ্ডলু চিমটে টিমটে কিছু নেই। নেহাৎ সাধারণ পাঞ্জাবী পাজামা। তবে ছোপটা একটু অবশ্য গেরুয়া।

এ হেন মূর্তি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত তুলে যেন ঘনাদাকেই বিশেষভাবে নির্দেশ করে বজ্রস্বরে ভর্ৎসনা করলেন —লজ্জা করে না তোমাদের! অতিথি যখন দ্বারে সমাগত তখন তার পরিচর্যার ব্যবস্থা না করে নিজেদের ভোজনবিলাসে মত্ত হয়েছ?

কথাগুলোয় সংস্কৃতের ঝংকার থাকলেও এবার ভাষাটা মোটামুটি বাংলা।

কিন্তু বাংলা বা সংস্কৃত যাই হোক ওই ভর্ৎসনায় আমাদের অবস্থাটা খুব সুবিধের হবার ত কথা নয়।

ঘনাদার দিকে একবার চেয়ে তাঁর অবস্থাটাও বুঝে নিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আর ফুরসৎ মিলল না।

আধা-সন্ন্যাসী আগন্তুকের বজ্রস্বর আবার শোনা গেল আর সেই সঙ্গে আরেক ভোজবাজি!

যে লোভে অতিথির অমর্যাদা করেছ, দুর্বাসার আধুনিক সংস্করণ তখন গর্জন করছেন,—সেই লোভের গ্রাসেই তাহলে ছাই পড়ুক!

এই অভিশাপ বাণী মুখ থেকে খসতে না খসতে ঘনাদার নাকের সামনে ঝুলন্ত ফিশরোল যেন লাফ দিয়ে ছাতে গিয়ে ঠেকে ছত্রাকার হয়ে গুঁড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

আমরা তখন হাঁ, হাঁ করে সবাই দাঁড়িয়ে উঠেছি।

আমাদের শোক তখন ছাদে ঠেকে ছত্রাকার ফিশরোলের জন্যে নয়। আমাদের সব উদ্বেগ ঘনাদার মুখের দিকে চেয়ে।

ব্যাপারটা কেমন মাত্রাছাড়া হয়ে গেল কি?

কি করবেন এবার ঘনাদা?

এস্পার ওস্পার একটা কিছু করে ফেলবেন না কি? আরাম-কেদারা ছেড়ে উঠেই চলে যাবেন না কি গটগটিয়ে তাঁর টঙের ঘরে? না, দুর্বাসার নতুন এডিশন্‌কে পাল্টা গর্জন শুনিয়ে ছাড়বেন।

ভুল, সব অনুমান আমাদের ভুল।

ঘনাদাকে অত সহজে যদি চেনা যেত তাহলে আমরা এমন কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁর কাছে নাড়া বেঁধে থাকি!

দ্বিতীয় দুর্বাসার প্রতি গর্জন বা নিজের টঙের ঘরে সটান প্রস্থান, কিছুই করলেন না ঘনাদা।

তার বদলে আমাদের সকলকে একেবারে থ' করে নিজে থেকেই দাঁড়িয়ে উঠে ঘনাদার সে কি বিনয়ের ভঙ্গি!

—ননুক্রিয়তামাসনপরিগ্রহঃ। অবহিতোঽস্মি!

কিন্তু সেই সঙ্গে আবোল তাবোল বলছেন কি ঘনাদা! হঠাৎ নাকের ডগা থেকে 'ফিশ্‌রোল' উধাও হয়ে গেছে বলে মাথাটাই বিগড়ে গেল নাকি!

আমরা যখন ভ্যাবাচাকা মেরে দাঁড়িয়ে, ঘনাদা তারই মধ্যে নিজের কেদারাই ঠেলে দিয়েছেন দু নম্বর দুর্বাসার দিকে।

দুর্বাসা ঠাকুরও কি একটু দিশাহারা!

তাঁর দাড়ি গোঁফের জঙ্গল ভেদ করে ভাবটা ঠিক বোঝা গেল না। তবে ঘনাদার বিনয়েই বোধহয় রাগটা তখন তাঁর প্রায় জল হয়ে গেছে মনে হল। ঘনাদার এগিয়ে দেওয়া কেদারাটা না নিয়ে তিনি নিজেই কোণ থেকে আরেকটা চেয়ার টেনে বসে একটু প্রসন্ন কণ্ঠেই বললেন,—যাক্‌ আমি প্রীত হয়েছি তোমার বিনয়ে আর দেব-ভাষার প্রয়োগে! আমার ক্রোধ আমি সংবরণ করলাম।

আমাদের ভাগ্য ভালো যে যত খটমটই হোক দ্বিতীয় দুর্বাসার কথাটা এবার বাংলা বলেই বুঝলাম। কিন্তু দেবভাষার কথা কি বললেন উনি!

দেবভাষা মানে ত সংস্কৃত। আবোল তাবোল নয়, ঘনাদা তাহলে সংস্কৃতই বলেছেন জবাবে!

এবার দুর্বাসা দি সেকেন্ডের সঙ্গে আলাপে তিনি যদি সেই সংস্কৃত চালান তাহলেই ত গেছি!

না। সে বিপদটা কলির দুর্বাসার একটা চালের দরুনই কাটল বলা যায়। দুর্বাসা ঠাকুর শুধু ক্রোধ সংবরণ করেই তখন ক্ষান্ত হলেন না, সেই সঙ্গে ক্ষমায় উদার হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমাদের মধ্যে ঘনশ্যাম কার নাম?

প্রশ্নটা শুনেই চমকে উঠেছিলাম। যত উদার ভাবেই করা হোক চালটা নেহাৎ কাঁচা হয়ে গেল না? বাহাত্তর নম্বরে ঢুকে ঘনশ্যাম কার নাম ঘনাদাকেই জিজ্ঞাসা করা!

এই এক বেয়াড়া প্রশ্নেই অন্য দিন হলে ত সব বানচাল হয়ে যেত।

আজ কিন্তু যাকে বলে অঘটন ঘটার দিন। শুধু ফিশরোল-এর বেলা নয় সব কিছুতেই যেন ভোজবাজি হয়ে যাচ্ছে! কাঁচা চালেই কাজ হয়ে গেল।

অমন একটা প্রশ্নেও ঘনাদা ফাটলেন না, বরং বিনয়ে গলে গিয়ে সংস্কৃত থেকে সরল না হোক, কাঁকর বালি সমেত অন্তত

এমন সময়ে সেই তাজ্জব কাণ্ড!

বোধগম্য বাংলায় নেমে এলেন।

আজ্ঞে অধীনের নামই ঘনশ্যাম! ঘনাদার মুখে লজ্জিত স্বীকৃতি শুনে আমরাই তাজ্জব,—আপনার প্রতি অমনোযোগের অপরাধে মার্জনা ভিক্ষা করছি। সত্যিই আপনাকে প্রথমে চিনতে পারিনি।

প্রথমে চিনতে পারোনি!—দুর্বাসা ঠাকুরের গলা যেন একটু কাঁপা,—এখন পেরেছ নাকি?

না।—কুণ্ঠিতভাবে জানালেন ঘনাদা,—তবে গোড়ায় আপনাকে সেই মালাঞ্জা এম্‌পালে বলে ভুল করেছিলাম।

মা-লা-ঞ্জা এম্‌-পা-লে!—দুর্বাসা মুনির গলার স্বরটা এবার দাড়ি গোঁফের জঙ্গলেই যেন প্রায় চাপা পড়ে গেল,—আমাকে ওই, ওই, তাই ভেবেছিলে!

আজ্ঞে হ্যাঁ,—ঘনাদা নিজের ভুলের জন্যে যেন অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে বললেন,—সেই যে সাংকুর নদীর ধারে এমবুজি মাঈ থেকে চোরাই হীরে পাচার করার জন্যে আমায় ম্যাজিকের ধোঁকা দিয়ে এপুলুতে নিয়ে গিয়ে মিথ্যে খবরে ইতুরির গহন বনে পাঠিয়ে জংলীদের ঝোলানো ফাঁদে ফাঁসিতে লটকে মারবার চেষ্টা করেছিল, আর যার মতলব হাসিল হলে পৃথিবী আরো বিরাট হয়ে দুনিয়ার কি দশা হত জানি না, সেই মালাঞ্জা এমপালে ভেবেই আপনাকে একটু তাচ্ছিল্য করেছিলাম গোড়ায়। তবে—

অত্যন্ত বিশ্রী কষ্টকর স্মৃতি মনে না আনবার জন্যেই ঘনাদা যেন চেপে গিয়ে দুঃখের নিশ্বাস ফেলে বললেন,—থাক সে কথা!

থাকবে মানে!—আমরা অস্থির হয়ে উঠলাম। বলেন কি ঘনাদা! চোরাই হীরে ম্যাজিকে পাচার করার ব্যাপারে ইতুরি না ফিতুরির জঙ্গলে ঘনাদা ঝোলানো ফাঁস থেকে ফাঁসি যেতে যেতে বাঁচলেন, আর দুনিয়া তাতে আরো বিরাট হতে না পেরে কি দশা থেকে বাঁচল কেউ জানে না,—এতদূর শুনে আমরা ঘনাদাকে 'থাক্' বলে থামতে দেব! কিন্তু আমাদের মুখ খুলতে হল না।

না না থাকবে কেন?—আমাদের আগে দুর্বাসাই নাছোড়বান্দা হলেন,—মনে যখন হয়েছে তখন বলেই ফেলো। বদখদ্ কিছু হলে সে স্মৃতি পেটে রাখতে নেই, বুঝেছ কি না? তাতে আবার

নিজেকে বাঁচাতে শিখছে ও...
বাবা, সকালে সুনীল আমাকে মারলো...
তুমিও উল্টে মেরে দিলে না কেন? নিজেকে বাঁচাতে শিখতে হবে তো!
ঘুষি খাওয়া এড়ানোর একটা উপায় হল একপা পেছনে বা পাশের দিকে সরে যাওয়া। কিম্বা, কোমর থেকে শরীরের ওপর দিকটা পিছিয়ে নেওয়া।
নয়তো, হাতের কব্জি দিয়ে মারটা আটকাতে পারো।
কিম্বা, হাত বা কাঁধ বাড়িয়ে মারটা নিতে পারো।
বেশ! তাহলে বক্সিংয়ে নিজেকে বাঁচাবার প্রথম পাঠটা শিখলে তো?
উরেঃ বাবা! এত দেরী হয়ে গেছে! শিগগির শুয়ে পড়ো, রোহিত! ওহো-দাঁড়াও! দাঁতব্রাশ করেছ?
লক্ষ্মীটি বাবা! সে তো রোজ সকালে উঠেই করি!
উঁহুঃ! তা চলবে না—রোজ রাত্রে আর সকালে দাঁত মাজা চাইই চাই। যে সব খাবারের কুচি পচে দাঁত ক্ষইয়ে ফেলে—তাদের বের করে ফেলতে হবে তো! মাড়িও মালিশ করবে বুঝলে? তাহলে মাড়ি সুস্থ আর মজবুত হবে।
এসো, দুজনে মিলে ফরহ্যান্স টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করে নিই।
আচ্ছা, বাবা!
Forhan's
FOR THE GUMS
ফরহ্যান্স
টুথপেস্ট
এক দন্তচিকিৎসকের তৈরী
50 F-203 BN

-বদহজম হয়।

না, বদহজম আর কি হবে!—ঘনাদা একটু যেন হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন,—পেটেই যখন কিছু পড়েনি।

তাও ত বটে! তাও ত বটে!—দুর্বাসা ঠাকুরই এবার বেশ ব্যতিব্যস্ত—আমি আবার অভিশাপটা ভুল করে দিয়ে ফেলে খাওয়াটাই নষ্ট করে দিয়েছি। তা তোমরা...

দুর্বাসা আমাদের দিকে ফিরলেন। ফেরার অবশ্য দরকার ছিল না। ঘনাদার মুখের খেদটুকু শেষ হতে না হতে শিশির শিবু দুজনেই ছুটে নেমে গেছে নিচে।

দুর্বাসা যখন মুখ ফেরালেন তখন দুজনেই ফিরে দরজা পেরিয়ে ঘরের ভেতরে এসে হাজির দুটি প্রমাণ সাইজের প্লেট হাতে নিয়ে।

তার একটা ঘনাদার আর অন্যটি দুর্বাসার হাতে দিতে দুর্বাসাই অত্যন্ত বিব্রত। আমি মানে—আমি——প্লেটটার জোড়া ফিশরোলের দিকে চেয়ে তাঁর যেন করুণ আর্তনাদ,—আমি ত কি বলে...

তা দুর্বাসার আর্তনাদ নেহাৎই অকারণ নয়। মাথার জটা ছাড়া দাড়ি গোঁফের যা জঙ্গল তিনি মুখে গজিয়েছেন তার ভেতর দিয়ে কিছু চালান করাই ত সমস্যা।

ঘনাদা নিজের প্লেটটির প্রতি যথাবিহিত মনোযোগ দিতে দিতেই আমাদের সেজন্যে ভর্ৎসনা করলেন,—কি তোমাদের আক্কেল! ওঁকে এই সব খাবার দিয়ে অপমান করছ!

অপমান!—আমরা সত্যিই সন্ত্রস্ত,—অপমান কি করলাম?

অপমান নয়?—ঘনাদা বেশ ধীরে সুস্থে তাঁর ফিশরোল দুটির সদ্গতি করে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বললেন—ওঁকে কিছু খেতে বলাই ত অপমান। তোমার আমার মত গাণ্ডেপিণ্ডে খেলে ওঁর এমন যোগ-শক্তি হয়, না ওই জটাজুটের ভার উনি বইতে পারেন! যিনি স্রেফ হাওয়ার সঙ্গে হয়ত দু ফোঁটার বেশী জল মেশান না, তাঁকে দিয়েছ কিনা ফিশরোল! ছিছি তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত।

আমাদের লজ্জা থেকে বাঁচাতে ঘনাদা তখন চায়ের পেয়ালা রেখে দুর্বাসা দি সেকেণ্ডের কাছেই গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে ফিশরোলের প্লেটটা দুর্বাসার কোল থেকে সরিয়ে নিজের আসনে এসে বসতে বসতে বললেন,—চোখের ওপর জিনিসটা নষ্ট হতে দিতে খারাপ লাগে তাই, নইলে ওঁর সামনে কিছু মুখে দিতেই সঙ্কোচ হয়।

ঘনাদার ডান হাতের কাজ তখন আবার শুরু হয়ে গেছে। তা দেখে আমরা যদি অবাক হওয়ার সঙ্গে একটু মজা পেয়ে থাকি, আমাদের দুর্বাসা ঠাকুরের চেহারাটা যেন হতভম্ব হওয়ার চেয়ে বেশী কিছু মনে হ'ল। দাড়ি গোঁফের অরণ্যের ভেতর দিয়ে তাঁর দু চোখের দৃষ্টির প্রায় জ্বলন্ত ভাবটাও খেতে দেওয়ার অপমান থেকে বাঁচাবার জন্যে ঘনাদার প্রতি কৃতজ্ঞতা কিনা ঠিক বোঝা গেল না।

ঘনাদা ইতিমধ্যে অবশ্য আমাদের সকলের হয়ে তাঁর প্রায়শ্চিত্তটা সেরে ফেলে পেয়ালায় নতুন করে চা ঢেলেছেন। শিশিরও তার যথাকর্তব্য ভোলেনি।

শিশিরের এগিয়ে ও জ্বালিয়ে দেওয়া যে সিগারেট থেকে বার-করা ধোঁয়ার বহর দেখে একটু ভরসা পেয়ে কেমন করে আবার আসল কথাটা তুলব ভাবছি, এমন সময় ঘনাদা নিজে থেকেই সদয় হলেন।

আমাদের যোগিবর দুর্বাসার কাছ থেকেই যেন অনুমতি চেয়ে বললেন,—পেটের কথা চেপে রাখতে নেই বলছিলেন না! আপনার উপদেশই মানতে চাই। শুধু ভাবছি এ সব বিশ্রী কথা আপনার সামনে বলা কি ঠিক হবে?

খুব হবে! খুব হবে!—দুর্বাসার হয়ে আমরা এবার সমস্বরে উৎসাহ দিলাম।

আমাদের উৎসাহটুকুর জন্যেই ঘনাদা যেন অপেক্ষা করছিলেন।

এর পর আর তাঁকে উস্কে দেবার দরকার হল না। নিজের স্টীমেই বলে চললেন,—আসল কথা কি জানো? ওঁকে মালাঞ্জা এমপালে ভাবার জন্যেই এমন লজ্জা হচ্ছে। কোথায় উনি আর কোথায় সেই শয়তানের শিরোমণি। চেহারায় মিল আছে ঠিকই; মালাঞ্জা অবশ্য আরো ফর্সা ছিল, আরো মোটাসোটা জোয়ান চেহারার। তবে ওঁকে দেখে ভেবেছিলাম নিজের শয়তানির সাজাতেই বুঝি মালাঞ্জা এমন শুঁটকো মর্কট মার্কা হয়ে গেছে।

ঘনাদা গলা খাঁকরি দেবার জন্যে একটু থামলেন। আমাদের তখন যোগিবর দুর্বাসার দিকে একবার তাকাবারও সাহস নেই।

মালাঞ্জার ম্যাজিকও ছিল উঁচু দরের,—ঘনাদা আবার সুরু করে আমাদের যেন বাঁচালেন।—প্রথম ম্যাজিক দেখিয়েই সে আমায় মোহিত করে। একটা মানুষের খোঁজে প্রায় অর্ধেক পৃথিবী ঘুরে তখন এমবুজি মাঈ শহরে এসে কদিনের জন্যে আছি। এমবুজি মাঈ শহর হিসেবে এমন কিছুই নয়, কিন্তু সেখান থেকে মাসে দুবার নিতান্ত ছোট দু এঞ্জিনের এমন একটা প্লেন ছাড়ে যা হুমকি দিয়ে একবার হাইজ্যাক্ করতে পারলে মঙ্গলগ্রহে না হোক চাঁদে অমন পাঁচটা রকেট নামানোর খরচ উঠে যায়।

এমবুজি মাঈ-এর কথা আপনি ত সবই জানেন!—ঘনাদা দুর্বাসাকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন হঠাৎ।

আমি...মানে...আমি—দুর্বাসার অবস্থা যেন একটু কাহিল বলে মনে হল।

আপনার ত সশরীরে যাবারও দরকার নেই।—ঘনাদা ভক্তিভরে বললেন,—যোগবলেই সব জানতে পারেন। তার সময় পাননি বুঝি? আমিই তাহলে বলে দিই, এমবুজি মাঈ আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্তের এক রাজ্যের এমন এক শহর যার চারিধারের মাটি আঁচড়ালেও হীরে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে সখ করে পরবার দামী হীরের অন্য অনেক বড় খনি আছে, কিন্তু যা দিয়ে সত্যিকার কাজ হয় শিল্পের দিক দিয়ে সে রকম দামী হীরের অদ্বিতীয় আকর হল ওই এমবুজি মাঈ শহরের চারিদিকে কাসাই প্রদেশের লাল মাটি।

সেখানে একটি মাত্র সরকারী কোম্পানী মিবা-ই হীরে তোলবার অধিকারী। তারা প্রতিদিন যে পরিমাণ হীরে তোলে তার দাম কম পক্ষে দশ লক্ষ টাকা।

এ এমবুজি মাঈ শহর আর কাসাই প্রদেশ হল জানতি পারো না র জ দেওয়া জাঈর রাজ্যের অংশ। এ জাঈর রাজ্যের আগের নাম ছিল কঙ্গো। ১৯৬০ সালে এ রাজ্য স্বাধীন হবার পর নাম বদলে জাঈর রাখা হয়।

হীরের খোঁজে এমবুজি মাঈ শহরে আসিনি। এসেছি এমন একজনের খোঁজে দুনিয়ার সব হীরের চেয়ে যার দাম তখন আমার কাছে বেশী।

তার খোঁজ সুরু করেছিলাম উত্তর আমেরিকায় পৃথিবীর এক গভীরতম গিরিখাতে

তার মানে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে!—গৌর বিদ্যে জাহির করবার সুযোগটা ছাড়তে পারলে না।

না।—কানমলাও খেল তৎক্ষণাৎ।

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন-এর চেয়ে অন্তত আড়াই হাজার ফুট বেশী গভীর গিরিখাত ওই আমেরিকাতেই আছে,—ঘনাদা অনুকম্পা-ভরে জ্ঞান দিলেন,—ইডাহো আর ওরিগন স্টেট যা প্রায় দুশ মাইল ধরে ভাগ করে রেখেছে সেই স্নেক নদী-ই কমপক্ষে বিশ লক্ষ বছর ধরে পাহাড় কেটে এই গিরিখাত তৈরী করেছে। নাম তার হেল্‌স্ ক্যানিয়ন।

নামে হেল্‌স ক্যানিয়ন, অর্থাৎ নরকের নালা, কাজেও তাই। তা দিয়ে স্নেক অর্থাৎ যে সাপ নদী বন্যাবেগে দক্ষিণ থেকে বয়ে যায় নামের মর্যাদা সেও রেখেছে।

লিকলিকে সাপের মত আঁকাবাঁকাই তার গতি নয়, এক এক জায়গায় দারুণ স্রোতের বেগে সঙ্কীর্ণ গিরিখাত—তোলপাড়করা

ঘূর্ণিতে জল যেন বিষের ফেনায় শাদা করে তুলে তার প্রচণ্ড ঝাপটা দিচ্ছে ছোবলের মত।

এই দুরন্ত স্নেক নদী দিয়ে জেট বোটে উজানে যেতে যেতে বোটের ক্যাপ্টেন ডীন ম্যাকের কাছ থেকে ডাঃ লেভিনের কথা জানবার চেষ্টা করছিলাম।

এত জায়গা আর এত লোক থাকতে একটা প্রায় অজানা বিপজ্জনক গিরিখাতে নগণ্য একজন জেট বোটের ক্যাপ্টেনের কাছে ডাঃ লেভিনের খোঁজ করতে আসা একটু আহাম্মকি মনে হতে পারে কিন্তু খোঁজ খবর নেবার আর কোথাও কিছু তখন বাকি নেই বলেই শেষ এই হতাশ চেষ্টা।

ডাঃ লেভিন সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার আগে এই হেল্‌স ক্যানিয়নেই এসেছিলেন। এসেছিলেন নাকি এখানকার গিরিখাতের একদিকের পাহাড়ের গায়ে পাঁচ হাজার বছর আগেকার কোন অজানা আদিবাসীদের খোদাই করা সব রেখা আর ছবি দেখার জন্যে।

তিনি কি তাহলে এই দুরন্ত সাপ নদীর স্রোতে কোথাও ডুবে টুবে গেছেন নাকি? যা ভয়ঙ্কর গিরিখাত আর জলের তোড় তাতে সেরকম কিছু ঘটা অসম্ভব নয় মোটেই।

কিন্তু সে রকম কিছু যে হয় নি তার যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। হেলস্ ক্যানিয়নের অভিযান থেকে ফেরার পর তাঁকে স্বচক্ষে সেখান থেকে প্লেনে উঠতে দেখেছে এমন সাক্ষীর অভাব নেই। তা ছাড়া ডাঃ লেভিনের নিজের ল্যাবরেটরিতে রেখে যাওয়া তাঁর লেখা চিরকুটটাই যে এ সব কল্পনার বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ।

ডাঃ লেভিন তাঁর ল্যাবরেটরিতে ঢুকলেই চোখে পড়ে এমন ভাবে একটা কাগজ এঁটে রেখে দিয়েছেন। সে কাগজে তাঁর নিজের হাতে যা লেখা তার মর্ম হল,—আমি স্বেচ্ছায় নিরুদ্দেশ হচ্ছি। কেউ যেন আমার খোঁজ না করে!

কিন্তু কেউ যেন খোঁজ না করে বলে লিখে গেলেই কি ডাঃ লেভিনের মত মানুষের সম্বন্ধে তাঁর নিজের দেশ ও পৃথিবী হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে! খোঁজ তাই তখন থেকেই সমানে চলছে। শুধু এত দিকের এত চেষ্টা সত্ত্বেও ধরে এগোবার মত একটা খেই-ও কোথাও পাওয়া যায়নি।

ডাঃ লেভিনের মত মানুষের নিরুদ্দেশ হতে চাওয়াটাই যে অবিশ্বাস্য। জৈব রসায়নের অসামান্য গবেষক হিসেবে যাঁর নাম নোবেল প্রাইজ-এর জন্যে বহু জায়গা থেকে প্রস্তাবিত হয়েছে, অত্যন্ত আদর্শবাদী ও সফল বিজ্ঞানসাধক হিসেবে যাঁর জীবনে কোন দিকে কোনো দুঃখের কিছু নেই, তিনি হঠাৎ স্বেচ্ছায় নিরুদ্দেশ হতে যাবেন কেন? আর তা হয়ে থাকলে কোথায় বা গিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারেন দুনিয়ার সেরা সন্ধানী দের চোখ এড়িয়ে? রহস্যটা সত্যিই যেন একেবারে আজগুবি।

আমেরিকার এফ বি আই ও কোনো কিনারা করতে পারেনি বুঝি? চোখে মুখে মুগ্ধ বিস্ময় ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

কই আর পারল!—ঘনাদা একটু করুণা ফোটালেন দৃষ্টিতে।

শিবু তোয়াজটা বাড়াবার জন্যে একটু উল্টো গাইলো,—জেমস্ বণ্ডকে ত ডাকলে পারত!

আরে তা কি আর ডাকেনি!—শিশির ধমক দিল শিবুকে—তাতে কিছু হয়নি বলেই না শেষ পর্যন্ত ঘনাদার শরণ নিয়েছে! না নিয়ে যাবে কোথায়? ছাগল দিয়ে কি যব মাড়ানো চলে!

ঠিক বলেছ!—শিশিরকে গলা ছেড়ে সমর্থন করবার এমন সুযোগ আর ছাড়ি। বললাম,—কিসে আর কিসে! ধানে আর শিষে! আরে জেমস্ বণ্ড ত সেদিনের মাতব্বর। তার জন্ম হবার অন্তত বিশ বছর আগে ঘনাদা মশা মেরে নুড়ি তুলেছেন সে হুঁস কারুর আছে!

যেতে দাও, যেতে দাও ওসব কথা!—ঘনাদা উদার মহত্ত্বে নিজের প্রসঙ্গ চাপা দিলেন,—ব্যাপারটা হাতে নেবার পর থেকে আমিও কোথাও ছিটেফোঁটা একটা খেইও পাইনি। হতাশ হয়ে তাই তাঁর শেষ অভিযানের জায়গা সেই হেল্‌স্ ক্যানিয়নে গেছলাম হার স্বীকার করার আগে আর একটিবার অপ্রত্যাশিত কিছু সূত্র সেখানে মেলে কি না দেখতে।

যাওয়াই পণ্ডশ্রম মনে হয়েছে। স্নেক নদী দিয়ে জেট বোটে পাড়ি দেওয়ার উত্তেজনা মিলেছে যথেষ্ট, কিন্তু আসল লাভ কিছুই হয়নি। জেট বোটের ক্যাপ্টেন ডীন ম্যাককে নানারকমে জেরা করেও কোন ফল না পেয়ে নিজের বুদ্ধির ওপরই অবিশ্বাস এসেছে। মনে হয়েছে আমার এ চেষ্টাটাই পাগলামি। এত দিকের এত রকম সন্ধানে যে রহস্যের এতটুকু কিনারা হয়নি, তার খেই মিলবে ডাঃ লেভিনের মোটমাট এক দিনের একটা বোটের পাড়িতে?

তাই কিন্তু মিলেছে আশাতীতভাবে অকস্মাৎ।

গিরিখাতের ধারের পাহাড়ের গায়ে পাঁচ হাজার বছর আগেকার লুপ্ত কোন জাতির খোদাই-এর কাজ দেখাতে দেখাতে ম্যাকে হঠাৎ বলেছে—আপনাদের ডাঃ লেভিন কিন্তু একটু ক্ষ্যাপাটে ছিলেন।

ম্যাকের এ কথায় বিশেষ কান দিইনি। ডাঃ লেভিনের মত মানুষ সাধারণের কাছে একটু অদ্ভুত মনে হবেন এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

কিন্তু ম্যাকের পরের কথায় একটু চমকে উঠে কানটা খাড়া করতে হয়েছে।

ডাঃ লেভিন এইসব খোদাই দেখতে দেখতে কি বলেছিলেন জানেন? ম্যাকে তখন আমায় শোনাচ্ছে,—বলছিলেন যে পৃথিবীটাকে আরো বড় করতে হবে, অনেক বড়। শুনে আমার ত তখন হাসি পাচ্ছে। পৃথিবী আবার বড় করবে কি? পৃথিবী কি বেলুন যে ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে বড় করবে! তাঁর লোকটা কিন্তু খোসামোদ করে করে তাঁকে যেন তাতিয়ে বললে,—একা আপনিই তা পারেন হুজুর। এই পাহাড়ের খোদাইকার জাতের মত কাউকে তাহলে আর দুনিয়া থেকে মুছে যেতে হবে না।

ম্যাকের মুখে ডাঃ লেভিনের পৃথিবী বড় করার কথা শুনেই তখন আমার মাথার ভেতর ভাবনার চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। তার ওপর আর একটা প্রশ্নও খোঁচা দিচ্ছে অবাক করে। ডাঃ লেভিনের লোকটা আবার কে? তাঁর সঙ্গে কেউ কি আরো ছিল?

সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলাম ম্যাককে। ম্যাকের কাছে যা জানলাম তা এমন কিছু অদ্ভুত নয়। ডাঃ লেভিনের সঙ্গে তাঁর একজন অনুচর গোছের ছিল। অমন অনুচর থাকাই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু ডাঃ লেভিনের অন্তর্ধান সম্বন্ধে যা যা বিবরণ আমায় দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে এরকম অনুচরের বক্তব্যও কি থাকা উচিত ছিল না? যত তুচ্ছই হোক এ বিষয়ে কারুর কথাই ত উপেক্ষা করবার নয়।

আগেকার সন্ধানের এ ত্রুটি শোধরাতে হবে ঠিক করে আসল কাজের জন্যে ইডাহোর রাজধানী বয়েস্-এ ডাঃ লেভিনের নিজের ল্যাবরেটরিতেই গিয়ে হাজির হলাম। তারপর তাঁর সহকারীদের সাহায্যে তন্নতন্ন করে ডাঃ লেভিন সম্প্রতি যে গবেষণার কাজে মেতে ছিলেন তার সন্ধান নিতে কিছু বাকি রাখলাম না।

যা আঁচ করেছিলাম সে রকম কিছু সত্যিই তার মধ্যে পেলাম। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! তাঁর সঙ্গে যে অনুচর হেলস্ ক্যানিয়ন-এ স্নেক নদীর পাড়িতে গিয়েছিল, তার সম্বন্ধে কিছুই জানা গেল না। লোকটার কোন পাত্তাই নেই। ডাঃ লেভিন একা তাঁর যে বাসায় থাকতেন সেখানে তাঁর নিয়মিত জ্যানিটরের বদলি লোকটা নাকি কিছুদিন মাত্র কাজ করেছিল। নেহাৎ ক' দিনের বদলি বলে তার সম্বন্ধে খোঁজ খবরের কথা কেউ ভাবেনি।

ডাঃ লেভিনের আসল জ্যানিটরও লোকটা সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারল না। সে ক'দিনের ছুটিতে যাবার সময় তাদের ইউনিয়ন থেকেই চিঠি নিয়ে লোকটা নাকি বদলিতে এসেছিল। জ্যানিটরের কাছে অনেক কষ্টে লোকটার নামটা শুধু উদ্ধার করা গেল।

সে নামটা বেশ অবাক করবার মত। নাম হল মালাঞ্জা এমপালে।

পাঁচ হাজার বছর আগেকার লুপ্ত কোন জাতির খোদাইএর...

নাম শুনেই সন্দিগ্ধ ভাবে জ্যানিটরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, —নামটা ঠিক তোমার মনে আছে ত?

আজ্ঞে হ্যাঁ,—বলেছিল জ্যানিটর,—নামটা অদ্ভুত বলেই মনে আছে। আমাদের এ দিকে আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ান, কাফ্রি ও কিছু কিছু এস্কিমোও আছে। তাদের নানা রকম মজার নামের ভেতর এরকম বেয়াড়া নাম কখনো পাইনি।

মালাঞ্জা এমপালে যার নাম বলছ, সে লোকটা কি চেহারায় কাফ্রি, আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ান বা এস্কিমোদের মত? এবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

আজ্ঞে না,—বলেছিল জ্যানিটার,—নামটা উদ্ভুট্রে হলেও চেহারায় আমাদেরই মত!

নাম মালাঞ্জা এমপালে, অথচ চেহারায় য়ুরোপীয় এই রহস্যটা মাথায় নিয়ে সেখান থেকে চলে এসেছিলাম।

তারপর ডাঃ লেভিনের ল্যাবরেটরির কাগজপত্র ঘেঁটে যা পেয়েছি আর মালাঞ্জা এমপালে নাম থেকে যা হদিস মিলেছে তাই সম্বল করে বারো আনা পৃথিবী ঘুরে একবার ফিলিপাইন্‌স আর তারপর উত্তর বর্মা হয়ে সোজা জা-ঈর-এ গিয়ে রাজধানী ফিন্‌শাসা, আর কানাঙ্গা হয়ে এমবুজি মাঈতে এসে উঠলাম।

দুই-এ দুই-এ চার জুড়তে ভুল যে আমার হয়নি দুদিন ওই ছোট শহরে একটু শোরগোল তোলবার পরই তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল।

ওখানকার প্রধান মাইনিং কোম্পানীর ম্যানেজারের সুপারিশেই হোটেলের বদলে সাংকুরু নদীর ধারে নির্জন একটা ছোট বাংলো বাড়িতে থাকবার সুবিধে পেয়েছিলাম। তিন দিনের দিন সন্ধ্যার পর সেই বাংলোতেই এক দর্শনপ্রার্থী এসে হাজির।

কেউ একজন আসবে বলেই অনুমান করেছিলাম। কিন্তু আমার চাকরের আনা কার্ডে যে নামটা ছাপানো সেটা আমার কাছেও অপ্রত্যাশিত।

নামটা মালাঞ্জা এমপালে!

চাকরকে তক্ষুনি রাত্রের মত ছুটি দিয়ে আগন্তুককে বসবার ঘরে ডাকালাম।

কার্ডের নামটা পড়ে যেমন মানুষটাকে স্বচক্ষে দেখে তেমনি অবাক হতে হল।

ইডাহো-র রাজধানীতে ডাঃ লেভিনের বাসার জ্যানিটরের

কাছে যার বর্ণনা শুনেছিলাম তার সঙ্গে এ লোকটির ত কোনো মিল নেই। সে লোকটির শুনেছিলাম য়ুরোপিয়নদের মত ফর্সা চেহারা। আর এ লোকটি পোশাক আশাক থেকে চেহারাতেও ঝামা ইটের রং-এর বাণ্টু।

কথাবার্তা আর উচ্চারণে কিন্তু নির্ভুল ফ্লেমিশ।

সেই ভাষাতেই প্রথম ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলে,—খুব অবাক হয়েছেন না মঁশিয়ে দাশ?

তা একটু হয়েছি!—যেন লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করলাম

কিসে অবাক হয়েছেন? আমার ঘাড়ের ওপর সচাপ্টে একটা হাতের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে এমপালে,—এত তাড়াতাড়ি হাজির হয়েছি বলে?

না।—কাঁধ থেকে তার হাতের চাপটা সরাবার যেন বৃথা চেষ্টা করে একটু অস্বস্তি দেখিয়ে বললাম—আপনাকে খোঁজার জন্যে আমার যত গরজ, আপনার আমাকে খোঁজার গরজও যে তার চেয়ে কম নয় তা জানতাম। তবে নিজেই প্রথমে দর্শন দেবেন এটা আশা করতে পারিনি, আর গায়ের রংটা ইডাহো থেকে জা-ঈরে এসেই রোদে পুড়ে এতটা পাল্টাবে সেটা ধারণার মধ্যে ছিল না।

যা দরকারী তা অন্যকে দিয়ে আমি করাই না।—মালাঞ্জা এমপালে আমার এক কাঁধ ছেড়ে আর কাঁধে চাপ দিয়ে বললে,—আর এই আমার আসল রং। ইডাহোতে যা লোকে দেখেছে সে রং মেক্-আপ করা নকল কিন্তু ইডাহো থেকে আপনি এই জা-ঈরে আমার খোঁজে এলেন কি করে?

সামান্য একটু বুদ্ধি তার জন্যে খাটাতে হয়েছে!—আবার যেন এমপালের হাতের চাপটা সরাতে গিয়ে হার মেনে কাতর গলায় বললাম,—তা ছাড়া আপনি নিজেই একটা সোজা স্পষ্ট খেই রেখে এসেছিলেন কি না!

আমি সোজা স্পষ্ট খেই রেখে এসেছিলাম! সত্যিই চমকে উঠে কাঁধের ওপর চাপ দেওয়া ছেড়ে আমার নড়া ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে,—কি খেই?

আজ্ঞে, আপনার নামটা!—গলাটা যেন যন্ত্রণায় নাড়তে নাড়তে বললাম।

আমার নামটা!—আর ভদ্রতার মুখোশ না রাখতে পেরে এমপালে হিংস্র গলায় জিজ্ঞাসা করলে,—ওই নাম থেকে তুই এখানে আমার খোঁজ করতে আসার হদিস্ পেয়েছিস?

শুধু আপনাকে নয়, আপনি যাকে সঙ্গে এনে লুকিয়ে রেখেছেন সেই ডাঃ লেভিনকে খোঁজ করার হদিস্‌ও ওই নামটা থেকে অনেকটা পেয়েছি!—যেন ভয়ে ভয়ে বললাম,—বাকিটা পেয়েছি ডাঃ লেভিনের ল্যাবরেটরির কাজ কর্ম দেখে আর হেলস্ ক্যানিয়নে তাঁর একটা বাতুল ইচ্ছের কথা জেনে।

আমার কথায় হতভম্ব হয়ে এমপালে এবার বোধ হয় আমায় শারীরিক শাস্তি দিতে ভুলে গেল। শুধু দাঁত খিঁচিয়ে জানতে চাইলে,—ওসব বাজে বাকতাল্লা ছেড়ে আমার নাম শুনে কি করে এখানে এলি তাই আগে বল্!

আজ্ঞে! এটা আপনার কাছে এত শক্ত মনে হচ্ছে কেন? একটু রেহাই পেয়ে যেন সভয়ে একটা দেয়ালের দিকে ঘেঁসে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম,—দুনিয়ার সব জায়গায় নামের বিশেষত্ব আছে জানেন ত! আপনাদের এই অঞ্চলেরই পশ্চিম টাঙ্গানাইকা হ্রদের ওপারে টানজানিয়ায় কি দক্ষিণ পুবে জাম্বিয়ায় যে ধরনের নাম জা-ঈয়ের নামের ধরন তা থেকে আলাদা। মালাঞ্জা এমপালে শুনেই তাই বুঝেছিলাম আসল বা ছদ্মনাম যা-ই হোক নামটা এই জা-ঈর অঞ্চলের। এ নাম যে নিয়েছে জা-ঈর-এর সঙ্গে তার সম্পর্ক যে নিশ্চিত আছে ডাঃ লেভিনের গবেষণার ধারা জেনে আর তাঁর পৃথিবী বড় করার ইচ্ছের কথা শুনে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হই।

আমার নাম শুনে জায়গাটা না হয় আঁচ করেছিস বুঝলাম, কিন্তু ডাঃ লেভিনের পৃথিবী বড় করার ইচ্ছে থেকেই নিশ্চিত বুঝলি আমরা জা-ঈরে এসেছি! চালাকি করবার আর জায়গা পাসনি!—হতভম্ব থাকার দরুনই এবারও এমপালে আমায় মারধোর দেবার চেষ্টা করলে না।

চালাকি করবার এই ত এখন জায়গা!—একটু যেন সাহস পেয়েছি ভাব দেখিয়ে জোর গলায় বললাম,—আর পৃথিবী বড় করার মত আশ্চর্য চালাকি এই জা-ঈর ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও সম্ভব নয়। তাই জেনেই ডাঃ লেভিনকে বোঝাতে এখানে তাঁর খোঁজে এসেছি।

সে খোঁজ তাহলে তোকে ছাড়তে হবে!—এবার আর দাঁত খিঁচুনি নয়, এমপালের গলায় যেন বজ্রের হুমকি,—কোথায় তোর দেশ জানি না। তা যে চুলোতেই, ঘরের ছেলে ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরে যা।

আমার ঘর যে বড় দূর!—যেন দুঃখের সঙ্গেই বললাম,—সেই গোটা আফ্রিকা আর আরব সাগর পার হবার পরও যেতে হবে ভারতবর্ষের একেবারে পূব প্রান্তে। তার চেয়ে আপনার ঘরে ফিরে যাওয়াই সোজা নয়? প্লেন যদি না জোটে তাহলে মাতাদি-র বন্দর থেকে জাহাজে চেপে সোজা উত্তরে আপনার বেলজিয়মে গিয়ে পোঁছোতে পারেন। অবশ্য বেলজিয়ম যদি আপনার আসল দেশ হয়। আমায় মঁসিয়ে বলে সম্বোধন করেও যেরকম ভাঙা ফ্লেমিশ-এ কথা বলছেন তাতে মনে হয় বেলজিয়মও আপনার দেশ নয়। যুদ্ধে হারবার পর শয়তান নাৎসীদের অনেকে অসংখ্য পাপের শাস্তির ভয়ে দেশ বিদেশে পালিয়ে লুকিয়ে আছে শুনেছি। কে জানে আপনি তাদেরই একজন কি না, পৈশাচিক এক মতলব নিয়ে ছদ্মনামে আর চেহারায় এই ঘোর জঙ্গলের দেশে পড়ে আছেন! এখন চলে গেলে ডাঃ লেভিনকে তাঁর স্বপ্ন আর আদর্শের টোপ দিয়েই ভুলিয়ে নিয়ে এসে সে মতলব হাসিল করা আপনার আর হয়ে উঠবে না বটে, তবে আমি যখন এসে গেছি তখন সে উদ্দেশ্য সফল ত আপনার আর হবার নয়। তাই ভালোয় ভালোয় আপনারই এখন চলে যাওয়া ভালো। বেলজিয়মে জায়গা না জোটে জা-ঈর ছেড়ে যেখানে খুশি গেলেই হবে। জা-ঈর-এর ইতুরি-র জঙ্গলের অন্তত ধারে কাছে থাকবেন না।

ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে গেলেও শুধু আমি কতটা কি ধরে ফেলেছি তা জানবার অদম্য কৌতূহলেই নিশ্চয়, আমার দীর্ঘ বক্তৃতায় এতক্ষণ কোন বাধা দেয়নি মালাঞ্জা। এবার ইতুরি কথাটা আমার মুখ থেকে খসতেই একেবারে বোমার মত সে ফেটে পড়ল।

ইতুরি! কি জানিস তুই ইতুরির?—এমপালে চোখের আগুনেই আমায় যেন ভস্ম করবে।

কিছুই এখনো জানি না।—সহজ সরল ভাবে ভালোমানুষের মত বললাম,—শুধু অনুমান করছি যে পৃথিবী বড় করবার পরীক্ষা চালাবার পক্ষে ইতুরির চেয়ে ভালো জায়গা আর হতে পারে না। সেইখানেই আপনার গুপ্ত ঘাঁটি বসিয়ে ডাঃ লেভিনকে এনে রেখেছেন মনে হচ্ছে...

আর কিছু বলতে হল না। জা-ঈরের দুর্দান্ত পাহাড়ী গোরিলার মতই মণ পাঁচেক কয়লার বস্তার ভার নিয়ে এমপালে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দড়াম করে একটা শব্দ হল দেয়ালে। বেচারার মাথাটা ফেটে রক্তারক্তি।

ধরে তুলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সুযোগ দিলে না। মালাঞ্জার জেদ আছে বটে। ফাটা মাথা নিয়েই আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। একবার দুবার নয় পাঁচ পাঁচবার। কপাল মাথা কিছু আর আস্ত রইল না।

বেচারার আর দোষ কি? আমায় তাগ্ করে যেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেখানে শুধু দেয়ালের সঙ্গেই মোলাকাৎ হয়। আমি তার আগেই সরে গেছি।

পাঁচ পাঁচবার এমনি দেয়ালবাজি দেখাবার পর সত্যিই ধরে তুলতে হল মালাঞ্জাকে। ধরে তুলে আমার চেয়ারটাতেই বসিয়ে দিয়ে বললাম,—আমি বড়ই দুঃখিত, হের মালাঞ্জা। এ বাংলো-বাড়ির দেয়ালে গদি আঁটা থাকা উচিত ছিল।

আমিও দুঃখিত যে,— ধুঁকতে ধুঁকতে হাঁফাতে হাঁফাতে বললে মালাঞ্জা এমপালে,—আমার কথাটা আপনাকে ঠিক বোঝাতেই পারিনি। আমি এতক্ষণ শুধু আপনাকে পরীক্ষা করছিলাম মিঃ দাস? ডাঃ লেভিনের নিজের হুকুমেই এত কড়া পরীক্ষা করতে হয়েছে। বুঝতেই ত পারছেন, ডাঃ লেভিন যা করতে যাচ্ছেন অমন আশ্চর্য একটা গবেষণার কথা একেবারে ষোল আনা খাঁটি মানুষ ছাড়া কাউকে জানানো যায়! আপনাকে এখান থেকে ডাঃ লেভিনের কাছেই নিয়ে যাবার জন্যে আমি এসেছি, পরীক্ষাটা আগে শুধু করে নিলাম।

আমায় পরীক্ষা করছিলেন এতক্ষণ?—চোখ দুটো আপনা থেকেই কপালে উঠল।

অবাক হবার তখনও কিছু তবু বাকি।

মালাঞ্জা যন্ত্রণায় মুখটা একটু বেঁকিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললে,—হ্যাঁ, সে পরীক্ষা আমার শেষ হয়েছে, শুধু শেষ হুঁশিয়ার করাটা এখনো বাকি। এখান থেকে আপনার যাবার আসল বাধাটা তাই কাটিয়ে দিই।

আসল বাধা?—সন্দিগ্ধ ভাবে বললাম,—সে আবার কি?

এই দেখুন না!—বলে মালাঞ্জা এবার যা দেখালো তা সত্যি তাজ্জব করার মত ব্যাপার।

গাছ থেকে ফুল তোলার মত আমার মাথা মুখ নাক কান হাতা পকেট যেখানে খুশি হাত দিয়ে সে একটার পর একটা ছোট বড় হীরে বার করে আনতে লাগল।

তারপর সেগুলো সামনের টেবিলে রেখে ওই রক্ত-মাখা মুখেই একটু কাৎরানির হাসি হেসে বললে,—যতই আপনি ম্যানেজারের বন্ধু হন এই সব চোরাই হীরে নিয়ে আপনি এমবুজি মাঈ ছেড়ে যেতে পারতেন! এবার বুঝতে পারছেন আমি আপনার বন্ধু না শত্রু! শত্রু হলে এই সব হীরে দিয়েই আপনাকে আমি ধরিয়ে দিতাম না?

আমার মুখে তখন আর কথা নেই। এ ম্যাজিকের পর আর বলার কিই বা থাকতে পারে?

শত্রু না বন্ধু মালাঞ্জার সঙ্গেই তারপর এমবুজি মাঈ থেকে বোয়ামা জলপ্রপাতের শহর কিসান্‌গানি হয়ে এপুলু গেলাম। সেখান থেকে দুনিয়ার সব চেয়ে রহস্যময় জঙ্গল ইতুরি। ইতুরির জঙ্গলে মালাঞ্জার সাধ্য নেই একা পথ চিনে যাবার। তাই সেথো নেওয়া হল মাকুবাসি নামে ইতুরির বিখ্যাত বামন জাতের এক সর্দারকে। মাকুবাসি মাথায় চার ফুটের বেশী লম্বা নয়, পরনে তার নেংটি। হাতে যেন খেলাঘরের একটা ছোট ধনুক। কিন্তু যেমন সে ধনুকের তীরের অজানা অব্যর্থ বিষ তেমনি আশ্চর্য তার সব ক্ষমতা। গহন জঙ্গলের সঙ্গে তার যেন গোপন দোস্তি আছে এমনি তার সেখানকার সব কিছু সম্বন্ধে জ্ঞান।

এই মাকুবাসিকেও কিন্তু মালাঞ্জার বিশ্বাস নেই। দুদিন মাকুবাসির কথা মত চলবার পর তিন দিনের দিন এক জায়গায় রাত কাটিয়ে ভোর না হতেই মালাঞ্জা আমায় ঘুম থেকে তুলে দিয়ে বললে,—এবার আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে দাস!

হেসে বললাম, এতক্ষণ কি শুধু আরাম করেছি?

না, না,—লজ্জিত হয়ে বললে মালাঞ্জা,—এবার খানিকটা পথ আপনাকে ও আমাকে একলা একলা আলাদা যেতে হবে। মাকুবাসি রাত থাকতেই উঠে জালে শিকার ধরতে গেছে। সে আসবার আগেই আমাদের পালাতে হবে। ডাঃ লেভিনের গোপন আস্তানা ওই 'বামন' জাতের কাউকেও আমরা জানাতে চাই না।

একটু চুপ করে থেকে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, —একলা অমন কতদূর যেতে হবে? পথ চিনতে পারবো ত!

খুব পারবেন!—ভরসা দিলে মালাঞ্জা,—এখান থেকে সোজা গেলেই মাইল খানেক দূরে একটা প্রকাণ্ড বাওবাব দেখতে পাবেন। সেই বাওবাবের প্রকাণ্ড একটা কোটরের ভেতর দিয়ে মাত্র মিনিট দুই-এর একটা সুড়ঙ্গ, ডাঃ লেভিনের গোপন আস্তানায় যাবার রাস্তা। আমি ভিন্ন রাস্তায় সেখানেই যাচ্ছি। আপনি আগে বেরিয়ে পড়ুন। কোন ভাবনা নেই। শুধু একটু দেখে শুনে যাবেন মাকুবাসির নজরে না পড়েন।

দেখে শুনেই যাচ্ছিলাম। তাতে এক মাইলও যেতে হল না। তার আগেই মাকুবাসির নজরে পড়ে যাব কে জানত!।

ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কোন রকমে পথ করে যাচ্ছি হঠাৎ পেছনে জামায় টান পড়ে থেমে যেতে হল। ফিরে তাকিয়ে দেখি কাঁধে এমবোলোকো নামে ছোট্ট ক্ষুদে একটা নীল হরিণ নিয়ে মাকুবাসি। সে উত্তেজিত ভাষায় যা বলল তা প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। বোঝবার জন্যেই কাঁধের ছোট্ট নীল হরিণটা সে আমার সামনে এক পা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

বুঝতে আর তখন কিছু বাকি রইল না। হরিণটা সেখানে পড়া মাত্র মাটির ওপর পাতা জংলী-লতার ফাঁস তার পা দুটোতে জপেশ করে আটকে তাকে এক ঝটকায় শূন্যে ঝুলিয়ে দিলে। মাকুবাসি মোক্ষম সময়ে টেনে না ধরলে ইতুরির জংলী বামনদের ফাঁদে আমারও ওই অবস্থাই হত।

মাকুবাসি তার হরিণটা ঝোলানো ফাঁদ থেকে ছাড়িয়ে তখুনি আমাদের রাতের আস্তানায় ফিরে যেতে চাইছিল, তাকে তা দিলাম না। কোন রকমে আমার মনের কথাটা তাকে বুঝিয়ে রাত পর্যন্ত তাকে রেখে দিলাম সঙ্গে।

তারপর...

হ্যাঁ তারপর নাটকের শেষ দৃশ্যটা একরকম জমাটিই হল।

ইতুরির জঙ্গলের মাঝখানে সত্যিই বেশ মজবুত করে তৈরী বাঁশ বেত আর জংলী লতাপাতার একটা ছোটখাটো বাসা। তার একটা ঘর গবেষণাগারের সাজ সরঞ্জামেই সাজানো। কি কষ্ট করে শুধু সে সমস্ত লটবহর নয়, ঘরের জোরালো হ্যাসাক বাতিটাও আনানো হয়েছে ভাবলে অবাক হতে হয়।

অবাক হতে হয় সেখানকার দুটি মানুষের আলাপ শুনেও। তাদের একজন ডাঃ লেভিন, আরেকজন মালাঞ্জা এমপালে।

ডাঃ লেভিন তখন জিজ্ঞাসা করছেন,—যাঁর খোঁজে গিয়েছিলে বলছ, সত্যিই তাঁর দেখাই পেলে না। তিনি ত আমাদের বন্ধু বলছ।

হ্যাঁ পরম বন্ধু!—হতাশভাবে বললে মালাঞ্জা,—তিনি এলে অনেক উপকার আমাদের হত। তাই গোপনে খবর পাঠিয়ে তাঁকে আসতে বলেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইতুরির জঙ্গলের ভয়েই বোধহয় আসতে পারলেন না।

না, ঠিকই এসেছি মালাঞ্জা, আর বোধহয় ঠিক সময়ে। নমস্কার ডাঃ লেভিন।

বাইরের বেতের দরজা প্রায় ভেঙে আমায় হঠাৎ ঢুকতে দেখে মালাঞ্জা আর ডাঃ লেভিন দুজনেই একেবারে স্তম্ভিত হতবাক।

তার মধ্যে ডাঃ লেভিনই প্রথম চাঙ্গা হয়ে বললেন,—একি তুমি মিঃ দাস? তোমায় আনতে গিয়ে মালাঞ্জা খুঁজে পাইনি! তুমি যে আমার খোঁজে আসছ তা আগে আমায় বলোনি কেন?

বলেনি একটু বাধা ছিল বলে বোধহয়,—হেসে মালাঞ্জার দিকে তাকিয়ে বললাম,—প্রথমত আপনার সঙ্গে আমার যে পরিচয় বহুদিনের তা ওর জানা ছিল না, দ্বিতীয়ত আগে থাকতে বললে ইতুরির ঝোলানো ফাঁসে আমাকে লটকাবার ব্যবস্থা করা যেত না।

ফাঁসে লটকানো? কী বলছ তুমি দাস? ডাঃ লেভিন ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন।—তোমাকে ঝোলানো ফাঁসে লটকাতে যাবে কেন মালাঞ্জা?

যাবে, আমার মত পথের কাঁটা না সরালে ওর আসল মতলব হাসিল হবে না তাই। কি বলো মালাঞ্জা? মালাঞ্জার দিকে ফিরে তাকিয়ে তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম।

মালাঞ্জা একেবারে চুপ। তার বদলে ডাঃ লেভিনই বিমূঢ় এবং একটু উত্তেজিত গলায় বললেন,—কী তুমি বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না দাস! আমার এই একান্ত লুকোনো আস্তানার খোঁজ পাওয়াই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তোমার অসাধ্য কিছু নেই বলেই তা তুমি পেয়েছ বুঝলাম, কিন্তু সে খোঁজ পাবার পর আমার

বাইরে বেতের দরজা প্রায় ভেঙে আমায় ঢুকতে দেখে...

একান্ত বিশ্বাসের সহকারী সম্বন্ধে এ সব মিথ্যা অভিযোগ করতেই কি তুমি এসেছ!

মিথ্যা অভিযোগ নয় ডাঃ লেভিন, সব সত্য।—এবার গম্ভীর হয়ে বললাম,—কিন্তু শুধু তার জন্যে আমি আসিনি! আমি এসেছি আপনাকে নিয়ে যেতে।

আমায় নিয়ে যেতে!—ডাঃ লেভিন এবার গরম হলেন,—আমায় তুমি নিয়ে যেতে চাইলেই আমি যাব? আমি কি জন্যে এখানে এসেছি তা তুমি জানো?

তা জানি বলেই আপনাকে নিয়ে যেতে চাই।—কঠিন হয়ে এবার বললাম,—আর আপনার সন্ধান যে পেয়েছি তা আপনার নিরুদ্দেশ হবার কারণ থেকেই। শুনুন ডাঃ লেভিন, আপনি মস্ত বৈজ্ঞানিক, সেই সঙ্গে পৃথিবীতে স্বর্গের স্বপ্ন দেখা কবি। আপনি পৃথিবীকে আরো বড় করতে চান মানুষের ভালোর জন্যে।

হ্যাঁ।—এবার উৎসাহিত হয়ে উঠলেন ডাঃ লেভিন, মানুষের এত সব সমস্যা, জাতিতে জাতিতে এত মারামারি কাটাকাটি শুধু পৃথিবীতে এখন জায়গার অভাব বলে। পৃথিবী বড় করতে পারলে মানুষের বারো আনা সমস্যার মীমাংসা হয়ে যাবে।

আপনি পৃথিবীকে বড় করতে চান জেনেই,—ডাঃ লেভিনকে বাধা দিয়ে থামিয়ে বললাম,—কোথায় আপনি নিরুদ্দেশ হয়ে থাকতে পারেন তার নিশ্চিত হদিস পেয়েছি।

কেমন করে?—ডাঃ লেভিন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন।

বললাম,—পেয়েছি, পৃথিবী বড় করার আসল রহস্যটা বুঝে। পৃথিবী ত সত্যি বেলুনের মত ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করা যায় না। পৃথিবী যা আছে তাই থাকবে। তা সত্ত্বেও পৃথিবীকে আরো বিস্তৃত করতে হলে মানুষকে ছোট করতে হয় এই বুদ্ধি আপনার

মাথায় এসেছে। মানুষ যদি এখনকার মাপের বদলে সমস্ত বর্তমান বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে ছোট হতে হতে ইঁদুর আর তারও পরে পিঁপড়ের মত ছোট হয়ে যায়—তাহলে পৃথিবী তার পক্ষে কি বিরাটই না হয়ে যাবে। তাই ভেবেই আপনার জৈব-বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষকে আকারে ছোট করার উপায় আপনি খুঁজতে সুরু করেছেন। সে খোঁজে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর এই একটি দেশ জা-ঈরের ইতুরি জঙ্গলে আপনাকে আসতেই হবে।

কেন আসতে হবে তা তুমি বুঝেছ?—ডাঃ লেভিন বেশ একটু মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে আমার দিকে চাইলেন।

হ্যাঁ, কিছুটা তার বুঝেছি ডাঃ লেভিন,—বিনীতভাবেই জানালাম,—পৃথিবীতে বামন জাত, বামন প্রাণী অনেক জায়গাতেই আছে, কিন্তু জা-ঈরের এই ইতুরির জঙ্গল যেন সে রহস্যের আসল ঘাঁটি। এখানে শুধু আদ্যিকালের এক বামন জাতের মানুষই নেই, এখানকার আরো অনেক কিছুর আকার ছোটর দিকে, যেমন এখানকার ক্ষুদে লাল মোষ, বামন হাতি ইত্যাদি। এখানকার মাটি আর জলে সুতরাং আকার কমাবার কোনো রহস্য লুকোন আছে। নিজের গবেষণায় যা জেনেছেন তার সঙ্গে এখানকার রহস্যও আপনার না জানলে নয়।

সবই বুঝলাম!—এবার ডাঃ লেভিন আবার একটু সন্দিগ্ধ গলায় বললেন,—কিন্তু আমার একান্ত বিশ্বাসী সহকারী মালাঞ্জার বিরুদ্ধে তোমার ও সব অভিযোগ কেন?

প্রথমত ও সত্যি মালাঞ্জা এমপালে নয় বলে,—মালাঞ্জার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে এবার বললাম,—দ্বিতীয়ত আপনার গবেষণার ফল ও নিজের লাভেই লাগাবে বলে মতলব করে আপনাকে এখানে এনেছে বলে অভিযোগ।

এসব কথা তুমি কিসের জোরে বলছ দাস? ডাঃ লেভিনের গলা এবার কঠিন হল।

বলছি কিসের জোরে এই দেখুন!—মালাঞ্জার নাক মুখ চোখ থেকে টুক টুক করে যেন ফুল ছেঁড়ার মত হীরে টেনে বার করতে করতে বললাম,—মালাঞ্জা চোর। এমবুজি মাঈ থেকে ও এমনি করে হীরে পাচার করে এনেছে।

ঘনাদার কথা শুনে যত না, তার কাণ্ড থেকে তখন আমরা সবাই থ। করছেন কি ঘনাদা? মালাঞ্জার নাক মুখ থেকে হীরে বার করা দেখাতে গিয়ে আমাদের দুর্বাসার জটাজুট দাড়ি থেকেই যে মার্বেলের গুলি আর তার সঙ্গে কটা আস্ত ডিম বার করে ফেললেন।

সে সব মার্বেল আর ডিম টেবিলের ওপর রেখে ঘনাদা আবার বললেন,—হীরেগুলো বার করবার পর ঘরের একটা তাক থেকে একটু স্পিরিট হাতে লাগিয়ে মালাঞ্জার গালে একটু জোরে একটা আঙুল ঘসতে যেতেই ডাঃ লেভিন হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

আমি আঙুল ঘসতে আরম্ভ করার সঙ্গেই প্রায় ধমক দিয়ে বললেন,—আরে করছ কি দাস! মালাঞ্জা যে গায়ে পেণ্ট করে ইডাহোতে সাহেব সেজেছিল তা ও আমার কাছে স্বীকার করেছে।

না, ডাঃ লেভিন,—আঙুলটা ভালো করে মালাঞ্জার গায়ে ঘসে তুলে নিয়ে বললাম,—মালাঞ্জার এখনকার রংটাই পেণ্ট করা কি না এই দেখুন। আসলে ও একজন য়ুরোপীয়ান, হয়ত ফেরারি নাৎসী। আপনার গবেষণা সফল হলে তাই দিয়ে পৃথিবীর কি সর্বনাশ করা ওর মতলব কে জানে! আপনাকে তাই আমার সঙ্গে চলে আসতে হবে।

কেমন যেন বিহ্বল দিশাহারা হয়ে ডাঃ লেভিন বললেন,—কিন্তু আমার গবেষণা, আমার স্বপ্ন...?

আপনার গবেষণা আপনার স্বপ্ন মানুষের পক্ষে সর্বনাশা ডাঃ লেভিন!—সহানুভূতির সঙ্গেই বললাম,—মানুষকে আকারে ছোট করলেই তার বেশীর ভাগ সমস্যা মিটবে এ কথা ভাবা আপনার ভুল। শুধু পৃথিবীই তার পক্ষে বিশাল করলে চলবে না, মানুষের মনটাকেও সেইসঙ্গে আরো বড় আরো উদার করতে হবে। তার উপায় যত দিন না হয় ততদিন পৃথিবীর বদলে সারা ব্রহ্মাণ্ড পেলেও মানুষের সমস্যা মিটবে না। যা ভুল করতে যাচ্ছিলেন তা ছেড়ে এখন আমার সঙ্গে চলুন।

চলুন!—হঠাৎ হা হা করে হেসে দাঁড়িয়ে উঠল মালাঞ্জা,—খুব ত বড় বড় কথা শোনালে দাস। কিন্তু চলুন বললেই কি এই ইতুরির জঙ্গল থেকে যাওয়া যায়! আমি ফেরারী নাৎসী বা যে-ই হই, যে গবেষণার জন্যে ডাঃ লেভিনকে এখানে এনেছি তা শেষ না করা পর্যন্ত এখান থেকে এক পা যেতে ওঁকে দেব না। সেইসঙ্গে তোমাকেও যে এখানে বন্দী থাকতে হবে তা বুঝতে পারছ দাস?

ঠিক পারছি না ত?—একটু হেসে ইসারা করার সঙ্গে মাকুবাসি ঘরে এসে ঢুকতেই তাকে দেখিয়ে বললাম,—বরং মনে হচ্ছে চলুন বললেই ইতুরি থেকে যাওয়া যায়। তবে তোমার যখন ইতুরির ওপর এত মায়া তখন তোমাকেই কিছুদিন এখানে রাখবার ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। ভয় নেই আলগা করেই বাঁধন দেব। একটু চেষ্টা করলে একদিনের মধ্যেই যাতে খুলতে পারো।

মালাঞ্জা এমপালেকে সেইরকম ভাবে বেঁধেই সেখান থেকে ডাঃ লেভিনকে নিয়ে মাকুবাসিকে গাইড নিয়ে চলে এসেছিলাম। মাকুবাসিকে ফিরে গিয়ে মালাঞ্জার খোঁজ নিতে বলতেও ভুলিনি।

ঘনাদা কথাগুলো শেষ করেই আচমকা উঠে পড়ে ঘর থেকে চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন। যেতে যেতে দরজার কাছ থেকে ফিরে শুধু বলে গেছেন,—ছাদের সঙ্গে বাঁধা কালো সুতোটা এখনও ঝুলছে। ওটা ছিঁড়ে ফেলো। আর তোমাদের ওই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে জটাজুট দাড়ি গোঁফ একটু খুলে আরাম করে বসতে বলো। যা গরম।

টঙের ঘরের সিঁড়িতে ঘনাদার পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেছে। আমরা তখন চোরের মত এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করছি।

দুর্বাসার দিকে চাইতেই চোখ উঠতে চাইছে না।

অত সাজগোজ শেখানো পড়ানোর পর অমন নাকাল হয়ে যা কটমট করে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে!

এরপর তাদের ক্লাব থেকে আর কাউকে কোনদিন কিছু সাজিয়ে আনা যাবে!

শৈলেন ঘোষ

আমার

ছবি এঁকেছেন প্রণবেশ মাইতি

নাম টায়রা

আমার নাম টায়রা।

আমরা থাকি একটা ছোট্ট বাড়িতে। আমি, মা আর বাবা। আমাদের বাড়ি তো মাটির তৈরি, তাই খড় দিয়ে ছাওয়া। চারি-দিকে গাছ। সবুজ-সবুজ ছায়া। ভারি শান্ত শান্ত। এমনিতে আমাদের গ্রামটাও খুব ছোট্ট। অনেক গাছ আর অনেক পাখি আমাদের গ্রামে। অনেক কাঠবিড়ালি আর বকুল ফুলের গন্ধ। আর নয়নকাকা, দাদু, রাঙাপিসি, আরও অনেকে।

ফুলের গন্ধ আমার বড্ড ভাল লাগে। বকুল ফুল কুড়িয়ে এনে, মালা গেঁথে আমি গলায় পরি। জান, মা আমায় খুব ভালবাসে। মায়ের পায়ের রুপোর তোড়া আমার পায়ে সাজিয়ে আমি যখন ছুটে চলি, তখন আমার কী খুশিই না লাগে। আমায় গ্রামের সবাই বলে, "কী মিষ্টি মুখখানি তোর টায়রা। যার ঘরের বৌ হবি ঘর আলো করবি।"

আমার আবার বিয়ে কী! আমি তো এখন কত ছোট। মায়ের মত হতে তো আমার অনেকদিন বাকি। মায়ের মত না হলে আমার বিয়ে হবে কেমন করে! বিয়ের কথা শুনলে না আমার ভীষণ লজ্জা করে। সেবার যখন রাঙাকাকার মেয়ের বিয়ে হল, রাঙাকাকার মেয়ে কী কান্নাই কাঁদছিল। গাল দুটো বেয়ে, কাজল পরা-চোখ দুটি দিয়ে টুসটুস করে জল পড়ছিল। তার কান্না দেখে আমারও কান্না পেয়ে গেল। কান্না পেলেই কেন জানি না, মায়ের মুখখানি আমার চোখে ভেসে ওঠে। মনে হয় মায়ের বুকে লুকিয়ে পড়ি।

গ্রামের পাশ দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে। আমাদের নদীর নাম টুংরি। শীতকালে টুংরির চেহারা দেখলে ভাববে, ভারি লক্ষ্মী একটি মেয়ে। তাই বইকি! টুংরি দুষ্টুর দুষ্টু! যখন খুব বিষ্টি আসে ঝমঝমিয়ে বর্ষাকালে, তখন তার কী রূপ! দেখলে শিউরে উঠবে। এ-পার থেকে ও-পার তোমার দিষ্টিই যাবে না। মনে হবে সমুদ্দুর। কী তার ঢেউ! উঠছে, পড়ছে আর আছাড় খেয়ে মাটিতে মিশে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে।

আমি কিন্তু টুংরিকে একটুও ভয় পাই না। টুংরির ঢেউ জাগান জলে দোল খেতে আমার কী মজাই না লাগে। আমি রোজ দোল খাই।

আমার বাবা মাছ ধরে। রোজ সকালে জাল নিয়ে বাবা নদীতে যায়। আমিও যাই, বাবার সঙ্গে। কিন্তু রোজ না। এক-এক দিন। আমাদের একটা ছোট্ট নৌকো আছে। নৌকোয় চেপে, জলের দোলায় দুলতে দুলতে আমি আর বাবা টুংরির বুকে হারিয়ে যাই! বাবা জাল ফেলে ফেলে মাছের খোঁজ করে। আর আমি চোখ মেলে মেলে চেয়ে থাকি বাবার মুখের দিকে। বাবাকে আমার খুব ভাল লাগে! বাবার জন্যে আমার বড্ড মায়া লাগে। ভাবি, আমাদের জন্যে বাবা কত কষ্ট করে। কিন্তু সে কষ্ট মুখ দেখে বুঝবে না তুমি। দেখবে, সব সময়ে বাবার মুখখানি হাসি-হাসি।

আমি গান শিখেছি বাবার কাছে। যখন সাঁঝ নামে আকাশে, টুংরির জলের আয়নায় রঙের ছবি ফুটে ওঠে, তখন আমাদের নৌকো ঘরে ফিরবে। তখন নদীর বুকে গান গাইবে বাবা। বাবার গান শুনতে শুনতে হঠাৎ যখন আকাশের দিকে চেয়ে ফেলি আমার মনটাও কেমন আনমনা হয়ে যায়। আমিও বাবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গেয়ে উঠি। কে জানে আমার গান, গান হয় কিনা। কিন্তু নদীর দোলনায় দোল খেতে খেতে গানের সুর আমার ভেসে যায়। কোথায় যায়, আমি ভেবে পাই না।

সন্ধে এলে মনটা যেন আমার কেমন কেমন করে। মনে হয়. এক্ষুনি তো রাত্তির এসে পড়বে। রাত্তির এলে দিনের সবটুকু আলো অন্ধকারে হারিয়ে যবে। আর ঐ যে ছোট্ট ছোট্ট পাখিরা গাছের ডালে খেলছিল, ডাকছিল, ওরা আর ডাকবে না, খেলবে না। ঘুমিয়ে পড়বে।

আমারও ঘুমিয়ে পড়তে ভাল লাগে।

আমি দেখি ঘুমোয় না জোনাকিগুলো। ওর সারারাত আলো জেবলে জেবলে উড়ে বেড়ায়। ওরা তো এইটুকু-টুকু। ঐটুকু প্রাণীর কতটুকু আলো আর। অমন যে আকাশভরে তারার চুমকি, তাদের কথাই ধর! তারাই কী পারে অন্ধকারে আলো ছড়িয়ে দিতে? আমার যখন ঘুম পায়, তখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জোনাকির আলো দেখি। দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। মনে হয়, আমি যেমন কপালে কাচ-পোকার টিপ পরি, তেমনি যেন জোনাকিগুলো অন্ধকারের কপালে আলোর টিপ পরিয়ে দিচ্ছে।

আমার না খুব রাজকন্যা হতে ইচ্ছে করে। হাসছ? সত্যি বলছি। ইচ্ছে করলেই তো আর হওয়া যায় না! রাজকন্যার কত বড় বাড়ি। কত সাজ-পোশাক। কত গয়না-গাটি। কত দাস-দাসী। সোনার রথ। কত কী! আমার তো আর ওসব কিচ্ছু নেই। আমি শুধু রাজকন্যার গল্পই শুনি। গল্প শুনতে শুনতে আমার মনটা গল্পের রাজকন্যা হয়ে নীল আকাশের পরীর সঙ্গে খেলে বেড়ায়। উড়ে যায়। গল্প শুনতে কার না ভাল লাগে বল? আর যদি সে-গল্প অন্ধকার রাত্তিরে মায়ের মুখে শুনতে পাই! মায়ের বুকের মধ্যে কত গল্প। আমার যখন ঘুম-ছোঁয়া চোখ দুটি বুজে আসে, তখন দেখি সেখানে গল্প আর গল্প।

আমাদের এখানে যাত্রা হয়। তোমরা যাত্রা দেখেছ? সেবার হল অভিমন্যু পালা। বীর অভিমন্যুকে সপ্তরথী ঘিরে ফেলেছে। বীর হার মানবে না কিছুতেই। কী সাংঘাতিক যুদ্ধ! বীর একা লড়তে লড়তে যখন মাটিতে পড়ে গেল, চোখ দুটি বুজে এল, তখন আমার কিন্তু একটুও কান্না পায়নি। উল্টে আমার মনে হয়েছিল, আমি যদি অভিমন্যু হতে পারি। বীরের মত লড়াই করতে পারি! অমনি করে লড়তে লড়তে যদি সপ্তরথীর দর্প আমি ভাঙতে পারি! আচ্ছা, ওদের লজ্জা করল না? একটা ছেলেমানুষকে ওরা সবাই মিলে এমন করে মারল!

যাত্রা দেখে আমি কেঁদেছিলুম একবার। অন্ধমুনির গল্প তো আমি অনেক আগেই শুনেছি। তাঁর ছেলে সিন্ধু। যখন দশরথের হাতের তীর সিন্ধুর বুকে লাগল, চিরদিনের মত তার চোখের আলো নিভে গেল, তখন আমি চোখের জল না ফেলে পারিনি। ছেলের শোকে অন্ধমুনির সে কী কান্না! সে-কান্না শুনলে কে থাকতে পারে? আমি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরেছিলুম। আমি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

অন্ধমুনির যাত্রা আমি যেদিন দেখেছি সেদিন থেকে মানার জন্যে আমার যে কী ভাবনা ধরে গেছে, আমি বলতে পারি না। তোমরা চিনবে না মানাকে। মানা আমার বন্ধু। ওর মা চোখে দেখতে পায় না। মানার তো বাবা নেই, তাই অন্ধ মায়ের কাছে মানা একা থাকে। মা আর ছেলে। বড্ড গরীব ওরা। হবেই তো।

ওদের তো কেউ দেখে না। খেতেই পায় না সব দিন। আর যে-ঘরটায় থাকে, দেখলেই মনে হবে, এই বুঝি মাটির সঙ্গে মাটির ঘর ভেঙে পড়ে মিশে যায়।

কেন জানি না, মানাকে দেখলে আমার ভারি কষ্ট হয়। বলো, ঐটুকু ছেলে অন্ধ মাকে নিয়ে ও একা কী করে? আমি রোজ ওদের ঘরে যাই। এখান থেকে তো বেশিদূর নয় ওদের ঘরটা। দু পা হাঁটলেই হল। আমার পায়ের শব্দ শুনলেই মানার মা ঠিক বুঝবে আমি এসেছি। ডাকবে, "কে রে, টায়রা এলি?"

আমি বলি, "মাসী তুমি কোনদিন পিঠে খেয়েছ?"

আমার কথা শুনে মানার মায়ের অন্ধ চোখ দুটিও ছলছলিয়ে ওঠে।

আমি বলি, "কাঁদছ কেন মাসী, মা পিঠে করেছে। খাবে? আমি এনেছি।"

মাসী বললে, "আর জন্মে তুই আমার মেয়ে ছিলি মা।"

আমি বললুম, "মানা আমার ভাই।"

তারপর মানার হাত ধরে আমি ছুট দিই। ছুটে যাই টুংরি-নদীর ধারে। দুজনে বসে গল্প করি। আর নয়তো ফড়িং-বনে সবুজ ঘাসের আড়ালে হারিয়ে যাই।

আমি বলি, "মানা গান শিখবি?"

মানা উত্তর দেয়, "আমি গাইতে পারি না।"

আমি বলি, "আমার সঙ্গে গা।"

আমার সুরে সুর মিলিয়ে গায় মানা। কিন্তু তেমন কী আর গাইতে পারে!

ও কতদিন এসেছে আমাদের বাড়িতে। আমি কতদিন মানাকে নিয়ে, বাবার সঙ্গে নৌকো চেপে নদীর এ-পার ও-পার করেছি। আর নয়তো দুজনে, সাঁতার কাটতে কাটতে নদীর জলে হারিয়ে গেছি।

মানার মা-ও আসে আমাদের বাড়ি। মানার হাতটি ধরে। অন্ধ মাকে ও পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। ওরা এলে আমার এত ভাল লাগে। ওর মাকে দেখলে আমার কেবলই মন বলে, আমার চোখ দুটি ওর মায়ের চোখে পরিয়ে দিই। হলেই বা আমি অন্ধ। ওর মা তো দুচোখ ভরে তার ছেলেকে দেখতে পাবে। আহা! ছেলের মুখটি ও কোনদিনই দেখতে পেল না। কোনওদিনই দেখতে পাবে না! হাত দিয়ে ছেলের চিবুকে চুমু খেলেই কী মার সব সাধ মেটে?

মানার মা আমাদের বাড়ি এলে আমার মা পেট ভরে খেতে দেয়। মা আর ছেলে খাবে আর কাঁদবে। কান্না দেখলে আমার চোখেও জল এসে যায়। আমি বলি, "কাঁদছ কেন মাসী। মা তো তোমার বোন।" আমার কথা শুনে ওর মায়ের চোখে জল থামে না। আরও কাঁদে, আরও।

আমার মা একদিন একটি পাটভাঙা থান পরিয়ে দিয়েছিল অন্ধ মাকে। মা বলেছিল, "দিদি, এ-কাপড়টা তোমার জন্যে দোকান থেকে আনিয়েছি।"

নতুন কাপড় পরে মাসীকে কী সুন্দর মানিয়েছিল! আমি সেদিন মানার মুখেও হাসি দেখেছি। নতুন কাপড়ের মত ওর হাসিটাও কেমন যেন আমার চোখে নতুন নতুন লাগছিল। সেদিন মানাকে আমার এত ভাল লেগেছিল। মনে হয়েছিল ওকে-ও আমি নতুন পোষাকে সাজিয়ে দিই।

বর্ষা এলে আমার এত ভাল লাগে। আমি জানি বর্ষায় যেদিন প্রথম চাঁদ ওঠে, সেদিন মানার জন্মদিন। আমি তাই কতবার মাকে জিজ্ঞেস করি, "মাগো, কবে বর্ষা আসবে? প্রথম চাঁদ উঠবে?"

মা হাসবে। মা তো জানে আমি কেন বলছি। মানার জন্মদিনে আমি ওকে হাত ধরে ডেকে আনি আমাদের বাড়ি। মা পায়েস করে দেয়। আমি পায়েসের বাটি মানার হাতে তুলে দিয়ে বলি, "মানা, বর্ষায় আজ প্রথম চাঁদ উঠেছে। আজ তোর জন্মদিন।"

মানা আমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। ও হয়তো নিজেই জানে না কোন্ দিন তার জন্মদিন। আমি জানি বলে ও যেন অবাক হয়। অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আর তো কদিন পরে আবার বর্ষা আসবে। আবার ওর জন্মদিন আসবে। এবারও কি মানা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে?

দেখো না, আমি এবার সত্যি মানাকে অবাক করে দেব। এই বর্ষায় আমি ওকে রেশমি সুতির জামা দেব। মাকে আমি বলেওছি। মা বলেছে, "বেশ তো বর্ষা আসুক।"

আমার কানে এই যে সোনার ঝুমকো দুটো দেখছ, এ দুটো না বাবা আমায় দিয়েছে। বলো, ভাল না? বাবা শহরে গেছল। কিনে এনেছে। সেদিন ছিল আমারও জন্মদিন। তাই বাবা যখন ঝুমকো দুটো আমার কানে সাজিয়ে দিয়ে আদর করেছিল, তখন লজ্জায় মরে যাই। আমি মায়ের কাছে ছুটে পালিয়েছি। মায়ের আঁচলে নিজের মুখখানা লুকিয়ে বলেছি, "মা, মা, আমার কানে ঝুমকো—। বাবা দিয়েছে।" মা "কই কই" বলে আমার মুখখানি দেখার আগেই, আমি মায়ের আঁচল ছাড়িয়ে ছুট দিয়েছি। ঘর ছেড়ে রাস্তায়।

পাখিওলা যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। বনের পাখি খাঁচায় পুরে সে প্রায় বেচতে আসে এখানে। আমার না পাখিগুলোকে দেখলে ভারি মন কেমন করে। কেন যে পাখিওলা ওদের এমন করে বন্দী করে বেচে বেড়ায়, আমি বুঝতে পারি না। ওদেরও তো মা আছে। আমি পাখিওলাকে বলেছিলুম, "পাখিওলা,—আজ আমার জন্মদিন। আমায় একটি পাখি দেবে। আমি আকাশে উড়িয়ে দেব। এই দেখো না, বাবা আমায় ঝুমকো দিয়েছে।"

পাখিওলা আমায় পাখি দেয় নি। মুখখানা কেমন শুকনো-মুকনো করে শুধু বলেছিল, "বাঃ বাঃ! ঝুমকো দুটো বেশ তো!" বলে পাখির খাঁচা মাথায় নিয়ে হনহনিয়ে চলে গেল।

যাকগে। আমার খারাপ লাগলে পাখিওলার বয়ে গেছে। ওর পয়সা হলেই হোল।

আমি তারপর ছুটতে ছুটতে মানাদের বাড়ি গেছি। ওর মাকে বলেছি, "মাসী, মাসী, বাবা আমায় ঝুমকো দিয়েছে। দেখো।"

মাসী আমার গলাটি ধরে আমায় কাছে টেনে নিয়েছিল। বললে, "কই দেখি।" বলে আমার সারা মুখখানা দু হাত দিয়ে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে আদর করলে। সোনার ঝুমকো দুটো হাতে ধরে বললে, "কী সুন্দর হয়েছে।"

আর একটু গেলেই ময়রা-দাদার দোকান। আমি মানাদের বাড়ি পেরিয়ে ময়রা-দাদার কাছে ছুটে গেছি। বলেছি, "ময়রা-দাদা, ময়রা-দাদা, এই দেখো না, বাবা আমায় ঝুমকো দিয়েছে।"

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ময়রা-দাদার মুখখানাও কেমন খুশিতে আর হাসিতে ভরে গেল। বললে, "বাঃ! বাঃ! বেশ হয়েছে তো! এবার টায়রার বিয়ে হবে। আমি রসগোল্লা বানাব।" বলে এমন হো হো করে হেসে উঠল ময়রা-দাদা যে, আমি লজ্জায় চোখ বুজে ছুট দিলুম।

অত কী, আমার নিজেরই নিজের মুখখানা দেখতে এত ইচ্ছে করছিল। কেমন সেজেছে মুখখানা আমার ঝুমকো পরে। নিজের মুখ তো আর নিজে নিজে দেখা যায় না। তাই আমি ছুটে ছুটে নদীর ঘাটে গেছি। টুংরির জলে হেট হয়ে আমার মুখের ছায়া দেখেছি। দেখতে দেখতে আমি হেসে ফেলছি। তা বলে তো আর নদীর জল আয়না নয়। আয়নায় যেমন দেখা যায় স্পষ্ট স্পষ্ট, নদীর জলে তো তা হবে না। কিন্তু গয়না পরে, মায়ের সামনে নিজের মুখটা ঘরের আয়নায় কি করে দেখি বল? মা দেখে ফেললে!

টুংরির জলে মুখের ছায়া দেখে, আঁজলা-ভরে চোখে আমার জল ছিটিয়ে, আমি যখন উঠতে গেছি, তখনই আমার কানে যেন কিসের ঘণ্টা বাজল ঠুং ঠুং। আমার মনে হল, কে যেন ঘণ্টা

পরে হাঁটছে আর আসছে। আমি ফিরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখি, ও মা! গাধায় চেপে রামুকাকা আসছে! আমার যে কী হাসি পেল তোমাদের কী বলব! রামুকাকাকে তোমরা তো কেউ দেখ নি। আমি বলতে পারি, দেখলেই হেসে ফেলবে। খুব মোটা তো। আমি তা বলে রামুকাকার মুখের সামনে কোনদিন বলি না মোটা। বলব কেন? আমি তো ছোট। বলতে আছে? ভগবানের যা ইচ্ছে তাই তো হবে।

কিন্তু হাসি পেলে আমি কী করব! সত্যি বলছি, হাসি পেলে আমি চাপতে পারি না। আমায় দোষ দাও, দেবে! আচ্ছা, অমন একটা মোটা মানুষ যদি উল্টো দিকে মুখ করে গাধার পিঠে বসে বসে চলে, কে বাবা না হেসে থাকতে পারে? আমিও সামনের দিক দিয়ে পা টিপে টিপে গিয়ে রামুকাকার কানে কু দিয়ে দিয়েছি, রামুকাকা একেবারে চমকে উঠেছে। আর একটু হলেই পড়ে যেত। বলতে হবে গাধাটা খুব চালাক। ও যদি দাঁড়িয়ে না পড়ত, ঠিক একটা কাণ্ড হত। কিন্তু জানো, রামুকাকা একটুও রাগ করলো না আমার ওপর। উল্টে এমন হেসে উঠল যে, আমি নিজেই কেমন অবাক হয়ে গেলুম।

হাসতে হাসতে রামুকাকা বললে, "ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।"

আমি অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলুম, "গাধার পিঠে? উল্টো বসে?"

রামুকাকা বললে কী, "রোদটা ভারি মিষ্টি।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "উল্টে পড়ে গেলে?"

"পেটটা আমার দুম ফট হয়ে যেত।" বলে রামুকাকা নিজেই হেসে উঠল হো হো করে। কী রকম ছেলেমানুষটির মত হাসে রামুকাকা! মনে হয়, রামুকাকা যেন আমার চেয়েও ছোট।

ততক্ষণে আমিও হেসে ফেলেছি। আমি হেসেছি বলে আমার কানের ঝুমকো দুটোও হয়তো দুলে দুলে নেচে উঠেছিল। রামুকাকা দেখে ফেলেছে।

"আরে! আরে! টায়রার কানে ও দুটো কী?"

আমি বললুম, "কাকা, কাকা, ঝুমকো। আজ তো আমার জন্মদিন, বাবা দিয়েছে।"

রামুকাকা কেমন খুশিতে আমায় জড়িয়ে ধরল। আমার চিবুক ধরে বললে, "বা, বা, বা! ভারি মানিয়েছে তো!" অমনি দেখি গাধাটাও হেলে-দুলে তার ঘাড়টা নাড়ছে। গলার ঘণ্টা ঠুং ঠুং করে বেজে উঠছে।

জানো, রামুকাকার গাধার রঙটা বাদামি। কানের কাছে সাদা-সাদা একটু ছোপ। আমার কিন্তু সাদা রঙটা সবচেয়ে ভাল লাগে। সাদা ফুটফুটে ঘোড়াগুলো যখন চার পায়ে টগবগ করে ছোটে, কী সুন্দর দেখতে লাগে। আর সাদা ফুটফুটে হাঁসেরা যখন জলে সাঁতার কাটে, ভাল লাগে না? দুর্গোপুজোর সময় আমাদের এখানে না, ঝাঁকে ঝাঁকে বক আসে। সাদা-সাদা বকগুলো কেমন সাদা আকাশে উড়ে যায়! কী ভালই লাগে আমার। দুর্গোপুজোর সময় দেখো, ওই নীল আকাশটার গায়ে একেবারে তুলোর মত ধবধবে মেঘগুলো কেমন ভেসে বেড়ায়। তা বলে কী বলবে, প্রজাপতি আমি ভালবাসি না? খুব। উঃ! কত রঙ প্রজাপতির পাখায়! আমি কুমোরকাকুকে দেখেছি, মাটির সরার ওপর মা লক্ষ্মীর ছবি আঁকতে। কুমোরকাকু তুলি দিয়ে রঙ বুলিয়ে বুলিয়ে মা লক্ষ্মীকে সাজিয়ে দিচ্ছে। লক্ষ্মীর ঠোঁট দুটি লাল টুকটুক। পায়ের পাতা আলতা-রাঙা। চোখ দুটিতে কাজল-টানা। কপালের ঠিক মাঝখানটায় গোল নিটোল সিঁদুরের ফোঁটা। আচ্ছা, লক্ষ্মীঠাকুরকে রঙ দিয়ে না হয় কুমোরকাকু সাজায়, কিন্তু প্রজাপতির গায়ে রঙ দিয়ে কে আঁকিজুকি করে?

আমি না সেদিন রামুকাকার গাধার পিঠে চেপেছিলুম। অনেকক্ষণ থেকে ইচ্ছে করছিল একটু চাপি। কিন্তু ভয় লাগে তো! একেবারে নতুন মানুষকে পিঠে বসতে দেখলে যদি চার পা তুলে লাফায়! না, সেসব কিচ্ছু না। গাধাটা ভারি ঠাণ্ডা। আমায় পিঠে নিয়ে ঠুকঠুক করে হাঁটতে লাগল। আমায় পিঠে নিয়ে ওর আর একটুও কষ্ট হচ্ছে না। আমি তো হালকা। বাবা রামুকাকার ভার কী করে সইছিল কে জানে!

জানো, রামুকাকা না ভারি মজার মানুষ। শীতকালে করবে কী, মাথায় একটা পাগড়ি বাঁধবে। গায়ে কম্বল জড়াবে। রোদে পা দুটো ছড়িয়ে যখন সা-রে-গা-মা-পা-ধা করে গান গাইবে, দেখলে তোমার হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবে। কত গল্প জানে। একবার রামুকাকার বাড়িতে একটা চোর ঢুকেছিল। তখন তো শীতকাল আর নিশুতি রাত্তির। রামুকাকা কম্বল মুড়ি দিয়ে খুব ঘুমুচ্ছে। এদিকে চোরটাও ঘরে ঢুকে খুব সিন্দুক হাতড়াচ্ছে। কিন্তু যা কিছু সম্পত্তি সব তো রামুকাকা একটা থলের মধ্যে পুরে, পেটের সঙ্গে কাপড়ে বেঁধে রাখে। চোর তো আর সে-কথা জানে না। সে সিন্দুক হাতড়ালে। প্যাঁটরা-বাক্স ভাঙলে। এটা ওটা উল্টেপাল্টে দেখলে, কিচ্ছু পেলে না। না পেয়ে করেছে কী, রামুকাকা যে-বিছানায় মুড়িসুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে, সেই বিছানায় উঠে বালিশের তলায় হাত দিয়ে খোঁজাখুঁজি লাগালে। ব্যস! রামুকাকার ঘুম ভেঙে গেছে। রামুকাকা ঠিক বুঝতে পেরেছে। প্রথমটা কিচ্ছু বলেনি। চুপটি করে চোখ বুজে পড়ে রইল। চোরটা বালিশের নিচটা হাতড়াতে হাতড়াতে, কম্বলের ভেতর যখন হাত গলিয়ে দিলে, তখনও রামুকাকা কিচ্ছু বললে না। মিথ্যে মিথ্যে নাক ডাকাতে লাগল। তারপর যেই চোরটা রামুকাকুর পেটে হাত দিয়ে ফেলেছে, অমনি রামুকাকু খিলখিল করে হেসে ফেলেছে। কাতুকুতু লেগে গেছে তো! হাসতে হাসতে রামুকাকু চেঁচিয়ে উঠল, "পেট ছাড়, পেট ছাড়, হাসি পাচ্ছে।" চোরটা তো হতভম্ব। তড়াং করে এক লাফ। রামুকাকাও ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ে চোরকে জাপটে ধরেছে। চোরটা মাটিতে ডিগবাজি মেরে রামুকাকুর সঙ্গে ধস্তাধস্তি লাগিয়ে দিলে। কিন্তু পারবে কেন রামুকাকুর সঙ্গে! রামুকাকা যদি একবার চোরের ঘাড়ে চাপে, নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে যাবে। তখন চোরটা আর কিছু না পেয়ে ভ্যাঁ-এ্যাঁ করে কান্না জুড়ে দিলে।

রামুকাকার চেহারাটা অমন দত্যির মত হলে কী হবে! মনটা একেবারে জলের মত। চোরের কান্না শুনে ধমক দিলে, "এই, কাঁদছিস কেন?"

চোর তবুও কাঁদছে।

রামুকাকা এবার আরও চেঁচিয়ে উঠল, "কাঁদবি তো আমি তোকে কেটে ফেলব। আমি কান্না-ফান্না সহ্য করতে পারি না।"

চোরটা বললে, "কাঁদব না, আমি কদিন কিচ্ছু খাইনি। ঘরে বৌ-ছেলে কিচ্ছু খেতে পায়নি।"

"ঠিক আছে। তো কাঁদবি না। এই নে।" বলে রামুকাকা চোরকে দেবে বলে ট্যাঁক থেকে থলিটা টেনে বার করলে।

চোর তো থলি পেয়ে খুব খুশি। কিন্তু কান্না থামল না। প্যানপ্যান করে কেঁদেই চলেছে।

রামুকাকু বললে, "ফের কাঁদছিস! ওই তো থলি দিয়েছি।"

চোর নাকি-সুরে বললে, "শুধু থলিতে হবে না।"

"তবে?"

"ঘাড়ে চাপব!"

রামুকাকা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "ঘাড়ে চাপবি? কার ঘাড়ে চাপবি?"

"তোমার।"

রামুকাকার গায়ে তো ভীষণ জোর। সঙ্গে সঙ্গে রোগা প্যাঁটকা চোরটাকে চ্যাংদোলা করে ঘাড়ে তুলে নিলে। জিজ্ঞেস করলে, "কোথা যাবি?"

"বাইরে যাব।"

"তাই চ।" বলে রামুকাকা চোরটাকে ঘাড়ে নিয়ে, সেই কনকনে ঠাণ্ডা রাত্তিরে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল।

বাইরে এসে চোরটা বললে, "নামব।"

"কেন, ঘর যাবি না?"

"যাব। একা যাব। তোমায় আর কষ্ট দেব না।"

তখন রামুকাকা চোরটাকে ঘাড় থেকে নামিয়ে দিল।

চোরটা কিন্তু এমন দস্যি, ঘাড় থেকে নেমে আচমকা রামুকাকার পেটে এমন গুঁতিয়ে দিলে যে, রামুকাকা টাল সামলাতে পারলে না। মাটিতে পড়ে গেল। চোরটাও রামুকাকার থলি নিয়ে পাঁই পাঁই করে ছুট দিলে। ছুটতে ছুটতে চেঁচালে,

মোটা রামু বোকারাম,
কেমন তোকে ঠকালাম!

রামুকাকা একটি কথাও বললে না মুখ দিয়ে। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াল। যদিও কোমরটা টনটনাচ্ছে, তবু মুখে মুচকি মুচকি হাসি। মনে মনে বললে, "যা ব্যাটা, খুব বেঁচে গেলি। ঘরে গিয়ে বুঝবি আমি রামু বোকা, না তুই ব্যাটা ঘুঘু।"

চোরটাকে কেন যে এ-কথা রামুকাকা বলেছিল, তখনও কেউ বোঝেনি। সেই রাত্তিরে আলো জেলে যখন ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেছিল, তখনও কেউ বুঝতে পারেনি। ভাঁড়ার ঘরে আনাজের চুপড়ি হাতড়ে, যখন টাকার থলিটা বার করে টাকা গুনতে বসল, তখন অবাক! আসলে কী হয়েছে. চোরের ভয়ে রামুকাকা রোজ রাত্তিরে শোবার সময় টাকার থলিটা আনাজের চুপড়িতে লুকিয়ে রেখে দেয়। আর নিজের ট্যাকে, থলিতে ঠেসে ঠেসে খোলামকুচি পুরে বেঁধে রাখে। চোর আর অতশত জানবে কী করে? সে ভেবেছে ওইটাই বুঝি টাকার থলি।

উঃ! কী ঠকানই না ঠকিয়েছে রামুকাকা! রামুকাকাকে দেখতে অমন হলে কী হবে, এক নম্বরের চালাক।

জানো, কাল না মানার জন্মদিন। কদিন ধরে খুব বিষ্টি হচ্ছে আমাদের এখানে। মেঘের মুখখানা এখনও যে-রকম গোমড়া হয়ে আছে, আমার ভয় করছে, কালও হয়তো মেঘ সরবে না। যদি চাঁদ না ওঠে। চাঁদ নাই বা উঠল। জন্মদিন তো ঠিক আসবে, বলো? রেশমি সুতির জামাটা কী সুন্দর! পরলে মানাকে ভারি ভাল লাগবে। মানা একটু রোগা। কিন্তু মুখখানা তো মিষ্টি। চন্দনের ফোঁটা দিয়ে যখন ওর গালের ওপর ফুল এঁকে দেব, তখন আরও ভাল লাগবে। আমি তা বলে তেমন আঁকতে পারি না। কিন্তু আমি ছাড়া ওর কপালে আর তো কেউ চন্দনের টিপ পরিয়ে দেবে না।

বর্ষা হলে না মনটা আমার কেমন হয়ে যায়। তুমিও দেখো যাকে খুব ভালবাস, সে যদি অনেক দূরে থাকে, বার বার তার কথা মনে পড়বে। আমার অবশ্য কারুর কথা মনে পড়ছে না। কিন্তু চাঁদের জন্যে মন কেমন করছে। জান, চাঁদ না উঠলে আমার যে মনেই হবে না, এ দিনটা মানার জন্মদিন!

ব্যাঙগুলো কী রা কাড়ছে বাবা। ওই তো থ্যাবড়া থ্যাবড়া একটু একটু চেহারা। কিন্তু গলার কী তেজ দেখো। কানের পর্দা যেন ফেটে যাচ্ছে। কাকগুলোও খুব জব্দ হয়েছে। বিষ্টিতে ভিজে চুপসে চুপটি করে বসে আছে।

আজ সারাদিন আমি মেঘের দিকে চেয়ে চেয়ে কাটিয়েছি। আজ মানাদের বাড়িও যেতে পারিনি। বাইরে এক হাঁটু জল। আর এমন দমকা-দমকা হাওয়া দিচ্ছে! কে জানে, ঝড় উঠবে হয়তো।

সত্যি ঝড় উঠেছিল। মেঘ ডাকছিল। বাজ পড়ছিল আর এক নাগাড়ে আকাশ ভেঙে বর্ষা হচ্ছিল। আমি রাত্তিরবেলা যখন শুতে গেলুম তখন যেন বাইরে যুদ্ধ হচ্ছে। মেঘের সঙ্গে ঝড়ের সঙ্গে। ঝড়ের কী শব্দ!

শুয়ে শুয়ে কী ভাবনাই হচ্ছিল আমার। কী জানি ভাঙা ঘরে মাকে নিয়ে মানা এখন কী করছে! যতক্ষণ না চোখে ঘুম এসেছিল, ততক্ষণ আমি ভেবেছি। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছি।

সকালবেলা যখন ঘুম ভেঙেছিল, তখনও ঝড় থামেনি। বৃষ্টিও ধরেনি। আমি রেশমি সুতোর জামাটা আমার কাপড়ের আঁচলে ঢেকে নিয়ে ভাবছিলুম, হয়তো ঝড় আর থামবে না। যাই না এখনই একবার দেখে আসি মানাকে। এখনই ওর গায়ে জামাটি পরিয়ে দিয়ে আসি!

আমার তো ছোট্ট একটা টোকা আছে। রথের দিনে মেলা বসে। মা কিনে দিয়েছে। প্রত্যেক বছর আমি রথ টানি। আমাদের রথটা তিনতলা। সেই ওপর তলায় জগন্নাথ, সুভদ্রা আর বলরামের আসন। কেমন বোনটিকে মাঝখানে আগলে রেখে দু পাশে দু ভাই বসে আছে। জগন্নাথের মাসীর বাড়ি বেশ খানিকটা দূরে। কত লোক এ-গ্রাম ও-গ্রাম থেকে রথ টানতে আসে, আর জয় জগন্নাথ বলে জয়-ধ্বনি দেয়। আমি জগন্নাথের জয় দিই খুব চেঁচিয়ে। কিন্তু অত লোকের মধ্যে আমার গলা কী আর কেউ শুনতে পায়! কেউ না পাক, জগন্নাথদেব তো পায়। মা বলে, ঠাকুর-দেবতাদের নাকি সব দিকে নজর। সব্বার কথা শুনতে পান। মন দিয়ে ডাকলে, সক্কলকে দয়া করেন।

রথের মেলার টোকাটা মাথায় দিয়ে আমার মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। জগন্নাথদেবের মুখখানি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমি মনে মনে বললুম, "ঠাকুর, ঠাকুর, একটু দয়া কর। আজ একবার চাঁদকে আকাশে উঠতে বল। আজ মানার জন্মদিন।"

ঠাকুর আমার কথা শুনলেন কি না আমি কী করে বলব বল! শুনলেও তো আমি জানতে পারব না। ওঁরা তো আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না। চুপটি করে বসে থাকেন, আর পুজো হয়ে গেলে আমাদের পেসাদ দেন। ঠাকুরের মনের কথা ঠাকুরই জানেন।

মাথায় আমি টোকা রাখতেই পারছিলুম না। ঝড়ের হাওয়ায় বার বার উড়ে পড়ছিল। আমি মাকে বললুম, "মা, আমি একটু আসছি, এ্যাঁ!"

মা জিজ্ঞেস করলে, "ঝড়-জলে কোথায় যাচ্ছিস?"

আমি বললুম, "মানাদের বাড়ি। আজ তো মানার জন্মদিন।"

মা আমার মুখের দিকে একবারটি তাকাল। শুধু একটিবার। তারপর বললে, "মানা নেই রে।" বলেই মায়ের চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠল।

আমি কেমন চমকে উঠলুম। বললুম, "কেন, কোথা গেছে?"

মা বললে, "ওদের ঘর পড়ে গেছে।"

আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। আঁচল-চাপা মানার রেশমি জামাটা আমার হাত ফস্কে মাটিতে পড়ে গেল। আমি আর কোন কথা না বলে মায়ের সামনে দাঁড়িয়েই চেঁচিয়ে কেঁদে ফেললুম, "মানা-আ-আ।" তারপর ছুট দিলুম। সেইবারই যেন প্রথম, সব প্রথম আমি মায়ের কথা শুনিনি।

ছুটতে ছুটতে জল থৈ থৈ রাস্তা পেরিয়ে কখন যে আমি মানাদের ভাঙা বাড়ির মাটির ওপর এসে দাঁড়ালুম, আমি নিজেই এখন জানি না। ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটা ঝড়ের ঝাপটায় কোথায় যে হারিয়ে গেছে, আমি খুঁজেই পাচ্ছি না। আমার মনের ভেতরটা কী রকম কেঁদে উঠছিল। কিন্তু চোখ দিয়ে একটুও জল পড়ছিল না। মনে হচ্ছিল, এখনই ছুটে যাই ঠাকুরের কাছে। বলি, "ঠাকুর, তোমায় যে এত করে ডাকলুম, কই তুমি আমার কথা শুনলে না তো! তবে তুমি কার কথা শোন? কা-কে তুমি সবচেয়ে ভালবাস?"

আমার আর ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করছিল না। মানাদের ঘরের সামনে সজনে গাছটা এখনও আছে। কেন যে সেটা এখনও ঝড়ে মাটিতে উল্টে পড়েনি, আমি কেমন করে বলব! গাছটাকে বড্ড ভালবাসতো মানা। ওদিকে নজর পড়তেই আমি ছুটে গিয়ে গাছের গুঁড়িটা দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলুম। তারপরেই আমায় কে যেন কাঁদিয়ে দিল। আমার দু চোখ ফেটে জল এল। আমি গাছের গায়ে মুখ ঘসতে ঘসতে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললুম। তারপর ডাকলুম, "মানা-আ-আ।" ডাকতে ডাকতে আমি ছুটতে লাগলুম। কোথায় ছুটছি আমি জানি না। মনে হচ্ছিল, এই ঝড়ের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করি। মনে হচ্ছিল এই রাক্ষুসীর গলাটা টিপে দিয়ে ওকে শেষ করে দিই।

তারপর ছুটতে ছুটতে জানো, আমি টুংরি নদীর ধারে চলে এসেছি। এইখানটায় আমি আর মানা কতদিন এসেছি। কতদিন এখান থেকে খোলামকুচি ছুড়ে আমরা দুজনে জলের বুকে

ঝিলিমিলি খেলেছি। মানার সঙ্গে আমি পারতুম না। ও এমন ছুড়ত, খোলামকুচিটা জলের ওপর লাফাতে লাফাতে কোথায় চলে যেত, আমি দেখতে পেতুম না।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন আমার মনে হয়, আমার মনের কথাটা কাউকে খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলি কিন্তু এখানে তো কেউ নেই। কা-কে বলব? কা-কে জিজ্ঞেস করি মানার কথা? টুংরির বুকটা জলে জলে ছাপিয়ে গেছে। কী মস্ত মস্ত ঢেউ উঠছে ঝড়ের ঝাপটায়। আমার কিন্তু একটুও ভয় করছে না। আমার কেন মনে হল, এখন এখানে ও-ই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। আমি আনমনে কথা বলে ফেললুম। কথা বললুম টুংরির সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলুম, "নদী, নদী, মানাকে দেখেছ?"

নদী হঠাৎ কী রকম গর্জে উঠল। আমি দেখলুম গর্জাতে গর্জাতে একটা মস্ত উঁচু আকাশ ছোঁয়া ঢেউ আমার দিকে ছুটে আসছে। আমি পেছন ফিরে ছুটে পালাতে গেলুম। আমি পালাতে পারলুম না। ঐ ঢেউটা লাফাতে লাফাতে একেবারে আমার ঘাড়ে এসে পড়ল। আমি আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলুম। চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলুম, "মা-আ-আ।" তারপর গুড়গুড় করে ডাকতে ডাকতে একটার পর একটা ঢেউ এসে আমার ওপর আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল। তখন আমার মনে হ'ল টুংরি নদীটাই যেন উপছে আমার ঘাড়ে এসে পড়ছে। আমি জলের সঙ্গে জল হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। আমি চেঁচাচ্ছি, পারছি না। আমি হাত তুলে যা পারছি ধরছি। ধরা যাচ্ছে না। আমার যেন মনে হল, আমাদের গ্রামটাই টুংরি নদী হয়ে গেছে। কোথাও একটু ডাঙা নেই। আমার চারিদিকে জল। আমার পেছনে, সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে, শুধু জল আর জল। মনে হল এই জলের তলায় এক্ষুনি আমি তলিয়ে যাব। স্রোতের টানে হারিয়ে যাব। আমি মাকে বাবাকে কত ডাকলুম, কত কাঁদলুম, কেউ শুনল না। টুংরি আমায় টেনে নিয়ে চলে গেল। যতক্ষণ পেরেছি সাঁতার কেটেছি। যতক্ষণ পেরেছি আমার হাত দুটো আকাশের দিকে তুলে বাঁচতে চেয়েছি। তারপর জলে তলিয়ে গেছি, না জলের ওপর ভেসে চলেছি আমি জানি না। আমার চোখ থেকে বাবার মুখখানা কেমন ঝাপসা হয়ে গেল। মায়ের চোখ দুটি মিলিয়ে গেল। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমাকে কে যেন জোর করে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। চেষ্টা করেও চোখের পাতা দুটো আমি খুলে রাখতে পারছি না। আমার আর কিছুই মনে নেই।

হঠাৎ যেন টুং টুং করে বেজে বেজে একটি মিস্টি সুর আমার কানে ভেসে আসছিল। ভোরবেলা পাখি ডাকলে ঘুম চোখে বিছানায় শুয়ে শুয়ে যেমন তাদের আধো-আধো-ডাক শুনতে পাই, শব্দটাও ঠিক তেমনি আবছা আবছা। একবারটি মনে হল, আমি মায়ের পাশে ঘুমুচ্ছি। সকাল হয়ে গেছে উঠতে হবে। তারপরই ভয়ে আমার বুকটা কেঁপে উঠল। মনে হল টুংরি নদীর ঢেউ-এ আমি ঘুরপাক খাচ্ছি এখনও। আমি চমকে চোখ চেয়ে ফেললুম।

কী অন্ধকার! তোমায় বলব কী, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিলুম না। মনে হচ্ছে আমি জলে কাদায় গড়াগড়ি খাচ্ছি। হাঁপাচ্ছি আমি। আর ভীষণ কষ্টে উঃ! আঃ! করে কাতরাচ্ছি। ধড়ফড়িয়ে ওঠবার

আমার না খুব রাজকন্যা হতে ইচ্ছে করে।

চেষ্টা করলুম। পারলুম না। উঠতে গিয়ে আমার গায়ে এমন ব্যথা লাগল, আমি তোমাদের তা বোঝাতেই পারব না। তখন আমি কী করে জানব বল যে, টুংরির বানের জলে ভেসে এসে আমি একটা গভীর বনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছি।

ওই টুং টুং শব্দটা আমার কানে যদি না আসত, আমি তা হলে নিশ্চয়ই ভাবতুম, হয়তো আমি অতল জলে ডুবে গেছি। আমি তো শুনেছি জলের তলায় অন্ধকার। অন্ধকারের নিচে আরও অন্ধকার। তার নিচে নাকি পাতাল। পাতালপুরীর রাজ-প্রাসাদে হয়তো আলো আছে।

হঠাৎ আমার চোখে আলো পড়ল। ছোট্ট একটি ফোঁটার মত এক টুকরো আলো। আমার যে তখন কেন মনে হল, ওই টুং টুং শব্দটা ঠিক যেন মায়ের হাতের গয়নার ঝুনঝুনি। আর ওই আলোর ফোঁটাটি যেন মায়ের হাতে প্রদীপ। মা তুলসীতলায় প্রদীপ জেবলে অমনি করে সন্ধে দেয় রোজ।

কিন্তু কী জানো, আমি ঠিক দেখতে পাচ্ছি, একটুখানি ওই আলোটা আর মিষ্টি মিষ্টি এই শব্দটা দূর থেকে এদিকেই এগিয়ে আসছে। ঠিক আমার দিকে। যত কাছে এগিয়ে আসছে, আমার বুকের ভেতরে ততই কেমন কষ্ট হচ্ছে। আমার মন বলছে, আমি চেঁচিয়ে ডাকি। কিন্তু কিছুতেই পারছি না।

এত কাছে এসে গেল আলোটা, আমি এবার সব দেখতে পেলুম। দেখতে পেলুম, একটি লোক। তার মাথায় পাগড়ি। হাতে একটি লণ্ঠন। কাঁধে একটা বর্শা। বর্শার আগায় একটি থলি বাঁধা। আমাকে দেখতে পেয়ে লোকটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকে দেখে আমার একটুও ভয় করল না। লোকটা যদি ডাকাত হয়, একবারও তা মনে হল না। আর ডাকাত হলেই বা কী! আমাকে মারবে? কিন্তু তাকে দেখে আমার তো তা মনে হল না। আমার যে কী আনন্দ হল, আমি সে-কথা এখন বলতেই পারব না।

আমাকে দেখে লোকটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি তার দিকে একদিষ্টে তাকিয়ে রইলুম। আর একবার উঠে বসবার চেষ্টা করলুম, পারলুম না।

লোকটি আমার দিকে হেঁট হয়ে দেখলে। আলোটা মাটিতে নামালে। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কি হয়েছে তোমার?"

আমি ঠোঁট নাড়লুম। কথা বলতে চেষ্টা করলুম। কিন্তু কথা আমার বেরুল না। আমার মনে হল, সব কথা আমার গলায় আটকে গেছে। অনেক কষ্ট করেও কিছু কইতে পারছি না।

লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কি?"

আমি পড়ে পড়ে বোবার মত চেয়ে রইলুম। আর মনে মনে ভাবলুম, আহা! ও যদি আমায় একটু বসিয়ে দেয়!

"তোমার বাড়ি কোথা?"

আমি তবুও বলতে পারলুম না। এবার আমার চোখ দুটি কেঁদে ফেলল।

লোকটি আদর করে আমার কপালে হাত দিল। কপাল থেকে চুলগুলি সরিয়ে দিল। আমায় কোলে তুলে নিল। আমার এই ছোট্ট শরীরটা ওর হাতের ছোঁয়া লেগে খুশিতে কেমন যেন চমকে উঠল। আমি ওর বুকে মাথা রাখলুম। আমার অবশ হাত দুটি দিয়ে ওর গলাটি জড়িয়ে ধরতে চাইলুম। আমি পারলুম কি, জানি না। কিন্তু ওর বুকে মাথা রাখতেই আমার চোখ দুটি আবার কেমন বুজে গেল। আমি অনেক চেষ্টা করেছি চেয়ে থাকতে। পারিনি। কে যেন আমায় জোর করে ঘুম পাড়িয়ে দিল।

কতক্ষণ পর আমার আবার যে ঘুম ভাঙল তা আমি কিছু জানি না। আমি দেখলুম দিনের আলো ফুটেছে। আমি একটা বিছানায় শুয়ে আছি। একটা ছোট্ট ঘর। ঘরের জানলা দিয়ে রোদের আলো ছড়িয়ে আছে। আর সেই লোকটি আমার মুখের দিকে চেয়ে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আমার ভীষণ জল তেষ্টা পাচ্ছে। কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারছি না।

আমায় কিছু বলতেও হল না। লোকটি নিজেই এক বাটি দুধ নিয়ে এল। আমার মুখে একটু একটু করে ঢেলে দিলে। আঃ! আমার যে কী ভাল লাগছে! আমার বুকটা শুকিয়ে গেছে একটু জলের জন্যে। হয়তো শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত। তখন হয়তো আমি আর কোনদিন চোখ চাইতে পারতুম না। সত্যি বলছি বিশ্বাস কর, তখন ওই লোকটির হাত দুটি ধরে আমার বলতে ইচ্ছে করছিল, তুমি কত ভাল লোক। আর মনে হচ্ছিল খুব চেঁচিয়ে আমি কাঁদি, খুব কাঁদি!

আচ্ছা, বলো কাঁদব না? এই লোকটি যদি না দেখত, আমায় কে বাঁচাত? কে আমায় ওই গভীর বন থেকে তুলে এনে এমন করে আদর করত? আমি আবার উঠে দাঁড়াব। আমি ভাল হয়ে বাড়ি যাব। মা আর বাবাকে আমি আবার দেখতে পাব।

জানো, কদিন পরে না, আমি সত্যি ভাল হয়ে গেছি। আমার আর কিচ্ছু কষ্ট নেই। আমি এখন নিজে নিজেই বসতে পারি। একটু একটু হাঁটতে পারি। খুব যখন ইচ্ছে হয়, ওই লোকটির হাত দুটি ধরে বাইরে যেতে পারি। তবু আমি কাঁদি। রোজ রোজ কাঁদি। জানলায় মাথা রেখে বাইরের দিকে যখন চেয়ে থাকি আমি, আমার চোখ দুটি কান্নায় উপছে পড়ে। কেন জান? আমি না আর কথা বলতে পারি না! আমায় কতবার ওই লোকটি জিজ্ঞেস করেছে, আমার নাম কি, আমার বাড়ি কোথা? আমি বলতে পারি না। আমি বলতে পারি না আমার নাম টায়রা। আমাদের বাড়ি টুংরি নদীর ধারে, আর সজনে গাছটা একা-একা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, ওখানে মানাদের বাড়ি! আমি কথা বলতে পারি না, কিছুতেই পারি না। যদি কথা না বলতে পারি, বলো, লোকটি কী করবে? কী করে আমায় পৌঁছে দেবে আমাদের বাড়ি? বলো, কে আমার কথা কেড়ে নিল এমন করে? কেন কেড়ে নিল বলো না! তবে কী টুংরি নদীটা কথা বলতে পারে না বলে, ওর হিংসে হয়েছিল আমার ওপর? তাই আমাকে এমন করে বোবা করে দিলে! আমি এখন কেমন করে আবার মাকে ডাকব। আমি কেমন করে বলব, "বাবা, রুপো-রুপো ওই খয়রা মাছটা আমায় দেবে, আমি ভাজা করে দেব, মানা খাবে। খয়রা মাছের ভাজা খেতে ও খুব ভালবাসে।"

আমি কবে আবার মাকে বাবাকে দেখতে পাব, জানি না। জানি না, সাঁঝের বেলা নৌকো চেপে আমি বাবার পাশে বসে আবার গান গাইতে পারব কি না। জানি না এখন, কিচ্ছু জানি না। শুধু জানি ওই জানলাটা এখন আমার বন্ধু। ওর গরাদে গাল দুটি ছুঁইয়ে রেখে এখন বাইরে চেয়ে থাকতেই আমার ভাল লাগে।

আর ভাল লাগে ভাবতে, বাবা যদি কোনদিন এ-পথ দিয়ে যায় আমি দেখতে পাব। তারপর ছুটে গিয়ে বাবার দু হাতের মধ্যে হারিয়ে যাব।

ভারি ঝকঝকে এই ঘরটা। ছোট্ট কিন্তু আলোয় ভর্তি। এটা তো বনের ধার। তাই তুমি যদি জানলা দিয়ে মুখ বাড়াও দেখতে পাবে, সামনে খালি বন আর বন। থমথম করছে। দেখলে তোমার ভয় করবে কিনা জানি না। আমার কিন্তু ভাল লাগে।

কত রঙ-বেরঙের পাখি আসে এদিকে। আমার এই জানলাটার সামনে, ওই যে মাধবী ফুলের গাছটা লতিয়ে লতিয়ে ছাতে উঠে গেছে, ওখানে ওরা লুকোচুরি খেলে কেমন! আমি যখন হাত বাড়াই, ওরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে আমার মুখের দিকে। ভাবে হয়তো, এ মেয়েটা কে আবার আমাদের পাড়ায় এসেছে! জানো, একদিন না একটা হরিণ এসেছিল। মা-হরিণ। কী মিষ্টি কচি কচি দুটো বাচ্চা সঙ্গে! কী সুন্দর চোখগুলি! আর তাদের শিংগুলো যেন গাছের ডালপালা। আমার না, বাচ্চা দুটোকে এত আদর করতে ইচ্ছে করছিল! আমি জানলা দিয়ে হাতটি বাড়িয়ে দিয়েছিলুম। ও মা! মা-হরিণটা পালিয়ে গেল। আর বাচ্চা দুটো জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে, আমার হাতটা কেমন চেটে দিলে। আমি ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেলুম। দুটোকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলুম। কিন্তু মা-হরিণটা এমন দুষ্টু! এমন তেড়ে এল আমায়, আমি ছুটে ঘরে ঢুকতে পথ পাই না। বাবা! একবার

আমার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

গুঁতিয়ে দিলে রক্ষে আছে!

লোকটি কিন্তু আমায় খুব ভালবাসে। দেখলে মনে হয় ও যেন আমার বাবার চেয়েও অনেক বড়। বাবার তো একটিও চুল পাকেনি। আমি মনে মনে ভাবি ও আমার দাদু। কিন্তু মুখে তো বলতে পারি না! তবু ভাবি দাদু বলে যদি একবার ডাকতে পারি! একবার যদি বলতে পারি, "দাদু, তুমি এত ভাল লোক!"

ভালই তো। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে, একটা কোথাকার-কে বোবা মেয়ের জন্যে কে এমন করে? কিন্তু দাদুতো জানে না. আমি কোনদিনই এমন বোবা ছিলুম না। আমি তো বোবা হয়ে গেছি। আমার জন্যে কী সুন্দর শাড়ি এনে দিয়েছে। টুকটুকে আলতাপাতা কিনে দিয়েছে। চুড়ি এনে দিয়েছে। আমি কিন্তু সাজতে পারি না। কিছুতেই পারি না। সাজতে গেলেই মায়ের মুখখানি স্পষ্ট আমার মনে পড়ে যায়! তখন আমার চোখ দুটিও টুলটুল করে উপছে পড়ে। আমায় কাঁদতে দেখলে দাদু আমায় এত আদর করে। বলে ভয় কিরে, আমি তো আছি! কিন্তু কতদিন পরের ঘরে থাকতে পারে মানুষ!

দাদুকে আর আমার পর মনে হয় না। এত হাসি-খুশি মানুষ। আমাকে যেন কেমন করে আপন করে নিয়েছে। আমার না ভারি দুঃখ হয় দাদুর জন্যে। জানো, দাদুর কেউ নেই। একটি ছেলে ছিল। যুদ্ধে গেছল, ফেরেনি। আচ্ছা, যুদ্ধ কেন হয় বল তো? কেন বল তো, অত বড় বড় মানুষগুলো নিজেরা মারামারি করে রক্তারক্তি করে? ওরা এত নিষ্ঠুর কেন? ওদের কী একটুও দয়ামায়া নেই? আমায় তো সক্কলে ভালবাসে। তেমনি সবাই সবাইকে ভালবাসে না কেন? ভালবাসলে তো আর যুদ্ধ হয় না।

দাদু না ডাক-হরকরা। রোজ রাতদুপুরে, কাঁধে বর্শা নিয়ে. তাতে চিঠির থলি বেঁধে, রাতে লণ্ঠন জেবলে দাদু ওই বন পেরিয়ে শহরে যায় চিঠি বিলি করতে। দেখে আমার কী রকম কষ্ট লাগে। আমার বলতে ইচ্ছে করে, "দাদু, এ-কাজটা তুমি ছেড়ে দাও।" কিন্তু আমি তো বলতে পারি না। শুধু দাদুর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। দাদু হয়তো চোখ দেখে আমার মনের কথা বুঝতে পারে। তাই বলে, "আমার জন্যে তোর কষ্ট হয়, না রে?"

আমি মুখ বুজে ঘাড় নাড়ি, হ্যাঁ।

দাদু বলে, "না রে, আমার তা বলে কিছু কষ্ট হয় না। আমার তো অভ্যেস।"

আমি মুখ নেড়ে, হাত নেড়ে কত চেষ্টা করে যে-কথাটা বোঝাতে চাই, দাদু ঠিক বুঝতে পারে। জিজ্ঞেস করে, "ডাকাত?"

আমি ঘাড় নাড়ি।

দাদু হেসে ওঠে। বলসে, "এইটুকু বয়স থেকে আমি এ-কাজ করছি। ডাকাতে আমার ভয় নেই। আর ডাকাত যদি আসে আমার তো বর্শা আছে। আমি লড়ে যাব।"

দাদুর সাহস দেখে, আমারও কেমন সাহস বেড়ে যায়।

রোজ রাত্তিরে দাদু যখন চিঠি বিলি করতে যায়, আমায় বলে যায়, "সাবধানে থাকবে। দরজা খুল না যেন।"

আমি দরজা খুলি না। জানলা খুলে দেখি দাদু যাচ্ছে ছুটতে ছুটতে। আর ডাক-হরকরার ঘণ্টা বাজছে ঠুং ঠুং করে। আমার না ওই ঘণ্টার সুরটা কানে এলেই এত গান গাইতে ইচ্ছে করে। কিন্তু গাইব কী করে? বোবা মেয়ে কী গাইতে পারে? আমি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি, দাদুর ওই ঘণ্টা বাজতে বাজতে দূরে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে, আর হাতের লণ্ঠনটা কেমন নিভু-নিভু হয়ে বনের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। কী অন্ধকার ঘুরঘুট্টি চারিদিক। ভয়ে ছমছম করবে তোমার গা। কিন্তু আমার না একটুও ভয় লাগে না। আমি তো সারারাত এই ঘরটাতে একা থাকি। তোমায় যদি বলি, থাকবে এস আমার সংগে, তোমার সাহসই হবে ন।

দাদু চলে গেলেও আমি অনেকক্ষণ জেগে থাকি। জেগে জেগে ওই জানলা দিয়ে অন্ধকারে চেয়ে থাকি। ওই অন্ধকারে একটু পরেই আমার বন্ধু আসবে। তার সংগে একটু খেলা করব না?

হয়তো ভাবছ, অন্ধকারে আবার আমার কে বন্ধু আসবে!

আসবে, আসবে, আমার বন্ধু হরিণ আসবে।

জানো, মা-হরিণটার সঙ্গে না আমার ভাব হয়ে গেছে। রোজ রাত্তিরবেলা দাদুর চলে যাওয়ার ঘণ্টা শুনলেই মা আর বাচ্চা হরিণ দুটো জানলায় এসে দাঁড়াবে। আমি যতক্ষণ না দরজা খুলে দেব, ওরা আমার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েই থাকবে। আমি দরজা খুলে দিলে ওরা একেবারে তিড়িং তিড়িং লাফিয়ে ঘরে ঢুকে পড়বে। তারপর আমায় নিয়ে এমন করবে! বাচ্চা দুটো আমার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লুটোপুটি খাবে। আমি কী ওদের কোলে রাখতে পারি? আমি ওদের গাল দুটি ধরে যখন আদর করব, কী খুশি ওরা। আমায় ছাড়বে না, কিছুতেই না। আমায় জড়িয়ে ধরবে, যেন বলবে, আমাদের আরও আদর কর, আরও আদর। তারপর আমার ছোট্ট কাপড়ের আঁচলের মধ্যে মুখ দুটি লুকিয়ে ফেলবে। মা-হরিণটা চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার ডাগর-ডাগর চোখ দুটি যেন খুশিতে কেমন উছলে ওঠে। আমার মুখের কাছে মুখটি এনে হয়তো কিছু বলতে চায়, আমি কী বুঝতে পারি? হয়তো বলে, "একটি গান গাও না, আমরা শুনি।" ওরা তো জানে না, আমি আর এখন গাইতে পারি না। ওরা তো জানে না, আমার কত কথা বলতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে ওদের কাছে আমার মায়ের গল্প করি। ইচ্ছে করে বাবার সঙ্গে নৌকোয় চেপে আমার মাছ ধরতে যাবার গল্প বলি। কিম্বা মানা আর মানার অন্ধ মায়ের গল্প শোনাই। কিন্তু কিছুই যে পারি না। আমার মনের যত কথা সব যেন মুখের কাছে এসে হারিয়ে যায়। আমিও যেমন হারিয়ে গেছি এই বনের মধ্যে, আমার সব কথাও তেমনি হারিয়ে গেছে মনের মধ্যে। আমি যে বোবা।

আচ্ছা ধর, এখনই যদি আমি খুব জোরে চিৎকার করে উঠতে পারি, চিৎকার করে বলতে পারি, আমার নাম টায়রা। কিম্বা চিৎকার করে ওই হরিণ-মা আর বাচ্চা দুটোর সঙ্গে ছুটতে ছুটতে বনের মধ্যে হারিয়ে যাই? নয়তো খুঁজতে খুঁজতে টুংরি নদীর তীরে এসে দাঁড়াই? বলি, "নদী তুমি এত নিষ্ঠুর কেন? আমায় কেন তুমি মা আর বাবার কাছ থেকে এমন করে ছিনিয়ে নিলে?" নদী কী আমায় সাড়া দেবে? না কি ও যেমন আপন মনে বয়ে যাচ্ছে, তেমনি বয়ে চলবে, আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না? আমার মত নদীও কী বোবা?

জানো, কদিন হ'ল আমাদের এই বনে না একটা বাঘ এসেছে! আমি তো কক্ষনো বাঘ দেখিনি। ছবি দেখেছি। বাবা, কী দেখতে! এত বড় মুখখানা। কী বড় বড় নোখ। বলো, দেখলে ভয় করে না? বাঘ এসেছে, তবুও দাদু চিঠি বিলি করতে যাবে! এই অন্ধকার বনের মধ্যে যদি দাদুকে বাঘে দেখতে পায়! ভাবলেই আমার গা শিউরে ওঠে। যদি দাদুকে কামড়ে খেয়ে ফেলে! বলা তো যায় না! না দাদুকে আর কিছুতেই যেতে দেব না, এই রাতদুপুরে বাঘের বনে কেউ এমন করে একলা একলা যায়!

দাদু আমার কথা শুনবেই না। দাদু যাবেই। আর বলবে, "আমায় যেতেই হবে। কাজ কী ফেলে রাখা যায়!" নিজের জন্যে কিচ্ছু ভাবনা নেই। দাদুর যত ভাবনা আমার জন্যে। আমায় বলবে, "ঘর থেকে বেরিও না যেন। জানলায় মুখ বাড়িও না।" আমি কেন কথা শুনব? আমার কথা দাদু শোনে?

আমি জানলার গরাদে মুখ ঠেকিয়ে ঠিক দাঁড়িয়ে থাকবো। দেখব দাদু যাবে, আমারও বুকটা ভয়ে কাঁপবে। আচ্ছা, আমার জন্যে দাদুর কী একটুও ভাবনা হয় না? আমি যে এই বনের ঘরে একলা পড়ে থাকি?

কেন বল তো আজ এখনও হরিণ-মা আর বাচ্চা দুটো এল না? দাদু তো অনেকক্ষণ চলে গেছে! এতক্ষণ তো ওরা এসে পড়ে। কী হল ওদের?

আমি এই জানলায় মুখটি বাড়িয়ে ওদের জন্যে কতক্ষণ বসে রইলুম। এই অন্ধকারে চোখের দিষ্টি আমার যতদূর যায়, ততদূর পর্যন্ত আমি চেয়ে চেয়ে দেখেছি। আর আনচান করেছি। সত্যি বলছি, এই বনের মধ্যে ওই বনের হরিণ আমার যেন সব কথা বুঝতে পারে। বুঝতে পারে, আমি বড় একা। তাই যেন ছুটে আসে রোজ রোজ। আমায় এসে ভালবাসে। আর আমি? হরিণ-মায়ের মুখ চেয়ে আমার মায়ের কথা ভাবি!

সত্যি, এখনও এল না তো! কী করব, একবার বাইরেটা দেখব?

আমি দরজা খুলে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলুম। কে জানত, তখন আমার ঘরের বাইরে বাঘ! কে জানত আমি যখন জানলায় মুখ ঠেকিয়ে বসেছিলুম, ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে বাঘ আমায় একদিষ্টে দেখছিল।

বাইরে কী অন্ধকার! এই অন্ধকারে কোথায় খুঁজি বল তো মা আর বাচ্চা হরিণ দুটোকে? হঠাৎ যেন আমার পেছনে শুকনো পাতার আওয়াজ পেলুম। কে আসছে খসখসিয়ে ঝরাপাতার ওপর পা ফেলে ফেলে? নিশ্চয়ই বনের হরিণ? ওঃ! কী আনন্দ হল আমার! আমি পিছন ফিরে লাফিয়ে ওদের ধরতে যাচ্ছিলুম! তারপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। আমার সামনে বাঘ! তার হিংসুটে চোখ দুটো অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। আমি ছুটে এক নিমেষে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। বাঘটাও গাঁক করে লাফিয়ে পড়েছে আমার পেছনে। আমি ঘরের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলুম। বাঘটাও ঘরে ঢুকে পড়ল। আর কী ভীষণ হালুম হালুম করে চিৎকার করতে লাগল।

আমি মুখ থুবড়েই পড়ে রইলুম। আর হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললুম। এখন জানি, আমায় আর কেউ রক্ষে করতে পারবে না। বাঘ আমাকে খেয়ে ফেলবে। আমি যতই কাঁদি, আমার কান্না বাঘ আর শুনবে না। তাই আবার লাফিয়ে পড়ল। আমার দিকে তেড়ে এল। পায়ের থাবা দিয়ে আমাকে লাথি মারল। আমি এ-পাশ থেকে ও-পাশে গড়িয়ে গড়িয়ে ছিটকে গেলুম। উঃ কী ভীষণ লেগেছে আমার কপালে। কেটে গেছে। রক্ত বেরুচ্ছে। আমি দু হাত বাড়িয়ে, আমার কান্না-ভেজা চোখ দুটি দিয়ে ওর চোখের দিকে তাকালুম। কতবার বলতে চাইলুম, "আমায় মারছ কেন বাঘ, তোমার তো আমি কোন ক্ষতি করিনি? আমি তো একটা ছোট্ট বোবা-মেয়ে, আমায় মেরে তোমার কি লাভ?" কিন্তু কথা মনে এলে কী হবে, মুখে তো বলতে পারিনি! আর বললেও বাঘের বয়ে গেছে! শুনছে কে? সে থাবা দিয়ে আমার গলাটা টিপে ধরল। উঃ! কী কষ্ট হচ্ছে আমার। আমি দু হাত দিয়ে ওর পা জড়িয়ে ধরলুম। শেষবারের মত ওর দিকে তাকালুম। আমার চোখের কান্না-ভাঙা জল ওর পায়ের ওপর গড়িয়ে পড়ল। তারপর আমার মনে হল আমার দম আটকে গেছে। সব অন্ধকার হয়ে গেছে। চোখে আমি আর কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। তারপর হঠাৎ চমকে উঠেছিলুম আমি। তাকিয়ে দেখি আমি তখনও মাটিতে পড়ে আছি হুমড়ি খেয়ে। অনেক কষ্টে উঠে বসলুম। ও মা! সামনে তাকিয়ে আমার বুকটা যে আবার কেঁপে উঠল! দেখি বাঘটা ওৎ পেতে বসে আছে ঘরের ওই কোণটায়! আমাকে বসতে দেখে বাঘটাও উঠে দাঁড়াল। আমি ভাবলুম, আবার বুঝি লাফিয়ে পড়ে আমার ঘাড়ে! না, এবার লাফাল না। কেমন গুটগুট করে আমার দিকে এগিয়ে এল! এবার কিন্তু আমি একটুও ভয় পাইনি। একটুও কাঁদিনি। আমি জানি, আমি তো বাঘের সঙ্গে পারব না। ভয় পেলে তো আর ও ছাড়বে না।

কিন্তু দেখো, বাঘটা এবার কিচ্ছু বলল না। গুটিগুটি এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমায় দেখতে লাগল। আমি উঠে দাঁড়ালুম। ও কী বুঝতে পেরেছে, আমি বোবা? তারপর টলতে টলতে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছি। বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলেছি।

কী বলব, বাঘটাও দেখি আমার বিছানায় উঠেছে। আমার কপালে তার মুখটা খুব আলতো আলতো বুলিয়ে বুলিয়ে আদর করতে লাগল। আমার গা জ্বলে গেল। আমি দু হাত দিয়ে ওর মুখটা সরিয়ে দিয়েছি। আমার বুঝি রাগ হয় না! আমায় যখন মারল, মনে ছিল না! আবার আদর করতে এসেছে! অমন আদর

চাই না আমার। দেখছে না আমার কপাল কেটে গেছে। ওর কী চোখ নেই! কাল যখন দাদু আমায় দেখবে কী বলবে! আমিই বা কী উত্তর দেব! যতই সাধুক আমি কিছুতেই ওর আদর নেব না।

জানো, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তারপরও অনেকক্ষণ বসেছিল বাঘটা। বালিশের নিচ থেকে আমি একবারটি উঁকি মেরে দেখেছি ওর মুখখানা, কেমন যেন শুকিয়ে গেছে। তারপর শুকনো মুখে ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। পেছন ফিরে একবারটি তাকিয়ে দেখেছিল। আর ফেরেনি। বনের অন্ধকারে হারিয়ে গেল বাঘটা।

আমি আবার উঠেছি। দরজা বন্ধ করে দিয়েছি। লণ্ঠনের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি।

আজ আমার খুব সকাল-সকাল ঘুম ভেঙে গেছে। দাদু ঘরে ফেরার অনেক আগে। দাদু জানতে না পারে, ঘরে বাঘ এসেছিল। কিন্তু কপালের এই কাটা দাগটা আমি কী করে লুকোই? দেখলে, বুঝতে পারবে না তো! আমার গলার ওপরটা কী ব্যথা হয়েছে বাবা! বাঘের অত বড় পা-খানা গলার ওপর টিপে ধরলে, ব্যথা হবে না?

দাদু যখন ঘরে এল, আমি ঘর-দোর সব গুছিয়ে ফেলেছি। দাদুর আর সাধ্যি নেই বুঝতে পারে কিছু। শুধু আমার কপালটা দেখে দাদু একটু চমকে উঠেছিল। হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "কী হয়েছে?"

আমি এদিক ওদিক ঘাড় নেড়ে বলেছি "কিচ্ছু না।"

তারপর দাদু আমার এই কপালে কাটার ওপর ওষুধ দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল। আমায় আদর করে জিজ্ঞেস করেছিল, "লাগল?"

আমি কিচ্ছু বলিনি।

দাদু চলে গেলে আজও আমি রাত্তিরবেলা জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। কিন্তু জানো, আজও মা-হরিণ আর বাচ্চা দুটো এখনও আসেনি। এত খারাপ লাগছে, কী বলব তোমাকে! আমি ক' মুঠো ছোল্য আঁচলে বেঁধে রেখেছি। ওরা আমার হাতে মুখ রেখে কেমন টুকটুক করে খায়! কী ছটফটে বল বাচ্চা দুটো! চোখ দুটো এত চঞ্চল! বেশি নয়, টুক করে একটু শব্দ কর, একেবারে অস্থির হয়ে নেচে উঠবে ওদের চোখ!

হঠাৎ টুক করে সত্যি কিসের শব্দ হল বল তো? জানলায় নুয়ে পড়া আমার হাতটির ওপর এমন চুপচাপ এসে কে মাথা ঠেকাল? আমি চকিতে হাতটা সরিয়ে নিয়েছি। তারপর তাকিয়ে দেখি বাঘটা! আবার এসেছে কেন? কাল আমায় অত মেরেও কী ওর সাধ মেটেনি? আমি দুমদুম করে জানলার পাল্লা দুটো বন্ধ করে বসে রইলুম।

অনেকক্ষণ পর কী জানি কেন, আমার মন বলল, দেখি তো বাঘটা গেছে কি না! জানলাটা একটুখানি ফাঁক করে আমি উঁকি মারলুম। না, এখনও বসে আছে। এখনও চেয়ে আছে জানলার দিকে। জানলার ওই ফাঁকটুকু দিয়েও আমার চোখে চোখ পড়ে গেল তার। কিন্তু এবার আমি বাঘের চোখের থেকে চোখ সরাতে পারলুম না। আমি জানলাটা হাট করে আবার খুলে দিলুম। আমার মনে হল, বাঘের চোখ দুটো যেন চিকচিক করছে। বাঘ কী কাঁদছে? বাঘ কী কাঁদে? ওর গাল বেয়ে কী জল গড়াচ্ছে?

কেমন যেন করে উঠল মনটা। কেন জানি মনে হল, আমার হাত বাড়িয়ে ওর চোখ দুটি মুছে দিই। আমি হাত বাড়ালুম। আমার ছোট্ট হাতের মুঠির মধ্যে বাঘ তার অতবড় মুখখানা লুকিয়ে ফেলার জন্যে ছটফট করে উঠল। আমি জানলা ছেড়ে ছুটে বাইরে চলে গেলুম। দু'হাত দিয়ে বাঘের গলাটা জড়িয়ে ধরলুম। তারপর আদর করতে করতে আমি নিজেও কেঁদে ফেললুম।

এমন করে যে আমার ভাব হয়ে যাবে বাঘটার সঙ্গে বুঝতেই পারিনি। আমি ওর গলাটি জড়িয়ে আদর করতে, কী খুশি দেখো বাঘটা। চিৎ হয়ে মাটিতে লুটোপুটি খেতে লাগল। তারপর সামনের পা দুটি দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরল। আমায় তার পিঠে তুলে নিল। ছোঁ-মেরে লাফিয়ে উঠল। উঃ! কী ভয় লাগছে! এক্ষুনি পড়ে যাব আমি! আমি বাঘের গলাটি আঁটিসাঁটি জড়িয়ে ধরলুম দু'হাত দিয়ে। বাঘ আমায় পিঠে নিয়ে নাচতে লাগল, ছুটতে লাগল। আর আনন্দে এমন দুরন্তপনা করতে লাগল অন্ধকার বনে যে তুমি দেখলে ভয়ে জুজু হয়ে যেতে।

তারপর বাঘের পিঠে চেপে অনেক রাত্তিরে আমি ঘরে ফিরেছিলুম। ঘরে ফিরে দু'চোখে ঘুম নিয়ে যখন আমি শুয়ে পড়েছিলুম বিছানায়, আমার আবার মনে পড়েছিল মা-হরিণ আর বাচ্চা দুটোর কথা। কেন ওরা আসে না? কেন ওরা এল না? আমার মন বলছিল, আমি যখন আবার বাড়ি যাব, ওই বাঘের পিঠে চেপে যাব আর মা আর বাচ্চা হরিণ দুটোকে সঙ্গে নেব। বলো তো কী মজা হবে! বাঘ দেখলে তো সবাই ভয় পাবে, পালিয়ে যাবে। আর আমি? বাঘকে ভয়ই পাই না। সবাই-কে বলব, দেখোনা, এ আমার পোষা বাঘ। কাউকে কামড়ায় না!

আমাদের গ্রামে একবার একটা বাঘ পড়েছিল। সে কী কাণ্ড! কেউ আর ঘর থেকে বেরুতেই পারে না। রোজ শুনছি, আজ একে মেরেছে। কাল অমুকের ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে। নয়তো ঘরের চালে উঁকি মেরেছে। সবাই তো ভয়ে তটস্থ। কেউ বললে, কাল বাঘটা নদীর ঘাটে এসেছিল। চুকচুক করে জল খাচ্ছিল, সে শুনেছে। কেউ বললে, বাঘটা কাল গর্জে গর্জে ডাকছিল। আবার কেউ বললে, বাঘটা কাল তাদের দরজা ঠেলেছে। মা আমায় কিছুতেই আর কাছ ছাড়া করে না। রোজ রাত্রে শোবার সময় ঘরের দোর-জানলাগুলো আঁটসাঁট করে বন্ধ করে, আমাকে একেবারে বুকের মধ্যে নিয়ে শোবে। বাঘ দেখতে কার না ইচ্ছে করে বল? আমার না এত ইচ্ছে করত। আমি তো ভেবেই পেতুম না বাঘকে এত ভয়ের কী আছে! যাই বল তাই বল, বয়েস হয়ে গেলে সবাই একটু বেশি ভীতু হয়ে যায়! তবে বাপু একটা কথা বলব, দাদুর সাহস আছে। রাতদুপুরে বন ডিঙিয়ে ক জন হাঁটতে পারে? শেষে না, একদিন আমাদের গ্রামে কোট-প্যাণ্টুল, আর মাথায় টুপি পরে এক সাহেব এল। গায়ে খুব জোর। তার হাতে একটা বন্দুক। রাতের বেলা গাছে মাচা বেঁধে, চুপটি করে বসে রইল টুপি-পরা ঐ সাহেবটা। তারপর একদিন যখন নিশুতি রাত্তির, সবাই ঘুমুচ্ছে, সাহেব বন্দুক ছুঁড়লে, গুড়ুম, গুড়ুম। পরের দিন সকালবেলা শুনলুম বাঘটা গুলি খেয়েছে, মরে গেছে। অমনি দলে দলে সব ছুটল বাঘ দেখতে। আমি যাইনি। মা যেতেই দিলে না।

আমাদের গ্রামের বাঘটা একদম বোকা! কেন, আমার এই বাঘটার মত সে-ও তো আমার সঙ্গে ভাব করে ফেলতে পারত!

সত্যি এই বাঘের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে। এখন ও সব জানে। জানে, কখন এই ছোট্ট ঘরে আলো জ্বলবে। কখন দাদু বাইরে যাবে। জানে, কখন আমি জানলায় এসে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। ও এসে অমার হাতে মুখ ঘসবে, আমি ছুট্টে বাইরে গিয়ে ওর গলাটি জড়িয়ে ধরব। ওর পিঠে চাপব। তারপর ও ছুটবে।

আজও ছুটছিল বাঘটা আমায় পিঠে নিয়ে। আমি প্রাণপণে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরেছি। হঠাৎ আমার মনে হল, বাঘের পেছনে যেন কারা সব ছুটে আসছে। বাঘের পিঠে ছুটতে ছুটতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখা তো মুখের কথা নয়! তবুও আমি একবার ঘাড় ফিরিয়েছি ভয়ে ভয়ে! ও মা! পেছনে দেখি, মা-হরিণটা বাচ্চা দুটোকে নিয়ে ছুটে আসছে বাঘের পেছনে। আমার না এত আনন্দ হল, দু'হাত তুলে আমি হাততালি দিয়েছি। আর বলব কী, আমি টাল সামলাতে পারলুম না। বাঘের পিঠ থেকে বনের গাছে ধাক্কা খেয়ে আমি পড়ে গেলুম।

বাঘটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। চোখের পাতা পড়ার আগে ঘুরে দাঁড়িয়ে এমন গর্জন করে লাফ মারল, একেবারে মা-হরিণের ঘাড়ের ওপর। ঘাড়টা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে একটু শুধু নেড়ে

দিল। মা চিৎকারও করতে পারল না। মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। আমিও ছুটে এসেছি। মা-হরিণ আমার চোখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তারপর ওর চোখ দুটো বুজে গেল। আমি আমার ছোট্ট হাতের আঙুল দিয়ে ওর চোখ দুটি আবার খুলে দেবার চেষ্টা করলুম। ওর চোখ আর খুলল না। আমি কেঁদে ফেললুম। আর ওর রক্ত ভেজা মাথাটি আমার কোলের ওপর তুলে নিলুম।

বাঘটা আমার কান্না দেখে কেমন যেন বেবাক হয়ে গেছে। আমার কাছে এগোচ্ছে না। অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে আমার দিকে। হয়তো ভেবেছে এমন কী দোষ করেছে সে! তারপর পা পা এসেছে আমার কাছে। আমার পিঠে মাথা ঠেকিয়ে ডেকেছে। আমি ওর ডাক শুনিনি। শুধু চোখ দুটি আমার আতিপাতি ঘুরে ঘুরে বাচ্চা হরিণ দুটোকে খুঁজেছে। দেখতে পাইনি। তারপর উঠে দাঁড়িয়েছি। কাঁদতে কাঁদতে পথ হেঁটেছি।

বাঘও আমার পিছু নিল। আমার পথ আটকালো। আমায় ডাক দিল। তারপর আমার হাতে আবার মুখ ঠেকাল। এবার আমি থাকতে পারিনি। ওর মুখটা জড়িয়ে ধরে গালে ঠাস ঠাস করে চড়িয়ে দিয়েছি। আর মনে মনে বলেছি, "কেন, কেন, তুই আমার

বাঘের পিঠে চেপে অনেক রাত্তিরে আমি ঘরে ফিরেছিলুম।

বন্ধুকে মেরে ফেললি? কেন?"

তারপর ছুট দিয়েছি আমি ঘরের দিকে। বাঘ আর আমার পিছু আসেনি। কে জানে কোথা গেল!

সারারাত আমার ঘুম হয়নি। বার বার মা-হরিণের শেষবারের মত চেয়ে থাকা চোখ দুটি, আমার চোখের ওপর ভেসে উঠল।

সেদিন আমি দাদুর সামনে হাসতে পারিনি। আমার হাসি না দেখলে দাদু ঠিক বুঝবে আমার কিছু হয়েছে। তাই সেদিনও জিজ্ঞেস করলে, "হাসছ না যে! মন খারাপ?"

আমি কিচ্ছু বলিনি। শুধু চুপটি করে দাদুর মুখের দিকে চেয়েছিলুম।

দাদু জিজ্ঞেস করলে, "ভয় লাগছে বাঘের জন্যে?"

এবারও আমি ঘাড়ও নাড়িনি, হাতও দেখাইনি।

দাদু নিজেই আবার বললে, "জানো, বাঘটা এদিকেই ঘোরাফেরা করছে। কাল একটা হরিণ মেরেছে। আসতে আসতে দেখি বনের মধ্যে পড়ে আছে। তুমি রাত্তিরে জানলা-দরজা একদম খুলবে না।"

দাদুর কথা শুনে আমার মনটা আবার চমকে উঠল। আমি দাদুকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলুম। বোবা মুখে বলতে চাইলুম, "দাদু, এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাই চল। ওই মা-হরিণটার জন্যে আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে। এখানে আমি থাকতে পারব না। কিছুতেই না।"

দাদু কী বুঝেছিল জানি না। আমার চিবুকটি ধরে আদর করেছিল।

কিন্তু বাঘটা কী বেহায়া দেখ। পরের দিন আবার এসেছে আমার জানলার কাছে। আবার আমায় ডাকছে! আমার বয়ে গেছে। আমি দুম দুম করে ওর মুখের ওপর জানলা বন্ধ করে দিয়েছি। আর খুলিনি। আমি জানতেও পারেনি, ও আছে না গেছে। অমন বাঘকে আমার দরকার নেই।

সত্যি, এমন বেহায়া তুমি আর দুটি পাবে না। আবার আজ এসেছে! আজও আমি ওর কাছে যাইনি। আজও আমি জানলা বন্ধ করে দিয়েছি। এত আহ্লাদেপনা কিসের একেবারে! কে বলেছে ওকে এখানে আসতে?

কিন্তু জানো, তার পরের দিন বাঘটা সত্যি এল না। আমি বসেই ছিলুম। বসে বসে ভাবছিলুম, হয়তো আজও আসবে। আজও হয়তো আমায় ডাকবে। ওকে না দেখে আমার মনটা কেমন ভার হয়ে গেল। আজ কী সত্যিই বাঘ আমার ওপর রাগ করল। আমি কী করব বল! আমার চোখের সামনে আমার হরিণ বন্ধুকে অমন করে মারল কেন? আমার বুঝি দুঃখ হয় না? আমি না হয় গালে দুটো চড় মেরেছি, দুদিন কথা বলিনি, তাতে রাগ করে না আসার কী আছে? আমি তো ছোট, আমাকে তো ভোলাতে পারত? তা নয়, একেবারে আসাই বন্ধ। ঠিক আছে, এরপর এলে একটুও আদর করব না। আর বুঝি আসতে হবে না? দেখব, আমায় ছেড়ে কেমন থাকতে পারে। মিথ্যে বলব না, বাঘের গালে ওই দুটো চড় মেরে, আমার কী যে কষ্ট হয়েছে, তা কাকে বলি! আমার মনটা খালি খালি কেঁদে বলেছে, ছিঃ ছিঃ কেন ওর গায়ে হাত তুললুম! তবু ওর তো বোঝা উচিত। কিন্তু ও-ই বা মারল কেন? অমন চট করে মাথা গরম করে হরিণ-মাকে মারে? দু দুটো বাচ্চা-হরিণ যে মা-হারা হয়ে ঘুরে বেড়াবে। কে দেখবে তাদের? ক্ষমতা থাকে তো দেখি, দেখাশুনো করুক। তা নয় ধিঙ্গিপনা করে বেড়ালেই চলবে? আহা! মা-হারা বাচ্চা দুটো কী করছে এখন? কোথায় আছে? বাঘটা যখন মাকে তেড়ে মারতে গেল, ভয়েময়ে কোথায় যে পালাল, আর দেখাই গেল না। আচ্ছা, তোদেরও বলি, কী দরকার ছিল বাঘের পেছনে অমন করে ছোটবার? জানিস তো বাপু, একটুতেই চটে যায়! দেখেও যদি শিখতে না পারিস, তো কে শেখাবে? ওরা বোধ হয় ভেবেছিল, বাঘটা আমায় নিয়ে পালাচ্ছে, নইলে কারো এত সাহস হয় বাঘের পিছে ছুটতে?

আমার কিন্তু এখন সত্যিই মনটা বড্ড খারাপ লাগছে। হরিণদের সঙ্গে যা-ও বা রোজ দু দণ্ড খেলা করতে পেতুম, সে তো গেল। আবার বাঘটার সঙ্গেও আমার আড়ি হয়ে গেছে। এখন আমি কী করি একা একা? আচ্ছা আজ আমিই যদি যাই ওর কাছে, তাতে ক্ষতি কী! যাই না দেখি। নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও আছে। আমি ডাকলেই ও আবার আসবে, ঠিক আসবে। আবার আমার হাতের মধ্যে ওর মুখটি দিয়ে আদর করবে। দেখি না।

লণ্ঠনটা আমি সঙ্গে নিয়েছিলুম। তা না হলে বাবা বনের ওই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে আমি পথ চিনব কী করে? তার ওপর কে জানে সাপ-খোপ যদি থাকে! থাকে মানে? নিশ্চয়ই আছে। আমাদের গ্রামেই কত সাপ, তো বন-বাদাড়ে থাকবে না? ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে দরজাটা আঁটসাঁট করে ভেজিয়ে দিয়েছিলুম। শেকলে তো আর আমার হাত যায় না! খোলাই থাক, এক্ষুনি তো ফিরব। আমি তো আর বেশি দূর যাচ্ছি না।

পায়ে-চলা এই পথটা বনের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। দাদু রোজ এই পথটা ধরে, ডাকের থলি নিয়ে বনের মধ্যে হাঁটা দেবে। আমায় কিন্তু একদিনও এদিকে আসতে দেবে না। দাদু হয়তো ভাবে, আমি তো ছোট্ট, পথ চিনতে পারব না।

আমিও আজ এই পায়ে-চলা পথেই হাঁটছিলুম আর এদিক ওদিক চোখ ঘুরিয়ে বাঘকে খুঁজছিলুম। কী জ্বালাতন বলো, একটু যে হাঁক পেড়ে বাঘকে ডাকব, তার উপায় নেই। দেখেছো, বনটাও যেন আমার মত বোবা। চারিদিক নিঃঝুম। আমি বনের ভেতর যতই হাঁটছি, আমার কী গা ছমছম করছে বাবা!

তুমি ঠিক বলবে, এটা বোকামি। রাতদুপুরে, এই অন্ধকার বনে বাঘকে খুঁজে বার করা চারটিখানি কথা! আমি ভাবছি, আচ্ছা, বাঘটা আমায় দেখতে পায়নি তো! আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে না তো!

উঁঃ! অত আর না। আমি না হয় বোবা। কিন্তু চোখ তো আর আমার কানা নয়। ফাঁকি দেওয়া অতই সহজ!

ও মা! একটা শেয়াল পালাল! উঃ! আমার বুকটা একেবারে ধড়াস করে উঠেছে! কী ভয় লেগেছিল বাবা!

কাজ নেই, এইখানে একটু দাঁড়াই। সামনেটা ভীষণ অন্ধকার। এখানে বাঘকে খোঁজাই মিথ্যে। আচ্ছা, ওর কী কোন আক্কেল নেই? আমার মত একটা ছোট্ট মেয়েকে এমন করে কষ্ট দিয়ে ওর কী লাভ হচ্ছে?

হঠাৎ না, ওই অন্ধকারের মধ্যে কী চেঁচামেচি লেগে গেছে! আমি তো অবাক। এতক্ষণ সব চুপচাপ ছিল। হঠাৎ কারা ঝগড়া লাগিয়ে দিলে বনের মধ্যে!

"গুড়ুম গুড়ুম।"

আমি থমকে গেছি। কারা যেন বন্দুক ছুড়ছে! আমি সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছি। লণ্ঠনের আলোটাও কমিয়ে দিয়েছি চটপট। ও মা! কতগুলো ঘোড়া টগবগ করে ছুটতে ছুটতে আমার সামনে দিয়ে চলে গেল! তাদের পিঠে লোক। তাদের হাতে বন্দুক। চেঁচাচ্ছে লোকগুলো। ঘোড়াগুলোও চিঁহিঁহিঁ করে ডাকছে। অমনি আবার বন্দুকের আওয়াজ হল, "গুড়ুম গুড়ুম।" ওই দেখ, একটা লোক ছিটকে পড়ল। আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি। লোকটা চেঁচাচ্ছে, "মরে গেলুম, বাঁচাও, বাঁচাও।" তারপর গোঙাতে লাগল। ও বাবা! দু দলে লড়াই হচ্ছে! কী করি এখন আমি? আমায় দেখতে পেলে আমাকেও তো গুড়ুম করে দেবে!

"গুড়ুম, গুড়ুম।" আবার আওয়াজ হল। অন্ধকারে আগুনের ফুলকিগুলো সাঁই সাঁই করে ছিটকে যাচ্ছে। আমি জুজুবুড়ি। ঝোপের আড়ালে চুপটি করে লুকিয়ে বসে রইলুম। আর ওই যে লোকটা পড়ে আছে, তার গোঙানির শব্দটা কান পেতে শুনতে লাগলুম। ওর গায়ে ঠিক বন্দুক লেগেছে! তা না হলে এতক্ষণ কী ও পড়ে থাকত?

ওই দেখো, কতগুলো লোক ঘোড়ায় চেপে ঝোপের আড়াল
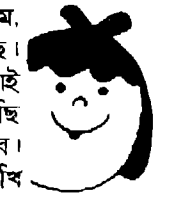
থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ যেন পালাচ্ছে! ওই তো, আর একদল তাদের তাড়া লাগিয়েছে! নিশ্চয়ই হেরে গেছে! নইলে পালাবে কেন? বলো, এখন আমি কী করে জানব এরা ডাকাত? কী করে বুঝব, এই রাতদুপুরে দু দল ডাকাতে মারামারি করছে?

বনের ওপর ছুটতে ছুটতে ওরা যে কোথায় চলে গেল, আর দেখা গেল না। তবু তক্ষুনি সাহসও হল না যে ঝোপের আড়াল থেকে বেরই। তাই কুঁকড়ে-মুকড়ে চুপচাপ বসে রইলুম।

তারপর অনেকক্ষণ কেটে গেছে। নিস্তব্ধ সেই বনে লোকটা এখনও গোঙাচ্ছে! কী ভীষণ দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেল এখানে, একটু আগে? এখন তার কিছু চিহ্ন নেই। আচ্ছা, এখন একটু বেরিয়ে দেখলে তো হয়! লণ্ঠনের আলোটা একটুখানি উসকে দিয়ে, পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলুম ঝোপটার ভেতর থেকে। আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

মাত্তর ক পা এসেছি, আমার নজরে পড়ল লোকটা যন্ত্রণায় ছটফট করছে। আলোটা কাছে নিয়ে দেখি, ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে পা দিয়ে। উঃ! আমি শিউরে উঠলুম। কিন্তু কী করি এখন? আমার শাড়ীর আঁচলটা ছিঁড়ে ফেলে লোকটার পায়ে বেঁধে দিলুম। কিন্তু তাতে কী রক্ত থামে, না যন্ত্রণা যায়? ভাবলুম, একটু হেঁটে যদি লোকটাকে ঘরে নিয়ে যেতে পারি, তা-হলেও একটা কিছু করা যায়। কিন্তু ওকে টেনে তুলে নিয়ে যাওয়া কী আমার কম্ম! এক যদি ও নিজে যেতে পারে! দূর ছাই, জিজ্ঞেসও তো করতে পারছি না। এই সময় যদি ভগবান একটিবার আমায় একটি কথা বলতে দিত, তা হলে আমি লোকটাকে বলতুম, "আমার সঙ্গে বাড়ি চল। ডাকাতি করে কী লাভ হল তোমার? পা গেল তো?"

হঠাৎ জানো, আবার ঘোড়ার টগবগানি কানে এল। আবার দেখি, ঘোড়ার পিঠে ডাকাতগুলো ছুটতে ছুটতে এদিকে আসছে! আমি উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ঘোড়াগুলো জোর কদমে লাফ মেরে এত কাছে এসে পড়ল, আমি কিছুই করতে পারলুম না। তবু আমি লুকিয়ে পড়েছিলুম। কিন্তু আমার হাতে যে লণ্ঠন। আমি যে লণ্ঠনটা নেভাতে ভুলে গেছি! সে আর আমার কী দোষ! বিপদের সময় মাথার ঠিক থাকে? নিশ্চয়ই ওরা আলোটা দেখতে পেয়েছে। আমার দিকে তীরের মত তেড়ে এল। আমি ধড়ফড়িয়ে এ-ঝোপ থেকে ছুটে ও-ঝোপে পালিয়ে গেছি। কিন্তু কোথায় পালাব? চেয়ে দেখি আমার চারিদিকে ডাকাত। তবু আমি লুকোচুরি খেলা সুরু করে দিলুম। কিন্তু পারলুম না। কোত্থেকে একটা ডাকাত ঘোড়ার পিঠে ছুটতে ছুটতে এসে একেবারে ছোঁ মেরে আমাকে ধরে ফেললে। আমাকে নিয়ে ছুট দিলে। আমি ঝুলতে ঝুলতে হাত-পা ছুড়তে লাগলুম। কিন্তু পারব কেন? কী জোর লোকটার গায়ে! হাতের মুঠোটা যেন লোহার মত শক্ত। আমার সাধ্য কী ওই মুঠোর থেকে বেরিয়ে আসি!

লোকটা আমাকে আর ঝুলিয়ে রাখল না। টেনে তুলে নিল ঘোড়ার পিঠে। এক হাত দিয়ে আমার মুখটা চেপে ধরলে। আমার যেন দম আটকে আসছে। ঘোড়াটা ছুটতে ছুটতে আঁরও গভীর বনে ঢুকে পড়ল। আমি শত চেষ্টা করেও ওর হাত থেকে আমার মুখটা ছাড়াতে পারলুম না। উঃ! কী কষ্ট হচ্ছে আমার!

আরও অনেকখানি এসে ঘোড়াটা দাঁড়াল বনের মধ্যে একটা ঘুপচি বাড়ির সামনে। লোকটা আমাকে নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে টেনে হিঁচড়ে বাড়ির মধ্যে নিয়ে চলল। আমি কিছুতেই যাব না। কে শুনছে! একটা ঘরের সামনে এসে আমার ঘাড় ধরে ছুড়ে ফেলে দিল। আমি ঘরের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলুম। লোকটা আমাকে আবার টেনে তুললে। আমি ভয়ে-ময়ে ওর মুখের দিকে তাকালুম। রক্তজবার মত চোখ দুটো কী লাল! হঠাৎ ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "এই, ওখানে কি করছিলি?" ওর চিৎকারে থতমত খেয়ে গেছি আমি। ও তো জানে না, আমি কথা বলতে পারি না।

ও আবার ধমকাল, "কি করছিলি?"

আমি ওর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েই রইলুম।

লোকটা এবার আমার গলাটা টিপে ধরল। আমার ঘাড়ে এমন ঝাঁকুনি দিল, আমার মনে হল ঘাড়টা বুঝি ভেঙেই গেছে। "বল, বল, ওখানে কি করছিলি?"

যন্ত্রণায় আমি চেঁচাতে পারলুম না। আমি শুধু "আ-আ-আ" করে ককিয়ে উঠলুম। লোকটা হঠাৎ আমায় ছেড়ে দিলে। আমার চোখের দিকে কটমট করে চেয়ে চেয়ে দেখলে। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। হঠাৎ গলায় বিকট আওয়াজ করে লোকটা হো হো হো করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বললে, "খুব চালাক ভাবছিস নিজেকে উঃ? ভাবছিস, কথা না বললে পার পেয়ে যাবি? বল, কোথা থাকিস? বল, নইলে, গলা টিপে মেরে ফেলব।" বলে আমার গলাটা আবার দু'হাত দিয়ে টিপে ধরল।

দেখো, আমি তো এত ছোট্ট। কিন্তু হঠাৎ যে কোথা থেকে আমার এত সাহস এল আমি জানি না। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করেও যখন ওর দুহাতের মধ্যে থেকে আমাকে ছাড়িয়ে আনতে পারলুম না, তখন ওর হাতের ওপর এমন জোরে কামড়ে দিয়েছি যে, লোকটা উ-উ-উ করে প্রচন্ড চেঁচিয়ে আমার মাথার ওপর এক ধাক্কা মারলে। আমি চার হাত দূরে ছিটকে পড়লুম। লোকটা আবার আমার দিকে এগিয়ে এল। আমার কাপড়টা ধরে হিড়হিড় করে টেনে তুলে, আমার গায়ে, পিঠে, মাথায়, মুখে ধাঁই ধাঁই করে এমন মারলে, আমি কেঁদে লুটিয়ে পড়লুম। কিন্তু তবু ছাড়বে না। জিজ্ঞেস করলে, "বল, বল, কোথায় থাকিস?" আমি বাঁচবার জন্যে কত চেষ্টা করে একটি কথা বলতে চাইলুম, তবু আমার মুখে কথা এল না। লোকটা তখন বন্দুক নিয়ে আমার বুকে তাক করল। বললে "বল, নইলে গুলি মেরে শেষ করে দেব।" তবু আমি বলতে পারলুম না। বলতে পারলুম না, "আমি কথা বলতে পারি না। টুংরি আমায় বোবা করে দিয়েছে!"

ওই বন্দুকের নলটা দিয়ে লোকটা আমার বুকে হঠাৎ এমন ধাক্কা দিলে, মনে হল, আমার বুকটা যেন ফেটে খান খান হয়ে গেছে। টাল খেয়ে আমি আবার পড়ে যাচ্ছিলুম, লোকটা আমায় ধরে ফেললে। তারপর তার গায়ে যত জোর ছিল, সব জোর দিয়ে আমায় এমন ঠেলে দিলে আমি মাথা গুঁজড়ে ধাঁই করে শান বাঁধানো মেঝের ওপর পড়ে গেলুম। লোকটা রেগে চিৎকার করে বলল, "থাক এখানে পড়ে। কাল তোকে কাটব আমি। তোর মেয়ের নিকুচি করেছে।" বলে দরজাটা বন্ধ করে আমাকে ঘরে বন্দী করে রেখে চলে গেল। আমি বুকের ওপর হাত রেখে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সেই বন্ধ ঘরে পড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলুম।

পরের দিন সকালেই লোকটা আবার এল। এবার একা এল না। সঙ্গে একটা বুড়ি। আমি তখন ঘরের এক কোণে বসে বসে ভাবছি, "আচ্ছা, আমি তো কোনদিন কারো কোন ক্ষতি করিনি। তবে আমার কেন এমন হল? কেন আমার সব হারাল? কেন ঠাকুর আমায় এত কষ্ট দিচ্ছে? এত নিষ্ঠুর কেন ভগবান? এত নির্দয়?

লোকটা রাগী-রাগী গলাটা তেমনি গম্ভীর করে বললে, "এই উঠে আয়।"

আমি সুড়সুড় করে উঠে দাঁড়ালুম।

জিজ্ঞেস করলে, "তোর নাম কী?"

বলতে পারলুম না।

"কোথায় থাকিস?"

এবারও বলতে পারলুম না।

"কথা বলবি না?"

তবুও কথা বলতে পারলুম না। খালি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললুম "আর আমায় মের না। আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে।"

"দাঁড়া দেখি, কেমন না কথা বলিস।" বলেই আমার কানটা টেনে ধরলে। আমি হাউ-হাউ করে চেঁচিয়ে উঠলুম। আমায়

একটা ডাকাত ছুটতে ছুটতে এসে...

আবার মারতেই যাচ্ছিল। বুড়িটা সঙ্গে সঙ্গে বললে, "আহা! মারছ কেন বাবু? মেয়েটা বোবা!"

লোকটা তেমনি তেড়ে উঠে বললে, "থাম তুই। বোবা! এক নম্বরের শয়তান! পাছে মুখ ফস্কে সব বলে ফেলে, তাই চুপ করে আছে। আমি যেন বুঝি না কিছু।"

বুড়িটা বললে, "ঠিক আছে বাবু, আর মের না। একেবারে দুধের বাছা! অমন করে মারলে মরে যাবে। আমি ভুলিয়ে-ভালিয়ে জিজ্ঞেস করব এখন।"

বুড়ির কথা শুনে লোকটার দয়া হল কিনা বলতে পারি না। কিন্তু আমায় ছেড়ে দিল। দিয়ে বললে, "ঠিক আছে, মেয়েটাকে ছাড়বি না। আজ থেকে সব কাজ ওকে দিয়ে করাবি।" তারপর আমার দিকে চোখ পাকিয়ে বললে, "যা, এখন ঘোড়ার আস্তাবল পরিষ্কার করগে যা।" বলে আমাকে টেনে ঘর থেকে বার করে দিলে। বুড়িটা তাড়াতাড়ি আমায় নিয়ে ওই লোকটার সামনে থেকে সরে গেল।

একটু আসতেই আস্তাবল। বুড়ির সঙ্গে আস্তাবলের সামনে এসে দাঁড়ালুম আমি। বুড়ি বললে, "কাজ তেমন নয়। রোজ আস্তাবলটা জল দিয়ে ঘসা-মাজা করতে হবে। ঘোড়াকে চান করাতে হবে। ঘাস কাটতে হবে, খাওয়াতে হবে।"

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম। ঘরে থাকতে মা আমাকে একদিনও বলেনি, "টায়রা এইটা কর তো, কী ওইটা আন।" বলবেই বা কেন! আমার কী ঘর-কন্নার কাজ করবার মত বয়েস হয়েছে? আমি কী করে পারব আস্তাবলের কাজ করতে?

হঠাৎ বুড়িটা আমার গালে হাত দিয়ে, আমার মুখের দিকে একদিষ্টে তাকিয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করলে, "তুই মা বোবা?"

আমি মাথা হেঁট করে নিলুম।

"আহা! এমন ফুটফুটে মেয়ে, তোর মুখ থেকে কে কথা কেড়ে নিয়েছে মা?"

আমার চোখ ছলছলিয়ে উঠল।

বুড়ি নিজের আঁচল দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিল। আমায় বুকে টেনে নিল। তার নিজের চোখেও জল উছলে পড়ল।

"তোর দুর্ভাগ্য মা, ডাকাতের হাতে পড়েছিস। বনে কেন ঢুকেছিলি মা? জানিস না এটা ডাকাতের বন? এরা বড্ড নিষ্ঠুর। এরা কাউকে দয়া করে না! এদের হাতে কারো নিস্তার নেই! তোর কোন ভয় নেই। আমি থাকতে তোর গায়ে আর কেউ হাত দিতে পারবে না। কাঁদিস না মা। আয় আমার সঙ্গে। আমি তোর সব কাজ করে দেব।"

তারপর বুড়ি আমার হাত ধরে আস্তাবলের ভেতরে নিয়ে গেল।

তিন-তিনটে ঘোড়া আস্তাবলে। আমায় দেখে তিনটে ঘোড়াই চিঁহিঁহিঁ করে ডেকে উঠল। পা ঠুকতে লাগল। আমার কী রকম ভয় করতে লাগল।

বুড়ি বললে, "ভয় নেই, আয়।"

আমি ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেলুম। বলো, আমি কী পারি ওই আস্তাবলের কাজ করতে? ওই অত বড় বড় ঘোড়া, আমি কেমন করে সামলাব?

বুড়ি বললে, "তোকে কিচ্ছু করতে হবে না। তুই এখানে দাঁড়া। আমি সব করে দিচ্ছি।"

আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। বুড়ি পাতকুয়া থেকে জল নিয়ে এল। কাছেই পাতকুয়া। ঝাঁটা দিয়ে, জল ঢেলে ঢেলে ধোয়া-মোছা করতে লাগল। আহা! যতই হোক বুড়ি তো! নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে। আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না। বুড়ির হাত থেকে ঝাঁটাটা নিতে গেলুম। বুড়ি বললে, "আমায় দেখে বুঝি তোর কষ্ট হচ্ছে? না রে, আমার এসব করা অভ্যেস আছে। আমি এখন মরব না মা। তাই যদি হত, তা হলে এখানে আসি।"

বুড়ি আমায় কিচ্ছু করতে দিল না। নিজেই সব করে, ঘাস এনে ঘোড়ার মুখে ধরলে। ঘোড়া ঘাস চিবুতে লাগল। আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম কে এই বুড়ি?

বুড়ি বললে, "জানিস এরা আমাকেও ধরে এনেছে। আমি এদের ঝি। আমারও ছেলে আছে মা। আমার ছেলেকে এরা ডাকাত করতে চেয়েছিল। সে শোনেনি। সে যে আমার ছেলে। সে কী ডাকাত হয়? মানুষ খুন করতে পারে? তাই আমার ছেলেকে শাস্তি দেবে বলে, আমায় ধরে এনে ঘরের মধ্যে বেঁধে রেখেছে। আমি মরি মরব। আমার ছেলে যেন ডাকাত না হয় মা। তা হয়ে গেল কতদিন। কতদিন আমার ছেলেকে আমি দেখিনি! আমি মা। আমার দুঃখ কে বুঝবে বল!

আমি এগিয়ে গেলুম বুড়ির কাছে। আমার মনে হল, এই ডাকাতের বনে, বুড়ি যেন আমার কত আপন। আমার মা-ও তো আমাকে এতদিন না দেখতে পেয়ে কত কাঁদছে। এই বুড়িও যা আমার মা-ও তো তাই। আমি বুড়িকে জড়িয়ে ধরলুম। হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললুম। ঘোড়াগুলো আবার চিঁহিঁহিঁ করে ডেকে উঠল।

বুড়ি আমার মাথায় হাত দিলে। বললে, "ভয় নেই মা। আমার এরা কী করবে! আমার তো তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। তোকে আমি কিছুতেই এদের হাতে মরতে দেব না। না, না, কাঁদিস না মা, চুপ কর।"

এত বিপদেও আমার মনে সাহস এল। মনে হল, বুড়িও যেন আমার আর এক মা!

ক' দিনেই কিন্তু আমি সব কাজ শিখে গেলুম। এখন আমি আস্তাবলের কাজ পারি। ঘোড়াকে নিজের হাতে ঘাস খাওয়াই। বুড়ি রান্না করে, আমিও ঘর-কন্নার কাজ করি।

বুড়ি বলে, "বাঃ! বোবা হলে কী হবে, তোর এত গুণ! তুই তো ভারি লক্ষ্মী মেয়ে মা!

আমার না সাদা ঘোড়াটার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে। ও না আমাকে এত আদর করে। আমি যখন ওর মুখে ঘাস এগিয়ে দিই, ও খাবে, আর আমার দিকে কেমন পিটপিট করে দেখবে। দেখতে দেখতে আমার গায়ে ওর মুখটা ঘসে দেবে। আমার এমন সুড়সুড়ি লাগে। আমার বড্ড ইচ্ছে ওই ঘোড়াটার পিঠে চাপতে। আমি বাঘের পিঠে চেপেছি। সে তো সোজা। বাঘ তো বেশি উঁচু নয়। কিন্তু ঘোড়া যা ঢ্যাঙা। আমার হাতই যাবে না। ঘোড়া যে কেন বসতে পারে না, জানি না। ঘোড়া নাকি একবার বসলে আর উঠতে পারে না। বলে, নাকি বাত ধরে যায়। এ কি অনাছিষ্টি কথা বাবা! আচ্ছা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কখনও ঘুমুন যায়। ঘোড়াগুলো যে কেমন করে ঘুময়, আমি ভেবে পাই না। ঢুলতে ঢুলতে পড়ে যায় না তো! পায়ে ব্যথাও ধরে না? বাঘটা কিন্তু বসতেও পারে, শুতেও পারে। আবার আমার সঙ্গে খেলতে খেলতে মাটিতে কী রকম গড়াগড়ি খাচ্ছিল! সত্যি, ভারি রাগ ধরছে বাঘটার ওপর। ওর জন্যেই তো আমার এই দুর্দশা! বাঘের আবার এত রাগ কিসের! রাগ দেখে বাঁচি না! আর আমি যে ওকে খুঁজতে খুঁজতে ডাকাতের হাতে পড়েছি। তার বেলা! যদি মুরোদ থাকে আমায় উদ্ধার করে নিয়ে যাক! আর দাদু? আহা! আমায় দেখতে না পেয়ে কত খোঁজাখুঁজি করছে বল তো! ভাবছে হয়তো, যাকে আমি বাঁচালুম, যাকে এত আদর যত্ন করলুম, সেই মেয়েটা ঠকিয়ে চলে গেল! পেটে পেটে এত শয়তানি! কিন্তু আমি কী করে বলি, "না দাদু, না। তোমাকে আমি একটুও ঠকাইনি। তোমাকে আমি ভুলিনি দাদু। তোমার বোবা-মেয়েকে

দাদা ঘোড়া আমাকে নিয়ে...

ডাকাতে ধরে এনেছে। সে যে বন্দী।"

ডাকাতের ঘরে থাকতে থাকতে আমিও যেন ডাকাতের মত হয়ে গেছি। আমি এখন ওদের সব জানি। রোজ রাত্তিরে ওরা ঘোড়ায় চড়ে ডাকাতি করতে যাবে। রোজ এত এত ধন-সম্পত্তি চুরি করে আনবে। নয়তো কাউকে মারবে। আমার যেন সব গা-সহা হয়ে গেছে। আমার একটুও অবাক লাগে না। আমার একটুও ভয় করে না। কেনই বা ভয় করবে! আমি যে বুড়ির কাছে থাকি। ও যে সব সময় আমায় আগলে রাখে। আর ওই সাদা রঙের ঘোড়াটা! ও যে আমার বন্ধু! আমি তো সব হারিয়েছি। এখন এরাই আমার সব। সত্যি কথা বলতে কী, ওই ডাকাত-লোকটাও এখন আমায় কিচ্ছু বলে না। নাই বলুক। তাই বলে আমিও কিন্তু ওর সামনে যেতে পারি না। ওকেই আমার সব সময়ে ভয়। এমন বিচ্ছিরি চোখ দুটো। আর তেমনি বিচ্ছিরি সাজ। কালো কালো পোষাক পরে, চোখে কালো কাপড়ের চশমা এঁটে ঘোড়ায় চেপে অন্ধকারে যখন লুঠ করতে বেরয়, দেখলে বুক দুরুদুরু করবে তোমার! লোকটাকে ভয় পেলেও আমার কেমন সয়ে গেছে। ও কিন্তু তা বলে আমার সঙ্গে একদিনও কথা বলেনি। এত যে কাজ করি, তা একদিনও কী একটু তারিফ করেছে! মোটেই না। আমারও তো ইচ্ছে যায় শুনতে। লোকটা যদিও কখন কথা বলে, বাবা! এমন তেড়েমেড়ে বলবে তখন মনে হয় ও যেন মানুষ নয়। বোধহয় কোন দত্যি-দানোর ছেলে!

ক' দিন তবু ভাল ছিলুম। তবু বুড়ির কোলে মাথা রেখে ঘুমুতে পারছিলুম। বুড়ির মুখে কত গল্প শুনছিলুম। আর ওই সাদা ঘোড়াটার সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে খেলা করছিলুম। এত দুঃখে এইটুকুই আমার আনন্দ। কিন্তু জানো, এইটুকু আনন্দও আমার সইল না।

বুড়ি যে কেন সেদিন আমায় "মেয়ে" বলে এত আদর করল! কেন যে সেদিন রাত্তিরবেলা আমায় কাছে ডেকে নিয়ে আমার গলায় একটি সোনার হার পরিয়ে দিল! কী দরকার ছিল। এর আগে বুড়ির কাছে আমি কোনদিন দেখিনি সোনার হারটা। কোনদিন আমি বুঝতেও পারিনি বুড়ির কাছে সোনার হার আছে। আমায় সেদিন ডেকে বললে, "আয় মা, তোর গলায় গয়না পরিয়ে দিই।"

আমি অবাক হয়ে চেয়ে দেখেছি। দেখেছি কোমরের কাপড় থেকে একটা সোনার হার বার করল বুড়ি। বললে, "এইটা আমার শেষ সম্বল। ইচ্ছে ছিল ছেলের বউ এলে তার গলায় পরিয়ে দেব। কিন্তু সে-সাধ আমার কোনদিন মিটবে না। ছেলের সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। তুই তো আমার মেয়ে, তাই তোর গলায় পরিয়ে দিই।"

আমি তো কিছুতেই নেব না। মনে মনে ভাবলুম, "আমি তো তোমার কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে, আমি তো তোমার আপন নই। ও হার আমার গলায় সাজে না।"

বুড়ি আমার মন বুঝল না। আমার বারণও শুনল না। জোর করে পরিয়ে দিল। আমি সোনার হার গলায় পরে, দু'হাত দিয়ে বুড়ির গলায় নিজেকে জড়িয়ে ফেললুম। বুড়ি আমার কপালে চুমো খেল। আর ঠিক তক্ষুনি আমার মায়ের মুখখানি মনে পড়ে গেল।

সকালবেলা আস্তাবলে যেই ঢুকেছি, সাদা ঘোড়াটার কী আনন্দ দেখো! বার বার আমার গলার দিকে তাকাচ্ছে আর চিঁহিঁহিঁ করে আনন্দে চেঁচাচ্ছে। এক মুঠো কচি ঘাস ওর মুখের কাছে এনে ওকে মনে মনে বললুম, "এত আনন্দ তোর কিসের জন্যে? আমার গলায় গয়না দেখে? আমি তো ডাকাতের হাতে বন্দী। বন্দীর গলায় হার মানায়?" কিন্তু জানো, হঠাৎ দেখি ঘোড়ার সেই খুশি-খুশি চোখ দুটো কেমন যেন ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আমি প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারিনি। বুঝতে বুঝতেই আমার গলার হারটা কে যেন পেছন থেকে টেনে ধরলে। আমি চমকে উঠলুম! উঃ! আমার কী ভীষণ লাগল। আমি তাড়াতাড়ি ফিরে তাকিয়ে দেখি, সেই ডাকাত-লোকটা। চোখগুলো তেমনি পাকানো। লাল টকটক করছে। আমি ভয়ে কেঁপে উঠলুম। লোকটা গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কোত্থেকে চুরি করেছিস?"

আমি হাত নেড়ে, ঘাড় নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, "না, চুরি আমি করিনি। বুড়ি আমায় দিয়েছে।"

লোকটা আমার কথা বুঝলই না। আমার গলা থেকে হারটা

টেনে ছিঁড়ে নিয়ে আমায় মারতে লাগল। আমি যতই কাঁদছি, আর আমার গলা দিয়ে বোবা আওয়াজ যতই বেরিয়ে আসছে, ও আমায় ততই মারছে। ওঃ! ঠিক সেই সময় যদি বুড়ি না এসে পড়ত, আমার যে কী হত বলতে পারছি না। বুড়ি এসে ঠিক চিলের মত ওই ডাকাত-লোকটার হাত থেকে আমায় ছিনিয়ে নিল। বলল, "এমন একটা দুধের বাছাকে অমন করে মারছ কেন বাবু?"

লোকটা ধমক দিয়ে বললে, "না, তুই ছেড়ে দে। ও আমার হার চুরি করেছে!"

বুড়ি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছে, বললে, "না, তোমার কেন হার চুরি করবে। ও হার আমি ওকে দিয়েছি।"

ডাকাত এবার আমায় ছেড়ে বুড়িকে ধরলে। "ও, তুই দিয়েছিস? তুই কোথা পেলি?"

বুড়ি বললে, "ওটা আমার হার।"

ডাকাতটা রেগে কাঁপছে। তিরিক্ষি গলায় চেঁচিয়ে উঠে আবার জিজ্ঞেস করলে, "তুই কোথা পেলি?"

বুড়ি বললে, "আমার ঘরের হার।"

"তোর ঘরের, না আমার ঘরের! চোর কোথাকার।" বলে বুড়ির চুলের মুঠি ধরে টানতে লাগল। বুড়ি কেঁদে ফেলল।

আমি থাকতে পারলুম না। ছিঃ ছিঃ! আমার বুড়ি-মাকে ধরে মারছে! আমার এই ছোট্ট হাতের মুঠোয় কী জানি তখন কোথা থেকে যে এত জোর এল আমি বলতে পারব না। আমি লোকটার পিঠে খুব জোরে এক ঘুসি মেরে দিলুম। কিন্তু একবারও ভাবলুম না, আমার হাতের ঘুসিতে ওর কিচ্ছু হবে না। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বুড়িকে ছেড়ে আমায় ধরতে এল। আমি পালালুম। কিন্তু কোথায় পালাব? আমি ছুটছি, লোকটাও আমার পিছু ছুটছে। আমি আস্তাবলে ঢুকে পড়েছি। লোকটাও ঢুকেছে। ঘোড়াগুলোর পেটের তলায় ঢুকে, লুকিয়ে লুকিয়ে ছুটছি। লোকটাও তাড়া করলে। আস্তাবলের ভেতর থেকে পালালুম। বাইরে ওই পাতকুয়াটার চারপাশে ছুটতে ছুটতে ঘুরপাক খেতে লাগলুম। লোকটাও ঘুরপাক খাচ্ছে। আমি হাঁপিয়ে গেছি। আর পারছি না। লোকটা আমায় ধরে ফেললে। আমায় চ্যাং-দোলা করে তুলে নিয়ে কুয়োর মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিতে গেল। আমি চিৎকার করে উঠলুম। ঠিক ওই সময় বুড়ি-মা একেবারে ছুটে এসে লোকটাকে টেনে ধরলে দু' হাত দিয়ে জাপ্টে। আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে সেই সাদা ঘোড়াটা কোত্থেকে না ছুটে এসে ঐ ডাকাত-লোকটার গায়ে এমন জোরে ধাক্কা মারল যে, আমি ডাকাতের হাত থেকে ছিটকে পড়েছি মাটিতে চিৎপাত হয়ে। আর ডাকাত লোকটা টাল সামলাতে না পেরে পা ফস্কে ঝপাং করে কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল। পড়ে গিয়েই "বাঁচাও, বাঁচাও" বলে কেঁদে উঠল। কিন্তু এত গভীর কুয়োটা, ওখান থেকে ওকে কে বাঁচাবে?

বুড়ি-মা আমায় কোলে তুলে নিলে। কী ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে বুড়ি-মা। আমি থতমত খেয়ে গেছি। বুড়ি-মা সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটার পিঠে বসিয়ে দিল আমায়। আমি ঘোড়ার গলাটা জড়িয়ে ধরলুম। বুড়ি-মা কাঁপা-গলায় বললে, "পালা এখান থেকে, এখুনি পালা।"

আমি জানি না এই সাদা ঘোড়াটা কী বুঝল! আমার চিবুকটা ছুঁয়ে আদর করার আগেই, বুড়ি-মার গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। ঘোড়াটা জোর-কদমে লাফিয়ে উঠল। আস্তাবলের চত্বর পেরিয়ে, পেছনের বন্ধ গেটটা ভেঙে ঘোড়াটা যখন প্রাণপণে ছুট দিল, তখন তার পায়ের খুরে বেজে উঠছে টগবগ, টগবগ। আমি তখনও শুনতে পাচ্ছি কুয়োর মধ্যে ডাকাতটা চিৎকার করছে, "বাঁচাও, বাঁচাও।" সেই চিৎকার শুনতে শুনতে, আর ঘোড়ার পিঠে ছুটতে ছুটতে আমি আবার বনের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। থমথমে বনের ভেতর এখন শুধু আমি আর ঘোড়া। আর কেউ নেই।

ছুটছি তো ছুটছিই। বন যেন শেষ হতে চায় না। এর আগে আমি তো আর কখনও ঘোড়ায় চাপিনি। তবু আমার একটুও ভয় করছিল না। শুধু মনে হচ্ছিল, এই বনটা পেরিয়ে একবারটি যদি বাইরে যেতে পারি! যেখানে অনেক মানুষ আছে। যেখানে আনন্দ আছে। শুধু ইচ্ছে করছিল, অনেক মানুষ আমাকে দেখুক। আমাকে ডাকুক, "টায়রা, টায়রা" বলে। আমি তাদের কাছে গিয়ে আমার সব কথা শোনাই।

কী জানি, ভাবছি, ঘোড়াটা হয়তো ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে ও কিছুতেই থামবে না। যতই কষ্ট হোক ও যেন আমায় অনেক দূরে নিয়ে চলে যাবে। যেখানে ওই ডাকাতের দল আর আমায় কোনদিন খুঁজে পাবে না। কিন্তু আমি তো জানি না সেই দূর দেশ কোথায়। হয়তো ঘোড়া জানে।

হঠাৎ কিসের শব্দ এল আমার কানে। আমি কান পেতে রইলুম। মনে হচ্ছে, যেন খুব কাছে কুলকুল করে নদী বয়ে চলেছে। বনটাও যে এখানে অনেকটা হাল্কা হয়ে গেছে, এতক্ষণ খেয়াল করে দেখিনি আমি। হাল্কা বনের ফাঁক দিয়ে আকাশটাও একটু একটু উঁকি মারছে।

দেখতে দেখতে ঘোড়াটা একেবারে নদীর ধারে এসে দাঁড়াল। মুখ ডুবিয়ে জল খেতে লাগল। আহা! বড় তেষ্টা পেয়েছে!

হঠাৎ আমার মনটা কেন এমন চমকে উঠল! কেন আমার বুকের ভেতরটা এমন ছটফটিয়ে উঠল! আমার মনে হল, আমি এখনই ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ি। এই নদীর জলটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমি চিৎকার করে উঠি, এই তো সেই টুংরি!

সত্যিই, এই তো টুংরি নদী। আমি তো চিনতে পেরেছি। এই টুংরিই তো আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে আমার মা আর বাবার কাছ থেকে।

আমি ঘোড়ার গলাটা জড়িয়ে ধরে বোবা-কান্নায় চিৎকার করে উঠলুম। ঘোড়া কী বুঝল জানি না। ওই নদীর তীর ধরে সে ছুটতে লাগল।

আমি চিনতে পারছি। একটু একটু করে সব চিনতে পারছি। নদীর এ-পার ও-পার সব আমার চেনা। এ-পার থেকে ও-পারে আমি বাবার সঙ্গে নৌকো চেপে কতবার এসেছি। কতবার বাবার গান শুনতে শুনতে আমি দেখেছি, নদীর পাড়ে পাড়ে, ওই যে মস্ত উঁচু উঁচু গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে, ঐ গাছের ডালে পাখিরা উড়তে উড়তে ফিরে আসছে। ওই তো, ওই তো সেই নয়নকাকার ছোট্ট মাটির ঘর। ওই তো দেখা যাচ্ছে রথের চূড়াটা আকাশের মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চূড়ার মাথায় সবুজ রঙের পতাকাটা পতপত করে উড়ছে। আর এই তো এখানে আমি আর মানা ছুটতে ছুটতে, খেলতে খেলতে কতদিন চলে এসেছি।

আমি আদর করে দু' হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলুম ঘোড়াটাকে। আমি বলতে চাইলুম, "ঘোড়া, ঘোড়া, একবার দাঁড়া।" কিন্তু ও তো আমার কথা বুঝলো না। বুঝল না এখন, একটিবার আমি নামব ওর পিঠ থেকে। ও ছুটেই চলল।

আমি পেছন ফিরে দেখি, সেই গভীর বনটা কখন যেন কোথায় মিলিয়ে গেছে। চেয়ে দেখি এ যে আমাদের সেই গ্রাম। যে গ্রামে আমার মা আর বাবা থাকে। তখন আমার মনের যত খুশি সব যেন একসঙ্গে বুকের ওপর নেচে উঠছে। মনে হচ্ছে এখনই ছুটে ছুটে আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠি।

জানো, হঠাৎ ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি লাফিয়ে নেমে পড়লুম। আমার একটুও লাগল না। আমি ঘোড়ার মুখের নিচে এসে দাঁড়ালুম। ও মুখটা হেঁট করে আমার মুখের কাছে নামিয়ে আনল। আমি ওর গালে হাত বুলিয়ে আদর করে হাতছানি দিয়ে ডাকলুম। তারপর আমি ছুটলুম। কে যে আমায় চিনতে পারল আমি জানি না। কারা যে আমায় ডাকল, "টায়রা, টায়রা, টায়রা" আমি বলতে পারব না। আমার চোখে তখন শুধু দুটি ছবি ভেসে ভেসে উঠছে, আমার মা আর বাবার ছবি। আর সব যেন

ঝাপসা। কিছু নেই, কেউ নেই।

ওই তো আমাদের ছোট্ট বাড়িটা। এখনও পৌঁছুতে পারছি না কেন? এত ছুটছি, তবু কেন মনে হচ্ছে এখনও অনেক দূরে! ছোট্ট বাড়িটা আমাদের নতুন নতুন লাগছে। নতুন মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ আমার কী ভালই না লাগছে। এই তো আমার হাতের সামনে ঘরের দরজা। আমি ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ালুম। আমার সারা দেহ ঠকঠক করে কেঁপে উঠল। আমি কাঁপা-হাতে দরজায় ঠেলা দিলুম। দরজা খুলে গেল।

সামনে আমার মা। আমি চমকে চেয়ে দেখলুম মায়ের দিকে। শুধু একবারটি দেখেছি। আমার এত আনন্দ, এত খুশি, তবু কেন হাসতে পারলুম না। আমার চোখ ফেটে জল আসছে। আমি যে কথা বলতে পারি না। মাকে ডাকবে কেমন করে?

তারপরেই জানো, আমি চিৎকার করে উঠলুম। আমি চিৎকার করে ডেকে উঠলুম, "মা।" কে যে আমার গলায় তখন কথা দিল আমি আজও জানি না। আমি "মা" বলে লাফিয়ে উঠে, মায়ের কোলে ছিটকে পড়লুম।

তারপর আর আমি কিছু জানি না। জানি না আমি কেঁদেছিলুম কি না। জানি না মা-এর চোখ দুটিও জলে ভেসে গেছল কি না। শুধু আদর করে চুমো খেয়েছিল মা আমার কপালে, গালে, একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, আরও কত, এখন আর আমার একটুও মনে নেই। তারপর যে কোথা থেকে বাবা ছুটে এসেছিল, তাও আমি জানি না। আমি বাবাকে দেখতে পেয়ে, ছুট্টে গিয়ে বাবার বুকের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছি। বাবা আমায় দু'হাত দিয়ে কোলে তুলে নিল। বললে, "টায়রা আমার, কোথায় ছিলি মা এতদিন?"

আমার যেন তখনও বিশ্বাস নেই। আমি যেন তখনও বুঝতে পারছি না, আমি কথা বলতে পারি। একটিবার শুধু ভয়ে ভয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, "বাবা, আমি কী বোবা?"

ঠিক তক্ষুনি না ঘরের মধ্যে কে যেন কেঁদে উঠল। আমি বাবাকে ছেড়ে ছুট্টে ঘরে ঢুকে গেলুম। ও মা! আমার একটি ভাই হয়েছে! কী সুন্দর ফুটফুটে। শুয়ে আছে বিছানায়!

আমি ভাইকে কোলে তুলে নিলুম। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে নাচতে লাগলুম। তাকে কোলে নিয়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় ছুটলুম। সাদা-ঘোড়াটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়ার পিঠে ওকে বসিয়ে দেব।

কিন্তু এ কী! বাইরে বেরিয়ে দেখি, ঘোড়া তো নেই। কোথায় গেল? তাকে অনেক খুঁজলুম, দেখা পেলুম না। অনেক ডাকলুম, তার সাড়া পেলুম না। সে কী চলে গেছে? কিন্তু কোথায় গেল? তার কী কাজ শেষ হয়ে গেছে? তাই সে ঘরে ফিরে গেল।

খুঁজতে খুঁজতে, ভাইকে কোলে নিয়ে, কখন যে আমি মানাদের বাড়ির সেই সজনে গাছটার সামনে এসে আনমনে দাঁড়িয়েছি, আমি এখন খেয়াল করতে পারছি না। সেখানে বাড়ি নেই। মানা নেই। মানার অন্ধ মা-ও নেই। শুধু সজনে গাছটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। দেখি, সজনে গাছের ডালে একটা নীল রঙের পাখি বাসা বেঁধেছে। ডিম ফুটে তার একটি ছানা হয়েছে। মা-পাখি ছানাকে ঠোঁট দিয়ে কেমন খাবার খাওয়াচ্ছে! আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম। মনে মনে ভাবছি, ওই কী আমার মানা, ওই ছোট্ট কচি পাখিটি? না, এই আমার মানা, আমার কোলে আমার এই ছোট্ট ভাইটি? ভাবতে ভাবতে আমার ছোট্ট ভাইটিকে আমি বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলুম। ওর গালে একটা চুমো খেলুম। ও খিলখিল করে হেসে উঠল! কী মিষ্টি হাসিটি!

সেদিন ওঁদের বাড়ি যেতেই এক তুল-কালাম কাণ্ডের মধ্যে পড়লাম! এমন হুলস্থূল বাধিয়েছেন হর্ষবর্ধন!

পাহাড়-প্রমাণ দাদা মূষিকের ন্যায় ভায়ের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এই মারেন কি সেই মারেন।

আমি গিরি আর গোবর্ধনের মাঝ-খানে গিয়ে পড়লাম—দাঁড়ান দাঁড়ান, করছেন কী! আপনার চাপে চ্যাপটা হয়ে যাবে যে ভাইটা!

চ্যাপটা! ওকে আস্ত রাখব আমি? ওরই একদিন কি আমারই একদিন! খতম্ করব ওকে—ওর ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিয়ে যদি আমার ফাঁসি যেতে হয় সেও ভি আচ্ছা! কিন্তু ওকে আমি ছাড়ছি না!

ভুঁড়ি যে ফাঁসাবেন, ভুঁড়ি কোথায় ওর! আমি বাধা দিয়ে বলি—আপনার মতন ওর ভুঁড়ি গজিয়ে দিন আগে তারপর তো? তবে না ফাঁসাবার মজা!

নাঃ! আর নয়! তদ্দিন আমার সবুর সইবে না। ওকে ছাড়ব এবার জন্মের মতই—আজই আমাদের কাটান ছেড়ান!

অ্যা, কী বললেন! গোবরচন্দরকে ছাড়বেন বলছেন? শুনেই আমি চমকাই।

হ্যাঁ হ্যাঁ। জন্মের মতই ছাড়ব ওকে বলছি তো! না হলে আমার শান্তি নেই। বললাম।

কী বলছেন মশাই! ও কথা কি বলতে আছে? আপনি কি গোরু যে গোবর ছাড়বেন?

গোরু কেন, গোরুর অধম। আমি মোষ। মোষেরও অধম, আমি উট। উট না হলে এমন উটকো ভাই জোটে আমার! আপনি এসে বাগড়া না দিলে এতক্ষণ ওর এসপার ওসপার হয়ে যেত। আপনি এসেও কিছু বাঁচাতে পারবেন না। আমি ওকে ত্যাজ্যপুত্তুর করে দিলাম। আমার বিষয় আশা কিছু ওকে দেব না।

কে চাইছে! মাঝখান থেকে গোবরা গোঙায়: চাইছে কে তোমার বিষয় আশয়? আমি কি সেই আশায় বসে আছি?

না চাস নাই চাস। ত্যাজ্যপুত্তুর হয়ে গেলি—ব্যাস!

বয়েই গেল আমার!

ছি ছি ছি! আপনি বলছেন কী! অমন কথা কি কইতে আছে? ভাই কি ছেলে যে তাকে ত্যাজ্যপুত্তুর করবেন? এমন অশাস্ত্রীয় কথা মুখে আনে কখনো?

অশাস্তর কোনখানে? রামায়ণ কি আমাদের শাস্তর নয়। রামচন্দ্র কি লক্ষ্মণকে বর্জন করেননি? আমিও আমার দুর্লক্ষ্মণটিকে বর্জন করলাম। বলে তিনি হাঁফ ছেড়ে চৌকির ওপর বসলেন।

এত রাগ কিসের জন্যে? বলি, হয়েছেটা কী? আমি শুধাই।

কাল রাত্তিরে এই ঘর থেকে আমার যথাসর্বস্ব চুরি গেছে। আর এই ঘরে ও ঘুমোচ্ছিল!...রাগে গর গর করতে করতে তাঁর গর্জন।

ঘুমোলে তো মানুষ মড়া! তখন কি কারো কোনো হুঁস থাকে নাকি? গোবরা ভায়ার দোষটা কোথায় দেখছিনে তো।

ও বলছে ও তখন জেগে। চোরটা ঢুকতেই ওর ঘুম ভেঙে গেছল। চোখ পিট পিট করে দেখেছে সব আগাগোড়া। তবু তাকে পাকড়ায়নি, কোনো বাধা দেয়নি...

তাই নাকি? তা, যথাসর্বস্বটা গেল কি আপনার?

ডজন খানেক ল্যাংড়া আম এনে রেখে-ছিলাম। ওই ফ্রিজেই ছিল, আধসের-টাক রাবড়িও ছিল সেইসঙ্গে। আজ সকালে উঠে সেগুলির সদ্গতি করব রাবড়ি দিয়ে, তারিয়ে তারিয়ে খাব আমগুলো...রাতারাতি সব ফাঁক! সকালে উঠে দেখি কিনা সব বিলকুল লোপাট!

আর টাকাকড়ি কী গেল?

টাকাকড়ি কিছু যায়নি। টেবিলের ওপর আমার শখের ডটপেনটা ছিল, সেটা উধাও।

এই আপনার যথাসর্বস্ব? শুনে বলতে কি আমার হাসি পায়।

নয়? কী বলছেন! রাবড়ি দিয়ে যদি ল্যাংড়া আম কখনো খেয়ে থাকেন তো বুঝবেন জীবনের সর্বস্বই তাই। আর ডট পেনটা, আমার বুক পকেটে শোভা পায়, ওটাও কিছু অযথা নয়।

যান যান, বাথরুমে যান। চানটান করে ঠান্ডা হোন গে।

হর্ষবর্ধনকে ভাগিয়ে দিয়ে আমি গোবর্ধনকে নিয়ে পড়লাম—

কী গোবরা ভায়া? চোর যখন ঘরে

বীর হওয়ার

তোমার ঢুকেছে তুমি নাকি তখন জেগে ছিলে? সত্যি?

চোর কোথায়! পাড়ার ছেলে তো? আমার চেনা ছেলে। যখন এল রাত তখন তিনটে।

রাত তিনটে! অবাক কাণ্ড তো। মানে চোরের বেলায় হয়ত বিস্ময়কর কিছু নয় কিন্তু কোনো পাড়ার ছেলের অমন অসময়ে আসাটা...

সব সময়ই তো আসে ওরা। সময়-অসময় বলে কিছু নেই ওদের। আমার কাছে আসে। এই ঘরেই আসে...

কিছু বললে না তুমি তাকে?

কী বলব? ও-ই তো বলবে! ও কিছু বলল না, আমিও কোনো রা কাড়লাম না! কারো গায়ে পড়ে কথা বলতে যাব কেন? চোখ পিট পিট করে দেখতে লাগলাম কী করে?

চোখ পিট পিট করে?

হ্যাঁ। চোখাচোখি হয়ে গেলে যদি সে লজ্জায় পড়ে যায়? চক্ষুলজ্জা বলে একটা জিনিস নেই! আমিও তাই প্রায় চোখ বুজে ছিলাম। দেখছিলাম, কী করে?

কী করে মানে? অমন সময়ে চুরি করতে এসেছে তা বুঝতে পারোনি? চোখ পিট পিট করে দেখছিলে কী করে সে? ঘটিটা নেয় কি বাটিটা নেয়? দেখছিলে?

হ্যাঁ, দেখছিলাম যে কী করে ছেলেটা?

কী করল দেখলে?

দেখলাম গুটি গুটি ঢুকেই না, কোনোদিকে না তাকিয়ে সে প্রথমেই ফ্রিজটা খুলল। খুলে তার ভেতরে যা খাবারদাবার ছিল বার করল সব। কেক পুডিং সন্দেশ আইসক্রিম—যা ছিল। তারপরে রাবড়ি আর ল্যাংড়া আমগুলো নিয়ে বসল। রাবড়ি আর আম দিয়ে চেটে পুটে খেয়ে শেষ করল সব। আঁটিগুলো খায়নি, নিয়েও যায়নি। ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিয়ে গেছে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে। ভাঁড়টাও রেখেছে সযত্নে।

তা, এত কাণ্ড সে করল। তুমি চেয়ে চেয়ে দেখলে সব? নাকি, চোখ বুজে বুজেই দেখেছ। তাকে বাধা দিলে না একদম?

বাধা দেব কেন? খাবার জিনিস খেয়েছে তো। ছেলেদেরই খাবার। ঐ আইসক্রিম, চকোলেট, কেক, পুডিং ছেলেরাই খায়—বাধা কিসের!

শুধু তাই? তোমার দাদার আমগুলো...

হ্যাঁ, তাও সব সাবড়ে গেছে। পাড়ার

বিড়ম্বনা

শিবরাম চক্রবর্তী

ছবি এঁকেছেন অলোক ধর

ছেলেরা কি আম খেতে পায় নাকি? ল্যাংড়া আম চোখেই দেখতে পায় না। ওদের বাড়ি সাত দিনে একদিন মাছ আসে আমি জানি। তাও আবার চুনো মাছ আর কুচো চিংড়ি—সেই রোববার! খেতেই পায় না বেচারারা।

আহা! ওর সঙ্গে আমারও সহানুভূতি জানাই!

আহা বলছেন, আহারের বাহারটা যদি দেখতেন ওর! আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত পিট পিট চোখে চেয়েছিলাম, চোখের পলকে ফ্রিজ ফাঁক! গোগ্রাসে শেষ করে দিল সব। কতো দিন যেন কিছু খায়নি বেচারা!

চক্ষের পলকে ফ্রিজ ফাঁক?

সত্যি পেট ভরে খেতে পায় না বেচারারা। আমার তো ইচ্ছে করে পাড়ার ছেলেদের ধরে ধরে বেশ করে খাওয়াই, কিন্তু পেরে উঠি না, পাছে ওদের মা-বাবারা রাগ করে, পাড়ার লোকেরা কিছু মনে ভাবে—তাই। তা ওরা যদি একেকজনা এমনি করে এসে রাত বিরেতে আমাদের ফ্রিজ ফাঁক করে দিয়ে যায়, মন্দ কি? আমি ভাবি, অনেক মেহনত বেঁচে যায় আমাদের।

তবু ভালো যে খেয়ে দেয়েই সরেছে, আর কিছু সরায়নি—ভাগ্যি বলতে হয়। টেবিলের ওপর তো তোমার দাদার হাতঘড়ি, দামী পেনটাও ছিল তো—নেয়নি।

নেয় কখনো? ছেলেরা কখনো আজে বাজে জিনিস ছোঁয় না। তারা কি চোর ছ্যাঁচোড় যে...? ডটপেনটা চকচকে ছিল, নেহাত ওর চোখে ধরেছে নিয়ে গেছে। দুদিন বাদেই ফেলে দেবে।

তাহলেও আমি বলব, ঘরের মধ্যে তাকে পাকড়ানো তোমার উচিত ছিল ভায়া। আর কিছু না, চুরি করাটা যে খারাপ, ভারী দোষের এই কথাটা—বলবার জন্যেই বলে কয়ে তার পরে ছেড়ে দিতে পারতে তাকে। ধরলে না কেন?

ধরতে পারলে তো! পলটুকে ছুটে ধরতে পারে কেউ? এই তল্লাটের দৌড়ের চ্যাম্পিয়ন সে। পাড়ার পলটনের ক্যাপ্টেন পলটু। দৌড়ে তাকে ধরার কারো সাধ্য নেই—দেখেছি ওর দৌড়, জানি তো, ওর পেছনে ছুটতে যাওয়া নাহক। চুপ করে শুয়ে রইলাম তাই।

বেশ করেছো। বলে আমি বাড়ির ভেতরে যাই। দেখি যে হর্ষবর্ধন গিন্নির কাছে গিয়ে রান্নাঘরে বসে গরম পরোটার সঙ্গে চা বসাচ্ছেন।

আমিও তার ভাগ বসাতে বসি। পরোটা চিবুতে চিবুতে বলি—জানলাম যা, গোবরের কোন দোষ ছিল না। জেগে থাকলে কি হবে, সাড়া দিলেই ছোঁড়াটা ভেগে পড়ত। পলটু ওর নাম, পাড়ার স্পোরটসের চ্যাম্পিয়ন, দৌড়ে তাকে ধরতে পারা গোবরার কম্মো না। তাই সব দেখে শুনেও সে চুপটি করে পড়েছিল, নাহক ছুটতে যায়নি।

পলটু না পটলা—ছোঁড়াটাকে আমি চিনি। জানালেন হর্ষবর্ধন—টিঙ টিঙে একটা ছেলে। ফিঙের মতন দেখতে। সেই রোগা পটকা ছেলেকে ধরে পটকে ফেলতে না পারাটা অন্যায়। কেন, গোবরা কি দৌড়ের চ্যাম্পিয়ন হতে পারে না? আমি কি তাকে মানা করেছি কখনো? হতে কী হচ্ছে? কেন পারছে না হতে?

পারবে কী করে? আপনি পারাবেন তবেই না হবে? আপনি অভিভাবক না? আপনি ওকে কলকাতার কোনো চ্যাম্পিয়ন দৌড়বাজের কাছে কোচিং-এ দিন! কদিনের মধ্যেই দেখবেন ও একটা দৌড়বীর হয়ে উঠেছে—দেখতে না দেখতেই। তখন কেউ আর ওকে কলা দেখিয়ে আম খেয়ে পালাতে পারবে না।

তাই হোলো। কলকাতার এক নামজাদা ব্যায়ামবীরের হাতে গছিয়ে দেওয়া হোলো গোবরাকে।

তিনি রোজ সকালে মোটরে এসে গোবরাকে নিয়ে গড়ের মাঠে চলে যান। দৌড়ের যতো কায়দা কসরৎ শেখান। ময়দানে মোটরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ায় গোবরা।

তারপর ফের একদিন! সেই পলটুই এসেছে আবার। রাত বিরেতে নয়, দিন দুপুরেই এবারটা।

এসেই আবদার—গোবরাদা, খিদে পেয়েছে বেজায়। কিছু খেতে দাও।

জামা ঝুলছে আমার ঐ! দ্যাখো কী আছে বাঁ পকেটে। নিয়ে কিনে টিনে খাওগে—যা তোমার খুশি।

পরের পকেটে হাত দিতে আছে? ছিঃ! আমি কি পকেটমার?

তাহলে কোথায় কী আছে খুঁজে পেতে দ্যাখো।

কোথায় আছে জানি আমি। ঐ ফ্রিজের মধ্যেই...বলতে বলতেই সে ফ্রিজটা খোলে। খুলেই খেতে লেগে যায়।

আস্তে আস্তে খাও।' ব্যস্ত হবার কী আছে? দাদা এখন কারখানায়। বউদি ঘুমুচ্ছেন এই দুপুরবেলা। ভয়ের কিছু নেই। হাঁসফাঁস খেতে গিয়ে, সেই কার মতন যেন, গলায় যদি তোমার আটকে যায়—তোমাকে নিয়ে হাসপাতালে দৌড়তে পারব না এখন।

খাওয়া-দাওয়া পরিপাটি হবার পর পলটু বলে—এবার তাহলে যাই গোবরাদা।

দাঁড়াও, তোমাকে কিছু বলতে চাই। কিছু শিক্ষা দেব তোমায়।

কী শিক্ষা দেবেন? শিক্ষার কথায় সে রুখে দাঁড়ায়।

চুরি করা বড় দোষ—করিয়োনা বৃথা রোষ—এসব কি পড়োনি তোমার পাঠ্য পুস্তকে? সেই কথাটা তোমাকে বুঝিয়ে বলবার আমার বাসনা।

চুরি করলাম কোথায়? আপনার অনুমতি নিয়ে খেলাম তো।

এখন খেলে। এবার খেলে। কিন্তু বছরখানেক আগে রাত তিনটের সময় ...সেই আমগুলো রাবড়ি দিয়ে ...আমি কি দেখিনি নাকি? আমার

'আমার সান্ত্বনায় উনি ভ্যাক করে কেঁদে ফেলেন—

মনে নেই, আমি ভুলে গেছি? সেটা তো চুরি করাই হয়েছিল, হয়নি কি? সেই কথাটাই ভালো করে তোমার মগজে ঢুকিয়ে দিতে চাই আমি। এমনি হয়ত ঢুকবে না, যা নিরেট মাথা তোমার, গাঁট্টা মেরে ঢোকাতে হবে। যেমন হাতুড়ি মেরে পেরেক ঢোকায় তেমনি করে।

আমায় গাঁট্টা মারবেন আপনি? ধরুন দেখি আমায়...গোবরা উঠে বসতে না বসতেই পলটু হাওয়া!

পলটুর পিছু পিছু গোবরাও ছুটেছে। সদর রাস্তা ধরে সবার চোখের ওপর সে এক দারুণ পাল্লা।

দেখতে না দেখতে উভয়েই অদৃশ্য! ডায়মন্ড হারবার রোড ধরে দুজনেই উধাও!

খানিক বাদে পলটু ফিরে এল হাঁফাতে হাঁফাতে। একলাই।

গোবরা গেল কোথায়? আমরা শুধোলাম।

কে জানে! যা ছুটছে না। দেখলে মাথা ঘুরে যায়!

পাকড়ায়নি তোমাকে?

কোথায়! আমাকে ধরে ফেলেছিল তো। কিন্তু ধরল না। পাশাপাশি ছুটতে লাগল আমার। খানিকক্ষণ। তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল বুলেটের মতই।

পাকড়ালো না?

পাকড়াতে পারল না বোধহয়। থামতে পারলো না। থামাতে পারল না—ঐ রামছুট। মিলখা সিংকে টেক্কা মারে এমনি দৌড় না!

কে জানে! এতক্ষণ বারাসাত-বসিরহাট ছাড়িয়ে বাংলা মুলুকে গিয়ে পড়েছে বোধহয়।

তা কি পারে? কাস্টমসের ফাঁড়িতে পাকড়াবে—আমাদের পুলিস কিম্বা ওদের পুলিস, চেক না করে ছাড়বে না।

পারলে তো চেক করবে। যা দৌড়বাজ হয়েছে না! আমি তো অবাক।

হর্ষবর্ধনও হতবাক্।—দেখুন তো, কী সর্বনাশ হল আমার। আপনার কথায় ব্যায়ামবীর বানাতে গিয়ে কী বিড়ম্বনায় পড়লাম।

আমি আর কী সান্ত্বনা দেব তার! বললাম—দেখুন, কী হয়। থানায় গিয়ে জানাই এখন।

লালবাজারে গেলাম দুজনাই।

অফিসারকে গিয়ে বলতেই তিনি কনট্রোলে গিয়ে দিগ্বিদিকে বেতারে খবর নিতে লাগলেন।

হ্যাঁ, একজন যুবক চেকপোস্ট পার হয়ে গেল এইমাত্র। তাকে থামানো যায়নি। ঢাকার দিকে ছুটছে বোধহয়।

ঢাকার দিকে খবর নেওয়া হোলো। ঢাকা পার হয়ে গেছে...চাটগাঁর দিকে চলেছে এতক্ষণে।

আমরা বসেই রইলাম থানায়, আহার নিদ্রা নেই। আমি খাবারের জন্য হাঁ, কিন্তু খাওয়াবে কে এখানে! আর উনি গোবরার খবরের জন্য গোমড়া মুখে সামনে বসে।

টেলেক্সে খবর আসতে লাগল ক্ষণে ক্ষণে...

বারমা মুলুকে গিয়ে পড়েছে গোবরা ...রেঙ্গুন টেঙ্গুন পার হয়ে গেল। কিছুতেই থামছে না, থামানো যাচ্ছে না, থামতে পারছে না হয়ত সে! খবর আসতে থাকে।

বর্মা পেরিয়ে সিঙ্গাপুরের দিকেই এখন!

ছুটতে ছুটতেই পড়ে মরবে না তো? শিঙে ফুঁকে বসবে না তো কখন! আমার ভয় হয়।

দিন তিনেকের পর দক্ষিণ উত্তর ভিয়েৎনাম বিলকুল পার। আনাম কাম্বোজ পেরিয়ে চীনের সীমান্তে।

কী সর্বনাশ!

দুজন বিদেশী সাংবাদিক স্কুটার নিয়ে ছুটছেন ওর পাশাপাশি—খবর জানবার খাতিরে...

সে বলেছে, আমি থামব না, থামতে পারব না। আমি পৃথিবী চক্কর দিতে চলেছি। পৃথিবীটাকে এক চক্কর দেখে নিতে চাই...ছুটতে ছুটতেই বলে গেছে সে।

দৌড়ের চক্করে দৌড়বাজির কী চক্রান্তে পড়লো বেচারা! ব্যায়ামবীর হওয়ার কী বিড়ম্বনা!

এর হেতু কি অধম এই চকরবরতি দায়ী? অনুতাপ হতে থাকে আমার।

এতক্ষণে দুনিয়া জুড়ে সব খবর কাগজে নাম ছাপা হচ্ছে, ছবি ছাপা হচ্ছে, আপনার গর্বের কথা হর্ষবর্ধনবাবু! পৃথিবী পরিক্রমায় বেরিয়েছে সে। দৌড়ের পরাক্রম না দেখিয়ে ছাড়বে না। আমি ওঁকে অভিনন্দনের সুরে সান্ত্বনা দিতে যাই।

আমার সান্ত্বনায় উনি ভ্যাক্ করে কেঁদে ফেলেন!

'আমার ভাইটাকে হারালাম। জন্মের মতই। কী সর্বনাশ যে হোলো আমার!...'

'আপনি ওকে ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন একদিন। ও-ই এখন আপনাকে ত্যাগ করে গেল! কোথায় গেল...কোথায় যাচ্ছে কে জানে'।

হর্ষবর্ধন গুম হয়ে শোনেন, তাঁর এ গুমোট বুঝি এ জীবনে কাটবার নয়।

'কিন্তু তার আমাকে ছেড়ে যাবার কথা ছিল না...। তিনি গুমরে ওঠেন হঠাৎ... 'রামায়ণে এমন তো লেখেনি। লক্ষ্মণ কি রামকে ছেড়ে গেছে কক্ষনো? আমার দুর্লক্ষণ আমায় ছেড়ে চলে গেল ...ভেউ ভেউ ভেউ!'

হাউমাউ করে কাঁদেন তিনি।

এদিকে খবর আসতে থাকে টেলেক্সে—

'ইন্ডিয়ান স্পোর্টস্ম্যান গাবারডান, ব্রাদার অব মিস্টার হাবারডান হ্যাজ রীচ্ড সাংহাই!'

খবরটা শুনেই তিনি মূর্ছিত।

সাংহাই! কী সাংহাতিক!

পাথর কেন নড়ে !
চণ্ডী লাহিড়ী
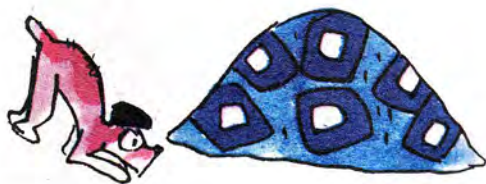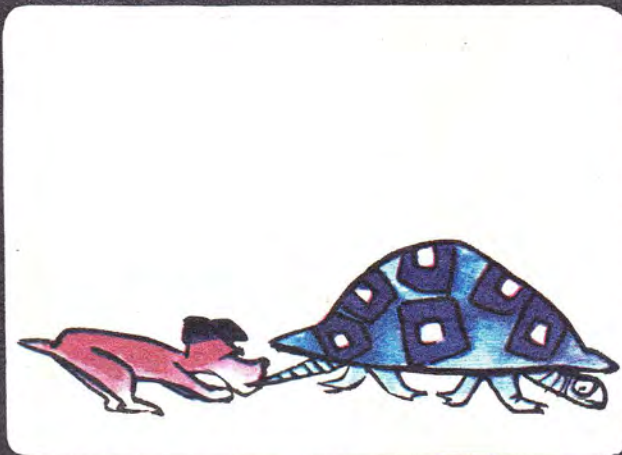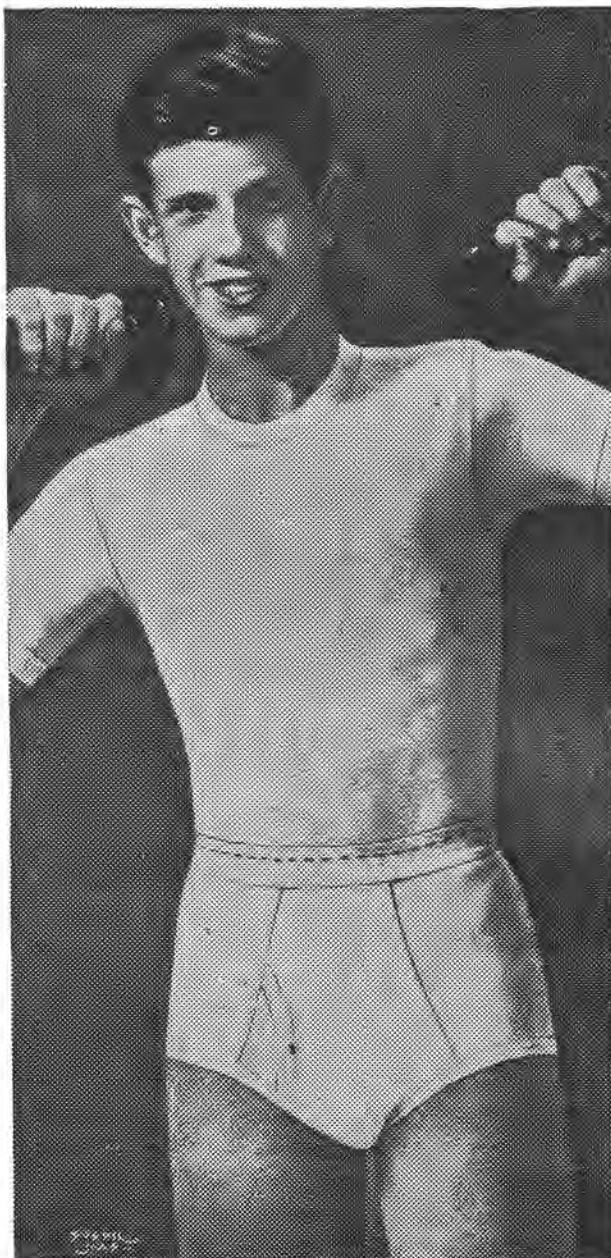
ইচ্ছাপুরাণ

সতীকান্ত গুহ

ছবি এঁকেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী

গরমের ছুটির পর সবে স্কুল খুলেছে। হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষা শুরু হতে সপ্তাহখানেক বাকি। জানুয়ারি মাস থেকে শুরু করে প্রায় ছ'টা মাস মা-সরস্বতীর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই ছিল না। সবে পড়ার বইগুলো উলটে-পালটে দেখছি। কোনো ভরসাই পাচ্ছি না। বিকেলে একপশলা বৃষ্টি হয়ে একখানা ঝকঝকে নীল আকাশ বার হয়ে পড়েছে। কিন্তু নিজের ভিতর তাকাতে গিয়ে দেখছি যে-অন্ধকার সেই-অন্ধকার। পরীক্ষার দুশ্চিন্তা একটা জমাট কালো মেঘের মতো মন জুড়ে থমথম করছে।

আমার যখন এই অবস্থা, কপাট ঠেলে হুড়মুড় করে ছক্কু একটা ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলো। আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বললো, 'কী রে! শুয়ে শুয়ে কী ভাবছিস? ওদিকে অঘোর শিকদারের বাড়িতে গল্পের আসর বসছে!"

বিশ্বাস হল না। হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষার মুখে অঘোর শিকদার গল্পের আসর বসাবেন, এ যে ঘোর অসম্ভব ব্যাপার! কারণ লেখাপড়া আগে, গল্প পরে, এ কথা অঘোর শিকদার গোড়াতেই আমাদের বলেছিলেন। কিন্তু ছক্কুর মুখ দেখে তার কথা অবিশ্বাস করা সম্ভব হল না। সে হাঁপাচ্ছে। আনন্দে উত্তেজনায় তার চেহারাই বদলে গিয়েছে।

আমি মুখে বললাম, 'এ কিন্তু ভারি অন্যায়! পরীক্ষার দুর্ভাবনায় মারা যাচ্ছি। এই সময়ে গল্পের আসর বসিয়ে আমাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া!'

মুখে বললাম বটে, কিন্তু আধ মিনিটের ভিতর আলনা থেকে একটা শার্ট নিয়ে মাথায় গলিয়ে দিয়ে বললাম, 'চল।'

ছক্কু ও আমি সারাটা পথ প্রায় ছুটে অঘোর শিকদারের বাংলোয় পৌঁছলাম। মালী ফটক খুলতে খুলতে বললো, 'খোকাবাবুরা শিগগির যাও। আর সবাই এসে গিয়েছে। গল্প শুরু হল ব'লে।'

সেদিন গল্পের আসর বারান্দায় না বসে ভিতরে লাইব্রেরি-ঘরে বসেছে। একদিকে দেয়াল বরাবর বিশাল তক্তপোষে ফরাস পেতে দেওয়া হয়েছে। ফরাসের ফকফকে শাদা চাদরের উপর দুধের মতো দাড়ি-গোঁফে সাজানো যাত্রার নারদমুনির মতো তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আড় হয়ে বসেছেন অঘোর শিকদার। আমাদের ক্লাবের ছেলেরা তাঁকে ঘিরে আধখানা চাঁদের মতো বসেছে। আমি ও ছক্কু যেতেই অঘোর শিকদার সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, 'এসো এসো। তোমাদের দু'জনের অপেক্ষায় ছিলাম।'

তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে মুখ যথাসম্ভব গম্ভীর করে বললেন, 'তোমাদের হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষার মুখে গল্পের আসর ডাকা উচিত হয়নি। কিন্তু শখ করে ডাকিনি। একটা গল্প প্রায়ই এসে আধখানা ধরা দিয়ে সরে পড়ছে। আজ প্রায় পুরোপুরি ধরা দিয়েছে। বলে না ফেললে আর কোনোদিন ধরা নাও দিতে পারে। মন দিয়ে শোনো। তোমাদের হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষার ব্যাপারে কাজে লেগে যেতে পারে।'

সৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি শক্তি কার বা কিসের জিজ্ঞাসা করলে তোমরা কেউ বলবে পাথরের, কেউ বলবে আগুনের, জলের, কেউ বলবে বাতাসের, এমনি আরো অনেক কিছুর। কিন্তু আসলে শক্তি হচ্ছে ইচ্ছার। ইচ্ছার চেয়ে বড় শক্তি সৃষ্টিতে নেই। ইচ্ছার অভাবে পাথর ইস্পাত জল বাতাস, কোনো কিছুই কিছু নয়। হয় প্রকৃতির নয় প্রাণীর ইচ্ছায় এদের ভিতর শক্তি এসে যায়। পাথরে ইস্পাতের ঘা না পড়লে পাথর ভাঙে না। আগুনে ইস্পাত না দিলে ইস্পাত গলে না। কিন্তু পাথরে কে ইস্পাতের ঘা দেবে? আগুনে-কে ইস্পাত গলাবে? হয় প্রকৃতি, নয় প্রাণী। কেন দেবে? কারণ প্রকৃতির ও প্রাণীর ইচ্ছা আছে যা আর কারো নেই। প্রাণীর ইচ্ছা বলতে আমি মানুষের ইচ্ছাই বুঝি। মানুষের ইচ্ছা দু'রকম। সাধারণ ও অসাধারণ। সাধারণ ইচ্ছার বেলায় আয়োজন ও সাজ-সরঞ্জাম দরকার। যেমন বাগান করতে গেলে মাটি কোপাতে হয়। অসাধারণ ইচ্ছার বেলায় কখনো কখনো এমন হয়—কোনো কিছুরই প্রয়োজন হয় না। ইচ্ছার জোরে শূন্য মাঠে একটা গোটা রাজধানী চোখের পলকে আলোবাতাসের ভিতর থেকে বার হয়ে আসে। ইচ্ছার হুকুমে অক্ষৌহিণী সৈন্য এক নিমেষে হুজুরে হাজির হয়।

(আমরা কয়েকজন, যারা বিজ্ঞান পড়ি, অঘোর শিকদারের এ কথায় মুচকি হেসে দিলাম, তা অঘোর শিকদারের চোখ এড়ালো না।)

তোমাদের কেউ কেউ ভাবছো এসব গল্পকথা। কিন্তু অসাধারণ ইচ্ছা যে গল্পকথা নয় তার চূড়ান্ত প্রমাণ আমি ও আকবর বাদশা।

(আমাদের ভিতর মুখ চাওয়া-চাওয়ি শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিছু গ্রাহ্য না করে অঘোর শিকদার তাঁর গল্পের রথ টেনে চললেন।)

প্রতি বছরের মতো সেবারও পুজোর ছুটিতে জয়পুরে মামাবাড়ি যাচ্ছি। সঙ্গে শিবমামা। মামার বন্ধু, এই সুবাদে মামা। যে-বছর সময়ের ফাটলের ভিতর দিয়ে আমাদের ট্রেনটা সোজা রানী পদ্মিনী ও আলাদিন খিলজির কাল-এর চিতোরে চলে গিয়েছিল তার পরের বছরের ঘটনা।

আগ্রায় সন্ধ্যায় ট্রেন থামতে শিবমামা উসখুস করতে শুরু করলেন। পরে, ট্রেনের কামরায় আর কেউ শুনতে না পায়, কানে কানে বললেন, 'কী রে, আগ্রায় নেমে দুটো দিন কাটিয়ে যাবি?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?'

শিবমামা বললেন, 'দুটো দিন শখ মিটিয়ে তাজমহল দেখা যাবে।'

আমি বললাম, 'তাজমহল তো দু'বছর আগেই দেখেছি।'

শিবমামা গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু পরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কখন দেখেছিস? দিনে, না রাতে?'

আমি বললাম, 'রাতে দেখবো কেন? দিনে দেখেছি। খুব ভালো করে দেখেছি।'

শিবমামা বললেন, 'খুব দেখেছিস! তাজমহল কেউ কখনো দিনে দেখে নাকি? দেখতে হয় চাঁদনী রাতে।'

শহরের খবর কোনো সময় মনে এল না।

শিবমামা বললেন, 'শাজাহান তাজমহল তৈরি করেছিলেন জ্যোছনা রাতের জন্য। চাঁদের আলোয় দেখলে তবেই তাজমহল ঠিকঠাক দেখা যায়।'

আমি বললাম, 'মামাকে না জানিয়ে—'

বাধা দিয়ে শিবমামা বললেন, 'মামার ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। সে ভার আমার।'

তখন আগ্রাশহরে এখনকার মতো শৌখীন হোটেল ছিল না। তাজমহলের এক মাইলের ভিতর এক মেমসায়েবের একটা হোটেল ছিল। তখনকার আন্দাজে হোটেল হিসেবে বেশ নাম ছিল। আমরা একটা এক্কায় লটবহর চাপিয়ে হোটেলে এসে উঠলাম।

পেট পুরে সায়েবি ডিনার খেয়ে শিবমামার ভাবান্তর হল। বললেন, 'কী রে, আজই দেখবি, না আজ রাতে হাত-পা ছড়িয়ে একটু আরাম করে ঘুমিয়ে নিয়ে কাল ধীরে-সুস্থে দেখবি?'

আমি বললাম, 'তুমি যা ভলো বোঝো।'

শিবমামা বললেন, 'তাহলে শুয়ে পড়। কাল কতক্ষণ জাগতে হয় কে জানে!'

পরদিন চাঁদের আলোয় তাজমহল নতুন করে দেখবো এই চিন্তা মনে নিয়ে যখন ঘুমোতে গেলাম তখন রাত দশটাও হয়নি। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল ছিল না। থাকবার কথাও নয়। হঠাৎ জেগে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা নিদারুণ অস্বস্তিতে মন ভরে গেল। বলে বোঝানো যায় না। আমার ত্রিসীমানায় শিবমামা ছাড়া কেউ নেই। শিবমামা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, অথচ স্পষ্ট মনে হল কে যেন আমাকে টানছে। অদ্ভুত আশ্চর্য এই টান আমার শরীর ও মন দখল করে নিচ্ছে। আমি ভয় পেলাম। শিবমামাকে ডাকতে গেলাম। গলা দিয়ে আওয়াজ বার হল না।

প্রচন্ড টানে আমি পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগোলাম। এ-টান ঠেকাবার সাধ্য আমার নেই। থামবো তার উপায় নেই। জলের তলার যে-সর্বনাশা চোরা টানে মানুষ মাঝ সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, সেইরকম ভয়ঙ্কর টান। কখন আমি দরজা খুলে বার হলাম, কখন ফটক খুলে পথে নামলাম, সবই দেখলাম, বুঝলাম। কিন্তু বাধা দিতে পারলাম না। শেষে বুঝলাম বাধা দেবার ইচ্ছেটুকু পর্যন্ত নেই। কে যেন আমার ইচ্ছা পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে।

চাঁদের আলোয় আগ্রা শহরটা বড় অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল চাঁদের আলো চুঁয়ে চুঁয়ে জমে গিয়ে শহরটা তৈরি হয়েছে। আলোয় ভাঁটা পড়লে শহরটা নিভে গিয়ে মিলিয়ে যাবে। আমার মনে হচ্ছিল নিত্যকার চোখেদেখা পৃথিবীর ভিতর যেন আর-একটা পৃথিবী আছে। সেই পৃথিবীতে আমি যেন আগ্রাশহরের একটা যাদু এলাকায় এসে গিয়েছি। বাড়িঘর পথঘাট চাঁদের আলোভরা আকাশ যেন একটা মস্তবড় স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের কোনো একটা কপাট খুলতে চলেছি। কী দেখবো কে জানে!

পথ চলছিলাম ঠিকই। কিন্তু একটা ঘোরের ভিতর। হঠাৎ সেই ঘোরটা কেটে গেল। আমি পুরোপুরি জেগে উঠলাম। বুকটা ধক্ করে উঠলো। দেখলাম চাঁদের আলোয় চারদিকে বান এসেছে। আর তারই ভিতর আকাশের তলায় জ্যোছনায় নরম সুন্দর সাতরাজার ধন তাজমহল। ফুরফুরে বাতাসে যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। জোরে ফুঁ দিলে পাখির পালকের মতো আকাশে উঠে ছায়াপথে মিলিয়ে যাবে।

দূরে কোথাও রাত একটার ঘণ্টা বাজলো। এত রাতে কী আশ্চর্য কারণে আমি তাজমহলে একা ভেবে একটু ভয় হল। ঠিক সেই সময়ে আমার মনে হল আমি তাজমহলে একা নই।

জ্যোছনার ভিতর থেকে একটি মানুষ বার হয়ে এলেন। থিয়েটারে যেমন দেখেছি, বাদশাহি চালে একটু সম্মুখে ঝুঁকে
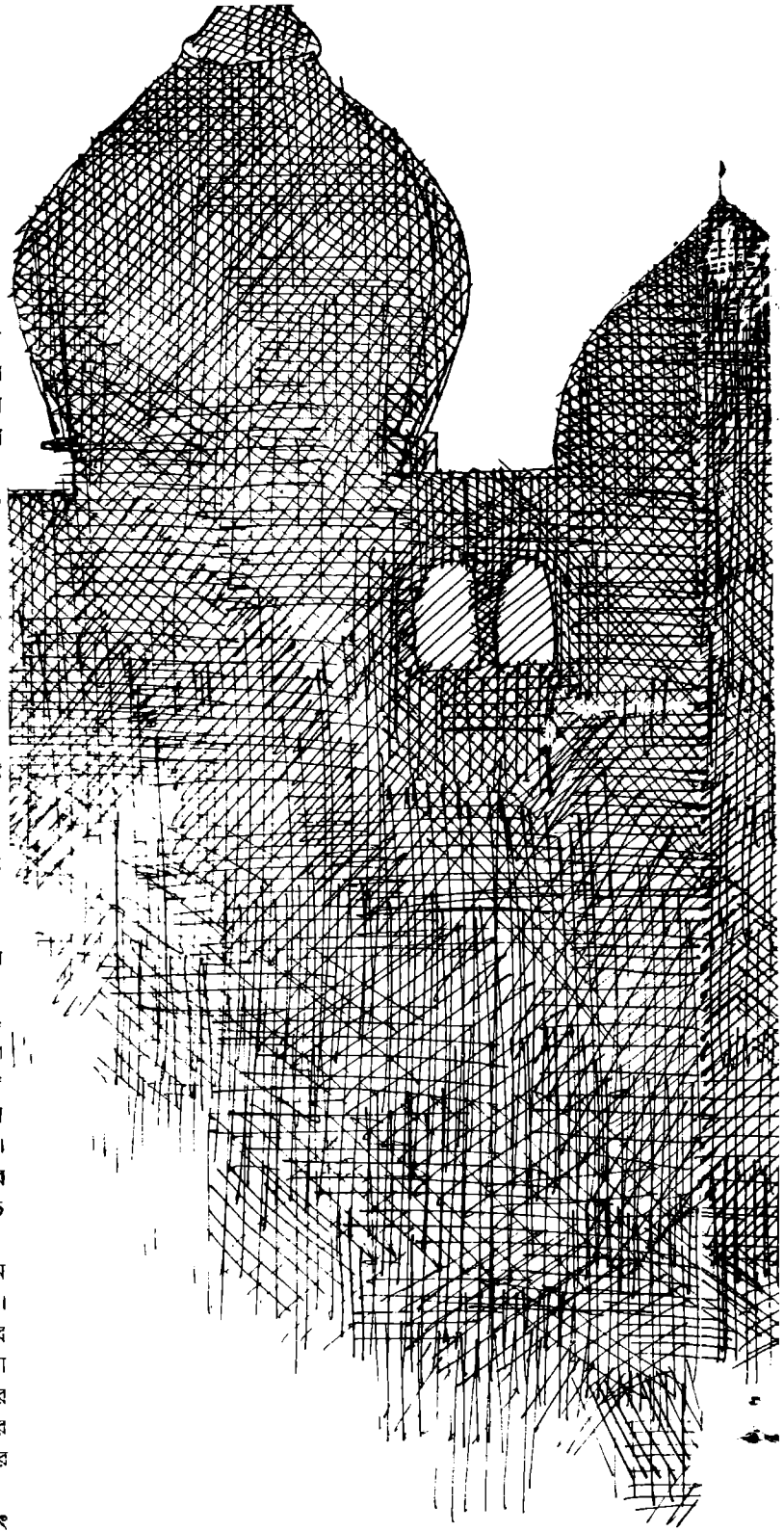
হাঁটতে হাঁটতে আমার দিকে এলেন। পরণে মসলিন ও সাটিনের জেবদাজোব্বা। মাথায় উষ্ণীষ। মাঝখানে একটা মস্ত হীরে ঝকঝক করছে। আমার একেবারে সম্মুখে এসে মুখ তুলে তাকালেন। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আমাকে চেনো?'

একটা ঢোক গিলে বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি শায়েনশা আকবর বাদশা।' বলে আমি রীতিমতো দরবারি কায়দায় তাঁকে কুর্নিশ করলাম।

আকবর বাদশা খুশি হলেন। হেসে বললেন, 'কী করে এত সহজে চিনলে বলো তো?'

আমি বললাম, 'ইতিহাসের বইয়ে আপনার ছবি যে একবার দেখেছে সে-ই চিনবে।'

আকবর মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'হল না। আমাকে চিনেছো অন্য কারণে। ইতিহাসের ছবি দেখে নয়। কিন্তু আশ্চর্য, নিজেকে চিনতে পারোনি। আমার সভায় এতকাল কাটালে, এত নাম কিনলে, অথচ আজ নিজেই নিজেকে চিনতে পারছো না?'

আমি আর-একবার ঢোক গিললাম। বললাম, 'আজ্ঞে।'

আকবর একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তখন তোমার কথায় কী চটক ছিল! মুখে খই ফুটতো। এত আজ্ঞে-আজ্ঞে করতে না।'

আমি মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ক্রমে আকবরের বিরক্তি ভাবটা কেটে গেল। হেসে আদর করে আমার কাঁধে একটি হাত রেখে বললেন, 'বীরবল! তুমি নিজেকে চিনতে পারছো না?'

আমি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললাম, 'আমি বীরবল? তা হলে অঘোর শিকদার কে?'

আকবর বললেন, 'তুমিই। হিন্দুস্থান ইংরেজের অধীন হবার পর তোমার অবনতি হয়। ফলে তুমি অঘোর শিকদার হয়ে জন্মেছো। কিন্তু আসলে তুমি হচ্ছো রসিকচূড়ামণি বীরবল।'

আমি বললাম, 'আজ্ঞে জাহাঁপনা—'

আকবর বললেন, 'স্রেফ জাহাঁপনা, আজ্ঞে কেন?'

আমি বললাম, 'আজ্ঞে না বললে আমার ঠাকুরদা ভীষণ চটে যেতেন। ফলে এই বদ অভ্যাস হয়েছে। গোস্তাকি মাফ করবেন জাহাঁপনা।'

আকবর বেজায় খুশি হয়ে বললেন, 'এই তো! কথায় বীরবলী ঢং এসে গিয়েছে।' বলে আদর করে খুব জোরে মাথাটা ধরে নেড়ে দিলেন। মনে হল আমার সামনেটা পিছনে, পিছনটা সামনে এসে গেল।

আকবর আমাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখছিলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'তুমি এসেছো, খুশি হয়েছি। কিন্তু তোমাকে দেখে খুশি হতে পারিনি। বীরবলের কী তাগড়াই চেহারা ছিল। তুমি এরকম একটা টিকটিকির মতো হয়েছো কেন?'

আমি বললাম, 'জাহাঁপনা, একে তো কলকাতার ছেলে, তার উপর এখনো ষোলো বছর বয়েস হয়নি।'

আকবর বললেন, 'ষোলো বছর হয়নি তো কী হয়েছে! আমাদের মুলুকে বারো-তেরো বছর বয়েসে একটা মোষের মতো শরীর হয়।'

আমি বললাম, 'জাহাঁপনা, দুধে ভেজাল, সব-কিছুতে ভেজাল। শরীর হবে কী করে?'

আকবর চিন্তিত হয়ে বললেন, 'তা অবশ্য ঠিক বলেছো। যা হোক, এবিষয়ে পরে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এখন হাতের কাজটা সারা যাক। বোসো।'

কোথায় বসবো ইতস্তত করছি, আকবর ধমক দিয়ে বললেন, 'বসে দেখোই না!'

আমি মনে মনে 'জয় দুর্গা' বলে বসে পড়লাম। ভেবেছিলাম তাজমহলের বাঁধানো পথে পড়ে গিয়ে চোট খাবো। কোত্থেকে মখমলে-মোড়া নরম গদি সমেত একটা সিংহাসন জ্যোছনার ভিতর থেকে বার হয়ে এল। আমি মহা আরামে বসে দেখি আকবর বাদশাও তাঁর বিখ্যাত বাদশাহি তখ্‌তে বসেছেন। আমাদের পায়ের তলায় পুরু সমরকন্দের গালিচা। সম্মুখে শ্বেত পাথরের মেঝের উপর দু-গেলাস আঙুরের রস।

আকবর বাদশা বললেন, 'গলাটা ভিজিয়ে নাও। অনেক কথা আছে।' আকবর একটা গেলাস তুলে নিয়ে চুমুক দিলেন। আমিও আমিরী চালে আঙুরের রস খেতে শুরু করলাম।'

আকবর বাদশা বললেন, 'জয়পুরে মামাবাড়ি যাচ্ছিলে। না গিয়ে আগ্রায় নামলে। সেখানেও শেষ নয়। মাঝরাতে তাজমহলে একেবারে আকবর বাদশার কাছে হাজির। কী করে এ-ব্যাপার সম্ভব হল বুঝতে পেরেছো বীরবল?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ জাহাঁপনা!'

আকবর বললেন, 'খুলে বলো।'

আমি বললাম, 'টানে।'

আকবর বললেন, 'কিসের টানে?'

আমি বললাম, 'বোঝাতে পারবো না। একটা সাংঘাতিক টান আমাকে ঘুমের ভিতর থেকে হোটেলের বিছানা থেকে টেনে এনেছে। জীবনে এত জোরে কেউ বা কোনোকিছু কখনো আমাকে টানেনি।'

আকবর বাদশা মুচকি হাসলেন। বললেন, 'ইচ্ছার টান৷ যার-তার ইচ্ছার নয়, আকবরের বাদশাহী ইচ্ছার টান।'

আমি বললাম, 'ইচ্ছার? ইচ্ছায় কী হয়? আমি তো ইচ্ছে করে করে হয়রান হয়েছি। তবু তো অঙ্কের পরীক্ষায় কখনো চল্লিশের বেশি পেলাম না।'

আকবর হেসে বললেন, 'সাধে কি তুমি বীরবল! তোমার কথায় কথায় রসিকতা। শোনো বীরবল! ইচ্ছা হচ্ছে দেশলাইয়ের মতো। শুধু থাকলেই হল না, জ্বালাতে হবে। আজ যে তুমি এখানে, তা হচ্ছে আমার ইচ্ছার টানে। আমার ইচ্ছার টানে প্রথম তোমার শিবমামা আগ্রা স্টেশনে নামবার মতলব আঁটেন। কিন্তু আমার আসল লক্ষ্য তুমি। আমার ইচ্ছার টানে তুমি ভয়কাতুরে অঘোর শিকদার আজ মাঝরাতে একা তাজমহলে হানা দিয়েছো। তুমি তোমার বিছানা থেকে, আমি আমার কবর থেকে।'

কবর কথাটা শুনে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হবার মতো হল। কিন্তু আকবর বাদশার ইচ্ছার জোরেই হয়তো সে-ভাবটা কেটে গেল। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম যে আকবর বাদশা খুব সম্ভব একটা জলজ্যান্ত ভূত এ-সন্দেহ হওয়া সত্ত্বেও আমার মনে বিন্দুমাত্র ভয় নেই। বরং ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম, 'জাহাঁপনা, আপনি এতক্ষণ আমাকে বীরবল বলে মেনে নিয়ে হঠাৎ আমাকে ভয়কাতুরে অঘোর শিকদার বলছেন। আসলে আমি কে?

আকবর গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আসলে তুমি বীরবল। আমার কাছে না আসা পর্যন্ত অঘোর শিকদার ছিলে। যেমন আমি আসলে আকবর বাদশা। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত আমি ছিলাম একটি বাদশাহী ভূত।' একটু থেমে আকবর বললেন, 'আসল কথায় আসা যাক। অর্থাৎ ইচ্ছার ব্যাপারটায়। অবশ্য এই ইচ্ছার ব্যাপারটার ষোলো আনা বাহাদুরি আমার নয়। আমাকে দিয়েই ব্যাপারটা শুরু, কিন্তু আমার কানে মন্ত্র দিয়েছিলেন এক যোগী।

'ইনি হিন্দু না মুসলমান বুঝবার উপায় ছিল না। গেরুয়া রঙের আলখাল্লা পরতেন আর সমানে ফার্সি ও সংস্কৃত বলতেন। যখনই মন খারাপ হতো কিংবা বিপদে পড়তাম, সিপাই-সান্ত্রীর পাহারা এড়িয়ে আমার সম্মুখে হাজির হতেন।

'একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সাধুজী! আপনাকে যে আমার দরকার কী করে টের পান? মনে করতে না করতেই এসে

হাজির হন!'

যোগী বললেন, 'না এসে উপায় কী আকবর! তোমার ইচ্ছার টানে আসতেই হয়। তুমি জানো না আকবর তোমার ভিতর কী প্রচণ্ড ইচ্ছা কাজ করছে। তুমি যে এত বড় বাদশা তার মূলে তোমার ইচ্ছা। ঐ ইচ্ছা না থাকলে নবাব বাদশাদের ভিড়ে তোমাকে খুঁজে পাওয়া যেত না।'

'সাধুজীর একথা কাজে-কর্মে থেকে-থেকেই মনে হতো। রাতে শোবার সময় আমার ভিতরের ইচ্ছাকে মনে মনে কুর্নিশ জানাতাম। কিন্তু সময় কারো অপেক্ষায় বসে থাকে না। সেই সঙ্গে মৃত্যু। আমার শেষ সময় যখন ঘনিয়ে এল, সকলের চোখ ও কান ফাঁকি দিয়ে সাধুজী আমার বিছানার পাশে এলেন। সকলকে ফাঁকি দিয়ে গোপনে কথা বললেন।

'সাধুজীর মুখে আমার নাম শুনে চোখ মেললাম। বললাম, সাধুজী চললাম। কিন্তু মরার আগে একটা দুশ্চিন্তা থেকে গেল।

'সাধুজী বললেন, কিসের দুশ্চিন্তা? হিন্দুস্থান জুড়ে তোমার জয়জয়কার। তোমার নামে কাফেরে-যবনে এক ইঁদারায় জল খায়।

'আমি বললাম, দুশ্চিন্তা এই, আমি সরে পড়বার পর এ পাট পালটে না যায়। সারাজীবন লড়াই করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রাজ্যশাসন করে, শত্রুমিত্র সকলকে কাছে টেনে এনে, হিন্দু-মুসলমানকে সমান চোখে দেখে আমি বড় হয়েছি। কিন্তু আসল কাজে ফাঁকি দিয়ে চটকদার কাজে ও কথায় কেউ যদি ফন্দি এঁটে আমার চেয়ে বড় হয়, আমার কী দশা হবে ভেবে মনে শান্তি পাচ্ছি না।

'সাধুজী বললেন, তোমার ইচ্ছার জোরে তুমি তাদের সব ফন্দি ভণ্ডুল করে দেবে।

'আমি বললাম, কিন্তু মরে গেলে আমার তো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। ইচ্ছা খাটাবো কী করে?

'সাধুজী বললেন, শরীরটাই শুধু থাকবে না। তুমি থাকবে। মূর্খেরা যাকে ভূত বলে, তোমার সেই ভূত থাকবে।

'আমি বললাম, যাকে চোখে দেখা যায় না সেই রকম কিছু?

'সাধুজী হেসে বললেন, কিছু বলছো কাকে আকবর? শরীর বাদে সেই তো সব।

'সাধুজীর কথায় আমার মনে শান্তি ফিরে এল। আমি নিশ্চিন্ত মনে মারা গেলাম।'

এ কথা বলে আকবর বাদশা জ্যোছনা রাতের এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, 'নিজের কথায় নিজেরই গা ছমছম করছে। একটু কাছে সরে এসো বীরবল। তাতে যদি একটু সাহস পাই।'

আকবর বাদশার হুকুম অমান্য করার সাহস হলো না। আমি মনের ভয় মনে চেপে রেখে তাঁর আর-একটু কাছে সরে এলাম।

আকবর বললেন, 'গোরস্থানে নিজের কবরে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় ক'শো বছর ঘুমিয়ে ছিলাম হিসেব ছিল না। হঠাৎ একদিন আমার টনক নড়লো। জেগে পড়লাম। বুঝলাম আমার বিরুদ্ধে রটনা শুরু হয়ে গিয়েছে। আমাকে মজিয়ে দু-চারটি বাদশাকে আমার চেয়ে বড় প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে। একদল বইয়ের পোকা, যাদের পণ্ডিত বলা হয়, তাদেরও ক'জন এ-ব্যাপারে আমার শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।

'প্রথমটা আমি দমে গেলাম। কিন্তু আমার ইচ্ছার কথা মনে হতেই বুকে বল পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছার খেলা শুরু হল। ইচ্ছা করলাম, বীরবল যেখানেই থাক অবিলম্বে আগ্রায় আসুক।'

আমি বললাম, 'এই ইচ্ছে কখন করেছিলেন জাহাঁপনা?'

আকবর বললেন, 'আজ সন্ধ্যায়।'

আমি বললাম, 'কী আশ্চর্য! আজ সন্ধ্যায় জয়পুরে যাবার পথে শিবমামা আমাকে তাজমহল দেখার উস্কুনি দিয়ে আগ্রা স্টেশনে নেমে পড়লেন।'

আকবর বাদশা গোঁফের ফাঁকে মুচকি হাসলেন। বললেন, 'তারপরই ইচ্ছা করলাম দুনিয়ার সব সেরা ইমারতে আমার সঙ্গে বীরবলের দেখা হোক। ফলে তুমি ও আমি কশো বছর বাদে চাঁদনী রাতে তাজমহলে সলাপরামর্শ করছি।'

একবার তাজমহলের দিকে তাকিয়ে 'আঃ' বলে তারিফ করে আকবর বললেন, 'কী ইমারতই না বানিয়েছে শাজাহান! সাধ হয় এখানে বসে পেয়ালা পেয়ালা আঙুরের রস খাই আর ফার্সি গজল লিখি।'

আমি বললাম, 'কিন্তু তাতে কি শত্রুদের রটনা থামানো যাবে?'

আকবর বললেন, 'ঠিক বলেছো। তার জন্য ফন্দি-ফিকির দরকার। দুষ্ট লোকে কী রটাচ্ছে জানো?' রাগে আকবর বাদশার চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। বললেন, 'রটাচ্ছে শাজাহান আমার চেয়ে বড় বাদশা কারণ সে তাজমহল বানিয়েছে। আমি যেন কিছুই বানাই নি। যা বানিয়েছি না বানালে শাজাহান তাজমহল বানাতো কী দিয়ে? আরো কী বলছে জানো?'

আমি বললাম, 'না জাহাঁপনা।'

আকবর বাদশা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'বলছে ঔরংজেব আমার চেয়ে ভালো। শাদাসিধে ভাবে থাকতো, আমার চেয়ে অনেক বেশি লড়াই করেছে। আচ্ছা বীরবল, লড়াই আমিই বা কী কম করেছি! ক'টা হেরেছি, কটা জিতেছি? কমই হেরেছি। ঔরংজেব যেখানে কারণ নেই সেখানেও লড়েছে। ক'টা জিতেছে বলো?'

আমি বললাম, 'এসব তো ইতিহাসের ব্যাপার!'

আকবর বললেন, 'ইতিহাস না ছাই! সব রটনা আর ধাপ্পা! আমার সঙ্গে লাগতে এলে সুবিধে হবে না। ইচ্ছার প্যাঁচে তুর্কিনাচন নাচিয়ে ছাড়বো। ইতিহাসের দফা রফা করবো।'

আমি বললাম, 'কী করে কী করবেন বুঝতে পারছি না জাহাঁপনা।'

আকবর বললেন, 'রাত না পোহাতে ইতিহাস বদলে দেবো। পৃথিবী জানবে তাজমহল শাজাহান বানায়নি, আমি বানিয়েছিলাম। আমি যে-ক'টা লড়াই হেরেছি তা আসলে হেরেছে ঔরংজেব। যে-ক'টা লড়াই জিতেছি তা বাদেও ঔরংজেবের জেতা লড়াইগুলোও আমিই জিতেছি।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কী করে এই অসম্ভব সম্ভব করবেন?'

আকবর গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ইচ্ছার টানে। তোমাকে কি অমনি টেনে এনেছি? পৃথিবীশুদ্ধ লোক জানে তুমি মরে গেলেও মিথ্যে বলবে না। তোমাকে দিয়ে একটা ফর্দ সই করিয়ে নেবো। তাতে এইসব বিষয়ের উল্লেখ থাকবে।'

আমি প্রমাদ গণলাম। সত্যিই যদি আমি বীরবল হয়ে থাকি তাহলে এই পাপকর্ম করার পর নরকেও আমার স্থান হবে না। কিন্তু এ কর্ম না করলে আকবর বাদশারও মান রক্ষা হয় না। হঠাৎ মাথায় একটা ফন্দি গজালো। বললাম, 'জাহাঁপনা! ঐতিহাসিক হিসেবে আমার নাম-যশ নেই। আমি ইয়ার্কির জন্য বিখ্যাত। লোকে মনে করবে ফর্দটা আগাগোড়া ইয়ার্কি।'

আমার কথা শুনে আকবর বাদশা মুষড়ে পড়লেন। বললেন, 'তুমি বিশ্বাসী বন্ধু। ব্যাপারটা ফাঁস করে দেবে না এই ভেবে তোমাকে ডেকেছি। তুমি যে ঐতিহাসিক নও এ কথা মনেই হয়নি। এখন কী করা যায়?'

আমি বললাম, 'ইচ্ছার টানে আবুল ফজলকে আনুন। ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁকে সবাই মানে। আবুল ফজল আপনার কথা মতো একটা ফর্দ সই করে দিলে কেউ টুঁ-শব্দটি করতে সাহস পাবে না।'

আকবর বাদশাকে চিন্তিত মনে হল। বললেন, 'বুঝলাম। কিন্তু তুমি হচ্ছো আমার ইয়ার। তোমাকে যা বলতে পারি আবুল ফজলকে তা বলি কী করে? যা কড়া মেজাজের লোক। চটেমটে ইতিহাস থেকে আমার নামটাই না কেটে বাদ দিয়ে দেয়?' তারপর কী ভেবে আমাকে বললেন, 'আমার হয়ে তুমিই বরং আবুল ফজলকে বলো। আমি ইচ্ছার টানে এক্ষুনি তাকে নিয়ে আসছি।'

আমি কিন্তু কিন্তু করে বললাম, 'জাহাঁপনা, আমার সম্বন্ধে আবুল ফজলের কোনোকালে ভালো ধারণা ছিল না। আমাকে আপনার ভাঁড় বলে দুয়ো টিটকিরি দিতো। আমি কথাটা পাড়লে ভাঁড়ামি মনে করে এই সং প্রস্তাবটা হেসে উড়িয়ে না দেয়।'

আকবর বললেন, 'তুমি তো হাঙ্গামা বাধালে দেখছি বীরবল!'

আমি বললাম, 'হাঙ্গামা যাতে না বাধে সেই চেষ্টাই করছি জাহাঁপনা। আমাদের পাড়ায় আমার চেনাশোনা একটি তুখোড় লোক আছে। তার সব ক'টা ব্যবসা বিশ বছর ধরে লোকসানে চলছে। অথচ ছ'খানা ন-দশতলা বাড়ি তুলেছে আর চারটে পেল্লায় গাড়ি কিনেছে। নামটা বলছি। আপনি ইচ্ছা করুন। সব শক্তি দিয়ে ইচ্ছা করুন। লোকটা আবুল ফজলকে পটিয়ে-পাটিয়ে এখানে হাজির করবে।'

আমি নামটা বলতে আকবর বাদশা চোখ বুজে দম নিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে ইচ্ছা করলেন। জ্যোছনা ফেটে চোখের পলকে দুটি লোক বার হয়ে এল। একজন গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি-পরা আমাদের পাড়ার তুখোড় চৌকস লোকটি। আর একজন পৃথিবীবিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজল। আবুল ফজলের মুখখানা রাগে থমথম করছে। আকবর বাদশাকে বললেন, 'কী যে করেন জাহাঁপনা! আমার কেতাবে আপনাকে যতটা সম্ভব উঁচুতে তুলেছি। আর কী চান?'

আমাদের পাড়ার তুখোড় লোকটি আবুল ফজলের কানে কানে কী বললো। আবুল ফজল রেগে মেগে তাকে একটা ধাক্কায় মাটিতে ফেলে দিলেন। লোকটি হা-হা করে উঠে আবুল ফজলের হাত মালিশ করতে লাগলো, ক্রমে ক্রমে আবুল ফজলের মুখের ভাব নরম হল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আকাশের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বিড়বিড় করে কী বললেন। তারপর আকবর বাদশাকে বললেন, 'বান্দাকে আদেশ করুন জাহাঁপনা। ফর্দ তৈরি করে সই করে দিই।'

ফর্দ তৈরি হল। আবুল ফজল সই দিয়ে আকবর বাদশার হাতে দিতে যাবেন। কোথা থেকে একখানা হাত বার হয়ে এসে ফর্দটা ছিনিয়ে নিলো।

জ্যোছনা ফেটে দুঃস্বপ্নের মতো ঔরংজেব বার হয়ে এসেছেন। তাঁর মুখে ভ্রূকুটি। দু-চোখে ঝড়ের আকাশের বিদ্যুৎ।

আকবর বাদশা ঘাবড়াবার লোক নন। ঔরংজেবকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বললেন, 'তুমিই ঔরংজেব? ভালোয়-ভালোয় কাগজটা দিয়ে দাও। গুরুজনের সম্মুখে নম্র হতে শেখো।'

ঔরংজেব মাথা নুইয়ে সেলাম জানিয়ে বললেন, 'বেয়াদবি মাফ করবেন বড় ঠাকুরদা। কাগজ তো পাবেনই না, গোরস্থানে ফেরার পথও আপনার বন্ধ।'

আকবর বললেন, 'কারণ?'

ঔরংজেব জবাব দিলেন, 'কারণ আপনি আমার ও আমার বাবা শাজাহানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন।'

আকবর বললেন, 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে গিয়েছি। আমার

বিরুদ্ধে যে-হীন রটনা চলছে তা বন্ধ করতে গিয়ে যা করা উচিত করেছি।'

ঔরংজেব দাঁত কড়মড় করে বললেন, 'আপনি, বলতে লজ্জা হয় বড় ঠাকুরদা, আপনি কাফেরেরও অধম। বীরবলের মতো আড্ডাবাজ লোকের সংগে না মিশলে আপনার পেটের কাবাব হজম হয় না।' ঔরংজেব আমার দিকে কটমট করে তাকালেন। আমি আবুল ফজলের পিছনে লুকোবার চেষ্টা করলাম।

আদ্দির পাঞ্জাবি-পরা তুখোড় লোকটি ঔরংজেবের সম্মুখে এসে বললো, 'কত চাই বলুন দাদা। ব্যাপারটা মিটিয়ে দিচ্ছি।'

ঔরংজেব লোকটির দিকে রেগে মেগে তাকাতে সে 'ওরে বাবা' বলে দু'পা পিছিয়ে এল।

ঔরংজেব আকবরের দিকে তাকিয়ে কঠোর স্বরে বললেন, 'বড় ঠাকুরদা, আমি আপনাকে বন্দী করতে বাধ্য হলাম।' ঔরংজেবের মুখের কথা না ফুরোতে যমদূতের মতো দুটি সান্ত্রী আকবর বাদশার দু'পাশে এসে দাঁড়ালো। একজনের হাতে হাতকড়া।

আকবর বাদশা গ্রাহ্য না করে বললেন, 'তোমার বদ অভ্যাস, যখন-তখন যাকে খুশি বন্দী করতে চাও। অত শখ হলে, যাও. শাজাহানের গোরস্থানে গিয়ে আর-একবার তাকে বন্দী করো। ইতিহাসে যেমনটি আছে তেমনটি কাজ করো।'

এবার ঔরংজেব হাসতে শুরু করলেন। বললেন, 'আজ রাতে ইতিহাস তো আপনি মানছেন না বড় ঠাকুরদা। ইতিহাসে কোথায় আছে যে চাঁদনী রাতে আকবর বাদশা তাজমহলে ইয়ার জুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন? আপনার আমলে কি তাজমহল ছিল?'

আকবর বললেন, 'ইতিহাসে না থাক, আছে আমার ইচ্ছায়।'

ঔরংজেব বললেন, 'ইচ্ছা আপনার একচেটিয়া সম্পত্তি নয় বড় ঠাকুরদা। ইচ্ছা আমারও আছে। না হলে আজ রাতে ক'শো বছর বাদে এখানে এলেম কী করে?'

আকবরের চোখে-মুখে সন্দেহ ঘনালো। ঔরংজেবের দিকে তাকিয়ে তাঁকে দেখতে দেখতে বললেন, 'এ কথা আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল। ইচ্ছামন্ত্র কার কাছ থেকে পেয়েছো?'

ঔরংজেব বললেন, 'সাধুজীর কাছ থেকে।'

আকবর বাদশা এ কথায় যেন চুপসে গেলেন। মাথায় হাত দিয়ে সিংহাসনে বসে পড়লেন। বললেন, 'বীরবল! সাধুজী এ কাণ্ড করবেন স্বপ্নেও ভাবিনি। তোমাদের শিবঠাকুর যেমন সকলকেই বর দিয়ে বেড়ান, সাধুজীও দেখছি যাকে তাকে ইচ্ছামন্ত্র দিয়ে বসে আছেন। এখন কী করি? নাতির ছেলের হাতে বন্দী হওয়া কপালে ছিল!'

হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। আমি আকবর বাদশার কানে ফিশফিশ করে বললাম, 'জাহাঁপনা, ইচ্ছাকে ঠেকাতে হয় অনিচ্ছা দিয়ে। আমি বীরবল আপনাকে অনিচ্ছার মন্ত্র দিচ্ছি। প্রাণপণ করে অনিচ্ছা করুন। দেখবেন সব ভোজবাজির মতো মিলিয়ে যাবে। আপনি আপনার গোরস্থানে ফিরে গিয়ে দিব্যি আরামে ঘুমোবেন।'

আকবর বাদশা গোঁফের ফাঁকে মুচকি হেসে 'জয় বীরবল!' বলে দম নিয়ে অনিচ্ছা করলেন।

অঘোর শিকদার থামলেন।

আমরা সমস্বরে বললাম, 'তারপর?'

অঘোর শিকদার বললেন, 'ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কাটাকাটি হয়ে আগে যেমন ছিল তেমনি রইলো। আকবর বাদশা. আবুল ফজল, ঔরংজেব, আমাদের পাড়ার তুখোড় লোকটি—সবাই জ্যোছনায় মিলিয়ে গেলেন। প্রথমে মেলালেন ঔরংজেব। তা দেখে আকবর বাদশা আহ্লাদে আটখানা হয়ে নাচতে সুরু করেছিলেন। কিন্তু অনিচ্ছামন্ত্রের এমনই জোর, সকলেরই মতো আকবর বাদশাও হাওয়া হয়ে গেলেন।'

ছক্কু বললো, 'আপনি? আপনি মাঝরাতে তাজমহলে একা পড়ে রইলেন?'

অঘোর শিকদার বললেন, 'তাজমহলে পড়ে থাকবো কেন? ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কাটকুট হবার ফলে হোটেলের বিছানায়ই পড়ে রইলাম।'

আমরা আড়চোখে অঘোর শিকদারকে দেখছিলাম। বুঝতে চেষ্টা করছিলাম অঘোর শিকদার তামাসা করছেন, না সত্যিকথা বলছেন।

অঘোর শিকদার বললেন, 'আজ আসর এখানেই শেষ। ইচ্ছায় জোর দিয়ে হাফ-ইয়ারলির জন্য তৈরি হও। দেখবে পরীক্ষা কত সহজ হয়ে যায়।'

বার হতে হতে আমি একবার পিছন ফিরে তাকালাম। আমার সংগে চোখাচোখি হতে অঘোর শিকদার চোখ টিপলেন। কেন চোখ টিপলেন সারাটা পথ ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরলাম। এখানে বলে রাখি সেবার সত্যিই আমরা সবাই হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষায় ভালোভাবে পাশ করেছিলাম। কারণ হয়তো এই, মাস্টারমশাইদের কারোই অনিচ্ছামন্ত্রটি জানা ছিল না।

RAAS/B/156 Ben

১২ বছর ও তারো বেশী বয়েসের ছেলেমেয়েরা তাদের সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লেনদেন করতে পারে

সত্যি রাজপুত্র

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ছবি এঁকেছেন মদন সরকার

একটা প্রকাণ্ড সাদা রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে স্কুলের সামনে। মাথায় টুপি আর খাকী রঙের পোশাক পরা দু'-জন লোক বসে আছে ভেতরে। ওদের মধ্যে একজন ড্রাইভার আর একজন পাহারাদার।

স্কুল ছুটির পর দলে দলে বেরিয়ে এলো ছেলেরা। অনেকেই ছুটতে ছুটতে চলে এলো রাস্তায়। এক্ষুনি বাসে খুব ভিড় হয়ে যাবে, তাই ওরা আগে উঠতে চায়। অনেকে হেঁটে হেঁটে গল্প করতে করতে চৌরঙ্গি পর্যন্ত গিয়ে তারপর সেখান থেকে ট্রামে কিংবা বাসে উঠবে। কয়েকটি ছেলের জন্য বাড়ি থেকে গাড়ি আসে বটে, কিন্তু ঐ সাদা গাড়িটার মতন বড় আর দামী গাড়ি আর একটাও নেই।

সাদা গাড়ির পাহারাদারটি আগেই নেমে দাঁড়িয়েছে। মলয় স্কুলের গেট থেকে বেরুতেই সে গাড়ির দরজা খুলে ধরে সেলাম করলো। মলয় পেছনের সীটে বসলো একা। কয়েকটি ছেলে তখন চিনেবাদামওয়ালাকে ঘিরে ধরে বাদাম আর ছোলা কিনছে। মলয় সেই দিকে তাকাতেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

স্কুল থেকে মলয়দের বাড়ি বেশী দূরে নয়। একটাই মাত্র রাস্তা। মলয় এই রাস্তাটুকু চিনে অনায়াসেই একলা হেঁটে হেঁটে আসতে পারে। কিন্তু মলয় কক্ষনো রাস্তা দিয়ে একলা হাঁটে না। নিষেধ আছে। কখনো বাড়ির খুব কাছাকাছি কোনো দোকানে এলেও সঙ্গে ঐ পাহারাদারটা আসে।

বাড়ির গেট দিয়ে গাড়ি ঢুকে এসে থামলো ঢাকা বারান্দার নীচে। পাহারাদারটি সঙ্গে সঙ্গে নেমে আবার দরজা খুলে ধরেছে। মলয়ের বই খাতার ব্যাগটি সেই নিয়ে নিল। মলয় সিঁড়ি দিয়ে গট গট করে উঠে গেল ওপরে। চওড়া কাঠের সিঁড়ি, তার ওপর কার্পেট পাতা।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই দোতলায় প্রকাণ্ড টানা বারান্দা। আগাগোড়া শ্বেত পাথরের। সেই বারান্দার একেবারে শেষের ঘরটা মলয়ের। যদিও অন্য ঘরগুলোও এখন ফাঁকা—সে যে কোনো ঘরেই ইচ্ছে হলে থাকতে পারে।

সিঁড়ির কাছেই শুয়েছিল মলয়ের নিজস্ব কুকুর টোটো। কুকুরটার রঙ কুচকুচে কালো, লোমগুলো ভেলভেটের মতন চকচকে। মলয়কে দেখেই টোটো উঠে দাঁড়ালো। মলয় তার মাথায় একবার হাত বুলিয়েই চলে গেল নিজের ঘরে। টোটোও তার পেছনে পেছনে এলো।

নিজের ঘরে এসে কালো মেহগনির চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে জুতো খুলতে লাগলো। জুতো আর মোজা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো ঘরের কোণে। শার্টটাও খুলে ফেললো গা থেকে। টোটো মাথা ঘষতে লাগলো মলয়ের পায়ে।

প্রায় তক্ষুনি দরজার পাশ থেকে একজন দাসী জিজ্ঞেস করলো, ছোটবাবু, জলখাবার এখানে নিয়ে আসবো?

মলয় বললো, হ্যাঁ, এখানেই নিয়ে এসো—

মলয় হাত মুখ ধুয়ে ফিরে আসবার আগেই দাসী এসে ট্রেতে করে একটা গেলাস ভর্তি দুধ আর প্লেটে দুটো সন্দেশ, আঙুর, একটা ছোট কেক এনে রাখলো টেবিলের উপর।

মলয় সেদিকে তাকিয়েই বললো, আমি আজ দুধ খাবো না!

দাসী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। মলয় প্রত্যেকদিনই দুধ খাওয়ার বিষয়ে আপত্তি করে। প্রত্যেকদিনই শেষ পর্যন্ত খেতে হয় অবশ্য।

মলয় বললো, দুধ নিয়ে যাও। খাবো না!

দাসী খুব মৃদু গলায় বললো, চকলেট মিশিয়ে দিয়েছি তো।

চকলেট দিয়ে খেতে আমার আরও বিচ্ছিরি লাগে।

মলয় তবু গেলাসটা তুলে নিয়ে এক চুমুকে ঢকঢক করে দুধটা শেষ করলো, গেলাসটা ঠক করে রাখলো টেবিলে। মুখখানা এমন বিকৃত করলো যেন কেউ তাকে নিম পাতার রস খাইয়েছে। দাসী ততক্ষণে মলয়ের জুতো আর মোজাগুলো গুছিয়ে রাখছিল। মলয় জলখাবারের প্লেটের দিকে হাত বাড়িয়েও হাত সরিয়ে নিল। বিরক্ত হয়ে বললো, রোজ রোজ এই এক খাবার? তোমাদের আর কিছু মনে পড়ে না।

দাসী বললো, কী খাবেন, বলুন?

অন্য কিছু নিয়ো এসো।

ঠাকুরকে লুচি ভেজে দিতে বলবো?

না। লুচি আমার বিচ্ছিরি লাগে! আমি চিনেবাদাম খাবো।

চিনেবাদাম তো নেই। কাজু বাদাম আছে, নিয়ে আসছি।

মলয় বললে, কাজু বাদাম আর চিনেবাদাম কি এক হলো? তুমি চিনেবাদাম চেনো না? যাও কিনে নিয়ে এসো—সঙ্গে ছোলাভাজা আর ঝাল নুন আনবে।

দাসী একটু বাদেই ঘুরে এসে বললো, সরকারবাবুকে দেখতে পেলুম না। কোথায় যেন গেছেন!

মলয় বললো, সরকারবাবু নেই বলে আর কেউ চিনেবাদামও আনতে পারবে না?

কে পয়সা দেবে?

মলয়ের খুব রাগ হয়ে গেলেও সে আর চেঁচামেচি করলো না। মলয়ের কাছে একটাও পয়সা থাকে না। যখন যা দরকার হয়, সরকারবাবুর কাছ থেকে চেয়ে নিতে হয়।

সে দাসীকে জিজ্ঞেস করলো, হারুর মা, তোমার কাছে পয়সা নেই? তুমি আমাকে ধার দাও না! এখন তোমার পয়সা দিয়ে চিনেবাদাম নিয়ে এসো, পরে সরকারবাবু এলে...

হারুর মা বললো, আমি কোথায় পয়সা পাবো ছোটবাবু? আমার কাছে তো পয়সা থাকে না!

মলয় একটা দুঃখের নিশ্বাস ফেললো। তার যদিও খুব খিদে পেয়েছিল, তবু কিছু খেল না। খাবারের প্লেটটা ঠেলে দিয়ে বললো, থাক্। আমি কিছু খাবো না। এসব নিয়ে যাও!

হারুর মা তবু একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। কিন্তু মলয় আজ কিছুতেই খাবে না প্রতিজ্ঞা করেছে। জোর করে তো আর খাওয়ানো যাবে না তাকে।

হারুর মা তখন বললো, দুপুরে পিসীমণি ফোন করেছিলেন। সাতটার সময় এসে আপনাকে বেড়াতে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন।

মলয় মুখ গোঁজ করে বললো, আমি আজ বেড়াতে যাবো না।

হারুর মা আবার বললো, পিসীমণি ঠিক সাতটার সময় আসবেন।

তারপর সে খাবারের প্লেটটা তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছিল, দরজার কাছ থেকে মলয় আবার তাকে ডেকে বললো, আজ মায়ের কোনো চিঠি এসেছে?

হারুর মা বললো, আমি তো জানি না।

কেন, জানো না কেন? যাও, দেখে এসো—চিঠি থাকলে এক্ষুনি নিয়ে আসবে আমার কাছে।

মলয় অবশ্য মনে মনে জানে, আজ তার কোনো চিঠি থাকবে না। কালকেই মায়ের কাছ থেকে চিঠি এসেছে—পরপর দু-দিন কি আর সে চিঠি পাবে?

মলয়ের মা দার্জিলিং-এ গেছেন। প্রত্যেক বছর গ্রীষ্মকালে তিনি দার্জিলিং থাকেন। মলয়ের স্কুলে এখনো ছুটি হয়নি বলে সে এখানে আছে। কয়েকদিন পর ছুটি হলেই চলে যাবে। মলয়ের বাবা কী একটা কাজে বিলেত গেছেন। বাবা বেশী চিঠি লিখেন না—মাঝে মাঝে ছবির পোস্টকার্ড পাঠান।

বাড়িতে মলয় এখন একা। ঠিক একা নয় অবশ্য। ওপর তলায় তার দাদা-বউদি থাকেন। কিন্তু বউদি প্রত্যেকদিন দুপুর বেলা বাপের বাড়ি চলে যান। মলয়ের দাদা অনেক রাত্তিরে তাঁকে নিয়ে আসেন সেখান থেকে। বাপের ব্যাড়িতে বউদি প্রত্যেকদিন যাবেনই। সেখানে অনেক লোকজন আছে—এই ফাঁকা বাড়ি বউদির ভাল লাগে না। রাত্তিরে দাদা-বউদি ফেরার আগেই মলয় ঘুমিয়ে পড়ে। তাই দাদা-বউদির সঙ্গে সকালবেলা একটু সময় ছাড়া মলয়ের দেখাই হয় না।

মলয়ের পুরো নাম কুমার মলয়েন্দ্রনাথ দেব চৌধুরী। যদিও স্কুলের খাতায় সে তার নাম লেখে শুধু মলয় দেব, তবু বন্ধুরা অনেক সময় তাকে রাজপুত্তুর, রাজপুত্তুর বলে রাগাতে চেষ্টা করে।

মলয়রা সত্যি সত্যি এক সময় সোনাপুরা বলে একটা জায়গার রাজা ছিল। এখন যদিও এই দেশে আর একটাও রাজা নেই, সবাই প্রজা—তবু লোকে তাদের রাজা বলে। পাড়ার লোকে তাদের বাড়িটাকে বলে রাজবাড়ি। মলয়ের ঠাকুর্দা রাজা অনন্ত দেবের নামে কলকাতায় একটা রাস্তাও আছে।

মলয় খুব কম বয়েসে একবার মাত্র সোনাপুরায় বেড়াতে গিয়েছিল। তখন অনেকেই তাকে ছোট রাজকুমার বলে ডেকেছে। তার বাবাকে দেখলেই সবাই মাটিতে ঝুঁকে পড়ে নমস্কার করেছে। সোনাপুরা জায়গাটা ছিল ভারী সুন্দর। এখন আর মলয়রা সেখানে যায় না। সেখানে তাদের পুরোনো কালের একটা পেল্লায় বাড়ি ছিল—সেই বাড়িটা সরকার থেকে নিয়ে নিয়েছে। এখন সেখানে কলেজ।

মলয়দের কলকাতার বাড়িটাও যেমন পুরোনো, তেমনি বড়। একতলায় অনেক অন্ধকার অন্ধকার ঘর অনেক কাল ধরে তালাবন্ধই পড়ে আছে। বাড়ির সামনে আর পেছনে বাগান—এক সময় অনেক ভালো ভালো গাছ ছিল। এখন বিশেষ কিছু নেই। ফোয়ারাটা দিয়ে জল পড়ে না। গেটের সামনে দুটো পাথরের সিংহ ছিল, তার একটার নাক ভেঙে গেছে। তাদের এ বাড়িতে অনেকদিন ধরে নতুন কোনো জিনিসপত্র কেনা হয় নি। চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমারি—এসবই অন্তত পঞ্চাশ ষাট বছরের পুরোনো। যেমন মোটা মোটা, তেমনি ভারী। প্রত্যেক ঘরেই এখনো ঝাড়লণ্ঠন রয়েছে, যদিও ইলেকট্রিকের আলোই জ্বলে।

মলয়ের বাবা এ বাড়ির তেমন আর যত্ন নেন না। তিনি আজকাল অধিকাংশ সময়েই দিল্লিতে কিংবা বিলেতে থাকেন। কলকাতায় আসেন মাত্র বছরে একবার-দুবার। মলয়ের মায়ের হাঁপানির অসুখ আছে। অসুখ বাড়লেই তিনি পুরীতে তাঁদের আর একটা বাড়িতে চলে যান। সমুদ্রের হাওয়ায় তিনি ভালো থাকেন। গরমকালে অবশ্য দার্জিলিং-ই তাঁর পছন্দ। স্কুল ছুটি হলেই মলয় চলে যায় মায়ের কাছে।

এত বড় বাড়িটা খাঁ খাঁ করে। মলয়ের দেখাশুনো করবার জন্য ঝি, চাকর, দরওয়ান আছে—নিচতলায় সরকারবাবু এবং আরো কয়েকজন কর্মচারী আছে। কিন্তু কেউ কখনো জোরে কথা বলে না বলে কারুর গলার আওয়াজ শোনা যায় না। মাঝে মাঝে শুধু শোনা যায় মোটরগাড়ি ঢুকবার আর বেরুবার শব্দ।

এক সময় মলয়দের এ বাড়িতে দু-খানা ঘোড়ার গাড়িও ছিল। ঘোড়াগুলো নেই, গাড়িগুলো ভাঙাচোরা অবস্থায় আজও পড়ে আছে গ্যারেজের পেছন দিকে। খুব ছেলেবেলায় মলয় ঐ গাড়িগুলোর মধ্যে বসে খেলা করতো। এখন আর একা একা খেলতে তার ভালো লাগে না।

মলয়ের কোনো বন্ধু নেই। সে রাজবাড়ির ছেলে বলে পাড়ার অন্য ছেলেরা তার সঙ্গে মেশে না। মিশবেই বা কী করে, মলয়কে তো কখনো একলা একলা বাড়ি থেকে বেরুতে দেওয়া হয় না। মলয়ের স্কুলের কয়েকজন ছেলে মাঝে মাঝে এ বাড়িতে আসে কিন্তু মলয় কক্ষনো তাদের বাড়িতে যায় না। এ রকম করলে কি আর বন্ধুত্ব হয়! মলয়ের বাবার কড়া নির্দেশ আছে, তাকে যেন যেখানে সেখানে যেতে দেওয়া না হয়। সেইজন্য মলয় অনুনয় বিনয় করলেও সরকারবাবু কিছুতেই শুনবেন না। আর দু-বছর পরেই মলয় স্কুল শেষ করে কলেজে ভর্তি হবে। মলয় ঠিক করেছে, তখন সে যেখানে ইচ্ছে বেড়াবে একলা একলা।

জামা কাপড় বদলে মলয় তার কুকুর টোটোকে নিয়ে বাগানে ঘুরতে লাগলো। কুকুরটা এক এক সময় দারুণ লাফালাফি শুরু করে দেয়। মলয় একটু বকুনি দিলেই আবার পায়ের কাছে এসে কুঁই কুঁই শব্দ করে।

খানিকটা বাদেই গেটের কাছে গাড়ির শব্দ হলো। মলয়ের পিসীমণি এসেছেন। মলয় ভেবেছিল, সেদিন আর পিসীমণির সঙ্গে বেড়াতে যাবে না। কিন্তু মুখে সে কথা বলতে পারলো না।

মলয়ের পিসীমণি কুচবিহারের রাজবাড়ির বউ। প্রায় পয়তাল্লিশ বছর বয়েস হলেও তিনি এখনো দারুণ সুন্দরী। এত বেশী সুন্দরী যে দেখলে ভয় করে। অসম্ভব ফর্সা রং, নাকটা টিকোলো, মাথার চুল খুব আঁট করে বাঁধা—মুখে একটা রুক্ষ ভাব। শুধু যখন তিনি হেসে ফেলেন, তখন তাঁকে ভালো দেখায়। কিন্তু তিনি হাসেন এত কম।

মলয় পায়ে বাড়ির চটি পরে ছিল। এই চটি পায় দিয়ে সে বাইরে যাবে না। তাই বললো, পিসীমণি, আমি জুতো পরে এক্ষুনি আসছি!

মলয় দৌড়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল। সেই সময় তার দাসী হারুর মা গাড়ির কাছে এসে ফিসফিস করে কী যেন বলে গেল পিসীমণিকে। পিসীমণি বললেন, আচ্ছা, ঠিক আছে।

মলয় এসে গাড়িতে ওঠবার পর পিসীমণি বললেন, আজ কোন্ দিকে যাবি? গঙ্গার ধারে?

মলয় মাথা নেড়ে বললো, হ্যাঁ।

মলয়ের মা যখন কলকাতায় থাকেন না, তখন পিসীমণি মাঝে মাঝে তার দেখাশুনো করতে আসেন। সন্ধেবেলা গাড়ি করে একটু ঘোরান। সেই ভিক্টোরিয়া বা ইডেন গার্ডেন বা গঙ্গার ধার। সব একঘেয়ে জায়গা। কলকাতায় ছোটদের সিনেমা এলে তাতেও নিয়ে যান পিসীমণি। এখন সে রকম কিছু নেই।

খানিকটা দূরে যাবার পর পিসীমণি জিজ্ঞেস করলেন, আজ বিকেলে জলখাবার খাস নি?

মলয় একটু চমকে উঠলো। তারপর বুঝতে পারলো, নিশ্চয়ই হারুর মা বলে দিয়েছে।

সে বললো, না, খাইনি, খিদে নেই।

পিসীমণি বললেন, তা হলে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাবার দরকার নেই এখন। ডাক্তারের কাছে চল!

ডাক্তারের কাছে কেন যাবো? আমার তো অসুখ করে নি।

অসুখ না করলে খিদে পায় না কেন?

বাঃ, রোজ রোজই বুঝি খিদে পাবে? খিদের কি একদিনও ছুটি নেই?

পিসীমণি ঠোঁট ফাঁক করে একটুখানি হাসলেন। তারপর বললেন, না, খিদে আর ঘুমের একদিনও ছুটি নেই! ওরা ছুটি নিলেই ডাক্তারের কাছে যেতে হয়।

মলয় বললো, না, আমি ডাক্তারের কাছে যাবো না। আমি চিনেবাদাম খাবো।

পিসীমণি অবাক হয়ে বললেন, চিনেবাদাম?

মলয় বললো, হ্যাঁ। পিসীমণি, তুমি আমাকে পয়সা দেবে? আমার কাছে পয়সা থাকে না, আমি ইচ্ছে করলেও কিছু কিনতে পারি না। সব সময় সরকারবাবুকে বলতে হয়।

পিসীমণি বললেন, আমি চিনেবাদাম কিনে দিচ্ছি। পয়সা দেবো না। তোর যখন যা খেতে ইচ্ছে করবে, টেলিফোন করে আমাকে বলবি, আমি পাঠিয়ে দেবো।

গাড়ি এসে থামলো গঙ্গার ঘাটের সামনে। পিসীমণি ব্যাগ থেকে একটা দু-টাকার নোট বার করে ড্রাইভারকে বললেন, চিনেবাদাম কিনকে লে আও!

ড্রাইভার লম্বা এক সেলাম করে চলে গেল। একটু বাদে সে ফিরে এলো মস্তবড় এক ঠোঙা ভর্তি চিনেবাদাম নিয়ে।

অতবড় ঠোঙা দেখে হেসে ফেললেন পিসীমণি। হাসতে হাসতে বললেন, দেখো বুদ্ধি! দু-টাকা দিয়েছি, দু-টাকারই চিনেবাদাম কিনে এনেছে! এত কে খাবে?

এতগুলো চিনেবাদাম দেখে মলয়েরও হাসি পাচ্ছিল। তাদের ক্লাসের সব ছেলেকে খাওয়ানো হয়ে যেত ওগুলো দিয়ে।

পিসীমণি আগে নিজে একটা বাদাম তুলে নিয়ে বললেন, দেখি, টাটকা কি না!

ভেঙে মুখে দিলেন। বললেন, বাঃ, বেশ ভালোই তো। নে, খা যতগুলো পারিস।

দু-জনে মিলে চিনেবাদাম খেতে লাগলো কিছুক্ষণ।

একটু বাদে মলয় জিজ্ঞেস করলো, পিসীমণি, তুমি কখনো ফুচকা খেয়েছো?

পিসীমণি বললেন, ফুচকা? ফুচকা কী?

ঐ যে লোকেরা ভিড় করে খাচ্ছে। ছোট ছোট কচুরির মতন, ভেতরে তেঁতুলের জল দিয়ে খেতে হয়। আমাদের ক্লাসের অনেক ছেলে খায়। আমার কাছে তো পয়সা থাকে না, তাই খেতে পারি না।

পিসীমণি ভুরু কুঁচকে বললেন, ছিঃ, ওসব জিনিস খেতে নেই। এত বাদাম কিনে দিয়েছি, আবার ঐসব চাইছো কেন?

আমি তো চাইনি। শুধু জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কখনো খেয়েছো কিনা। আমি তো খাইনি।

ওসব খেতে নেই। রাস্তার নোংরা, ধুলো সব এসে পড়ে। ঐ সব খেলেই অসুখ হয়।

কিন্তু এত লোক যে খাচ্ছে? ওদের অসুখের ভয় করে না?

ওদের অভ্যেস হয়ে গেছে। শোন্, একটা কথা বলে দিচ্ছি। আমাদের বাড়ির কেউ কখনো রাস্তার লোকেদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কিছু খায় না। আমাদের বংশের একটা আলাদা সম্মান আছে, এটা মনে রাখবি।

ঐ ফুচকাওয়ালাটাকে যদি গাড়ির কাছে ডেকে আনি?

না! ওসব কথা আর ভাবতেই হবে না। সোনাপুরা রাজবাড়ির কোনো ছেলে মেয়ে এরকমভাবে কিছু খায় না কখনো।

কিন্তু সরকারবাবু যে বলেছেন আমাদের আর রাজ্য নেই, গভর্ণমেণ্ট নিয়ে নিয়েছে?

রাজা না থাকলেও রাজবাড়ির সম্মান ঠিকই থাকে।

এখানে আমাদের তো কেউ চিনতে পারবে না!

সেইজন্যই তো বলছি, তোমার ব্যবহার সব সময় এমন হবে, যাতে লোকে বুঝতে পারে, তুমি অন্যদের চেয়ে আলাদা। মনে

মলয় একটু বকুনি দিলেই আবার গায়ের কাছে এসে কুঁই কুঁই শব্দ করে।

থাকবে? সবার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করবে, কিন্তু বেশী মেলামেশা করবে না।

মলয় আর কিছু বললো না। চুপ করে রইলো। গঙ্গার ওপর দিয়ে হু হু করে হাওয়া ছুটে আসছে। অন্ধকারের মধ্যে দেখা যায় নৌকোগুলোর ফুটকি ফুটকি আলো।

ঠিক আটটার সময় বেড়ানো শেষ হয়ে গেল। পিসীমণি গাড়ি ঘোরাতে বললেন। মলয়ের মাস্টার মশাই এসে বসে থাকবেন বাড়িতে। সারা সপ্তাহে মলয়ের জন্য তিনজন মাস্টার মশাই আসে।

২
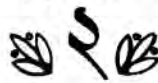
মলয়ের স্কুল বন্ধ হতে আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি আছে। ট্রেনের টিকিটও কাটা হয়ে গেছে তার জন্য। স্কুল ছুটি হলেই সে মায়ের কাছে দার্জিলিং-এ চলে যাবে।

আজ সকালেই মায়ের চিঠি এসেছে। মা লিখেছেন, দার্জিলিং-এ এখন বৃষ্টি সুরু হয়নি। কী চমৎকার ঠান্ডা। প্রায়ই কাঞ্চন-জঙ্ঘা দেখতে পাওয়া যায়। মলয়ের জন্য একজন সাহেব মাস্টার ঠিক করে রাখা হয়েছে। তিনি শুধু মলয়কে পড়াবেনই না। তিনি মলয়কে সঙ্গে করে কালিম্পং, সিকিম আরও অনেক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবেন। ওঁর সঙ্গে থেকে মলয়ের বেড়ানোও হবে

আর ইংরেজিটাও ভালো করে শেখা হবে।

কবে স্কুল ছুটির দিনটা আসবে—সেইজন্য মলয়ের মনটা ছটফট করছে। একা একা এত বড় বাড়িতে থাকতে তার একটুও ভালো লাগে না। পরশু দিন দাদা-বউদিও সিমলা চলে গেছেন বেড়াতে। দাদা অবশ্য যাবার আগে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুই একলা থাকতে পারবি তো? না হলে আমরা আর কয়েকটা দিন দেরি করে যেতে পারি।

মলয় তখন বলেছিল, না, না, আমার কোনো অসুবিধে হবে না। আমি ঠিক থাকতে পারবো।

কিন্তু কাল রাত্তিরে মলয়ের কিছুতেই ঘুম আসছিল না। মলয়ের অবশ্য ভূতের ভয় নেই, তবু মাঝ রাত্তিরে ফাঁকা বাড়িতে টুকটাক শব্দ শুনলেই কী রকম যেন মনে হয়। গেটে দু-জন দারোয়ান আছে, একতলায় সরকারবাবু, ঝি-চাকর-ড্রাইভার—অনেক লোকজন। তবু গোটা বাড়িতে তার নিজের লোক কেউ নেই—এটা ভাবলেই গা-টা কী রকম ছম ছম করে। মলয় বারবার বিছানা থেকে উঠে দেখেছে যে দরজা ঠিক বন্ধ আছে কিনা। কত গেলাস যে জল খেয়েছে তার ঠিক নেই।

পিসীমণিদের বাড়িতে ওঁদের গুরুদেব এসেছেন, তাই তিনি এখন খুব ব্যস্ত। ক-দিন ধরে পিসীমণি মলয়ের কাছে আসতে পারছেন না।

পিসীমণিদের গুরুদেব মস্তবড় একজন সাধু। তিনি সারা বছর হরিদ্বার থাকেন। বছরে শুধু একবার আসেন শিষ্যদের কাছে। তখন কী ভিড় হয় তাঁকে দেখবার জন্য। সেই সাধু এক মুঠো ধুলোকে গোলাপ ফুল করে দিতে পারেন। তাই দেখে তাঁর ভক্তরা কেঁদে ফেলে।

পিসীমণিদের আর একটা বাড়ি আছে বরানগর ছাড়িয়ে একটু দূরে। গুরুদেব সেই বাড়িতে এসে থাকেন। সেই বাড়ির সামনে রোজ প্রায় এক শো খানা মটর গাড়ি থেমে থাকে।

মলয় ক্লাসে বসে পড়াশুনো করছিল। এমন সময় ওদের ক্লাস টিচার ফাদার ডেভিড ওকে ডেকে পাঠালেন।

মলয় ফাদার ডেভিডের ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, মলয়, তোমার এক আণ্টি কি বরানগরের দিকে থাকেন?

মলয় হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনে একটু অবাক হলো। মুখে বললো, হ্যাঁ।

ফাদার ডেভিড বললেন, তোমার আণ্টি একটু আগে ফোন করেছিলেন। তোমার আণ্টির একজন গুরুদেব এসেছেন, তুমি জানো?

মলয় আবার বললো, হ্যাঁ।

সেই গুরুদেব তোমাকে দেখতে চেয়েছেন। তিনি তোমাকে আজকেই বিকেলে কী যেন বলবেন।

আমাকে? কী বলবেন?

ফাদার ডেভিড হেসে বললেন, কী বলবেন, তা তো আমি জানি না। গুরুদেবরা কী বলেন, তাও আমি জানি না। তবে, তিনি আদেশ করলে সঙ্গে সঙ্গে নাকি যেতে হয়। তোমার আণ্টি আমাকে অনুরোধ করেছেন, এক্ষুনি তোমাকে নিতে গাড়ি আসবে, তোমাকে পাঠিয়ে দিতে হবে। তুমি যাবে!

মলয় চুপ করে রইলো। পিসীমণি যখন ডেকেছেন, তখন তার যাওয়াই উচিত। কিন্তু তাদের স্কুল থেকে তো কেউ কখনো ছুটির আগে যেতে পারে না। ছুটি হতে তো অনেক বাকি।

ফাদার ডেভিড এমনিতে খুব ভালোমানুষ। কিন্তু পড়াশুনোয় একটুও ফাঁকি দেওয়া পছন্দ করেন না। কোনোদিন তো তিনি কারুকে আগে ছুটি দেন না।

ফাদার ডেভিড বললেন, স্কুল থেকে কারুর হঠাৎ চলে যাওয়া আমি পছন্দ করি না। কিন্তু গুরুদেবের ব্যাপার যখন, তখন আমার আপত্তি করা উচিত নয়। তুমি যেতে পারো।

মলয় বললো, ছুটির সময় আমাদের বাড়ি থেকে যে গাড়ি আসবে?

যিনি ফোন করেছিলেন, তিনি বললেন যে তোমাদের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে।

আমাকে কখন যেতে হবে?

ফাদার ডেভিডের ঘরের জানালা দিয়ে স্কুলের গেটের কাছটা দেখা যায়। সেইদিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ঐ যে দেখছি একটা গাড়ি এসে গেছে। তোমাকেই নিতে এসেছে মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, তুমি যাও।

মলয় ফাদার ডেভিডকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যাচ্ছিল, তিনি আবার ডেকে বললেন, মলয় শোনো! তুমি একটা কাজ করতে পারবে? তুমি তোমার খাতা পেন্সিল নিয়ে যাচ্ছো তো! তোমার আণ্টির গুরুদেব তোমাকে যা যা বলবেন, তুমি সব লিখে রাখবে খাতায়, বুঝেছো? কাল এসে আমাকে দেখাবে। গুরুদেবরা কী বলেন, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। এটাই তোমার আজকের হোম ওয়ার্ক। ঠিক আছে তো?

মলয় বললো, আচ্ছা!

মলয় তার বই খাতা নিয়ে গেটের সামনে চলে আসতেই পিসীমণির গাড়ির ড্রাইভার দরজা খুলে ধরে মলয়কে সেলাম করলো। এ গাড়িতেও একজন পাহারাদার আছে। পিসীমণিদের বাড়িতে অনেক গাড়ি। মলয় সব গাড়ি চেনেও না।

পাহারাদারটি বললো, ছোটবাবু, আপনাকে বউরাণীমা বরানগরে যেতে বলেছেন।

মলয় বললো, ঠিক আছে, আমি জানি। চলুন।

হুস করে গাড়ি ছেড়ে দিল। মলয় ভাবতে লাগলো, পিসীমণির গুরুদেব হঠাৎ তাকে দেখতে চেয়েছেন কেন? পিসীমণি নিশ্চয়ই কিছু বলেছেন তার সম্বন্ধে। সেই গুরুদেবকে গত বছর একবার মাত্র দেখেছে মলয়। বিরাট বড় দাড়ি, মাথা ভর্তি জটা। চোখ দুটো কী অসম্ভব জ্বলজ্বলে। দেখলেই ভয় ভয় করে।

গাড়িটা খুব জোরে ছুটছিল। শ্যামবাজার, টালা ব্রিজ, চিড়িয়া মোড় পেরিয়ে আসার পর হঠাৎ দেখা গেল সামনে এক জায়গায় রাস্তা একেবারে খুঁড়ে রাখা হয়েছে। সেখানে কয়েকটা গাড়ি এমন জট পাকিয়ে আছে যে যাওয়া মুস্কিল।

পাহারাদারটি ড্রাইভারকে একটু বিরক্ত হয়ে বললো, আঃ এই রাস্তায় এলেন কেন? এই রাস্তা ভীষণ খারাপ।

ড্রাইভার বললো, আমি ভেবেছিলাম, এ রাস্তাটা বোধহয় এতদিনে সারানো হয়ে গেছে।

এখন কী হবে? কোথা দিয়ে যাবেন? শুধু শুধু দেরী হয়ে যাচ্ছে।

ডান দিকে ঘুরে যাবো? ঐদিকে একটা ভালো রাস্তা আছে।

কিন্তু সে তো অনেক ঘুরে ঘুরে যেতে হবে। গুরুদেব অপেক্ষা করছেন। তাড়াতাড়ি যেতে হবে না? বাঁ দিকের রাস্তাটাই তো তাড়াতাড়ি যাওয়ার পক্ষে সুবিধে।

কিন্তু বাঁ দিকের রাস্তাটাও খুব খারাপ। ওদিক দিয়ে গেলে গাড়ি কিন্তু একদম আটকে যেতে পারে।

এরপর ড্রাইভার আর পাহারাদার নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে লাগলো। একজন বলে ডান দিকে যাবে, আর একজন বলে বাঁ দিকে। মলয় চুপ করে বসে শুনছে।

একটু পরে পাহারাদারটি মলয়কে জিজ্ঞেস করলো, ছোটবাবু, কোন্ দিক দিয়ে যাবো বলুন তো?

মলয় যখন শুনলো, বাঁ দিকের রাস্তাটা দিয়ে তাড়াতাড়ি হয় যদিও, কিন্তু সে রাস্তাটাও খুব খারাপ হয়ে আছে তখন সে বললো, তা হলে ডান দিক দিয়েই চলুন।

ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল ডান দিকে। একটু ফাঁকা রাস্তা পেয়েই বেশ জোরে ছুটতে লাগলো গাড়ি।

মলয় এর আগেও দু-তিনবার এসেছে পিসীমণিদের বরানগরের বাগান বাড়িতে। আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। আজ প্রায় এক ঘণ্টার বেশী সময় পার হয়ে যেতেও যখন গাড়ি

লোকটার হাত সরিয়ে দিয়ে ওকে একটা জোর ধমক দিতে চাইল মলয়।

সমান বেগে ছুটছে, তখন সে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লো। পিসীমণিও নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন। তাদের বাড়িতে কারুর কোথাও একটু দেরি হলেই সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তা ছাড়া গুরুদেব তক্ষুনি যেতে বলেছেন।

মলয় ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলো, এত দেরী হচ্ছে কেন? আর কত দূর?

পাহারাদারটিও বললো, সত্যিই অনেক দেরী হচ্ছে। ড্রাইভার সাহেব, আপনি রাস্তা ঠিক চেনেন তো?

ড্রাইভার আমতা আমতা করে বললো, মনে তো হচ্ছে ঠিকই যাচ্ছি। এদিককার রাস্তা ভালো করে আমি চিনি না।

ভালো করে রাস্তা চেনেন না। তা এদিকে এলেন কেন?

বাঃ, ছোটবাবুই তো ডান দিকে আসতে বললেন।

এই কথা শুনে মলয়ের খুব রাগ হলো। বাঁ দিকের রাস্তাটা খারাপ শুনেই তো সে ডান দিকের রাস্তার কথা বলেছে। তখন ড্রাইভারের বলা উচিত ছিল যে সে এদিকের রাস্তা চেনে না। তাদের নিজেদের বাড়ির কোনো ড্রাইভার এ রকম ব্যবহার করতো না।

সে বললো, গাড়ি থামিয়ে রাস্তায় কারুকে জিজ্ঞেস করে নিন।

কিন্তু সেখানে রাস্তার দু-পাশে মাঠ। বাড়ি ঘর নেই। কাকে জিজ্ঞেস করবে?

পাহারাদারটি বললো, চলুন, ঐ তো সামনে একটা দোকান আছে। ওখানে জিজ্ঞেস করা যাক।

দোকানটার কাছে গাড়ি থামিয়ে পাহারাদার আর ড্রাইভার দুজনেই নেমে গেল। সেখানে কী সব কথা বলতে বলতে তারা দুজনে দুটো পান কিনলো। ড্রাইভারটি একটি বিড়ি ধরালো। মলয় মুখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে। চাকর-বাকর বা ড্রাইভাররা যখন বিড়ি-সিগারেট খায়, তখন সেদিকে তাকাতে নেই।

একটু বাদে ওরা দুজনে ফিরে এসে বললো, রাস্তা ঠিকই আছে। আর দু-মাইল গেলে বাঁ দিকে একটা রাস্তা পাওয়া যাবে —সেটা দিয়ে গেলেই একেবারে সোজা—

কিন্তু গাড়ি খানিকটা দূরে যেতে না যেতেই নানা রকম বিশ্রী আওয়াজ করে আবার থেমে গেল। ড্রাইভর বললো, এই রে!

পাহারাদারটি জিজ্ঞেস করলো, কী হলো?

স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দেখছি!

পাহারাদারটি গম্ভীরভাবে বললো, আজ বউরানীমা, আমাদের ভীষণ বকবেন! এত দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ড্রাইভার বললো, আমার কি দোষ! গাড়ি খারাপ হলে আমি কী করবো!

পাহারাদার বললো, তা হলে কি আমার দোষ? শিগগির দেখুন, ঠিক করা যায় কিনা।

ড্রাইভার নেমে গিয়ে গাড়ির সামনের বনেট খুললো। পাহারাদারও তার পাশে দাঁড়ালো।

অন্যদিন এরকম কিছু হলে মলয়ের ভালোই লাগতো। অচেনা রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ার মধ্যে বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চার আছে। মলয় তো কখনো একা একা এসব জায়গায় এমনিতে বেড়াতে আসতো না। রাস্তার পাশেই একটা মস্তবড় পুকুর। মলয় গাড়ি থেকে নেমে অনায়াসেই পুকুরটায় ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে সময় কাটাতে পারতো।

কিন্তু আজ পিসীমণির কাছে পৌঁছোতে দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে সে খুব বিরক্ত হচ্ছে। পিসীমণি একটুতেই খুব রেগে যান। গুরুদেবকে অপেক্ষা করিয়ে রাখা হচ্ছে বলে আরও বেশী রেগে যাবেন আজ। একবার পিসীমণি রাগ করে ওঁদের বাড়ির সাতজন

চাকর আর ড্রাইভারকে একসঙ্গে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

ধমাস্ করে শব্দ হতেই মলয় চমকে তাকালো। ড্রাইভার গাড়ির বনেটটা ফেলেছে। পাহারাদার মলয়ের জানালার কাছে এসে বললো, যাক, ঠিক হয়ে গেছে। আর কোনো চিন্তা নেই!

ড্রাইভার নিজের জায়গায় ফিরে বসে স্টার্ট দিতেই গাড়ির ইঞ্জিন আবার শব্দ করে উঠলো। পাহারাদারটি কিন্তু পেছনের দরজা খুলে মলয়ের পাশে বসে পড়ে বললো, এবার খুব জোরে চালান তো! আর একটুও দেরী করা চলবে না।

তারপর পাহারাদারটি ফস্ করে একটা সিগারেট ধরালো।

মলয় ভুরু কুঁচকে তাকালো পাহারাদারটির দিকে। কোনো পাহারাদার কোনদিন পেছনের সীটে বসে না, সব সময় বসে ড্রাইভারের পাশে। তা ছাড়া, বাবুদের বাড়ির কারুর সামনে কক্ষনো এইভাবে সিগারেট ধরায় না। সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ মলয়ের খুব বিচ্ছিরি লাগে।

লোকটা আপনমনে সিগারেট টানতে টানতে এক দৃষ্টে দেখতে লাগলো মলয়কে। মুখখানা হাসি হাসি।

মলয় গম্ভীরভাবে হুকুমের সুরে বললো, সামনে গিয়ে বসুন।

লোকটি বললো, কেন ছোটবাবু আপনার অসুবিধে হচ্ছে? সামনে বড্ড গরম। সিগারেটটা ফেলে দিচ্ছি, তা হলে হবে তো?

সিগারেটটা জানালা দিয়ে ফেলে দিয়ে লোকটা পকেট থেকে একটা রুমাল বার করলো। সেটা মুখের সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে লাগলো।

রুমালটা যেমন ময়লা, তেমন তাতে বাজে গন্ধ। মলয়ের প্রায় বমি আসছে সেটা দেখে। সে বললো, আপনি সামনে গিয়ে বসুন বলছি! আমার ভালো লাগছে না।

লোকটা এবার হা-হা করে হাসলো। তারপর বললো, রুমালটা বড্ড ময়লা হয়ে গেছে, না? আচ্ছা, এটাতে সেন্ট ঢেলে দিচ্ছি একটু, খুব ভালো গন্ধ পাবেন।

সত্যি সত্যি সে পকেট থেকে একটা নীল রঙের শিশি বার করে কী খানিকটা ঢেলে দিল রুমালে। তারপর বললো, এবার গন্ধ শুঁকে দেখুন তো—

লোকটা হঠাৎ রুমালখানা জোর করে চেপে ধরলো মলয়ের নাকে।

ভয় পাওয়া কিংবা রেগে যাওয়ার বদলে মলয় অবাক হয়ে গেল খুব। তাদের বাড়ির কোনো ড্রাইভার বা পাহারাদার এরকম ব্যবহার করবে, এ যে অসম্ভব ব্যাপার। সবাই সব সময় সম্মান করে কথা বলে, খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়ায় না পর্যন্ত। আর এই লোকটা ঐ রকম নোংরা রুমাল তার নাকে চেপে ধরেছে!

লোকটার হাত সরিয়ে দিয়ে ওকে একটা জোর ধমক দিতে চাইলো মলয়। কিন্তু পারলো না। একটা তীব্র মিষ্টি গন্ধ তাকে যেন জোর করে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। মলয় কথা বলতে পারলো না, চোখ মেলে চেয়ে থাকতেও পারলো না। ঘুম...ঘুম...কি সুন্দর চমৎকার ঘুম!

মলয় এক পাশে কাৎ হয়ে ঢলে পড়তেই পাহারাদারটি তাকে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল সীটের ওপর। রুমালটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। পকেট থেকে পরিষ্কার এক টুকরো কাপড় বার করে বেঁধে ফেললো মলয়ের চোখ।

ড্রাইভারটি ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, বাঃ, একদম টু শব্দটিও করে নি দেখছি। অন্তত ঘণ্টা তিনেক ঘুমোবে তো?

পাহারাদার বললো, তা ঘুমোবে। জেগে উঠলেও ক্ষতি নেই!

মলয় যখন চোখ মেলে চাইলো, তখন সে দেখলো চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। প্রথমে সে ভাবলো, তখনও বুঝি সে ঘুমিয়ে আছে। তখন সে হাত নিয়ে এসে চোখ দুটো খুললো। চোখ দুটো যেন একটু জ্বালা জ্বালা করছে। মাথাতেও একটু ব্যথা।

এটা কোন্ জায়গা? মলয় কি স্বপ্ন দেখছে? অনেক সময় এরকম হয়। স্বপ্ন দেখতে দেখতেও মনে হয়, আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

মলয় নিজের গালে একটা চিমটি কাটলো। ব্যথা লাগছে তো, তা হলে স্বপ্ন নয়। আস্তে আস্তে উঠে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে ঝনাৎ করে একটা শব্দ হলো পায়ের কাছে। সেখানে হাত দিয়ে দেখলো, তার দু-পায়ে শেকলের মতন কী যেন বাঁধা রয়েছে। তার হাত দুটো খোলা, কিন্তু পা দুটো ছড়াতে পারছে না।

এসব কী ব্যাপার? এখানে সে এলো কী করে?

মলয়ের একটু একটু করে মনে পড়লো, সে পিসীমণির কাছে যাচ্ছিল। পাহারাদারটা তার নাকে একটা রুমাল চেপে ধরলো। তারপর ঘুম। পাহারাদারটা ও-রকম ব্যবহার করেছিল কেন?

তাহলে কি পাহারাদারটা তাকে চুরি করে এনেছে?

এই কথাটা মনে হতেই মলয়ের প্রথমে খুব আনন্দ হলো। কয়েকদিন আগেই সে একটা বইতে এ-রকম একটা গল্প পড়েছিল। তারই বয়েসী একটা ছেলেকে অনেকগুলো ডাকাত চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর কত সব সাংঘাতিক সাংঘাতিক মজার ব্যাপার হলো। শেষকালে একজন খুব চালাক ডিটেকটিভ একজন মিস্তিরি সেজে ঠিক খুঁজে বার করলো ছেলেটিকে। ডিটেকটিভকে ডাকাতরা ধরে ফেলে যখন মেরে ফেলতে যাচ্ছে—তখনই অনেক পুলিশ এসে ঘিরে ধরলো সারা বাড়ি। ডাকাতরা সব ধরা পড়ে গেল, ছেলেটা ফিরে গেল মা-বাবার কাছে।

এটা কি সত্যি সত্যি ডাকাতদের বাড়ি? মলয়কে বন্দী করে রেখেছে এখানে? তা হলে দারুণ মজা হবে তো! তার জীবনটা ছিল একদম একঘেয়ে। নিজে নিজে কোথাও যেতে পারতো না। এখন সে কত নতুন নতুন জিনিস দেখবে। ডাকাতরা কি মারবে তাকে? মারুক না। সব গল্পের বইতেই সে পড়েছে, শেষ পর্যন্ত ডাকাতরা ধরা পড়ে যায়। পিসীমণি যখন সব জানতে পারবেন, তখন নিশ্চয়ই খুব ভালো একজন ডিটেকটিভকে ঠিক করবেন। কিরীটী রায়কে ঠিক করলেই সবচেয়ে ভালো হয়। আর যদি অরণ্যদেব খবর পেয়ে যান, তা হলে তো কথাই নেই! অরণ্যদেবকেও দেখা হয়ে যাবে।

বেশ খুশী মনেই মলয় উঠে দাঁড়ালো। পায়ের শিকলে শব্দ হলো ঝন ঝন করে। পায়ে যখন শিকল টিকল বেঁধেছে—তখন বেশ বড় ডাকাত নিশ্চয়ই। ছোটখাটো ডাকাত হলে দড়ি দিয়েই বাঁধতো। হাত আর মুখ বাঁধে নি কেন? মলয় যদি খুব জোরে চিৎকার করে, তা হলে কি বাইরের লোক শুনতে পাবে?

ঘরটাতে এত অন্ধকার যে কিছুই দেখা যায় না। কোন্‌দিকে জানালা, কোন্‌দিকে দরজা? ঘরের মধ্যে যদি খাট কিংবা চেয়ার টেবিল থাকে—তা হলে হাঁটতে গেলেই ধাক্কা খেতে হবে। তবু মলয় সাহস করে কয়েক পা এগোলো। পায়ে শেকল বাঁধা থাকলেও তার এগোতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। সে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোচ্ছে।

খানিকটা যাবার পর একটা দেয়ালে কপাল ঠুকে গেল মলয়ের। বেশ জোরেই লেগেছে। এ ঘরে কি কোনো আলোর সুইচ নেই? এত অন্ধকার ঘরে মলয় জীবনে কখনো থাকেনি।

হাতড়ে হাতড়ে একটা দরজা খুঁজে পেল মলয়। দরজাটা তো বাইরে থেকে বন্ধ হবেই। সে দুম্ দুম্ করে দরজাটায় ধাক্কা দিতে লাগলো। বেশ কিছুক্ষণ ধাক্কা দেবার পরেও বাইরে থেকে কারুর সাড়া পাওয়া গেল না। এ বাড়িতে আর কেউ নেই নাকি? সে চেঁচিয়ে বললো, কেউ আছে? এখানে কেউ আছে? দরজা খোলো!

মলয় এত জোরে চিৎকার করেছিল যে তার নিজেরই কানে তালা লেগে যাবার মতন অবস্থা। এই ঘরটা সব দিক দিয়ে বন্ধ, তাই বাইরে আওয়াজ যাচ্ছে না। একটা ঘুলঘুলিও নেই বোধহয়—তা হলে বাইরের আলো একটু না একটু আসতো।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও কোনো ফল হলো না। মলয় অবসন্ন হয়ে মাটিতে বসে পড়লো। কটা বেজেছে এখন কে জানে! ক্রমশ

মলয়ের খুব খিদে পাচ্ছে। এরা কি তাকে খেতেও দেবে না নাকি?

বসে বসে মলয় চিন্তা করতে লাগলো, এখন কী করা যায়। তার বাড়িতে নিশ্চয়ই এতক্ষণে হৈ চৈ পড়ে গেছে। সবাই খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে। মলয়ের বাবা থাকেন বিলেতে, মা আছেন দারজিলিং। ওঁদের কাছে কি আজই খবর পাঠাবে? ডিটেকটিভ ঠিক করবে কে, সরকারবাবু না পিসীমণি? ডিটেকটিভের এখানে এসে পৌঁছোতে দু' তিন দিন অন্তত সময় লাগবে নিশ্চয়ই। এই ক'দিন সে কী খেয়ে থাকবে?

অনেকক্ষণ অন্ধকারে থাকলে চোখের দৃষ্টি অনেকটা সয়ে যায়। বুদ্ধিও একটু পরিষ্কার হয়। মলয় ভাবলো, এই ঘরে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও জানালা আছে। জানালা ছাড়া ঘর কি কেউ তৈরী করে? কারুকে বন্দী করে রাখার জন্যই শুধু কেউ ঘর বানায় না। আর জানালা সাধারণত ঘরের ভেতর থেকেই বন্ধ করে, বাইরে থেকে বন্ধ করে না। যে-দিকে দরজা, তার উল্টো দিকেই জানালা থাকা উচিত।

মলয় আবার উঠে দাঁড়িয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে দরজার উল্টো দিকে চললো। একটু বাদে সে সত্যিই একটা জানালা পেয়ে গেল। খুঁজে খুঁজে একটা ছিটকিনি হাতে ঠেকতেই সেটা তুলে ফেললো। এক ধাক্কাতেই জানালা খুলে গেল এবার।

সংগে সংগে খানিকটা টাটকা হাওয়া ঘরে ঢুকলো। নাক ভরে কয়েকবার নিশ্বাস নিল মলয়। এ-রকম বন্ধ ঘরে আর বেশীক্ষণ থাকলে তার দম বন্ধ হয়ে আসতো।

বাইরে তাকিয়ে মলয় বুঝতে পারলো, সে রয়েছে একটা দোতলার ঘরে। বাইরে একটা বাগানের মতন। বেশ রাত হয়েছে। জ্যোৎস্নার সামান্য আলোয় বাইরেটা অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। মনে হচ্ছে কোনো গ্রামের মতন জায়গা।

এখন ঘরেও একটু একটু আলো এসেছে। সেই আলোয় মলয় দেখলো, ঘরটা একদম ফাঁকা। কোনো খাট, টেবিল, চেয়ার কিছু নেই। শুধু এক কোণে কী একটা জিনিস পড়ে আছে। সেটা তুলে দেখলো, তারই বই খাতা ভর্তি স্কুলের ব্যাগটা। যাক্, দিনের বেলায় মলয় তার বই টই পড়ে সময় কাটাতে পারবে।

কিন্তু খাওয়ার কী হবে? রাত্তিরে কিছু না খেলে তার ঘুমই আসবে না। আর ঘুমোবেই বা কোথায়, ঘরে তো খাট বিছানা নেই।

মলয় আবার জানালার কাছে এসে বাইরে তাকালো। জানালার গরাদগুলো খুব মোটা সোটা। এখান থেকে বাইরে বেরুবার কোনো উপায়ই নেই। সে চেঁচিয়ে উঠলো, এখানে কেউ আছে? এখানে কেউ আছে?

এবারে বোঝা গেল, বাগানের গেটের কাছে একজন লোক দাঁড়িয়েছিল। সে ছুটে এলো বাড়ির দিকে। তারপরই সিঁড়িতে দুপদাপ পায়ের শব্দ শোনা গেল। এবং একটু পরেই ঘরটা ঝলমলে আলোয় ভরে গেল।

ঘরটায় তা হলে বিজলি আলো আছে! মলয় সুইচ খুঁজে পায় নি! মলয় তাকিয়ে দেখলো ঘরে কোনো সুইচ নেই। সুইচটা আছে বাইরে—মলয় ইচ্ছে থাকলেও আলো জ্বালতে পারবে না।

দরজার তালা খোলার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মলয় একটু সরে দাঁড়ালো। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো সেই ড্রাইভারটা। সে বেশ হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলো, কী ছোটবাবু, আপনি ডাকছেন?

মলয় দেখলো, লোকটির হাতে ছুরি-ছোরা বা বন্দুক-পিস্তল কিছুই নেই। একদম খালি হাত। অবশ্য লোকটার গায়ে বেশ জোর আছে। তা ছাড়া মলয় পালাবার চেষ্টাই বা করবে কী করে, তার যে পা বাঁধা।

মলয় জিজ্ঞেস করলো, আমাকে এ কোথায় নিয়ে এসেছেন?

লোকটি বললো, কেন, গুরুদেবের সংগে দেখা করার জন্য। গুরুদেবই তো আপনাকে এখানে আনতে বলেছেন।

মলয় অবাক হয়ে গেল। তারপর বললো, গুরুদেব? গুরুদেব এখানে থাকেন নাকি? এটা কি পিসীমণির বাড়ি?

লোকটা বললে, আপনার পিসীমণি কে তা-তো জানিনা। এটা বউরানীর বাড়ি। আপনাকে তো বলেইছিলাম, বউরানীর গুরুদেব আপনাকে ডেকেছেন।

আমার পিসীমণিই তো বউরানী। তিনি আমাকে এখানে আনতে বলবেন কেন!

লোকটা দু' হাত উল্টে বললো, তা তো জানি না। আমাদের ওপর যা হুকুম ছিল তাই করেছি। জানেন, আপনাকে আনতে দেরি হয়ে গেছে বলে গুরুদেব খুব রাগ করেছেন।

মলয় লোকটির ভাবভংগি দেখে বুঝতে পারলো, সে ওর সংগে ঠাট্টা করছে। একটাও সত্যি কথা বলছে না।

মলয় তখন ভুরু কুঁচকে বললো, আপনার গুরুদেব আমাকে এখানে আটকে রেখেছেন কেন? তাঁকে দেখা করতে বলুন!

গুরুদেব এখন পুজোয় বসেছেন। আগে পুজো শেষ হোক।

কখন পুজো শেষ হবে?

তা কি বলা যায়? এক ঘণ্টাও লাগতে পারে, চার ঘণ্টাও লাগতে পারে।

মলয়ের বিশ্রী লাগলো লোকটার কথা শুনে। তার সংগে এই রকম ঠাট্টার সুরে কোনো চাকর বা ড্রাইভার কখনো কথা বলে নি। লোকটার সংগে আর কোনো কথা বলবে না ঠিক করলো। কিন্তু খাবার কথাটা কী হবে? খুব খিদে পেয়েছে যে।

লোকটা বোধহয় মলয়ের মনের কথা বুঝতে পেরে নিজের থেকেই বললো, আপনার খাবার তৈরি হচ্ছে। এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মলয় বললো, খাবার জলও তো নেই। আমার হাত মুখও ধুতে হবে। রোজ স্কুল থেকে ফিরে আমার চান করা অভ্যেস।

লোকটা একটু হেসে বললো, চান তো আজ আর হবে না। খাবার জল এনে দিচ্ছি।

তারপর একটু ভেবে লোকটা আবার বললো, দরজা বন্ধ করে যাবো, না খোলা রেখে যাবো?

তার মানে?

মানে, বারবার দরজা বন্ধ করা আর খোলা তো এক ঝামেলা। সেইজন্যেই দরজা খোলাই রেখে যেতে চাই। কিন্তু আপনি আবার পালাবার চেষ্টা করে ঝঞ্ঝাট করবেন না তো!

মলয় বিরক্তভাবে লোকটার দিকে তাকালো। ঠাট্টা করারও একটা সীমা থাকা দরকার। পা শিকল দিয়ে বাঁধা থাকলে কেউ পালাতে পারে? সে কি হনুমান যে এক লাফে বাইরে চলে যাবে?

লোকটা দরজা খোলা রেখেই চলে গেল। মলয় তখন পরীক্ষা করে দেখলো তার পায়ের বন্ধনটা। পুলিশরা যেমন চোর ডাকাতদের হাতে হাতকড়া পরায়—সেই রকম একটা জিনিস দিয়ে তার পা দুটো আটকানো। তাতে আবার তালাচাবি লাগাবার ব্যবস্থা আছে। টানাটানি করে খোলার কোন আশাই নেই। বরং টানাটানি করতে গেলে পায়ে খুব ব্যথা লাগে।

মলয় দু' বার লাফিয়ে দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালো। সামনে একটা টানা বারান্দা। পাশাপাশি আরও অনেকগুলো ঘর আছে, সবগুলোই তালাবন্ধ। তবে, তালাগুলোতে মরচে পড়ে গেছে। অনেকদিন এ বাড়িতে কোনো মানুষ থাকে না মনে হয়। দেয়ালগুলোও ভাঙা ভাঙা। যেখানে সেখানে মাকড়সার জাল জমে আছে। অনেক দিনের পুরোনো বাড়ি।

এখান থেকে এখন পালাবার চেষ্টা করলে মলয় বেশী দূরে যেতে পারবে না। ওরা ঠিক খুঁজে বার করবে। তা ছাড়া, এত তাড়াতাড়ি পালিয়ে কী হবে? দেখাই যাক না কী হয়?

একটুবাদেই সেই লোকটি এক হাতে একটা খাবারের থালা আর এক হাতে একটা জলের কুঁজো নিয়ে ফিরে এলো। এসে বললো, কোথাও যান নি তো! বাঃ লক্ষ্মী ছেলে। এবার খেয়ে নিন গরম গরম।

মলয়ের খুবই খিদে পেয়েছিল ঠিকই। কিন্তু খাবারের দিকে তাকিয়ে তার হাসি পেল। তিনখানা শুকনো রুটি আর খানিকটা

কী যেন কালো কালো তরকারি। নিশ্চয়ই ঢ্যাড়স আর বেগুন— যে দুটো জিনিস মলয় একেবারেই পছন্দ করে না। তাদের বাড়ির ঝি চাকররাও এর চেয়ে অনেক ভালো খাবার পায়। এরা ভেবেছে কী?

মলয় বললো, এই খাবার আমি খাবো? আমি এসব খাই না।

লোকটি বললো, কেন, খারাপ কি? রুটিগুলো বেশ গরম গরম আছে!

আমি লুচি বা পরোটা খাই রাত্তিরে। শুধু রুটি খেতে পারি না! এই তরকারিও খাই না!

আচ্ছা দেখা যাক, কালকে যদি অন্য কিছু পাওয়া যায়—

এসব নিয়ে যান। আমি কিছু খাবো না। লোকটা এবার এক ধমক দিয়ে বললো, ওসব বাবুগিরি এখানে চলবে না। খেয়ে নিন শিগগির!

মলয়কে কেউ কোনোদিন ধমক দেয় না। তার বাবা মা-ও ওকে কখনো বকেন নি। এরা তো জানে না, মলয় কী রকম জেদী। একবার ওর দাদা ওকে একটু বকেছিল বলে মলয় পুরো একদিন কিছু না খেয়ে ছিল।

মলয় বললো, আমি খাবো না। এসব কিছু খাবো না!

তবে থাকুন না খেয়ে!

লোকটা ঝপাং করে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপরই আবার আলো নিভে গেল ঘরের।

এরা ডাকাত হলেও মলয় এদের কাছ থেকে একটু ভদ্রতা আশা করেছিল। কিন্তু খাবারের ব্যাপারে এদের এই কৃপণতা দেখে মলয় বিষম চটে গেল। সে ছুটে জানালার কাছে গিয়ে চ্যাঁচাতে লাগলো, এরা আমাকে ধরে রেখেছে! বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও। কেউ শুনতে পাচ্ছো! বাঁচাও!

সঙ্গে সঙ্গে তার ঘরে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হতে লাগলো। তার ঘরের আলোটা একবার জ্বলেই আবার নিভে গেল। আবার জ্বললো, আবার নিভলো। আবার ঠিক সেই রকম। বাইরে থেকে সেই লোকটা নিশ্চয়ই বারবার আলো জ্বালছে আর নেভাচ্ছে। এটা কি খেলা পেয়েছে নাকি?

তারপরই দরজা খুলে লোকটা হা-হা করে হাসতে লাগলো। ঠিক পাগলের মতন হাসি। বেশ কিছুক্ষণ হেসে লোকটা থামলো। তারপর ফিসফিস করে বললো, আপনি যা করলেন, তারপর-আর কেউ এ বাড়ির কাছাকাছিও আসবে না! জানেন না, এটা ভূতের বাড়ি?

মলয় একটু চমকে গিয়ে বললো, ভূতের বাড়ি?

লোকটা চোখ গোল গোল করে বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটাই ভূতের বাড়ি। আগে এটা একটা জমিদার বাড়ি ছিল। একবার দারুণ কলেরায় সবাই মরে যায়। তারপর থেকে এ বাড়িতে আর ভয়ে কেউ আসে না। লোকে কী বলে জানেন? মাঝে মাঝে নাকি রাত্তিরবেলা এখানকার একটা ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে একটা ছেলে চ্যাঁচায় আর ঘরের মধ্যে তখন বিদ্যুৎ চমকায়!

লোকটা আবার হাসতে লাগলো। মলয় বললো, আপনি এরকম বিশ্রীভাবে হাসছেন কেন?

লোকটা বললো, আজ তো সবাই নিজের চোখেই দেখলো এই ঘরের জানালা দিয়ে ভূত চ্যাঁচাচ্ছে। আপনি কি সত্যিই ছোটবাবু না ভূত? আমার নিজেরই সন্দেহ হচ্ছে!

মলয় মনে মনে ঠিক করে রাখলো, যখন ডিটেকটিভ এসে তাকে উদ্ধার করবে, তখন সে ডিটেকটিভকে বলে দেবে এই লোকটার নাকে একটা ঘুঁষি মারতে।

লোকটা বললো, তা হলে কী ঠিক করলেন? খাবার খাবেন না? সারা রাত না খেয়ে থাকবেন?

মলয় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো, আমি আপনার সঙ্গে কোনো কথা বলতে চাই না!

ঠিক আছে। থাকুন তা হলে।

লোকটা আবার দরজাটা টেনে বন্ধ করতে যাচ্ছিল, এই সময় বাইরে খটাস্ খটাস্ করে আওয়াজ হতে লাগলো। কে যেন খড়ম পরে হেঁটে আসছে। লোকটা আবার দরজা খুলে দিয়ে বললে, ঐ তো, গুরুদেব!

মলয় দেখলো একজন লম্বা চওড়া বিশাল পুরুষ এসে দাঁড়ালো দরজার কাছে। লোকটা একটা লাল টকটকে রঙের ধুতি পরে আছে। খালি গা। গলায় একটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। মাথার চুলগুলো জটা বাঁধা। দেখলেই কী রকম যেন ভয় করে। মোটেই পিসীমণির গুরুদেবের মতন নয়, তিনি খুব ঠাণ্ডা মানুষ।

ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সে বললো, এ ঘরে খাট টাট কিছু নেই দেখছি। এই বিলায়েতি, একটা চৌপাই নিয়ে আয়।

যে-লোকটা মলয়ের জন্য খাবার এনেছিল আর এতক্ষণ ইয়ার্কি করে কথা বলছিল, তার নাম তা হলে বিলায়েতি! ভারী মজার নাম তো। বিলায়েতি কিন্তু এই কাপালিকের মতন লোকটিকে খুব ভয় করে মনে হলো। হুকুম শুনেই সে দৌড়ে চলে গেল। আর এই গুরুদেব কটমট করে চেয়ে রইলো মলয়ের দিকে।

বিলায়েতি একটা খাটিয়া এনে পেতে দিল ঘরের মধ্যে। গুরুদেব তার ওপর বসলো। তার শরীরের ভারে মচ্‌মচ করে উঠলো সেটা। সে মলয়কে বললো, বসো।

মলয় বসলো না, দাঁড়িয়ে রইলো। ভয় না পেয়ে বললো, আমাকে এখানে ধরে এনেছেন কেন?

লোকটি বললো, একটু দরকার আছে। বেশী দিন রাখবো না। আট দশ দিনের মধ্যেই ছাড়া পেয়ে যেতে পারো!

আট দশ দিন?

সেটা নির্ভর করছে তোমার বাবা-মায়ের ইচ্ছের ওপর। তাঁরা যত তাড়াতাড়ি তোমাকে ফিরিয়ে নিতে চান, তত তাড়াতাড়ি তুমি চলে যাবে!

এতদিন এই ঘরে থাকতে হবে? আমি শোবো কোথায়?

কেন, এই চৌপাইটা পছন্দ হচ্ছে না!

এরকম বিচ্ছিরি খাটে আমি শুই না! বালিশ কোথায়?

অত আরামে রাখবার জন্য কী তোমাকে এখানে এনেছি?

আমি খিদে পেলে কি খাবো না?

ঐ তো খাবার দিয়েছে।

ঐ রকম বিচ্ছিরি খাবার আমি খাই না!

এত রাত্তিরে আর রাজভোগ কোথায় পাওয়া যাবে?

ঐ রকম বিচ্ছিরি খাবার দিতে আপনাদের লজ্জা করে না!

বিলায়েতি বললো, এই যে খোকাবাবু, গুরুদেবের মুখে মুখে ওরকম ভাবে কথা বলবেন না!

গুরুদেব বললেন, বাঘের বাচ্চা তো, তাই তেজ আছে ষোলো আনা! রাজত্ব থাক না থাক, রাজপুত্তুর তো বটে! এই বিলায়েতি, একটা কাগজ আর একটা কলম নিয়ে আয়!

বিলায়েতি আবার দৌড়ে চলে গেল।

মলয় জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কি ডাকাত?

গুরুদেব হাসতে হাসতে বললো, আমার বাবা ছিলেন ডাকাত। খুব নাম করা ডাকাত। কিন্তু সেইসব ডাকাতদের দিন আর নেই। তাই আমি সাধু হয়েছি।

সাধুরা বুঝি ছেলে চুরি করে?

আমি কি তোমাকে চুরি করেছি? কয়েক দিনের জন্য আটকে রেখেছি শুধু!

আমার পা শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছেন কেন?

দু-চার দিন যাক। তারপর খুলে দেবো এখন! এখন পালাবার চেষ্টা করে তো লাভ নেই! এখান থেকে কুড়ি মাইলের মধ্যেও কোনো রেল স্টেশন নেই। তুমি কোথাও যেতে পারবে না।

বিলায়েতি একটা কাগজ আর কলম নিয়ে ফিরে এলো। গুরুদেব সেটা মলয়কে দেবার ইশারা করে বললেন, এবার চট্‌পট

গুরুদেব কটমট করে চেয়ে রইলো মলয়ের দিকে।

তোমার বাবাকে একটা চিঠি লিখে ফ্যালো!

মলয় বললো, আমার বাবা এখানে থাকেন না। তিনি এখন ইংল্যাণ্ডে আছেন।

ও, তাই বুঝি! ঠিক আছে, তোমার মাকে লেখো তা হলে!

আমার মা এখন দার্জিলিংয়ে।

তোমার দাদা?

দাদা সিমলায় বেড়াতে গেছেন।

তোমাকে একা রেখে সবাই চলে গেছেন? ছি-ছি-ছি-ছি।

আমি একা থাকতে পারি। আমার ভয় করে না।

বটে? ঠিক আছে, তোমার বাবার নামেই চিঠিটা লেখো। তোমাদের সরকারবাবু খুলে পড়লেই হলো। আমি বলে যাচ্ছি, তুমি লেখো—

আমি অন্য কারুর কথা শুনে চিঠি লিখি না। আমি নিজেই চিঠি লিখতে পারি!

গুরুদেব এবার এক ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে বললো, যা বলছি, শোনো! তোমার বাবাকে লেখো, 'আমি ভালো আছি। আমাকে এক জায়গায় আটকে রাখা হয়েছে। পাঁচ লাখ টাকা মুক্তিপণ না পেলে এরা আমাকে ছাড়বে না। আজ থেকে ঠিক সাতদিন পরে সন্ধে সাতটার সময় বর্ধমান রেল স্টেশনে একজন দাড়িওয়ালা ভিখিরির হাতে টাকাটা দিতে হবে। তুমি যদি আমার তা হলে টাকাটা ঠিক সময়ে দিয়ে দিও। টাকা না পেলে আমাকে মেরে ফেলবে বলেছে। পুলিশে খবর দিলে আমাকে আর কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

মলয় সবটা মন দিয়ে শুনলো, তারপর বললো, আমি এ চিঠি লিখবো না।

কেন?

কারণ, আমাদের পাঁচ লাখ টাকা নেই।

সে কী হে? সোনাপুরা রাজবাড়ির ছেলে বলছে তাদের পাঁচ লাখ টাকা নেই! লোকে যে শুনে হাসবে!

তা হাসুক না! আমি একদিন শুনেছি, সরকারবাবু দাদাকে বলছিলেন, ব্যবসার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে এক লক্ষ টাকা ধার করতে হবে। নিজেদের টাকা থাকলে কেউ ধার করে?

হ্যাঁ, করে। ওসব বড়লোকদের বড় বড় ব্যাপার। তুমি এখনো ছেলেমানুষ তো, তাই বুঝবে না। মরা হাতির দামও লাখ টাকা হয়। তোমার বাবা এখনও হাত ঝাড়লেই পাঁচ দশ লাখ টাকা বার করে দিতে পারেন!

টাকা দিয়ে আপনি কী করবেন?

কামাখ্যা পাহাড়ে একটা আশ্রম বানাবো।

আপনি আশ্রম বানাবেন তো আমার বাবা কেন টাকা দিতে যাবেন?

কারণ, তোমার বাবার অনেক বেশী টাকা আছে।

তা বলে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করে কেউ মন্দির তৈরি করে?

এমনি এমনি ভিক্ষে চাইলে কি আর তোমার বাবা দেবেন?

ডাকাতদের মন্দির তৈরি করার জন্য কেউ টাকা দেয় না!

মন্দির তৈরি হয়ে গেলে তো আর তখন আমরা ডাকাত থাকবো না! সেই মন্দির থেকে আমাদের যা লাভ হবে, তাতেই সারা জীবন চলে যাবে!

আমি লিখবো না চিঠি!

ভালো চাও তো চটপট লিখে ফ্যালো!

না!

গুরুদেব বিলায়েতিকে চোখের ইশারা করলো। বিলায়েতি এগিয়ে এসে ঠাস করে জোরে একটা চড় কষালো মলয়কে।

মলয় জীবনে কখনো কারুর কাছে মার খায় নি। গালে চড় খেতে যে কী রকম লাগে, তাই সে এই প্রথম জানলো। সে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো বিলায়েতির দিকে। তার গালটা জ্বালা করছে, ঝিমঝিম করছে মাথা।

তবু সে জোরের সঙ্গে বললো, লিখবো না!

বিলায়েতি আর একটা চড় মারলো। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইছে মলয়ের, তবু সে কান্না সামলে নিয়ে বললো, কিছুতেই লিখবো না!

বিলায়েতি আবার মারতে যাচ্ছিল, গুরুদেব তাকে থামিয়ে দিল। তারপর বললো, আজ এই পর্যন্তই থাক্। আবার কাল সকালে দেখা যাবে।

খাট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গুরুদেব আবার বললো, ওহে ছোট রাজকুমার, একটা কথা শুধু শুনে রাখো। আজ থেকে ঠিক দশ দিন পরে অমাবস্যা। সেদিন মাঝ রাত্তিরে আমি পুজোয় বসার আগে যদি টাকাটা না পাই, তা হলে কী করবো জানো? ঠাকুরের সামনে তোমাকে বলি দেব! মানুষ বলি দিতে আমার খুব ভালো লাগে!

গুরুদেব ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই বিলায়েতি আবার দরজাটা বন্ধ করে দিল বাইরে থেকে। আলোও নিভে গেল।

এবার অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে মলয় কাঁদতে লাগলো। শব্দ করে কান্না নয়, শুধু তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে আসছে। এখন তো আর কেউ দেখছে না। কিছুতেই চোখের জল আটকে রাখতে পারছে না সে। ভীষণ অপমান আর অভিমান হয়েছে তার। ঐ বিলায়েতির মতন একটা বাজে লোক তাকে মারলো? কোনো দিন কেউ তাকে মারে নি! তার বাড়িতে তার জন্য খাবার নিয়ে সবাই কত সাধাসাধি করে। আর আজ তাকে এ-রকম বিচ্ছিরি খাবার খেতে দেওয়া হয়েছে!

খানিকটা বাদে মলয় চোখের জল মুছলো। খিদেয় তার পেট জ্বলছে। একবার সে ভাবলো, ঐ পোড়া রুটি-তরকারিই খেয়ে নেবে। হাত বাড়িয়ে একটা রুটি তুলে নিয়ে মুখে দিতে গিয়েও আবার রেখে দিল। তার মনে হলো, সাধারণ আজে বাজে লোকেরাই যখন যা পায়, তাই খায়। সোনাপুরো রাজবাড়ির কোনো ছেলে খিদে পেলেও কিছুতেই যা-তা জিনিস খাবে না!

যাতে আবার তার খেতে ইচ্ছে না করে সেইজন্য মলয় ঐ রুটি-তরকারি ফেলে দিল জানালা দিয়ে। শুধু ঢকঢক করে জল খেল খানিকটা।

ঐ বিচ্ছিরি দড়ির খাটেও সে শোবে না। বিছানা নেই, বালিশ নেই—এরকমভাবে কারুকে কেউ শুতে দেয়? মলয় সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকবে, তবু ওখানে শোবে না।

অনেকক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো মলয়। এক সময় তার পা ব্যথা করতে লাগলো, চোখ ঢুলতে লাগলো ঘুমে! এক সময় সে মনের ভুলে একবার শুধু বসে পড়লো চৌপাইটাতে। তারপর কখন সে ঘুমে লুটিয়ে পড়েছে, ও নিজেই জানে না।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অনেক রকম স্বপ্ন দেখতে লাগলো মলয়। কোনোটাই কিন্তু ভয়ের স্বপ্ন নয়। স্বপ্নের মধ্যে ওর মুখে হাসিও ফুটে উঠলো একটু একটু। ঠিক যেন ও নিজের বাড়িতে বিছানায় শুয়ে আছে—ঘুমের মধ্যে হাত বাড়িয়ে পাশ বালিশটা খুঁজলো অনেকবার। যখন ঘুম ভাঙলো, তখন দিনের আলোয় ঘর ভরে গেছে।

৫

মলয় ধড়মড় করে উঠে বসে এদিক ওদিক তাকালো। প্রথমে তার কিছুই মনে পড়লো না। এ কোথায় রয়েছে সে? তারপর পায়ের শিকলের দিকে চোখ পড়লো।

মলয়ের জামা কাপড় ধুলোয় ভরা। তার জুতো দুটো কোথায় সে খুঁজে পেল না। স্কুলের বই খাতার ব্যাগটা এক কোণে পড়ে আছে। সব মিলিয়ে কী বিচ্ছিরি যে লাগছে!

মলয় জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। সামনে একটা অযত্নে পড়ে থাকা বাগান, তারপর ধু ধু করছে মাঠ। কাছাকাছি কোনো বাড়ি ঘর তো দেখা যাচ্ছে না। শুধু দূরে মাঠের মধ্যে তিনটে তাল গাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। ঠিক যেন মনে হয়, ছাতা মাথায় তিনটে লম্বা দৈত্য।

একটু বাদে সেই বিলায়েতি নামের লোকটা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। গরম দুধ ভর্তি একটা মাটির ভাঁড় মাটিতে নামিয়ে রেখে সে বললো, দুধটা খেয়ে নিন। গুরুদেব একটু বাদেই আসবেন।

মলয় ওর সঙ্গে কোনো কথাই বললো না। পেছন ফিরে রইলো।

লোকটা চলে যাবার পর সে এগিয়ে এলো দুধের ভাঁড়টার কাছে। এত খিদে লেগেছে যে আর থাকতে পারা যায় না। অন্যদিন তাকে দুধ খাওয়াবার জন্য তাদের বাড়ির চাকর দাসীরা কত সাধ্য-সাধনা করে, আজ তার দুধ দেখেই লোভ হচ্ছে।

দুধ তো সব জায়গাতেই এক। সুতরাং মলয় এটা অনায়াসে খেয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু এরকম মাটির ভাঁড়ে করে সে কোনো দিন কিছু খায় নি। তাদের বাড়ির ড্রাইভার বা চাকরদের সে মাঝে মাঝে ছোট ছোট মাটির ভাঁড়ে চা খেতে দেখেছে বটে।

মলয় দু' হাত দিয়ে ভাঁড়টা তুলে একটু চুমুক দিল। কী রকম যেন অন্য রকম গন্ধ। বোধহয় মাটির ভাঁড়ের জন্যই এরকম গন্ধ। খারাপ লাগছে না কিন্তু। আস্তে আস্তে মলয় সব দুধটা শেষ করে ফেললো। তাতে তার শরীরটা বেশ সুস্থ হলো খানিকটা।

এরপর মলয় এক গেলাস জলও খেয়ে ফেললো। নিজের হাতে সে কোনোদিন জল গড়িয়ে খায়নি তো, তাই কুঁজো থেকে অনেকটা জল পড়ে গেল মাটিতে। কী বিশ্রী নোংরা হয়ে গেছে ঘরটা। এই রকম নোংরা ঘরে তাকে দিনের পর দিন থাকতে হবে?

কিছুই করার নেই বলে মলয় তার স্কুলের বই খাতা খুলে বসলো। অন্যদিন এই সময় তো সে পড়তেই বসে। মলয় এখান থেকে ছাড়া পাবার আগেই স্কুল ছুটি হয়ে যাবে। হোম ওয়ার্কের কথা সে জানতেই পারবে না।

মলয়ের হঠাৎ মনে হলো, ঐ গুরুদেবের কথা মতন বাবার কাছে তার চিঠি লিখে দেওয়াই উচিত ছিল। চিঠি না পেলে অন্যরা বুঝবে কী করে যে মলয়কে কারা আটকে রেখেছে। এরা পুলিশকে খবর দিতে বারণ করেছে, ডিটেকটিভকে খবর দিতে তো বারণ করে নি!

চিঠিখানা সরকারবাবুর হাতে পৌঁছোলে নিশ্চয়ই তিনি বাবাকে টেলিগ্রাম করবেন। টেলিগ্রাম পেয়েই বাবা চলে আসবেন কলকাতায়। আজকাল তো বিলেত থেকে একদিনেই চলে আসা যায়। বাবা ফিরে এসে সব ব্যবস্থা করে ফেলবেন।

মলয় যত বেশী দিন দেরী করবে, ততই এরা বেশী দিন তাকে আটকে রাখবে। ঠাকুরের কাছে বলি দেবার কথা যে বললো, তা কি সত্যি? এটা কখনো সত্যি হতে পারে না। ওটা বলেছে মলয়কে ভয় দেখাবার জন্য। ঐ গুরুদেব নামের লোকটার চোখ দুটো দেখলে সত্যিই খুব ভয় করে!

মলয় ওর অঙ্কর খাতাটা নিয়ে ঠিক মাঝখানটা খুললো। ঠিক মাঝখানের একটা পাতা ছিঁড়ে নিলে বোঝা যাবে না। মলয় সেই পাতায় চিঠি লিখতে বসলো।

কালকে গুরুদেব যা বলেছিল, মলয় মনে করে করে সেই কথাগুলোই লিখছে। মুক্তিপণ কথাটায় এসে আটকে গেল। মুক্তিপণে কি দন্ত্য ন, না মূর্ধন্য ণ? এই রে, মনে পড়ছে না তো! এক এক সময় এক একটা বানান কিছুতেই মনে আসে না।

মলয় যখন পেন্সিল হাতে নিয়ে বানানটা ভাবছে, সেই সময় আবার দরজা খুলে গেল। এবার গুরুদেবের সঙ্গে তিনজন লোক। তাদের মধ্যে একজন লোকের হাতে একটা নতুন চাবুক। চাবুকটা মলয়কে মারবার জন্যই কেনা হয়েছে, বোঝা যায়। কাল রাত্তিরেই কিনেছে, না আগেই কিনে রেখেছিল?

গুরুদেব কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই মলয় বললো, বাথরুম কোথায়? আমি সকাল থেকে বাথরুমে যাই নি!

গুরুদেব বিরক্ত হয়ে বিলায়েতিকে বললেন, আঃ, শুধু শুধু সময় নষ্ট। সকালবেলা ছেলেটাকে বাথরুম দেখিয়ে দিতে পারিস

নি?

বিলায়েতি গোমড়া মুখে মলয়ের হাত ধরে নিয়ে গেল বাইরে। তারপর ফিসফিস করে বললো, যখন দুধ নিয়ে এসেছিলাম, তখন বলেন নি কেন?

মলয় বললো, আমার তখন ইচ্ছে হয়নি, তাই বলিনি!

মলয় বাথরুম থেকে ফিরে আসার পর গুরুদেব খুব গম্ভীর-ভাবে বললো, এই যে রাজপুত্তুর তোমার জামাটা খুলে ফেলে এদিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াও!

মলয় জিজ্ঞেস করলো, কেন?

আমার সামনে এই লোকটি তোমাকে পাঁচ ঘা চাবুক মারবে! দুপুরবেলা আবার এসে মারবে দশ ঘা। সন্ধ্যেবেলা পনেরো ঘা, রাত্তিরে...

আমাকে এত চবুক মারবে কেন? আমি কি দোষ করেছি?

তুমি চিঠি লিখতে রাজি হওনি যে!

চাবুক খেয়ে আমি যদি মরে যাই?

তোমার মতন দু' একটি অপদার্থ রাজপুত্র মরে গেলে কার কি ক্ষতি হবে!

এই কথাটা মলয়ের খুব খারাপ লাগলো। একবার সে বলবে ভাবলো, রাজবাড়িতে তার জন্ম হওয়াটাই কি দোষের? সে কি ইচ্ছে করে ঐ বাড়িতে জন্মেছে?

গুরুদেব নিজেই আবার বললো, অবশ্য তোমাকে মেরে ফেলা হবে না, কারণ তা হলে টাকা পাওয়া যাবে না। তোমাকে এমন-ভাবে চাবুক মারা হবে, যাতে তোমার সারা গায়ে ঘা হয়ে যায়। তারপর সেই ঘায়ে লঙ্কার গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া হবে! তখন বুঝবে।

ইস, এরকম একটা নিষ্ঠুর লোককে এরা গুরুদেব বলে কেন? এ গুরুদেব না ছাই! এর থেকে ডাকাতরাও অনেক ভালো হয়।

মলয় আস্তে আস্তে বললো, আমার তো চিঠি লেখা হয়ে গেছে!

গুরুদেব বললো, হয়ে গেছে? বাঃ! ওষুধে কাজ হয়েছে দেখছি! কই দেখি চিঠিটা দাও!

মলয় বললো, একটু বাকি আছে। আপনাদের এখানে ডিকশনারি আছে?

ডিকশনারি? তা দিয়ে কি হবে!

একটা বানান মনে পড়ছে না। আপনারা ডিকশনারি রাখেন না কেন? সব বাড়িতেই তো থাকে। মুক্তিপণে কোন্ ন?

গুরুদেব এবার হেসে উঠলো। বললো, বানানে কি আসে যায়! যা হোক একটা লিখে দাও!

মলয় বললো, আমার বাবা ভুল বানান দেখলে ভীষণ রাগ করেন! আপনারা কেউ জানেন না, মুক্তিপণে কোন্ ন?

গুরুদেব বিলায়েতিকে জিজ্ঞেস করলো, কি রে, জানিস নাকি?

বিলায়েতি বললো, ন বুঝি দুটো থাকে? কখনো শুনিনি তো!

দূর মুখ্যু! এই তুই জানিস?

হাতে চাবুকওয়ালা লোকটি বললো, ওসব তো বাবুদের জানার কথা, ও কি আমরা বলতে পারি? লেখাপড়া শিখলে কি আর এ কাজ করতাম!

মলয় বললো, আপনারা কেউ মুক্তিপণ বানানই জানেন না। অথচ মুক্তিপণ চাইছেন?

গুরুদেব বললো, আমি জানতাম, এখন পেটে আসছে মুখে আসছে না! আচ্ছা এক কাজ করো, তুমি দন্ত্য ন লিখে মাথাটা একটু উঁচু করে দাও—তাতে মনে হবে দুটোই হতে পারে!

বিলায়েতি বললো, চিঠিতে ভুল থাকলে যদি টাকা না দেয়। গুরুদেব এবার এক হুংকার দিয়ে বললো, চুপ! বড্ড বাজে সময় নষ্ট হচ্ছে। দেখি, চিঠি দেখি!

চিঠিখানা হাতে নিয়ে গুরুদেব পড়ে দেখলো। মলয়ের হাতের লেখা খুব সুন্দর। দেখলেই সকলের ভালো লাগে। গুরুদেবের কিন্তু চিঠিখানা পেয়ে খুশী হবার বদলে মুখের ভাব হঠাৎ ভয়ংকর হয়ে গেল। মলয়ের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললো, টাকাটা পেলেও কিন্তু তোমাকে ছাড়া হবে না, এ কথা জেনো রেখো।

মলয়ের মুখটা শুকিয়ে গেল। দারুণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কেন?

তুমি তোমার বাবার কাছে ফিরে গিয়েই তো আমাদের কথা সব বলে দেবে। তারপর পুলিশ এসে আমাদের ধরবে। তুমি আমাদের সকলের মুখ চিনে গেছ, তুমিই পুলিশকে চিনিয়ে দেবে!

কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন, টাকা পেলেই আমাকে ছেড়ে দেবেন?

সেটা কথার কথা! তোমাকে অমাবস্যার দিন বলি দেওয়াই ঠিক আছে। মন্দিরের ভিত করার সময় তোমাকে সেখানে পুঁতে রাখবো—কেউ কিছু টের পাবে না!

মলয় চেঁচিয়ে বলে উঠলো, না, না, আমি কারুকে কিছু বলবো না! আমাকে ছেড়ে দিন!

চুপ! তোমার কথায় কোনো বিশ্বাস আছে?

কিন্তু আমাকে ফেরৎ না পেলে বাবা টাকা দেবেন কেন?

তোমার জামা-প্যান্ট পরিয়ে অন্য একটা ছেলেকে পাঠালেই হবে। অন্ধকারের মধ্যে চিনতে যতক্ষণ সময় লাগবে—ততক্ষণে আমাদের কাজ হয়ে যাবে। তোমার বয়েসের একটা ভিখিরীর ছেলেকে আমরা দেখে রেখেছি!

মলয় কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লো খাটিয়ার ওপরে। তার বুকের মধ্যে দুম দুম শব্দ হচ্ছে। এতটা ভয়ংকর ব্যাপার সে ভাবতেই পারে নি। এর আগে কোনো বইতে সে পড়েনি যে ডাকাতরা এত মিথ্যেবাদী হয়। মিথ্যে কথা বলে তাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নিল!

মলয় আর ভাবতে পারলো না। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তাকে সেই অবস্থাতেই রেখে ওরা চলে গেল দরজা বন্ধ করে।

এইরকমভাবে তিন চার দিন কেটে গেল। ঠিক তিন দিন, না চারদিন? আসলে চারটে রাত আর তিনটে দিন। মলয় তার পেন্সিল দিয়ে দেয়ালে দাগ কেটে কেটে হিসেব রাখছে। এই ক' দিনে মলয় মুক্তি পাবার কোনো পথই খুঁজে পেল না। কোথায়, কোনো ডিটেকটিভেরই তো পাত্তা নেই!

মাঝে মাঝে বিলায়েতিটা এসে ঠাট্টা ইয়ার্কি করে। আর গুরুদেব কালকে এসে বলে গেছে যে, মলয়ের লেখা চিঠি কলকাতায় পৌঁছে গেছে। সরকারবাবু মলয়ের বাবা আর মায়ের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে। পিসীমণি খবর দিয়েছেন পুলিশে। পুলিশের সাধ্য নেই মলয়কে খুঁজে পাওয়ার। গুরুদেবের একজন লোক কলকাতায় থেকে সব খবরাখবর নিচ্ছে।

এদিকে অমাবস্যার সেই পুজোর দিন ক্রমেই এগিয়ে আসছে। এর মধ্যে মলয়কে বাঁচাতে কি কেউ আসবে না?

সারাদিন রাত এই একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে থাকতে কী খারাপ যে লাগে! কিছুই করার নেই। পড়ার বইগুলো সব মুখস্থ হয়ে গেল। বেশীর ভাগ সময়ই শুয়ে থাকে। শুয়ে থাকলেই ঘুম পায়। শরীরটা খুব দুর্বল হয়ে গেছে। ওরা যা খাবার দেয়, মলয় রাগ করে তার বিশেষ কিছুই খায় না।

দিনের মধ্যে মলয় দু বার বাথরুমে যায়। তখন বিলায়েতি বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয় তাকে। বাথরুমে আবার স্নানের জল নেই। আগে প্রত্যেকদিন মলয় দু বার করে স্নান করতো। এখন এই তিন চারদিন একবারও স্নান করা হয় নি। মাথার চুলগুলো রুক্ষ হয়ে গেছে, গায়ে ময়লা ময়লা দাগ। এখন তাকে দেখলে তার বাড়ির লোক বোধহয় চিনতেই পারবে না।

তবু মলয় বাথরুমের মধ্যে অনেকক্ষণ সময় কাটায়। বাথ-রুমের জানালা দিয়ে তাকালে দূরে একটা নদীর মতন দেখা যায়

তার পারে কয়েকটা বাড়ি ঘর। এদিকটা শুধু ফাঁকা মাঠ নয়। ওখানে অনেক লোকজন আছে, তারা একবার খবর পেলে কি মলয়কে সাহায্য করতো না?

বাথরুমের জানালার শিকগুলো ক্ষয়ে গেছে. একটা শিক তো একেবারেই ভাঙা। ইচ্ছে করলে মলয় এই জানালা দিয়ে বাইরে পালাবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু পালিয়ে সে কত দূর যাবে? তার পায়ে যে শিকল বাঁধা. সে তো দৌড়োতেই পারবে না।

প্রথম দিন মলয় ভেবেছিল. গল্পের বইয়ের মতন তার অনেক অ্যাডভেঞ্চার আর অভিজ্ঞতা হবে। কিন্তু সেরকম কিছুই হচ্ছে না। খুব একঘেয়ে ব্যাপার। সারা দিন রাত একটা ছোট ঘরে বন্দী হয়ে থাকা! আর ডাকাতগুলো এসে খালি ভয় দেখায় আর বাজে বাজে কথা বলে। এমনকি ডাকাতগুলো নিজেরাও যে রোমাঞ্চকর কিছু কান্ড কারখানা করবে, তাও তো নেই। সব সময় বাড়িটা একেবারে চুপচাপ থাকে। মাঝে মাঝে শুধু গুরুদেবের খড়মের আওয়াজ শোনা যায়।

পাঁচ দিনের দিন, সন্ধেবেলা মলয় একা একা আবার অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো। হঠাৎ তার মনে হলো. তার বাবা-মা কেউ তাকে ভালোবাসে না! পাঁচদিন ধরে, সে নিরুদ্দেশ অথচ এখনো কেউ তার খোঁজ করতে এলো না। বাবা তো বিলেত থেকেও খুব ভালো একজন ডিটেকটিভ নিয়ে আসতে পারতেন! কিরীটী রায় হয়তো বলেছেন যে তিনি এখন খুনের কেস নিয়ে ব্যস্ত আছেন। এই সামান্য ছেলে হারানোর কেস নিতে পারবেন না। ব্যোমকেশ কিংবা হারকিউল পোয়রো-ও সব সময় বড় বড় খুনের কেস নিয়ে ব্যস্ত থাকেন—হারানো ছেলে খুঁজে বার করার গল্প তো ওঁদের একটা বইতেও নেই! আর কয়েকদিন বাদেই ওরা যে মলয়কে মেরে ফেলবে ঠিক করেছে. তা তো কেউ জানে না! একমাত্র অরণ্যদেবকে যদি কোনো খবর পাঠানো যেত! খবর না পাঠালেও অরণ্যদেব অনেক সময় জানতে পেরে যান। তবে. মলয়ের স্কুলের বন্ধু সিদ্ধার্থ একদিন বলেছিল, অরণ্যদেব নামে সত্যি সত্যি কেউ নেই. ও শুধু গল্প! তা যদি হয় তো আর কোনো আশাই নেই। তার বাবা-মা জানতেও পারবেন না—কোন্ একটা নতুন মন্দিরের তলায় মলয়ের কাটা মুণ্ডু চাপা পড়ে থাকবে!

নাঃ. একটা কিছু করতেই হবে। মলয় উঠে পড়ে এক গেলাস জল খেতে গেল। এই কুঁজোটা এত বিশ্রী যে জল গড়াতে গেলেই কাৎ হয়ে গড়িয়ে পড়ে। সব জল পড়ে গেল মাটিতে। মলয়ের এমন রাগ হলো যে ইচ্ছে হলো এক লাথি মেরে কুঁজোটা ভেঙে ফেলে। শেষ পর্যন্ত সামলে নিল নিজেকে। তা হলে যদি ওরা তাকে জল খেতেই না দেয়! জল না খেয়ে তো থাকা যায় না।

মলয় দুম দুম করে ধাক্কা দিতে লাগলো দরজায়। এক এক সময় আওয়াজ শুনলেও কেউ আসে না. কখনো কখনো আসে।

একটু বাদে বিলায়েতি এসে দরজা খুলে বিরক্তভাবে বললো, আবার কি হয়েছে?

মলয় বললো. আমি বাথরুমে যাবো।

এই তো দুপুরেই গেলেন।

আবার যাবো।

বড্ড আব্দার করেন আপনি!

বিলায়েতি একটু সরে দাঁড়াতেই মলয় দরজার বাইরে এলো। বিলায়েতি ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে বললো, ইস্, আবার জল ফেলেছেন ঘরের মধ্যে!

মলয় বললো. আমি কী করবো? কুঁজোটা ফুটো, সব জল বাইরে বেরিয়ে যায়।

নতুন কলসি আবার ফুটো হয় কী করে?

নিজেই দেখুন না! এত বড় ফুটো –

বিলায়েতি ঘরের মধ্যে ঢুকে কুঁজোটা তুলে নিয়ে দেখতে গেল। মলয় সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজা। তালা আর চাবি দরজার কড়ার সঙ্গেই ঝুলছিল. এক মুহূর্তে দেরী না করে মলয় তালা লাগিয়ে দিল।

চাবি মোটে একটাই। মলয় আশা করেছিল, তার পায়ের শেকলের তালা খোলার চাবিও পাওয়া যাবে। সেটা না পেয়ে একটু দমে গেল সে।

বিলায়েতি দারুণ ভয় পেয়ে দরজার কাছে এসে বললো, এ কী করছেন ছোটবাবু? ছিঃ, এরকম ছেলেমানুষি করে না!

মলয় বললো, আমার পায়ের শেকল খোলার চাবি কোথায়?

সেটা আমার কাছে নেই।

তা হলে থাকুন আপনি ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে।

ছিঃ. এরকম করবেন না। আমাকে এই অবস্থায় দেখলে গুরুদেব আমাকে মেরেই ফেলবেন! লক্ষ্মীটি, দরজা খুলে দিন।

আর আমাকে যে মেরে ফেলার জন্য আটকে রেখেছে, তার বেলা বুঝি কিছু না?

সেটা তো আমার দোষ নয়. শিগগির খুলে দিন, গুরুদেব আমাকে এই অবস্থায় দেখলে আর আস্ত রাখবেন না।

না খুলবো না।

তাহলে আমি চ্যাঁচাবো। আপনি পালাতে পারবেন না।

চ্যাঁচান না, কে বারণ করেছে! সবাই এসে ঘরের মধ্যে আপনাকে বন্দী দেখুক। তাতে আমার খুব আনন্দ হবে।

কেন গরীবের এই সর্বনাশটা করছেন!

আর আমার সর্বনাশ করলে খুব আনন্দ হয়, না? আমার শেকলের চাবি কোথায় আছে, না বললে আমি কিছুতেই খুলবো না!

আমি জানি না। সত্যিই জানি না!

মিথ্যে কথা।

আপনার শেকলের চাবি পেলে তারপর আমায় খুলে দেবেন?

হ্যাঁ।

আপনার কথায় বিশ্বাস কী?

আপনাদের মতন মিথ্যে কথা বলার অভ্যেস তো আমার নেই।

আপনি সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠে যান। সিঁড়ির ডান দিকেই গুরুদেবের ঘর। সেই ঘরের দেয়াল-আলমারিতে চাবিটা রাখা আছে।

আচ্ছা. আগে দেখে আসি।

মলয় হাঁটতে গেলেই তার পায়ের শেকলে ঝনঝন শব্দ হচ্ছে। পকেটে তার রুমাল ছিল, সেটা বার করে শেকলটার সঙ্গে জড়িয়ে নিল, তাতে একটু কমলো শব্দ। লাফিয়ে লাফিয়ে উঠলো তিনতলায়। এইরকমভাবে উঠতে তার খুব পরিশ্রম হয়।

এত কষ্ট করে ওপরে উঠেও নিরাশ হয়ে গেল। তিনতলায় কোনো ঘরই নেই, শুধু ছাদ—আর কিছু ভাঙা দরজা-জানালা ছড়ানো রয়েছে। এককালে বোধহয় ঘর ছিল।

বিলায়েতিটা কী দারুণ মিথ্যেবাদী আর শয়তান। শুধু শুধু সময় নষ্ট করার জন্য তাকে ওপরে পাঠিয়েছে। মলয়ের যা হয় হোক. ওকে শাস্তি পাওয়াতেই হবে।

সিঁড়ি দিয়ে মলয় তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলো। নামবার সময় বেশী কষ্ট হয় না।

একতলায় এসে দেখলো লোকজন কেউ নেই। রান্নাঘরে আলো জ্বলছে। গুরুদেব তার চ্যালাদের নিয়ে নিশ্চয়ই কোথাও বেরিয়েছে। বিলায়েতিকে একা রেখে যাওয়া হয়েছিল পাহারায়। সেই জন্যই বিলায়েতি চ্যাঁচাচ্ছে না এখনো—কেউ শুনতে পাবে না বলে!

মলয় বাগানটা পেরিয়ে বাইরে চলে এলো। থপ্ থপ্ করে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটা। দু একবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। এরকমভাবে কতদূর যাওয়া যাবে কে জানে? তবু চেষ্টা তো করতেই হবে।

মলয় পেছন ফিরে দেখলো. বিলায়েতি তার ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। থাক্. ব্যাটা বন্দী হয়ে।

একটু পরেই বিলায়েতি মুখ দিয়ে খুব জোরে একটা অদ্ভুত শব্দ করতে লাগলো। অনেকটা শেয়াল ডাকের মতন। মলয় বুঝতে

টর্চলাইটের আলো ঘুরে গেল তার দিকে।

পারলো, এটা একটা সাঙ্কেতিক ধ্বনি। অন্য লোকেরা কিছু বুঝতে পারবে না, তার দলের লোক ঠিক বুঝবে।

মলয় ভেবেছিল পাকা রাস্তা ছেড়ে দিয়ে মাঠের মধ্য দিয়ে যাবে। কিন্তু মাঠটা জল কাদায় গর্ত গর্ত হয়ে আছে, দু এক পা যেতে না যেতেই আছাড় খেয়ে পড়তে হচ্ছে। তা ছাড়া অন্ধকার হয়ে এসেছে, কিছু দেখাও যায় না।

মিনিট দশেক চলার পর মলয়ের আশা হয়েছিল এবার সে সত্যিই পালাতে পারবে। একবার নদীর ধারের বাড়িগুলোতে পৌঁছোতে পারলেই হয়। তখন সেখানকার কারুর সাহায্য নিয়ে...

ঠিক এই সময় দেখা গেল উল্টো দিক থেকে টর্চ হাতে নিয়ে কে যেন আসছে। বিলায়েতির শেয়াল ডাকের মতন আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে এখনো।

মলয় আবার তাড়াতাড়ি নেমে পড়লো মাঠের মধ্যে। একটা কিছু আড়াল নেই, যেখানে লুকোতে পারে। একবার কাদার মধ্যে পা পিছলে যেই পড়ে গেল, অমনি টর্চ লাইটের আলো ঘুরে গেল তার দিকে।

আর কেউ নয় স্বয়ং গুরুদেব। মলয়কে চিনে ফেলতে একটুও দেরী হলো না। বিশাল চেহারা নিয়ে গুরুদেব তাড়া করে এলো মলয়কে।

ইস্, মলয়ের যদি পা বাঁধা না থাকতো, তা হলে কি আর গুরুদেব ওকে ধরতে পারতো! মলয় ওর চেয়ে অনেক জোরে দৌড়োতে পারে। কিন্তু এখন তো তার উপায় নেই। তবু লুকোচুরি খেলার মতন মলয় কিছুক্ষণ এদিক ওদিক সরে যাবার চেষ্টা করলো। তারপর এক সময় গুরুদেব খপ করে ধরে ফেললো তার ঘাড়।

খুব জোরে তার মাথায় একটা গাঁট্টা মেরে গুরুদেব বললো, ইঃ, রাজপুত্তুরের দেখছি আবার পালাবার শখ হয়েছে!

সেই এক গাঁট্টাতেই মলয় একেবারে চোখে অন্ধকার দেখলো। লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

গুরুদেবের গায়ে দারুণ জোর। মলয়কে এক হ্যাঁচকা টানে নিজের কাঁধের ওপর ফেলে দুম্ দুম্ করে হেঁটে চললো বাড়ির দিকে। মনে মনে কী যেন বিড়বিড় করে বলছে।

মলয়ের মুখটা গুরুদেবের পিঠের ওপর ঝুলছে। দোলানিতে মাঝে মাঝে তার নাকটা ঘষে যাচ্ছে গুরুদেবের পিঠে। কী বিচ্ছিরি গন্ধ ওর গায়ে। গুরুদেব নিশ্চয়ই গাঁজা খায়।

এক একবার একটা কী যেন লোহার জিনিস লাগছে মলয়ের মুখে। আস্তে আস্তে সে চোখ মেলে তাকিয়ে জিনিসটা কি দেখার চেষ্টা করলো। ওঃ, এ তো একটা চাবি, গুরুদেবের পৈতের সঙ্গে বাঁধা। পৈতেটা ঘুরে চাবিটা পিঠের দিকে চলে এসেছে।

কিসের চাবি কে জানে! খুব সাবধানে মলয় পৈতের গিঁট খুলে চাবিটা বার করে নিল। তারপর টপ করে মুখে পুরে ফেললো সেটা।

গুরুদেব দোতলায় উঠে এসে মলয়কে ধপ করে ছুঁড়ে ফেললো মাটিতে। তারপর বললো, চাবি কোথায়? দাও চাবি—

মলয়ের বুকটা কেঁপে উঠলো, এর মধ্যেই টের পেয়ে গেছে যে চাবিটা ওর পৈতে থেকে খুলে নেওয়া হয়েছে। পরের মুহূর্তেই মলয় বুঝতে পারলো, গুরুদেব ঘরের তালার চাবি চাইছে।

মলয় কোনো কথা বললো না। গুরুদেব নিজেই মলয়ের পকেটে হাত ঢুকিয়ে চাবিটা বার করলো, তারপর অন্য সব পকেটও দেখে নিল আর কিছু আছে কিনা। আর কিছুই নেই।

গুরুদেবের আওয়াজ পেয়েই বিলায়েতি কাঁদতে আরম্ভ করে দিয়েছে। দরজা খুলে গুরুদেব এক হাতে তার চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে বাইরে আনলো। বিলায়েতি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, হুজুর, এবারের মতন ছেড়ে দিন। এ ছেলেটা মহা বিচ্ছু!

গুরুদেব হুংকার দিয়ে বললো, চুপ! আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন। আর এই ছেলেটাকে আমি কাল রাত্তিরে মজা টের পাওয়াবো! আজ রাত্তির থেকে ওর খাওয়া বন্ধ।

মলয়কে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ফেলে দরজা বন্ধ করে চলে গেল তারপর। মলয় তখনও মুখ দিয়ে একটুও শব্দ করলো না।

৭

কে যেন একজন জানালার বাইরে থেকে উঁকি মারলো মলয়ের ঘরের মধ্যে। মলয় চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলো, কে? কে?

লোকটি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললো, চুপ! আমি বন্ধু!

আপনি এখানে উঠলেন কী করে?

দেয়াল বেয়ে!

আপনি আমাকে চেনেন?

বাঃ, মলয়কুমারকে চিনবো না? তোমার বাবাই তো আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি হচ্ছি ডিটেকটিভ রাম ঢ্যাং!

রাম ঢ্যাং! এরকম কোনো ডিটেকটিভের নাম আগে শুনিনি তো!

যার নাম কেউ জানে না, সেই তো সবচেয়ে বড় ডিটেকটিভ। চোর ডাকাতরাও যদি নাম জেনে ফেলে, তা হলে আর ডিটেকটিভের বাহাদুরী কি রইলো? এ মাসে আমার নাম রাম ঢ্যাং, গত মাসে আমার নাম ছিল লক্ষ্মণ চূড়ামণি। বিশ্বাস না হয়, তোমাকে আমার ভিজিটিং কার্ড দেখাতে পারি।

না, না, তার দরকার নেই এখন। আপনি এরকমভাবে জানালা ধরে কতক্ষণ ঝুলবেন।

সে জন্য চিন্তা নেই কিছু। আমি সেলোটেপ দিয়ে দেয়ালের সঙ্গে নিজেকে আটকে নিয়েছি।

আমাকে এখান থেকে শিগগিরই উদ্ধার করুন!

ব্যস্ত হচ্ছো কেন? আগে ডাকাতগুলোকে ধরবো, না তোমাকে উদ্ধার করবো!

আগে আমাকে। আমার আর এখানে থাকতে একটুও ভালো লাগছে না। আপনি আসতে এত দেরী করলেন কেন? ছ' দিন হয়ে গেল—

কী করবো বলো! আমার কুকুরটার সর্দি হয়েছিল, তাই সে গন্ধ শুঁকতে পারছিল না কিনা!

আমাকে এখান থেকে কী করে বার করবেন?

চুপচাপ শুধু দেখে যাও। ম্যাটার অফ টু মিনিটস্!

ডিটেকটিভ বেশ রোগা আর লম্বা। গায়ে একটা ওভারকোট। নাকের নীচে ছুঁচোলো গোঁফ, চোখে কালো চশমা। কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি। তিনি নীচু হয়ে পায়ের মোজা থেকে একটা সিগারেট ধরাবার লাইটার বার করলেন। তারপর লাইটারটা জেলে আগুনটা ছোঁয়ালেন জানালার শিকে।

মলয় নিরাশ হয়ে বললো, এতে কি হবে?

ডিটেকটিভ বিজ্ঞের হাসি হেসে বললেন, দেখোই না! এটাকে কি সাধারণ লাইটার ভেবেছো। এর মধ্যে অক্সি-অ্যাসিটিলিন গ্যাস ভরা আছে—এর আগুনে লোহা তো ছেলে মানুষ, ইস্পাত পর্যন্ত গলে যাবে।

খানিকক্ষণ লাইটারের শিখাটা জানালার একটা শিকের ওপরে আর নীচে ছুঁইয়ে সেটাকে বন্ধ করে দিলেন। এবার পকেট থেকে এক জোড়া গ্লাভস বার করে হাতে পরে নিলেন। গ্লাভস পরা হাতে শিকটা ধরে টান দিতেই সেটা প্যাকাটির মতন ভেঙে গেল।

তিনি বললেন, দেখলে তো। এটা হাতে রাখো, এটা দিয়ে লাঠির কাজ চলবে। জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসো, তারপর নীচে লাফিয়ে পড়ো।

মলয় নীচের দিকে ঝুঁকে বললো, এত ওপর থেকে লাফাবো কী করে! আমার পা ভেঙে যাবে।

কোনো ভয় নেই। পা ভেঙে গেলেও আমার কাছে সারিয়ে দেবার ওষুধ আছে!

না, আমি পারবো না। আমার ভয় করছে।

এ হে! তুমি বড্ড দেরী করিয়ে দিচ্ছো। আচ্ছা, আর একটা জিনিস দিচ্ছি।

ওভারকোটের পকেট থেকে তিনি একটা ফোল্ডিং ছাতা বার করলেন। সেটা খুলে মলয়ের হাতে দিয়ে বললেন, এবার লাফাও, ভাসতে ভাসতে আস্তে আস্তে নেমে যাবে।

নীচে যে একটা মস্ত বড় কুকুর রয়েছে।

ও কিছু বলবে না। ও আমার কুকুর টোটো।

টোটো তো আমার কুকুরের নাম। আপনার কী করে হবে।

এখন তর্ক করো না তো। লাফাও।

মলয় চোখ কান বুজে লাফ দিল। পড়ছে তো পড়ছেই, মাটিতে আর পৌঁছোচ্ছে না। এত দেরী লাগছে কেন? এ কি, মলয় নীচের দিকে নামবার বদলে যে ওপরে উঠে যাচ্ছে। হাওয়ার টানে ছাতাটা শোঁ শোঁ করে দূরে চলে যাচ্ছে।

মলয় ধড়মড় করে জেগে উঠলো। কোথায় ডিটেকটিভ? কোথায় ছাতা? সে সব কিছুই না। মলয় এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল। অথচ একদম সত্যি মনে হচ্ছিল।

কোনো ডিটেকটিভ মলয়ের জন্য আসবে না। তাকে শেষ পর্যন্ত এখানেই মরতে হবে।

তখন হঠাৎ তার মনে পড়লো সেই চাবিটার কথা। যেটা গুরুদেবের পৈতে থেকে খুলে নিয়েছিল। মলয় সেটা মুখে ভরে রেখেছিল, তারপর ঘরে ঢুকে জল দিয়ে সেটা ধুয়ে রেখে দিয়েছিল তার বই খাতার ব্যাগে।

এবার উঠে গিয়ে সেই চাবিটা বার করলো। তার পায়ের শেকলের তালাতে সেটা লাগাতেই খুলে গেল কুট করে। এতে যে মলয়ের কতটা আনন্দ হলো, তা অন্য কেউ বুঝতে পারবে না। গত বছর স্কুলের পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েও তার এতটা আনন্দ হয়নি। এতক্ষণ যেন সে কোনো জন্তু-জানোয়ারের মতন বন্দী ছিল, এখন সে বন্দী থাকলেও মানুষের মতন বন্দী। খোলা পায়ে মলয় ঘরের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করে নিল খানিকক্ষণ। তারপর ভাবতে বসলো।

গুরুদেব যখন দেখবে তার পৈতের সঙ্গে চাবি বাঁধা নেই, তখন কী হবে? যদি আর একটা তালা লাগিয়ে দেয়? তবে, গুরুদেব কিছুতেই সন্দেহ করতে পারবে না যে মলয় চাবিটা নিয়েছে। গুরুদেব তো তার পকেট সার্চ করেছিল। গুরুদেব নিশ্চয়ই ভাববে চাবিটা অন্য কোথাও খুলে পড়ে গেছে।

যাই হোক, তাড়াতাড়ি একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু দরজা যে বন্ধ। কিছু একটা ভেবে মলয় আবার পায়ে শিকলটা পরিয়ে চাবি বন্ধ করে দিল।

পরদিন সকালে দরজা খুললো অন্য একজন লোক। এই লোকটা গুরুদেবের সঙ্গে একদিন চাবুক হাতে এসেছিল। আজ তার হাতে একটা লম্বা মতন পিস্তল।

রিভলবার-বন্দুক দেখে অন্য যে-কেউ ভয় পেতে পারে, কিন্তু মলয় বিশেষ গ্রাহ্য করলো না। তাদের বাড়িতেও তিন চারটে রিভলবার-বন্দুক আছে, সে নিজেও ওসব হাতে নিয়ে দেখেছে, গুলিও ছুঁড়েছে। সে জানে, একটু দূর থেকে পিস্তলের গুলি কারুর গায়ে লাগানো খুব সহজ নয়।

লোকটা বললে, তোমার জন্য বিলায়েতির কী হয়েছে জানো? গুরুদেব তাকে মারতে মারতে আধমরা করে ফেলেছে। আরও শাস্তি বাকি আছে।

মলয় বললো, বেশ হয়েছে! ওর জন্যে আমিও মার খেয়েছি।

হুঁ। দ্যাখো রাজপুত্তুর, আমার সঙ্গে কিন্তু ওসব চালাকি করতে এসো না! আমি ছোট ছেলেদের মারধোর করা পছন্দ করি না। কিন্তু যদি আমার রাগ হয়ে যায়, তা হলে কিন্তু আমি মারতে মারতে একেবারে—

মলয় তাকে বাধা দিয়ে বললো, তোমাদের আর মারতে হবে না। আমার অসুখ হয়েছে, দু' এক দিনের মধ্যে আমি নিজেই

মরে যাবো।

কী অসুখ হয়েছে?

আমার মাথায় ভীষণ ব্যথা। তোমাদের গুরুদেব কাল আমার মাথায় এমন মেরেছে যে আমি আর মাথা তুলতে পারছি না।

লোকটা বিড়বিড় করে বললো, গুরুদেবটা বড্ড বদ-মেজাজী। যখন তখন সবার গায়ে হাত তোলে। একদিন আমার গোঁফ টেনে ছিঁড়ে দিয়েছিল। ইস, এইটুকু দুধের ছেলেকে কেউ এত মারে?

লোকটা কাছে এসে মলয়কে দেখলো ভালো করে। তারপর বললো, হুঁ, চোখ দুটোও তো লাল হয়েছে দেখছি! দেখি গুরুদেব কী বলেন?

লোকটা দরজা বন্ধ করে চলে গেল। একটু বাদে নিয়ে এলো গুরুদেবকে।

মলয় চোখ বুজে শুয়ে আছে। ভয়ে তার বুক কাঁপছে। গুরুদেবের যদি চাবির কথাটা মনে পড়ে যায়? যদি আবার ঘরের মধ্যে খুঁজে দেখার হুকুম করে।

গুরুদেব কাছে এসে বললো, কী হয়েছে?

মলয় বললো, ব্যথা। ভীষণ ব্যথা। আমি মরে যাবো।

ইঃ, মরে যাওয়া অত সহজ! অমাবস্যার পুজোর আগে মরলেই হলো? দেখি জিভ দেখি!

গুরুদেব মলয়ের চোখ দেখলো, জিভ দেখলো, নাড়ী দেখলো। তারপর বললো, বিশেষ কিছু না, ঠান্ডা লেগেছে মনে হচ্ছে। একদিন শুয়ে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে। আমি একটা ওষুধ দিচ্ছি! আজকের দিনটাও আর কিছু খাবার দরকার নেই!

মলয় রাগ করে উপুড় হয়ে শুলো। কথায় কথায় এরা খাবারটা বাদ দিয়ে দেয়। অসুখ হলে খাবার বন্ধ করে দেবার কথা মলয় জন্মে শোনে নি। কৃপণ ডাকাত কোথাকার! খিদেতে মলয়ের পেট জ্বলে যাচ্ছে, তবু সে মুখ ফুটে কিছু চাইবে না এদের কাছে।

খানিকটা বাদে পিস্তলধারী লোকটা গুরুদেবের ওষুধ নিয়ে এসে বললো, খেয়ে নাও খোকাবাবু! গুরুদেবের ওষুধের খুব জোর। একবার ওনার ওষুধ খেয়ে আমি আমার হারানো গরুটাকে পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছিলুম।

মলয় কোনো কথা বললো না। লোকটা চলে যেতেই ওষুধটা ফেলে দিল জানালা দিয়ে। এত খিদে পেয়েছে যে ইচ্ছে করছে বেল্টটাকে চিবিয়ে খেতে। কিন্তু সোনাপুরার রাজবাড়ির ছেলেকে ওসব কিছু করলে মানায় না। সে না খেয়ে মরে গেলেও ওরকম কিছু করবে না!

সারাদিন সে শুয়ে রইলো। মনে মনে ছটফট করতে লাগলো, কখন সন্ধে হবে, কখন অন্ধকার নামবে। অন্ধকার না হলে কিছুই করা যাবে না। এবারও যদি সে ধরা পড়ে, তা হলে আর কোনো আশা নেই।

শুয়ে শুয়ে সব সময় খালি খাবার দাবারের কথা মনে পড়ে। দূর ছাই! যতবার সে স্কুলের কথা, মা-বাবার কথা ভাবার চেষ্টা করে, ততবারই শুধু মনে পড়ে যায়, স্কুলের বন্ধুরা তার বাড়িতে এলে কী কী খাবার দেওয়া হয়েছিল। মা-বাবার সঙ্গে কবে কোন্ হোটেলে গিয়ে কী কী ভালো খাবার খেয়েছে। ইস, মলয় কি শেষ পর্যন্ত হ্যাংলা হয়ে যাচ্ছে নাকি?

এক সময় দিনের আলো মিলিয়ে গিয়ে অন্ধকার নেমে এলো। তখন মলয় খাট থেকে নামলো। জানালা দিয়ে তাকালো বাইরে। আকাশটা আজ মেঘলা, জ্যোৎস্নাও ওঠেনি।

ঘরটা অন্ধকার ছিল, টুপ করে কে আলো জ্বাললো বাইরে থেকে। মলয় আবার খাটে শুয়ে পড়ে উঃ আঃ শব্দ করতে লাগলো।

পিস্তল হাতে নিয়ে দরজা খুললো সেই লোকটা। মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে?

মলয় অতিকষ্টে জবাব দিল, ভীষণ পেট ব্যথা করছে। আমি আর থাকতে পারছি না।

গুরুদেবকে ডাকবো?

আমি একটু বাথরুমে যাবো।

উঠে এসো তা হলে।

আমি উঠতে পারছি না।

লোকটা এক হাতে পিস্তল বাগিয়ে ধরে আর এক হাত দিয়ে মলয়কে ধরে খাটিয়া থেকে নামালো। মলয় যেন দাঁড়াতেই পারছে না, ঢলে পড়লো তার গায়ে।

লোকটা বললো, চলো, আমি তোমাকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছি!

তারপর আপন মনেই বললো, আহা রে, ক' দিনেই ছেলেটা বড্ড রোগা হয়ে গেছে।

মলয় ভাবলো, এই লোকটা যদিও চাবুক কিংবা পিস্তল নিয়ে আসে, তবু মানুষটা খারাপ নয়। কিন্তু ডাকাতদের দলে যোগ দিয়েছে যখন, শাস্তি পেতেই হবে।

মলয়কে ধরে ধরে লোকটা নিয়ে এলো বাথরুমের দরজার কাছে। তারপর বললো, তোমার বাবা তো টাকাটা দিয়ে দিলেই পারে!

মলয় বললো, যদি মরে যাই, তা হলে কি টাকা পাবেন?

লোকটি বললো, মরবে কেন? বালাই ষাট, ও রকম অলুক্ষণে কথা বলতে নেই। তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। গুরুদেব তোমাকে কালী ঠাকুরের কাছে বলি দেবেন শুনে ভয় পাচ্ছো? ওটা মিছিমিছি বলেছেন। তোমার চোখ দুটো শুধু অন্ধ করে দিলেই হবে। মারতে হবে কেন?

মলয় আঁতকে উঠে বললো, অ্যাঁ?

লোকটি বললো, কত লোকের তো চক্ষুরত্ন থাকে না। তা বলে তারা কি বেঁচে থাকে না? আমাদের দিকটাও তো দেখতে হবে। তুমি যদি আমাদের শেষকালে চিনিয়ে দাও পুলিশের কাছে।

তোমরা তো ডাকাত। তোমাদের তো পুলিশে ধরাই উচিত।

ছিঃ, ও কী কথা। বাড়িতে আমার বউ ছেলে মেয়ে আছে, তারা যে না খেয়ে মরবে। গুরুদেবের কাছে আমার সাত শো টাকা ধার আছে, সেটাই বা শোধ করবো কী করে?

বাথরুমের দরজার কাছে গিয়ে মলয় বললো, আমার মাথা ঘুরছে, ভীষণ মাথা ঘুরছে। তোমরা আমাকে অন্ধ করে দিও না, তার বদলে মেরেই ফেলো।

লোকটি বললো, ওসব কথা এখন থাক। এখন তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠো তো! ভেতরে নিজে নিজে যেতে পারবে, না আমি ধরবো?

মলয় অতি কষ্টে বললো, না, আমি নিজেই পারবো।

ভেতরে ঢুকে মলয় দরজা বন্ধ করে দিল।

এর আগে মলয় কখনো মিথ্যে কথা বলেনি, লোকের সঙ্গে অভিনয় করে নি। কয়েকটা দিন বন্দী থেকে আর প্রাণের ভয় পেয়ে মলয় নিজে থেকেই এসব শিখে নিয়েছে। বাইরের লোকটি সত্যিই বিশ্বাস করেছে যে মলয়ের খুব অসুখ।

দরজা বন্ধ করেই মলয় চট করে নীচু হয়ে খুলে ফেললো পায়ের শিকলটা। দেয়ালে একটা আংটার গায়ে সেটা ঝুলিয়ে দিল। তারপর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে সে চলে এলো জানলার কাছে। এখান থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে যদি পা ভাঙতেও হয়, তাতেও সে রাজি। লোকগুলো বলে কী, তাকে প্রাণে না মেরে চোখ অন্ধ করে দেবে? হাসতে হাসতে বলে কথাগুলো!

এই জানলার যে শিক ভাঙা সেটা মলয় আগেই দেখে রেখেছিল। সেখান থেকে মাথা গলিয়ে বাইরে এসে দেখলো পাশেই একটা পাইপ রয়েছে। ময়লা জলের পাইপ, মাঝে মাঝে ফাটা ফাটা আর এমন ঝুরঝুরে চেহারা যে মনে হয় হাত দিলেই ভেঙে যাবে। তবু মলয় সেটা ধরেই ঝুলে পড়লো। ভার সামলাতে পারলো না, খুব জোরে সর সর করে নেমে গেল নীচে, ধপ করে পড়লো মাটিতে। তার তো আর পাইপ বেয়ে নামার অভ্যাস নেই। এত জোরে নামার জন্য তার দু' হাতের ছাল চামড়া উঠে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে, আর কোনো ক্ষতি হয় নি।

এখন আর এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। উঠেই সে দৌড়োলো।

মলয় এত জোর দৌড়োচ্ছে যে এখন সে বোধহয় এমিল জেটোপেক কিংবা মিলখা সিংকেও হারিয়ে দিতে পারে। এর আগে কখনো সে খালি পায়ে হাঁটেনি—তাদের নিজেদের বাড়ির ভেতরেও সব সময় চটি পরে থাকা নিয়ম। এখন সে পায়ের তলায় ইঁট পাথর কাদা কিছুই গ্রাহ্য করছে না।

মলয় ছুটছে দূরের নদীর পারের বাড়িগুলো লক্ষ্য করে। কিন্তু ওপরের জানলা থেকে বাড়িগুলো যতটা দূরে মনে হয়েছিল, এখন মনে হচ্ছে তার থেকেও দূরে।

একবার সে পেছন ফিরে তাকালো। এখনো তো মনে হচ্ছে কেউ কিছু টের পায় নি। কোনো রকম সাড়া শব্দ নেই। বাথরুমের দেয়ালে ঝোলানো শেকলটা হাওয়ায় নড়ে যদি টুং টাং শব্দ হয়, তা হলে বাইরে দাঁড়ানো লোকটা আর কিছু সন্দেহই করবে না। তারপর দু' একবার ডেকে মলয়ের সাড়া না পেলে ভাববে যে মলয় বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেছে। তখন দরজা ভেঙে দেখবে নিশ্চয়ই। তাতে অনেকটা সময় পাওয়া যাবে।

খানিকটা দূর যাবার পর মলয় অন্ধকারের মধ্যে দু'জন লোকের গলার আওয়াজ পেল। ওদের মধ্যে একজন একটা গান গাইছে, 'এবার কালী তোমায় খাবো—'।

অন্ধকারে লোক দুটোর মুখ দেখা যায় না। মলয় চট করে সরে গিয়ে মাঠের মধ্যে শুয়ে পড়লো। আজ সে কিছুতেই ধরা দেবে না। লোক দুটো যদি এদিকে টর্চের আলোও ফেলে, তা হলেও উঠে এঁকে বেঁকে দৌড়োবে। ওরা গুলি ছুঁড়লেও যাতে গায় না লাগে।

লোক দুটো কিছুই সন্দেহ করেনি। গান গাইতে গাইতে চলে গেল মলয়কে ছাড়িয়ে। মলয় আবার উঠে পড়লো।

আরও কিছুক্ষণ দৌড়োবার পর মলয় শুনতে পেল পেছনে সেই বাড়িটায় গোলমাল শোনা যাচ্ছে। একটা কুকুর ডেকে উঠলো ঘেউ ঘেউ করে। তা হলে কি ওরা টের পেয়ে গেছে? এখন ওরা তাড়া করলেও আর মলয়কে ধরতে পারবে না।

এবার এদিক থেকেও কুকুর ডাকছে। মলয় নদীর ধারে সেই বাড়িগুলোর কাছাকাছি এসে পড়েছে। এটা একটা ছোটখাটো গ্রাম। এদিকে ওদিকে ছড়ানো কয়েকটা বাড়ি। সবগুলোই খড় মাটির ঘর, দু' একটাতে শুধু টিনের চাল। এখানে গরীব লোকেরা থাকে।

প্রথম বাড়িটার দরজাতেই মলয় ধাক্কা দেবে ভেবেছিল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল সংগে সংগে। ওরা খুঁজতে এসে নিশ্চয়ই আগে এই বাড়িটাই দেখবে। মলয় চুপি চুপি সেই বাড়িটা পার হয়ে গেল। তারপর পাশাপাশি দুটো বাড়ি। সে বাড়ি দুটোও মলয়ের পছন্দ হলো না। আবার এগিয়ে গেল সে।

কাদায় প্যাচপেচে সরু রাস্তা। লোকজন বিশেষ নেই। এরা বোধহয় সন্ধে হতে না হতেই ঘুমিয়ে পড়ে। এক জায়গায় দেখলে একটা বাড়ির সামনের উঠোনে চৌকি পেতে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে চারপাঁচজন লোক তাস না কি যেন খেলছে।

মলয় পা টিপে টিপে চলে গেল সেখান থেকে। এখন মানুষজন দেখলেই তার ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে, সবাই তার শত্রু। সেই কাপালিকের মতন চেহারার গুরুদেব এসে এদের ভয় দেখালে এরা নিশ্চয়ই তাকে ধরিয়ে দেবে।

মলয় আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল যে একবার পালাতে পারলে সে এই বাড়িগুলোর একটাতে আশ্রয় নেবে। কিন্তু এখন কোনো বাড়িতেই সে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না। এখানে সে রকম বড় বাড়ি তো একটাও নেই—যে-কোনো বাড়িতে গুরুদেব তার দলবল এনে একবার ঢুকলেই তাকে দেখে ফেলবে। গুরুদেবকে কি এরা কেউ বাধা দিতে পারবে?

বাড়িগুলো ছাড়িয়ে মলয় নদীর ধারে চলে এলো। না, কোনো বাড়িতে সে যাবে না। নদীর ধারেই বসে থাকবে। এদিক দিয়ে যদি কোনো নৌকো টৌকো যায়, তা হলে নৌকোর মাঝিকে বলবে, তাকে কোনো ভালো জায়গায় পেঁৗছে দিতে। কিন্তু তার কাছে তো পয়সা নেই, মাঝিরা তার কথা শুনবে কি? সরকারবাবুকে সে কতবার বলেছে, তাকে কটা টাকা দিতে, কিছুতেই দেয় না। মলয় এখন পৃথিবীর সবচেয়ে গরীব লোকের চেয়েও বেশী গরীব।

নৌকোর মাঝিদের যদি সে খুব কাকুতি মিনতি করে, তা হলেও কি তারা শুনবে না? বিনাপয়সায় কেউ কি কোনো উপকার করে না? আচ্ছা, আগে একটা নৌকো আসুক তো, তারপর দেখা যাবে। হে ভগবান, গুরুদেবরা এসে পড়বার আগেই তুমি এখানে একটা নৌকো এনে দাও।

নদীর এদিক ওদিক তাকিয়েও মলয় কোনো নৌকোর আলো দেখতে পেল না। তবু তাকে বসে থাকতেই হবে।

এতখানি একটানা ছুটে আসার জন্য মলয়ের নাক চোখ জ্বালা করছে। ক'দিন ধরে ভালো করে খায়নি, শরীর খুব দুর্বল, সে আর কিছুতেই বসে থাকতে পারছে না! তার চোখ টেনে আসছে, খুব ইচ্ছে করছে শুয়ে পড়তে। জোর করে নিজেকে জাগিয়ে রাখতে চাইছে। এখানে এখন ঘুমিয়ে পড়লে সে ঠিক আবার ধরা পড়ে যাবে! আর পারা যাচ্ছে না, ওরা তাকে ধরুক, ধরে নিয়ে গিয়ে এবার চোখ অন্ধ করে দিক্—যা খুশি করুক। আ—

কে ওখানে?

মলয় দারুণ চমকে গেল, ধড়মড় করে উঠে বসলো। একটুক্ষণের জন্য তার চোখ বুজে এসেছিল। সে দেখলো, দু'জন মাঝবয়েসী পুরুষ ও মহিলা হ্যারিকেন তুলে তার দিকে চেয়ে আছে।

মহিলাটি বললেন, তুমি কে গো?

মলয় নিজেকে সামলাতে পারলো না। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো। ছুটে এসে পুরুষটির হাত জড়িয়ে ধরে বললো, আমাকে বাঁচান, আমাকে বাঁচান, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।

লোকটি বললো, ওমা, এ তো ভদ্দরলোকদের ছেলে দেখছি। এখানে কী করে এলো?

মলয় বারবার বলতে লাগলো, আমাকে বাঁচান, বাঁচান!

এক কৃষক আর তার বউ রাত্তিরের খাবার খেয়ে নদীতে হাত ধুতে যাচ্ছিল, এই সময় তারা মলয়কে দেখতে পায়। মলয় তখন কিছুই ঠিক মতন বুঝিয়ে বলতে পারছে না। ওরা দু'জনে তাড়াতাড়ি মলয়কে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে এলো।

কৃষক আর তার বউ,—দু'জনেই খুব ভালো মানুষ। ওদের খুব মায়া দয়া। ওদের এক ছেলে আছে মলয়েরই বয়েসী, এক মেয়ে মলয়ের চেয়েও বড়, তার বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলেটির নাম নিত্যলাল। সে ঘরের মেঝেতে কাঁথা পেতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে উঠে চোখ রগড়াতে লাগলো।

ঘরের মধ্যে এসে মলয় তখনও কাঁপছে। কোনো রকমে বললো দরজা বন্ধ করে দিন, শিগগির দরজা বন্ধ করে দিন!

নিত্যলালের বাবা হরিচরণ বললো, ভয় কী বাবুভাই, এত ভয় পাচ্ছো কেন?

মলয় বললো, ওরা আমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

কারা তোমায় ধরতে আসবে?

ডাকাত!

হরিচরণের বউ ভানুমতী বললো, আহা, কাদের বাড়ির ছেলে যেন হারিয়ে গেছে গো। বাপ মায়ের মন কী রকম আকুপাকু করছে।

হরিচরণ হেসে বললো, ডাকাত আবার কোথায়? এখানে ডাকাত আসবে কোথা থেকে?

হ্যাঁ, আসবে! আপনি জানেন না।

তা আসবে তো আসুক না। আমার ঘরে লাঠি আছে না? আমি হাঁক দিলে আরও দু' চারখানা বাড়ি থেকে সবাই লাঠি নিয়ে আসবে। এ গাঁয়ে ডাকাত এলে ফিরে যেতে আর হবে না!

মলয় হরিচরণের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনারা ডাকাত নন তো?

হরিচরণ আবার হেসে বললো. না, বাবুভাই, তোমার কোনো ভয় নেই। আমরা গরীব চাষাভুষো মানুষ, আমাদের কি আর ওসব ঘোড়া রোগ মানায়?

ভানুমতী জিজ্ঞেস করলো, এত রাত্তিরে তুমি কোথা থেকে এলে? চারদিকে ধুধু করছে মাঠ—

মলয় বললো. দূরে মাঠের মধ্যে একটা বড় মতন ভাঙা বাড়ি আছে না? আমাকে সেখানে আটকে রেখেছিল।

ভানুমতী অবাক হয়ে চোখ বড় বড় করে বললো, ওটা তো ভূতুড়ে বাড়ি। ওখানে খোকা-ভূত থাকে—কত লোক দেখেছে!

না, ওখানে ভূতটুত কিছু নেই। ডাকাতদের আড্ডাখানা!

ওরা সকলে তখনও তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে মলয় ব্যাকুলভাবে বললো, আমি কিন্তু খোকা-ভূত নই। বিশ্বাস করুন, আমি ভূত নই। আমি মানুষ!

না, না, তুমি কেন ভূত হবে?

হরিচরণের ছেলে নিত্যলাল তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, একটা চিমটি কেটে দেখি তো!

বলেই সে মলয়ের ঘাড়ের কাছে একটা রাম চিমটি কাটলো।

মলয় যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলো উ উ করে।

নিত্যলাল তখন একগাল হেসে বললো, তা হলে ভূত নয় গো মা। ভূতেদের কখনো চিমটি কাটলে লাগে না।

নিত্যলালের মা ভানুমতী বললো, আ মরণ! এমন সোনার টুকরো ছেলে ভূত হতে যাবে কেন? যাদের অলক্ষ্মীর সংসার তাদের ছেলেপুলেরা ভূত হোক। আহা বাছার মুখটা শুকিয়ে গেছে একেবারে।

হরিচরণ বললো, ডাকাতরা তোমাকে খেতে টেতে দিয়েছিল তো? নাকি খিদে পেয়েছে?

কোনো বাড়িতে এর আগে খাবার কথা জিজ্ঞেস করলে মলয় কক্ষনো মুখ ফুটে কিছু বলে নি। খেতে রাজিই হতো না সাধারণত। আজ আর থাকতে পারলো না। ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে সে লাজুক ভাবে বললো, হ্যাঁ, আমার খুব খিদে পেয়েছে!

ভানুমতী কপাল চাপড়ে বললো, হায়, হায়, হায়। ঘরে যে কিছুই খাবার নেই। কেন আমরা আগে আগে খেয়ে ফেললাম!

হরিচরণ বললো, চিড়ে মুড়িও নেই?

না গো, কিছু নেই!

মলয়ের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। ঠিক হ্যাংলা ছেলের মতন তার এখন খিদের জন্য মন খারাপ লাগছে।

কিন্তু খাওয়ার সমস্যা নিয়ে তখন আর চিন্তা করা গেল না বেশিক্ষণ। বাইরে কয়েকজন লোকের গলার আওয়াজ আর একটা কুকুরের ডাক শোনা গেল।

মলয় বললো, ঐ এসেছে!

হরিচরণ বললো, রাতের বেলা এদিকে তো কেউ আসে না! কারা এলো সত্যি!

ভানুমতী বললো, বাইরে বেরিয়ে দ্যাখো না!

মলয় বললো, না, না, দরজা বন্ধ করে দিন।

হরিচরণ তার ছেলে নিত্যলালকে বললো, এই, তুই বাবু-ভাইকে নিয়ে গোয়াল ঘরে যা। আমি দেখছি—

নিত্যলাল মলয়কে নিয়ে দৌড়ে উঠোন পেরিয়ে গোয়াল ঘরে ঢুকলো। সেখানে একটা মস্ত বড় গরু দাঁড়িয়ে ভোঁস ভোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে। মাথায় বেশ বড় দুটো বাঁকানো শিং। অন্ধকারের মধ্যে তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। গরুর মতন শান্ত প্রাণীর চোখ অন্ধকারে একেবারে অন্যরকম দেখায়। মলয় কোনো দিন শিংওয়ালা গরুর এত কাছাকাছি আসেনি, তার গা ছমছম করতে লাগলো। যদিও এর চেয়ে বাইরের ভয়টাই বেশী।

নিত্যলাল খুব সহজ ভাবেই গরুটার গলার কাছে হাত দিয়ে

মলয় নিজেকে সামলাতে পারলো না। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো।

চুঃ চুঃ শব্দে আদর করতে লাগলো। তখন দেখা গেল গরুটা খুবই শান্ত।

এদিকে হরিচরণ ঘরের কোণে রাখা লাঠিটা হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। সেখানে তিন চারজন নতুন লোক ঘোরাফেরা করছে, তাদের সঙ্গে একটা মস্ত বড় কুকুর।

হরিচরণকে দেখেই গুরুদেব বললো, এই এদিকে শোনো তো—

হরিচরণ বাড়ির দরজা থেকে দু পা এগিয়ে বললো, হুজুর, কুকুরটা সরান। বিলিতি কুকুর দেখলে আমার বড্ড ভয় হয়।

এ কুকুর কিছু বলবে না। একটা কথা শুনে যাও।

হরিচরণ কাছে এগিয়ে গুরুদেবের সেই লাল রঙের কাপড় আর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা দেখে বললো, হুজুর যে সন্ন্যাসী, আগে বুঝতে পারি নি। দণ্ডবৎ! আসেন হুজুর, গরীবের বাড়িতে একটু পায়ের ধুলো দিন!

যে-লোকটা কুকুরের চেন ধরে ছিল, সে একটু দূরের অন্ধকারে সরে গেল। হরিচরণ এক পলক তার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলো।

গুরুদেব বললো, এখন সময় নেই। তুমি এদিক দিয়ে একটা বাচ্চা ছেলেকে যেতে দেখেছো? এই, দশ এগারো বছর বয়েস?

হরিচরণ নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করলো, কাদের ছেলে? দেখতে কী রকম?

ফর্সা গায়ের রং। খুব ফর্সা। বড় বড় চোখ, মাথায় অনেক চুল।

ফর্সা? হুজুর আমাদের এ গাঁয়ে তো ফর্সা ছেলে একটাও নেই।

আরে উজবুক, এ গাঁয়ের ছেলে নয়। দেখেছিস কিনা বল্!

ধমক খেয়ে হরিচরণ আরও কুঁকড়ে গিয়ে বললো, না, হুজুর। সে তো আমি কিছু দেখি নি। তবে—

তবে কী?

কিছুক্ষণ আগে যখন আমরা নদীতে হাত ধুতে বেরিয়েছি, তখন দেখলাম, কী যেন একটা নদীর পাড় দিয়ে ছুটে গেল—ঐ সেদিকে—আমি তখন চোখ বুজে বললাম রাম, রাম—রাত্তিরবেলা তো কত কিছুই বেরোয়—

গুরুদেব হরিচরণকে ধরে এক ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, কোন্ দিকে গেল? কতক্ষণ আগে?

আমরা তো অত টাইমের হিসেব জানি না। তা ধরুন গিয়ে আধা ঘণ্টা হতে পারে।

গুরুদেব লাফিয়ে উঠে বললেন, সেইটাই নিশ্চয়ই। চল্, চল্—ছোঁড়াটা পালাবে কোথায়!

হরিচরণ ওদের যাবার পথে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে ফিরে এলো বাড়িতে। তার বউ দরজা ফাঁক করে সব দেখছিল। হরিচরণ ঘরে ঢুকতেই বললো, তোমার কী সাহস, তুমি ওদের বাড়িতে আসতে বলছিলে?

হরিচরণ হেসে বললো, ওটা এমনি কথার কথা। ঐ সব লোক কখনো আমাদের বাড়িতে আসে! বললুম বলে, আরও এলো না!

তুমি ওকে পেন্নাম করলে কেন? ডাকাতদের কেউ পেন্নাম করে?

রাস্তায় ঘাটে কত লোককেই তো পেন্নাম করি। আমি কী জেনে বসে আছি, তেনাদের মধ্যে কে চোর আর কে ডাকাত? ওর চোখ দেখে মনে হলো, ছেলেটাকে পেলে বোধহয় ছিঁড়েই খেয়ে ফেলতো।

আমি বার বার ঠাকুরের নাম জপ করেছি। ঠাকুরই ওকে বাঁচিয়েছে। ছেলেটাকে এবার ডাকি?

নিত্যলাল মলয়কে নিয়ে এ ঘরে আবার ফিরে এলো। হরিচরণ বললো, আর তোমার ভয় নেই বাবুভাই। ওনারা চলে গেছেন।

মলয় দরজার দিকে তাকিয়ে বললো, যদি আবার ফিরে আসে

আর আসবে না! এখন আমরা দরজায় কুলুপ এঁটে ঘুমিয়ে থাকবো।

হরিচরণ তার বউয়ের দিকে ফিরে বললো, একটা দুঃখের কথা কি জানো? বিলায়েতি দাসটাও ডাকাতদের দলে যোগ দিয়েছে।

মলয় দারুণ চমকে উঠে বললো, বিলায়েতি আপনার চেনা?

হরিচরণ বললো, চেনা তো বটেই। পীরগঞ্জের হাটে ওকে আমি গরু-ছাগল কেনাবেচা করতে দেখেছি। এখন বুঝি ছেলে বিক্রির ব্যবসা ধরেছে। ভেবেছে, আমি ওকে দেখতে পাইনি, তাড়াতাড়ি আঁধারে সরে গেল। আমি কিন্তু এক নজর দেখেই চিনেছি।

মলয় উত্তেজনা গোপন করার চেষ্টা করে আবার জিজ্ঞেস করলো, এটা কোন্ ডিস্ট্রিক্ট? মানে, ইয়ে, কোন্ জেলা?

সেটাও জানো না? এটা হলো যে মুর্শিদাবাদ জেলা।

মলয় তাড়াতাড়ি মুর্শিদাবাদ আর পীরগঞ্জ এই নাম দুটো মনে মনে তিন চারবার বলে নিল। নাম দুটো তার মুখস্থ রাখা দরকার, পরে কাজে লাগতে পারে।

হরিচরণ বললো, যাক, এখন আর কথাবার্তার দরকার নেই। ছেলেটাকে কিছু খেতে দাও!

ভানুমতী বললো, কী যে খেতে দেবো, তাই তো ভাবছি। একটুখানি ভাত ছিল, তাতেও তো জল দিয়ে ফেলেছি। তাই খাবে?

হরিচরণ বললো, কী যে বলো! বাবুদের বাড়ির ছেলে কখনো পান্তা ভাত খেতে পারে?

মলয়ের ইচ্ছে হলো, চিৎকার করে বলে, পারবো, ঠিক পারবো। তোমরা এখন আমাকে যা খেতে দেবে, তাই-ই পারবো। আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে!

নিত্যলাল বললো, কেন খাবে না, মা! পান্তা ভাত তো খুব ভালো লাগে।

ভানুমতী বললো, তাই দিই খানিকটা, দেখুক খেয়ে। তুই একটা লেবু নিয়ে আয় তো।

ওদের বাড়ির উঠোনেই একটা লেবু গাছ। নিত্যলাল দৌড়ে গিয়ে একটা লেবু ছিঁড়ে নিয়ে এলো। ভানুমতী সেই লেবু কেটে এক বাটি পান্তা ভাতের মধ্যে কচলে দিলো। তারপর বললো, নুন মেখে খেয়ে দেখো তো দেখি!

সেই পান্তা ভাত এক গেরাস মুখে দিয়ে মলয় রীতিমতন অবাক হয়ে গেল! এত চমৎকার খেতে হবে, সে ভাবতেই পারে নি। এত ভালো ভালো খাবার থাকতেও তার বাড়িতে প্রত্যেকদিন একঘেয়ে ডিম, ছানা আর সন্দেশ দেয় কেন? ফিরে গিয়েই বলতে হবে এই কথাটা। এটা কী সুন্দর নোনতা নোনতা টক টক জল মেশানো ভাত। শুধু যে মলয়ের খুব খিদে পেয়েছে, আর এরা খুব আগ্রহ করে দিয়েছে বলেই তার ভালো লাগছে, তা নয়। সত্যি অন্যরকম ভালো।

ওরা তিনজনেই এক দৃষ্টে মলয়ের খাওয়া দেখছিল। মলয় একেবারে চেটেপুটে বাটিটা শেষ করার পর ভানুমতী বললো, আহা রে, বড্ড খিদে পেয়েছিল গো!

বেশ কয়েকদিন পর পেট ভরে খেয়েছে বলে মলয়ের এখন ঘুমে চোখ টেনে আসছে। কিন্তু এখনো তার বিপদ কাটে নি।

হরিচরণ বললো, যাও বাবুভাই, তুমি হাত ধুয়ে এসো। ওগো, তুমি ওর শোবার জায়গা করে দাও একটা।

ভানুমতী বললো, আর তো বিছানা নেই। আমাদের ছেলেটার বিছানাতেই আর একটা বালিশ পেতে দিই।

মলয় বললো, তার কিছু দরকার নেই। আমি ঘুমোবো না।

ওমা ঘুমোবে না কেন? তুমি বুঝি আলাদা বিছানা ছাড়া ঘুমোতে পারো না? তুমি তা হলে খাটের ওপর আমাদের বিছানায় শোও! আমরা নীচেই শুচ্ছি।

না, না, আমি সেজন্য বলছি না। আমি সারা রাত জেগে বসে থাকবো। ওরা যদি আবার ফিরে আসে?

হরিচরণ বললো, তোমার সেজন্য চিন্তা করতে হবে না বাবুভাই। আমি বরং বারান্দায় বসে বসে একটু তামাক খাই। আমি তোমায় পাহারা দেবো। ফিরে আসুক না ব্যাটারা। লাঠির ঘায়ে ছাতু করে দেবো। আমার ঘরের অতিথিকে কেউ জোর করে নিয়ে যেতে পারে?

মলয় আর আপত্তি করতে পারলো না। তাড়াতাড়ি আঁচিয়ে এসে নিত্যলালের পাশে শুয়ে পড়লো। বিছানায় কোনো তোষক নেই, তেল চিটচিটে বালিশ, তাতে মাথা দিয়ে পড়তে না পড়তেই তার চোখ বুজে এলো। বহুদিন মলয় ভালোভাবে ঘুমোয় নি।

জানলা দিয়ে চোখে রোদ পড়ায় ঘুম ভাঙলো মলয়ের। পাশে তাকিয়ে দেখলো নিত্যলাল নেই। ঘরে কেউ নেই।

তখন মলয়ের একবার মনে হলো, সে যে একটা মাটির বাড়ির মেঝেতে শুয়ে আছে, এটা কি স্বপ্ন, না সত্যি? কাল রাত্তিরে সে কি সত্যিই ডাকাতদের আখড়া থেকে পালাতে পেরেছিল?

ড্যাম কুড় কুড়...
পুজোয় হরেক মজা
নতুন জামা, নতুন জুতো,
ঢাকের বাদ্যি, হৈ হুল্লোড়।
এ সময়েও কিন্তু কেউ ভোলেনা
বোরোলীন-এর কথা। লক্ষ্মী ছেলে,
দস্যি মেয়ে সবার চাই—
সুরভিত অ্যাণ্টিসেপটিক ক্রীম
বোরোলীন
কাটা-ছেঁড়া-ফাটা, রুক্ষ-শুষ্ক-বিবর্ণ
ত্বক সুস্থ সতেজ স্বাভাবিক। উৎসব
হল উদ্বেগহীন।
BOROLINE
জি, ডি,
ফার্মাসিউটিক্যালস
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৭০০০০৩
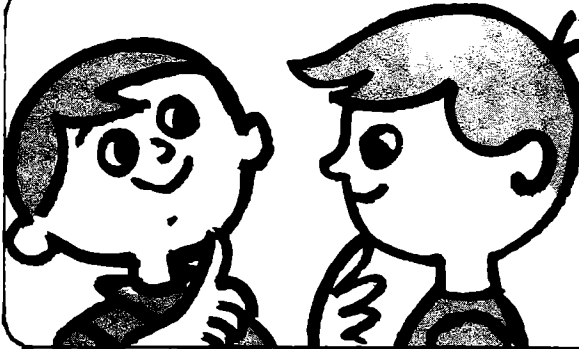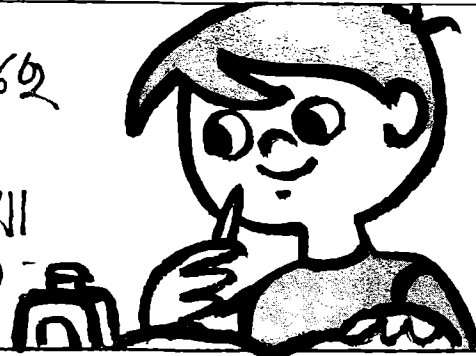
বাইরে পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে নানা রকম। একটা গরু খুব মিষ্টি গলায় হাম্বা করে ডেকে উঠলো। মলয় যে ঘরটায় শুয়ে আছে, তার দু দিকে দুটো দরজা, একটা মাত্র জানলা— সব দিকেই ঝকঝক করছে রোদ। মলয়ের মনে হলো, এটা যদি স্বপ্নও হয়, তাহলেও দুঃস্বপ্ন নয়।

তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে সে চলে এলো ভেতরের উঠোনের দিকে। এক কোণে গোয়াল ঘরটা সে দেখেই চিনতে পারলো।

নিত্যলাল আর তার মা সেখানে গরুর দুধ দুইছে। ভানুমতী তাকে বললো, আপনা-আপনি উঠে পড়লে? তোমার ঘুম ভাঙেনি বলে আর ডাকিনি তোমাকে।

বাড়ির সবাই জেগে উঠে কাজে লেগে গেছে, আর সে এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিল, এই ভেবে মলয় খুব লজ্জা পেয়ে গেল।

কিন্তু একটা রাত ভালো করে ঘুমিয়ে মলয়ের শরীরটা আবার বেশ ঝরঝরে হয়ে গেছে। একটুও ক্লান্ত ভাব নেই। দরজার পাশেই একটা ঘটিতে জল রাখা ছিল, তাই দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিল, খেয়েও ফেললো খানিকটা। বেশ তেষ্টা পেয়েছিল। তারপর দেখতে লাগলো দুধ দোওয়া।

ভানুমতী দুধ দুইছে আর নিত্যলাল অনেক কথা বলে যাচ্ছে। বালতিতে চ্যাঁ চোঁ করে শব্দ হচ্ছে দুধের, গরুটা খুব শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। নিত্যলাল তার মুখের সামনে একটা খড়ের তৈরী পুতুল ধরে আছে।

নিত্যলালই বললো যে এই গরুটার বাছুরটাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে, তাই খড় দিয়ে এই বাছুরের মতন পুতুলটা বানানো হয়েছে—এটা দেখলেই গরুটা এর গা চাটে।

কথাটা শুনে মলয় একটু শিউরে উঠলো। যদি সে সত্যিই আর কোনোদিন বাড়িতে না ফিরতে পারে, তা হলে তার মা-বাবাও কি তার মতন দেখতে একটা পুতুল বানিয়ে তাকে আদর করবে? উঃ, ভাবাই যায় না। হঠাৎ মা-বাবার জন্য তার ভীষণ মন কেমন করতে লাগলো।

হরিচরণ মাঠে চাষ করতে গেছে। সে অন্যের জমিতে চাষ করে। আর নিত্যলাল এই গরুর দুধ প্রত্যেকদিন সকালে বিক্রি করে আসে। আজ আর দুধ বিক্রি করতে গেল না। বাড়িতে কিছু খাবার নেই, মলয়কে তো কিছু খেতে দিতে হবে?

মলয় এত শত বোঝে না। গরম গরম দুধ খেতে তার দারুণ ভালো লাগলো। এমন মিষ্টি স্বাদের দুধ কখনো সে খায় নি। এই মাত্র যে দুধ দোয়া হলো, সেটাই তক্ষুনি গরম করে খাওয়া— আগে তো সে কখনো এরকম দেখেনি!

আর কোনো খাবার নেই, নিত্যলাল তাদের উঠোনের বেড়া থেকে কয়েকটা কচি শশা নিয়ে এলো। ভানুমতী সেগুলোই কেটে নুন মেখে দিল ওদের সামনে। দুধের সঙ্গে শশা—কী অদ্ভুত খাবার! তবু মলয় তা খেয়ে ফেললো মহানন্দে।

নিত্যলালের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল মলয়ের। নিত্যলাল ইস্কুলে যায় না। এক বছর মাত্র পাঠশালায় সে গিয়েছিল, কোনো-রকমে অ-আ-ক-খ আর এক দুই পড়তে লিখতে পারে। কিন্তু ইংরেজি জানে না এক বর্ণও। এ ছাড়া অন্য অনেক কিছু সে মলয়ের চেয়ে বেশী জানে। মলয় কি জানে, পুরুষ কোকিল আর মেয়ে কোকিল একদম আলাদা দেখতে হয়? শজারু মারতে হয় কলাগাছ দিয়ে? আর কচ্ছপ জলে থাকে বটে কিন্তু ডিম পেড়ে যায় ডাঙায় এসে?

ভানুমতী এসে বললো, এই নিত্য, বসে বসে গল্প করলেই হবে? জালটা নিয়ে নদীতে যা—দেখ্ যদি দু একটা মাছ ধরতে পারিস! বাবুভাইকে একটু ভালো করে খাওয়াতে হবে না!

মলয় ভাবলো, যারা মাছ ধরে তারা জেলে, যারা দুধ বিক্রি করে তারা গয়লা আর যারা চাষ করে তারা চাষী। এরা কি একই সঙ্গে তিন রকম?

নিত্যলাল তাকে জিজ্ঞেস করলো, যাবে, আমার সঙ্গে মাছ ধরতে?

মলয় তক্ষুনি রাজি। সে কোনোদিন মাছ ধরা দেখেনি। তারই বয়েসী একটা ছেলে জাল দিয়ে মাছ ধরতে পারে? এ তো দারুণ ব্যাপার।

একবার তার একটুক্ষণের জন্য মনে হলো বটে যে এক্ষুনি দিনের আলোয় তার বাইরে বেরুনো বোধহয় উচিত নয়। গুরুদেব আর তার লোকজন যদি কাছাকাছি থাকে কিংবা ফিরে আসে? কিন্তু এই চিন্তাটাও সে মন থেকে তাড়িয়ে দিল। দিনের আলোয় তেমন ভয় করে না—তাছাড়া কত লোকজন রয়েছে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ওদের মাছ ধরতে যাওয়া হলো না। নিত্যলাল সবে মাত্র খাটের তলা থেকে জালটা বার করেছে, এমন সময় দু জন লম্বা চওড়া লোক হাতে দুটো লাঠি নিয়ে ওদের উঠোনে এসে দাঁড়ালো। বাইরে থেকে ডাকেনি, সোজা ভেতরে ঢুকে এসেছে।

একজন লোক বাজখাই গলায় বললো, এই, হরিয়া কোথায়?

লোক দুটোকে দেখেই ভানুমতী আর নিত্যলালের মুখ শুকিয়ে গেছে। নিত্যলাল বললো, বাবা তো মাঠে গেছে।

যা ডেকে নিয়ে আয়!

নিত্যলাল জাল ফেলে ছুটে বেরিয়ে গেল। লোক দুটো গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো উঠোনে।

মলয় লোক দুটোকে দেখে প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিল। ভেবেছিল যে গুরুদেবের ডাকাতের দলেরই লোক বুঝি। কিন্তু ওরা মলয়ের দিকে একবার তাকালোও না।

ভানুমতী গরুটাকে বাইরে বোধহয় ঘাস খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছিল, লোক দুটো এক ধমক দিয়ে বললো, গরু কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? এইখানে থাকবে! এ গরু আজ আমরা নিয়ে যাবো।

ভানুমতী সে কথা শুনে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো। দু হাত দিয়ে আড়াল করে দাঁড়ালো গরুটাকে।

তারপর এক কাণ্ডই শুরু হয়ে গেল। হরিচরণ তার ছেলের সঙ্গে বাড়ি ফিরে এলো দৌড়োতে দৌড়োতে। সারা গায়ে কাদা মাখা। এসেই হাউমাউ করে কেঁদে লোক দুটোর পা জড়িয়ে ধরলো। লোকদুটো অনবরত ধমক দিতে লাগলো—অনেকক্ষণ ধরে চললো কান্না আর চেঁচামেচি।

মলয় ভালো করে ব্যাপারটা বুঝতেই পারছিল না। সব শুনে এইটুকু বুঝলো যে হরিচরণ লোকদুটোর কাছ থেকে টাকা ধার করে গরুটা কিনেছিল। অনেকদিন হয়ে গেল তবু টাকা শোধ দেয়নি, ওরা আজ গরুটাকে নিয়ে যেতে এসেছে।

মলয় আর একটা জিনিস বুঝতে পারলো না। কাল রাত্তিরে হরিচরণের কত সাহস দেখেছিল। ডাকাত এলেও সে বলেছিল, লাঠি নিয়ে দাঁড়াবে, পাড়ার লোকদের ডাকবে। আজ সে লাঠিও বার করছে না, পাড়ার লোকদেরও ডাকছে না। যারা টাকা ধার দেয় তারা কি ডাকাতদের থেকেও সাংঘাতিক ভয়ংকর?

শেষ পর্যন্ত লোকদুটো কোনো কথাই শুনলো না। তক্ষুনি পঞ্চাশটা টাকা না পেলে তারা গরুটা নিয়ে যাবেই। হরিচরণ দিতে পারলো না পঞ্চাশ টাকা। তখন তারা গরুর দড়িটায় হাত দিল। গরুটাও যেতে চায় না। সে এদেরই ভালোবাসে। গরুটা করুণভাবে ডাকতে লাগলো হাম্বা হাম্বা করে। তবু লোকদুটো টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল সেটাকে। ভানুমতী উঠোনে আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো।

নিত্যলাল বা হরিচরণ কেউই ভানুমতীর কান্না সামলাতে গেল না। তারাও ম্লানমুখে গালে হাত দিয়ে বসে রইলো উঠোনের এক কোণে। রান্নাঘরের উনুনে ভাত না ডাল কী যেন চাপানো ছিল, সেখান থেকে পোড়া পোড়া গন্ধ আসতে লাগলো। কেউ গেল না সেদিকে।

মলয়ের খুব অপরাধী মনে হলো নিজেকে। এদের আজ কত বিপদ, আর সে নিজের বিপদ নিয়ে এদের মধ্যে এসে পড়েছে। এমন চমৎকার গরুটা কেড়ে নিয়ে গেল? মাত্র পঞ্চাশ টাকার জন্য!

মলয়ের তো এক-একটা জামা বা প্যাণ্টই কেনা হয় পঞ্চাশ টাকা দিয়ে। সেগুলোও সে দু-তিনবারের বেশী পরে না।

মলয়ের কাছে এখন টাকা থাকলে সে নিশ্চয়ই ওদের দিত। কিন্তু তার কাছে যে একটাও পয়সা নেই।

হঠাৎ তার নজর পড়লো নিজের হাতের দিকে। তার বাঁ হাতের আঙুলে তো একটা সরু আংটি আছে। আগের বছরের জন্মদিনে তার ছোট মামা আংটিটা দিয়েছিলেন। আংটিটার মাঝখানে একটা পাথর বসানো—পোখরাজ না কী যেন। সোনার আংটি বিক্রি করলেও তো কিছু টাকা পাওয়া যায়। কত টাকা কে জানে, তবু যাই হোক।

আংটিটা খুলে ফেললো মলয়। আগের দিন পাইপ বেয়ে নামতে গিয়ে তার হাত ঘষে গিয়েছিল কিনা, তাই আংটিটা খোলবার সময় বেশ জ্বালা করলো। সেটা নিয়ে সে আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ালো হরিচরণের পাশে। তারপর খুব লজ্জার সঙ্গে বললো, এটা নেবেন?

হরিচরণ চমকে উঠে বললো, এটা কী?

একটা আংটি!

আংটি? সোনার? এটা নিয়ে আমি কী করবো?

এটা বিক্রি করে যদি গরুটা—

ওরে বাবা, সোনার আংটি বিক্রি করতে গিয়ে কি আমি মারা পড়বো?

ভানুমতী পর্যন্ত কান্না থামিয়ে এদিকে উঠে এসেছে। নিত্যলাল এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। সবাই অবাক।

হরিচরণ এবার কেঁদে উঠলো। কাঁদতে কাঁদতে বললো, হায়, হায়, বাবুভাই আমাকে সোনার আংটি দিতে এসেছে, কী আমার কপাল! আমার বাড়িতে অতিথি, তাকে আমি যত্ন করতে পারি না—না বাবুভাই, তুমি এটা রেখে দাও। এ কি আমি নিতে পারি?

মলয় তবু বললো, নিন না—

ভানুমতী বললো, না বাবুভাই, আমরা গরিব চাষা, আমাদের কাছে সোনা দেখলে যে লোকে সন্দেহ করবে। কত দামের জিনিস। তুমি অতিথি, তোমার কাছ থেকে কি কিছু নিতে পারি!

হরিচরণ বললো, তুমি যে দিতে চাইলে, এই জন্যই তোমার কাছে আমরা জন্ম জন্মান্তরের জন্য ঋণী হয়ে রইলুম।

মলয় জিজ্ঞেস করলো, তা হলে গরুটার কী হবে?

হরিচরণ উদাসীনভাবে বললো, দেখি, যদি অন্য কোনো মহাজনের কাছ থেকে আবার টাকা ধার করতে পারি। ভগবান যদি মুখ তুলে চান, এবার যদি ভালো বৃষ্টি হয়, তা হলে ভালো ফসল উঠবে, সব দেনা শোধ করে দেবো!

নিত্যলাল বললো, আর যদি বৃষ্টি না হয়?

তা হলে সবাই থুতু ফেলে ডুবে মরবো।

কাঁধের গামছাখানা দিয়ে মুখ চোখ মুছে হরিচরণ বললো, যাক গে, এখন কাজের কথা হোক। বাবুভাই, তুমি শোনো। আমি মাঠে গিয়ে অন্য চাষীদের জিজ্ঞেস করলুম, কাল রাতে কারা এসেছিল? সবাই কী বললো, জানো? সাধু সেজে থাকে ঐ লোকটা একটা মস্ত বড় খুনে ডাকাত। বিলায়েতিকেও আর দু চারজন চিনতে পেরেছে। বিলায়েতি তাদের ভয় দেখিয়েছে।

মলয় জিজ্ঞেস করলো, আমার কথা আর কেউ জানতে পেরেছে?

হরিচরণ বললো, আমি কারুক্কে বলিনি। কিন্তু যে-দু'জন লোক গরুটা নিতে এসেছে, তারা কি দেখেছে তোমায়?

মলয় বললো, আমি দরজার পাশে লুকিয়ে ছিলাম।

নিত্যলাল বললো, হ্যাঁ, দেখেছে। আমি জানি দেখেছে!

তবে? ওরা যদি বাইরে গিয়ে বলাবলি করে? চাষার বাড়িতে এ রকম রাজপুত্তুরের মতন চেহারার ছেলে দেখলে তো লোকের সন্দেহ হবেই। দিনের আলো থাকতে থাকতেই তোমার চলে যাওয়া ভালো, আমি তো তাই মনে করি!

ভানুমতী বললো, ও মা, এইটুকু ছেলে একলা-একলা কোথায় যাবে গো?

এখান থেকে দশ ক্রোশ দূরে ভগবানগোলায় রেলের ইস্টিশন। সেখানে একবার পোঁছোতে পারলে আর ভয় নেই।

অতদূরে কী করে যাবে?

নদীতে এই সময় অনেক পাটের নৌকো যায়। একটা নৌকোয় বলে কয়ে উঠিয়ে দিতে যদি পারি,—

মলয়ের কাছে যে রেলের টিকিট কাটার পয়সা নেই, সে কথা আর লজ্জায় বলতে পারলো না। এদের কাছে যে পয়সা নেই, তা তো সে নিজেই দেখেছে। তবু এখান থেকে অনেক দূরে চলে যাওয়াই ভালো।

মলয় তখনই চলে যেতে রাজী। কিন্তু ভানুমতী কিছুতেই তাকে না খাইয়ে ছাড়বে না। বাড়ি থেকে অতিথি যদি না খেয়ে চলে যায়, তাতে যে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়।

গরুটার দুঃখ ভুলে গিয়ে সবাই মলয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। ভানুমতী তাড়াতাড়ি ভাত বসিয়ে দিল। ফেনা ভাত আর তার মধ্যে বেগুন সেদ্ধ—নুন দিয়ে গরম গরম তাই খেতেই লাগলো অমৃতের মতন।

মলয়ের মতন চেহারার ছেলেকে পাটের নৌকোয় একা একা যেতে দেখলেও কেউ সন্দেহ করতে পারে। তাই মলয় একটা বুদ্ধি বার করলো। সে তার জামা প্যাণ্ট বদলে নিল নিত্যলালের সঙ্গে। তার জামা-প্যাণ্ট নোংরা হয়ে গেলেও এখনো দেখলে বোঝা যায় বেশ দামী। নিত্যলালের ছেঁড়া ধুতি আর ময়লা হাফ শার্টটা গায়ে দিয়ে অনেকখানি বদলে গেল তার চেহারাটা। নিত্যলাল আবার খানিকটা ধুলো নিয়ে মাখিয়ে দিল মলয়ের মুখে আর চুলে। এখন তার ফর্সা রং সত্ত্বেও অনেকটা ভিখারির মতন দেখাচ্ছে।

হরিচরণ বললো, তা হলে আর দেরি করা ঠিক নয়।

সবাই মিলে মলয়কে নিয়ে এলো নদীর ধারে। দু-তিনটে নৌকো ডাক শুনে থামলো না, তার পরের আর একটা নৌকো থামলো। তারা লালগোলাতেই যাচ্ছে, মলয়কে নিয়ে যেতে তাদের আপত্তি নেই।

বিদায় দেবার সময় হরিচরণ চুপি চুপি মলয়কে বললো, বাবুভাই, তোমার তো রেলের টিকিট কাটবার পয়সা নেই। আমিও তোমাকে কিছু দিতে পারলুম না। তবু তুমি জোর করে রেলের কামরায় চেপে বসে থেকো। তারপর যদি তোমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়, তাতে আর এমনটা কী হবে?

মলয় যখন নৌকোয় উঠে পড়েছে, তখন নিত্যলাল জলের মধ্যে অনেকখানি নেমে এসে একটা মুঠো করা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, বাবুভাই এটা নিয়ে যাও!

নিত্যলাল জোর করে মলয়ের হাতে কী যেন পুরে দিল। নৌকো ততক্ষণে চলতে সুরু করেছে। মলয় হাত খুলে দেখলো, তাতে কয়েকটা ঘামে ভেজা খুচরো পয়সা।

এর আগে গুরুদেবের দলের লোকের হাতে মার খেয়েও মলয় কাঁদেনি। কিন্তু এখন তার চোখে জল এসে গেল। বিদায় নেবার সময় সে একটাও কথা বলতে পারলো না।

পাটের নৌকোটায় পাঁচজন মাঝি। দু'জন দাঁড় আর একজন হাল ধরে আছে, আর দু'জন বসে বসে তামাক টানছে। তাদের মধ্যে একজন মলয়কে জিজ্ঞেস করলো, কী রে ছোঁড়া, তোর বাড়ি কোথায়?

মলয় বলতে যাচ্ছিল যে তার বাড়ি কলকাতায়, কিন্তু সেটা গোপন করে গেল। তারপর ভাবলো বলবে মুরশিদাবাদ। কিন্তু মুরশিদাবাদ তো একটা জেলার নাম। এখনো তো সে

মুরশিদাবাদেই রয়েছে।

হঠাৎ টপ করে তার মনে এসে গেল অন্য একটা নাম। সে বললো, পীরগঞ্জ!

লোকটা বললো, হুঁ! পীরগঞ্জে মস্ত বড় হাট হয়!

আর কিছু কথা বললো না সে। আপনমনে তামাক টানতে লাগলো। লোকটা যে মলয়কে তুই করে কথা বলেছে, এজন্য কিন্তু সে দুঃখিত হয়নি, খুশীই হয়েছে। তার মানে, তাকে এখন আর ভদ্দরলোকের ছেলে বলে চেনাই যাচ্ছে না!

নৌকোর মাঝখানে বিরাট পাটের গাদা। অনেকখানি উঁচু। মলয় তার ওপর উঠে শুয়ে পড়লো। ওপরটা গদীর মতন নরম। এত মোটা গদীতে রাজা মহারাজারাও কখনো শোয় না।

মলয় শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখতে লাগলো। মেঘের পর মেঘ, অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে কখনো মনে হয় পাহাড়, কখনো ভারতবর্ষের ম্যাপ, আবার কখনো মনে হয় বিরাট একটা জঙ্গল। মাঝে মাঝে এক ঝাঁক করে পাখি উড়ে যাচ্ছে। মলয় সব রকম পাখির নামও জানে না। একবার শুধু এক ঝাঁক সাদা বক দেখে চিনতে পারলো।

অনেকক্ষণ থেকে একটা ঝিক ঝিক শব্দ শোনা যাচ্ছে। মলয় আগে খেয়াল করেনি। নৌকোটা একটু দুলতে দুলতে এগোচ্ছে। এক সময় দুলুনিটা বেড়ে গেল। মলয় তাকিয়ে দেখলো, একটা

কী রে ছোঁড়া, তোর বাড়ি কোথায়?

মটর লঞ্চ আসছে। সেই মটর লঞ্চের ঢেউ ধাক্কা মারছে নৌকোটার গায়ে। লঞ্চটার ছাদের ওপরে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে।

মলয় এতক্ষণ গুরুদেবের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। এখন হঠাৎ মনে হলো, ঐ লঞ্চটায় যদি ওরা থাকে? ওরা কি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা না করে ছাড়বে? তবে, মলয় এত উঁচুতে রয়েছে যে ওরা সহজে দেখতে পাবে না। মলয় উপুড় হয়ে পাটের গাদার ভেতরে আরও অনেকটা ঢুকে গেল। সেইভাবেই শুয়ে শুয়ে শুনলো, লঞ্চটা তাদের নৌকোর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে।

মলয় কোনোদিন নৌকোয় চাপে নি। আজ প্রথম এই পাটের গাদায় শুয়ে নৌকো ভ্রমণ করতে তার খুব ভালো লাগলো। অবশ্য, গুরুদেবের জন্য মনে মনে ভয় না থাকলে আরও ভালো লাগতো।

নৌকো কতক্ষণ চলেছিল, মলয়ের খেয়াল নেই। মনে তো হয় ঘন্টার পর ঘন্টা। আস্তে আস্তে রোদ পড়ে এলো। ভাগ্যিস নিত্যলালদের বাড়িতে সে ফেনাভাত খেয়ে এসেছিল, তাই তার আর খিদে পায়নি। এর মধ্যে নৌকোর মাঝিদের রান্নার গন্ধ তার নাকে এসেছে, তারা অবশ্য মলয়কে খেতে ডাকে নি।

এক সময় একজন মাঝি মুখ বাড়িয়ে বললো, এই ছোঁড়া, ওঠ্ রে! লালগোলা যে এসে গেল!

মলয় ধড়ফড় করে নেমে পড়লো নীচে। নৌকো ডাঙায় এসে ঠেকেছে। মলয়ের মনে হলো, মাঝিরা যে তাকে এত দূর কষ্ট করে পৌঁছে দিল, এজন্য তার একটা কিছু বলা উচিত। কিন্তু কী বলবে? ইস্কুলে শিখিয়েছে, কেউ কিছু উপকার করলেই থ্যাংক ইউ বলতে হয়। কিন্তু মাঝিদের কি থ্যাংক ইউ বলা যায়, ওরা তো ইংরেজি বোঝে না! ধন্যবাদ বললেই কি বুঝবে? তাই সে হাসি হাসি মুখ করে বললো, আচ্ছা, চলি, নমস্কার!

একজন মাঝি হো হো করে হেসে বললো, এঃ, এ যে দেখি বাবুদের মতন ন্যামোস্কার করে! এই ছোঁড়া, ভাড়া দিলি না?

ভাড়া?

বাঃ, নৌকো চাপলে ভাড়া দিতে হবে না? পাঁচ টাকা ভাড়া দে!

মলয়ের কাছে তো একটাও টাকা নেই। সে ভেবেছিল নৌকোর মাঝিরা তো এদিকে আসছিলই, তাই তার কাছ থেকে ভাড়া নেবে না।

মলয় আর কী করে, হাত থেকে আংটিটা খুলে বললো, আমার কাছে তো টাকা নেই, আপনারা এইটা নিন্।

একজন মাঝি আংটিটাকে হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে বললো, এঃ, একটা পেতলের আংটি আমাদের গছাতে এয়েছে! এর দাম তো চার আনাও হবে না! যা, ভাগ্!

মাঝি আংটিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে। মলয় সেটা কুড়িয়ে নিয়ে মাঝিদের আবার হাত তুলে নমস্কার করে হাঁটতে আরম্ভ করলো।

মলয় যেখানে নেমেছে, তার কাছেই পদ্মানদী। ওপারে বাংলা দেশ। এখান থেকে লালগোলা স্টেশনটা খানিকটা দূরে। লালগোলার মহারাজার লেখা অনেক শিকারকাহিনী সে পড়েছে, কিন্তু কাছাকাছি কোনো বন জঙ্গল দেখতে পেল না অবশ্য। উনি আবার মলয়ের দাদামশায়ের বন্ধু ছিলেন। খুঁজে খুঁজে রাজবাড়িতে উপস্থিত হয়ে মলয় যদি নিজের পরিচয় দেয়, তা হলে সকলেই তাকে চিনতে পারবে। তখন আর মলয়ের কোনো ভয় নেই।

কিন্তু মলয় সেই সাহায্য নিতে চাইলো না। এ রকম ভিখারীর মতন পোশাকে সে রাজবাড়িতে যাবে কেন? তা ছাড়া, এত দূর যখন সে নিজের চেষ্টায় আসতে পেরেছে, তখন কি আর বাকিটা পারবে না?

নৌকোর ঘাট থেকে অনেকেই স্টেশনের দিকে যাচ্ছে, মলয় তাদের সঙ্গে জুটে গেল। একটু পরেই দেখা গেল রেল স্টেশন। কাঁচা রাস্তা দিয়েই সোজা উঠে গেল প্ল্যাটফর্মে, কোনো গেট-টেট নেই। টিকিট কাউন্টার আর গেট অন্যদিকে।

স্টেশনেই একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেনটার নাম লালগোলাঘাট প্যাসেঞ্জার। এই ট্রেনে একবার চাপতে পারলেই সোজা শিয়ালদা পৌঁছে যাবে।

কিন্তু টিকিট কাটার কী হবে? টিকিট কাউন্টারে তো টাকার বদলে আংটি দেওয়া যায় না। কিংবা, এরাও যদি আংটিটাকে পেতলের ভাবে?

যা হয় হোক, এই ভেবে মলয় ট্রেনের একটা কামরায় উঠে বসলো। মলয়ের বংশের কেউ কখনো বিনা টিকিটে ট্রেনে চাপার কথা চিন্তাও করেনি। কিন্তু ওর বেশ উত্তেজনা বোধ হচ্ছে। টিকিট না থাকলে কী হয়? জেলে দিয়ে দেয়? জেলে নিয়ে গিয়ে কি মারে?

একটা বাদামওয়ালা অনেকক্ষণ ধরে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে চ্যাঁচাচ্ছে। মলয় উঠে গিয়ে তার কাছে চার আনার বাদাম চাইলো।

বাদামওয়ালাটা মলয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, আগে পয়সা দেখি!

ও হরি! লোকটা ভেবেছে, মলয়ের কাছে পয়সা নেই! পিসীমণির সঙ্গে মলয় যখন মটরগাড়িতে চেপে বেড়াতে বেরোয়, তখন সত্যি তার কাছে কোনো পয়সা থাকে না। কিন্তু মলয় আজ বিনা টিকিটের রেলযাত্রী হলেও তার কাছে কিছু খুচরো পয়সা আছে। নিত্যলাল তাকে দিয়েছে।

ধুতির পকেট নেই, তাই মলয় পয়সাগুলো কোমরে গুঁজে রেখেছিল। তার থেকে কিছু বার করে দিয়ে বাদামগুলো নিয়ে এক কোণে বসে মনের আনন্দে খেতে লাগলো। ঝাল নুনটার দারুণ স্বাদ!

ট্রেন যখন ঠিক ছেড়েছে, তখন একদল ছেলে লাফিয়ে উঠে পড়লো কামরাটায়। তাদের দেখে মনে হয় ভিখিরি কিংবা ফিরিওয়ালা কিংবা লেখা-পড়া না-শেখা ছেলে। তারা যে বিনা টিকিটে উঠেছে, তা বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় না। তারা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জটলা করছে।

কোনো স্টেশনে ট্রেন থামলেই তারা হুড়মুড় করে নেমে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ায়। আবার ট্রেন চলতে শুরু করলে উঠে পড়ে। চেকাররা তাদের ধরতে পারে না।

মলয়ও এই কায়দাটা শিখে গেল। কোনো স্টেশন এলে সে নেমে পড়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকে। ট্রেন ছাড়ার সিটি দিলে যে কামরায় চেকার নেই, সেরকম কোনো কামরায় উঠে পড়ে। বেশ মজার ব্যাপার।

এ-রকম ভাবে মলয় একটা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় একটা লোকের দিকে নজর পড়লো তার। লোকটি খুব ফিটফাট সুট-টাই পরা, চোখে কালো চশমা আর সরু গোঁফ। লোকটি একটা লোহার থামের পাশে দাঁড়িয়ে হাতের একটা ছবির দিকে তাকাচ্ছে আর অন্য সব লোকের দিকে তাকাচ্ছে।

এই ট্রেনটা বেশ বড়, ট্রেন ছাড়তে দেরী হবে। মলয় কৌতূহলী হয়ে লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর লোকটার হাতের ছবিটার দিকে তাকাতেই সে চমকে উঠলো।

ছবিটা মলয়েরই!

মলয় চট করে একটু পিছিয়ে গেল। প্রথমে সে ভাবলো, এ কি গুরুদেবের দলের লোক। চেহারা দেখে কিন্তু তা মনে হয় না। তারপরই মলয় বুঝতে পারলো, এ নিশ্চয়ই ডিটেকটিভ। সেইরকমই হাবভাব। মলয় ঠিক করে ফেললো, এর কাছে সে কিছুতেই পরিচয় দেবে না। আহা-হা, এত দূর মলয় নিজেই সব কিছু করলো

আফগান স্নো আপনার স্বপ্নকে সফল করুক

আফগান স্নো ই এস পটনওয়ালা, বম্বে-৮৬

রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ এনে দেয়

ইন্দ্রজাল কমিকস। পাক্ষিক এই পুস্তিকাটি হাজার হাজার শিশুকে (এবং বড়দেরও) মাতিয়ে তোলে। বেতালের তো মৃত্যু নেই, তাঁর দুর্ধর্ষ সব কীর্তিকলাপের কাহিনীর মধ্যে মগ্ন হও। জেনে নাও বেতাল, ম্যানড্রেক ইত্যাদি সব চরিত্রের কথা, দারুণ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যাঁরা শয়তানদের শাস্তি দিয়ে ফেরেন। যেমন অ্যাডভেঞ্চার, তেমনি উত্তেজনা, আর সব সময়ে তেমনি একটা কী-হয় কী-হয় রহস্য!

ছটি ভাষায় প্রকাশিত হয়—ইংরেজী, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, তামিল আর বাংলা। ইন্দ্রজাল কমিকস সব শিশুরই পড়া উচিত।

Indrajal Comics

এখন ডিটেকটিভ তাকে খুঁজে পেয়ে সব কৃতিত্ব নেবে? মোটেই তা হচ্ছে না!

মলয় ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে লাগলো, ট্রেনের কামরার দিকে। একবার ডিটেকটিভটার চোখ পড়ে গেল, সে কিন্তু মলয়কে গ্রাহ্যই করলো না। সে শুধু মনোযোগ দিচ্ছে ভালো ভালো জামা প্যান্ট পরা ছেলেদের দিকে। মলয়ের আর একটু হলেই হাসি পেয়ে গিয়েছিল আর কি!

ট্রেন যখন ছেড়ে গেল, তখনও ডিটেকটিভটা দাঁড়িয়ে রইলো। মলয় যে জানলা দিয়ে ওর দিকে হাত নেড়ে দিল, তাও লক্ষ্য করলো না। থাক ও ওখানে, আরও ঘুরে মরুক। মলয় এর মধ্যে বাড়ি পেঁৗছে যাবে!

অনেকক্ষণ আর চেকার-টেকার আসে নি দেখে মলয় আর নীচে নামে নি। জানলার কাছে ভালো জায়গা পেয়েছে, বারবার ওঠাওঠি করে আর কী হবে!

ট্রেন একটা স্টেশনে এসে থামলো, তার নাম নৈহাটি। নামটা বেশ চেনা-চেনা। কলকাতা থেকে তো খুব বেশী দূরে নয়। বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে ভাবতেই মলয়ের বুক কেঁপে উঠলো। কতদিন যেন সে বাড়িছাড়া! বাবা-মা কি তার আশা ছেড়ে দিয়েছে? মলয় নিজেই তো একবার ভেবেছিল, সে আর কখনো বাড়িতে ফিরতে পারবে না। নিজের বাড়ির মতন ভালো জায়গা আর কোথাও নেই। নিজের বালিশে ঘুমিয়ে যে আরাম, সে আরাম কি আর কোথাও পাওয়া যায়?

মলয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, তাই লক্ষ্য করেনি যে কখন একজন চেকার তাদের কামরায় উঠে পড়েছে। এই রে! এত দূর এসে ধরা পড়তে হবে?

টিকিট চেকার তখন একজনের সঙ্গে কী একটা কথা নিয়ে তর্ক করছিলেন, সেই ফাঁকে মলয় টুক করে নেমে পড়লো। এইবার অন্য কোনো একটা কামরায় উঠলেই হবে। মলয় ট্রেনের পাশে পাশে হাঁটতে লাগলো। সব কামরাগুলোতেই খুব ভিড় এখন। তবু যে-কোনো একটায় তো উঠতেই হবে। ঢং ঢং করে ঘণ্টা দিয়েছে, আর দেরি করা যায় না।

মলয় হাতের সামনের কামরাটাতেই উঠে পড়লো। উঠেই যেন ভূত দেখলো সে। দরজার কাছেই গুরুদেব আর তার দুজন চ্যালা বসে আছে। মলয় নিজে থেকে এসে পড়লো ওদের খপ্পরে!

গুরুদেব মলয়কে দেখেই বললো, এই যে খোকা, কোথায় গিয়েছিলি? কখন থেকে তোকে খুঁজছি!

মলয় পেছন ফিরেই এক লাফ দিয়ে নেমে পড়লো প্ল্যাটফর্মে। তারপর পড়ি মরি করে ছুটলো। পেছন ফিরে এক পলক তাকিয়ে দেখলো, গুরুদেবরাও তাড়া করে আসছে। মলয় কী করবে, চ্যাঁচাবে? যদি অন্য কেউ তার কথায় বিশ্বাস না করে? তার ময়লা ছেঁড়া পোশাক দেখে বোধহয় তাকে কেউ গ্রাহ্য করবে না!

কাছাকাছি কোনো পুলিশও নেই? মলয় কী করবে? মলয় কী করবে? আঃ, আর সে ভাবতে পারছে না।

এমন সময় মলয় দেখলো, সেই টিকিট চেকারটি প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছেন। মলয় আর উপায়ান্তর না দেখে তাঁকেই জড়িয়ে ধরে বললো, আমার টিকিট নেই, আমার টিকিট নেই, আমাকে ধরে নিয়ে যান!

টিকিট চেকার ভুরু কুঁচকে বললেন, টিকিট নেই? তা হলে বেরিয়ে যাও প্ল্যাটফর্ম থেকে!

মলয় বললো, না, না, আমাকে ধরুন আপনি। আমাকে থানায় বন্দী করে রাখুন।

এই সময় গুরুদেব সেখানে এসে টিকিট চেকারকে বললো, এই ছেলেটা চোর। আমার বাড়ি থেকে চুরি করে পালিয়েছে। একে আমার হাতে ছেড়ে দিন।

টিকিট চেকার বললেন, চোর?

গুরুদেব বললেন, হ্যাঁ। আমাদেরই বাড়ির ছেলে, এখন চুরি টুরি করতে শিখেছে। এই, চল, চল—

গুরুদেব যেই মলয়ের হাত ধরলো, অমনি মলয় ইংরেজিতে টিকিট চেকারকে বললো, ডোনট বিলিভ হিম। হি ইজ এ ক্রিমিন্যাল—

ততক্ষণে ভিড় জমে গেছে! টিকিট চেকারের একটু সন্দেহ হলো মলয়ের মুখে ইংরেজি শুনে। তিনি গুরুদেবকে বললেন, ঠিক আছে, আপনারা দু জনেই থানায় চলুন!

তখন গুরুদেব ভিড় ঠেলে দৌড়ে গিয়ে চলন্ত ট্রেনে উঠে পড়লো। ট্রেন চলে গেল প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে।

ভোরবেলা চেকারবাবু ও আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে মলয় চলে এলো কলকাতায়। একটুবাদেই ট্যাক্সি চড়ে চলে এলো তাদের বাড়ির সামনে।

সেই বিশাল বাড়ি দেখে টিকিট-চেকারবাবু বললেন, এই বাড়িটা তোমাদের?

মলয় বললো, হ্যাঁ।

টিকিট-চেকারবাবুর মুখ দেখে মনে হলো তিনি যেন পুরো-পুরি বিশ্বাস করেন নি। মানুষটি খুবই ভালো। মলয়ের সব কথা শুনে তিনি ওকে রাত্তিরটা নৈহাটিতে নিজের বাড়িতে রেখেছিলেন। ভোর হতে না হতেই আর একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন নিজে ওকে পেঁৗছে দিয়ে যেতে।

এত বড় বাড়ির একটা ছেলে এই রকম নোংরা ধুতি আর ছেঁড়া জামা পরে আছে! তিনি মলয়কে আর একবার দেখে নিয়ে বললেন, তোমাকে এ বাড়ির কেউ চিনতে পারবে তো?

মলয় গেটের দিকে এগিয়ে গেল। মস্ত বড় লোহার গেট ভেতর থেকে তালা বন্ধ। দারোয়ানকে কাছাকছি দেখা যাচ্ছে না। বাগানে মলয়ের কুকুর টোটো ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ইস, এ ক' দিনেই কি রোগা হয়ে গেছে কুকুরটা।

মলয় ডাকলো, টোটো, টোটো! কাম হিয়ার!

টোটো গেটের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো দারুণ জোরে।

টিকিট চেকারবাবু ভয় পেয়ে বললেন, সরে এসো, সরে এসো, কামড়ে দেবে!

মলয় বললো, টোটো কক্ষনো কারুকে কামড়ায় না!

মলয় টোটোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই সে সেইরকমই ডাকতে লাগলো জোরে জোরে। টোটো যে আনন্দে চিৎকার করছে, টিকিট-চেকারবাবু তা বুঝলেন না।

এমন সময় একটু দূরে দেখা গেল সরকারবাবুকে। তিনি টোটোর ডাক শুনে এদিকে এগিয়ে এসে বললেন, এখানে আপনারা কারা? কী চাই?

মলয় বললো, সরকারবাবু আমি!

সরকারবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, আমি কে? আমি কে? সবাই-ই তো আমি।

টিকিট-চেকারবাবু তখন গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, দেখুন এই ছেলেটি হারিয়ে গেছে–

মলয় বাধা দিয়ে বললো, মোটেই আমি হারিয়ে যাইনি। আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

টিকিট-চেকারবাবু বললেন, আহা, বলতে দাও না আমাকে। দেখুন, এ ছেলেটিকে আমরা নৈহাটি স্টেশন থেকে পেয়েছি। এ তো বলছে, এই বাড়িটাতে থাকে, মানে, দেখুন, যদি আপনাদের কেউ হয়!

সরকারবাবু বললেন, এই হয়েছে এক জ্বালাতন। আমাদের ছেলে হারিয়েছে খবর পেয়ে রাজ্যের লোক যত সব ভ্যাগাবণ্ড ছেলেদের ধরে আনছে! তখনই কর্তাবাবুকে বললাম, অত টাকা

পুরস্কার ঘোষণা করবেন না! আপনারা ঘরে আসুন, দশটার সময় আসবেন, কর্তাবাবু এখন ঘুমোচ্ছেন।

মলয় রেগে গিয়ে এক ধমক দিয়ে বললো, সরকারবাবু, শিগগির গেট খুলুন! আমি এ-বাড়ির ছোটবাবু!

এরকম গলার আওয়াজ শুনে সরকারবাবু চমকে গেলেন। বললেন, কে? ওরে, আমার চশমা কোথায়? আমার চশমা! শিগগির চশমাটা নিয়ে আয়!

চশমা ছাড়া সরকারবাবু ভালো দেখতে পান না চোখে। দৌড়ে গেলেন চশমা আনতে। দৌড়োবার সময় তাঁর চটি খুলে গেল, তাও গ্রাহ্য করলেন না, চটি ফেলে খালি পায়েই ছুটলেন।

চশমা নিয়ে সরকারবাবু আধ-মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলেন। সঙ্গে, চাবি হাতে দারোয়ান। সরকারবাবু মুখটা বাড়িয়ে দিলেন গেটের মধ্য থেকে। চ্যাঁচাতে লাগলেন, গেট খোল! শিগগির গেট খোল!

গেট খোলা হতেই সরকারবাবু মলয়কে জড়িয়ে ধরে বললেন, ওরে আমার সোনা, ওরে আমার মানিক! সরকারবাবু ভেউ ভেউ করে কেঁদেই ফেললেন একেবারে।

হাঁকডাকে বাড়ির সকলেই জেগে উঠলো। মলয় দেখলো যে, বিলেত থেকে বাবা ফিরে এসেছেন, মা চলে এসেছেন দার্জিলিং থেকে, দাদা-বৌদি চলে এসেছেন সিমলা থেকে। দিদি-জামাইবাবুও এসেছেন খবর পেয়ে। এ বাড়িতে অনেকদিন একসঙ্গে এত লোক থাকে নি। সবই মলয়ের জন্য। মলয়কে দেখে অজ্ঞান হয়ে গেলেন মলয়ের মা।

টিকিট-চেকারবাবু এবং তাঁর বন্ধুকে যত্ন করে বসানো হলো বৈঠকখানায়। থালাভর্তি মিষ্টি তো এলোই, তা ছাড়া মলয়ের বাবা ওঁদের দু জনের হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, আপনাদের উপকার আমরা জীবনে শোধ করতে পারবো না। ছেলেটা না ফিরে এলে ওর মাকে বাঁচানো যেত না!

আস্তে আস্তে সবাই পুরো গল্পটা শুনলেন। মলয়ের বাবা উত্তেজিতভাবে বললেন, ইস, আমার ছেলে এত কষ্ট পেয়েছে! এদিকে আমি পাঁচজন ডিটেকটিভ ঠিক করেছি। সারা ভারতবর্ষের পুলিশ ওকে খুঁজছে। দমদম আর দিল্লি এয়ারপোর্টে, বোম্বাই-এর জাহাজঘাটায় লোক রেখেছি, তারা কেউ কিছু করতে পারলো না! সব অপদার্থ!

মলয় যখন রেল স্টেশনে দেখা ডিটেকটিভের কথা বললো, তখন সবাই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লো!

সত্যিকারের ডিটেকটিভরা যেমন গল্পের বইয়ের ডিটেকটিভদের মতন করিৎকর্মা হয় না, তেমনি সত্যিকারের ডাকাতদেরও গল্পের বইয়ের ডাকাতদের মতন বুদ্ধি নেই।

এরপর পুলিশ যখন মলয়ের কাছে সব কথা জিজ্ঞেস করলো, তখন মলয় বললো, আপনারা মুর্শিদাবাদের পীরগঞ্জ বলে একটা গ্রাম চেনেন? সেই গ্রামে বিলায়েতি দাস থাকে।

পুলিশ লাফিয়ে উঠে বললো পীরগঞ্জ? সেখানে আমরা আজই যাচ্ছি।

মলয় এই নামটা মনে করে রেখেছিল। কিন্তু বিলায়েতি দাসটা এত বোকা, তার এইটুকুও বুদ্ধি নেই যে, এই সময় গ্রামে ফিরে যেতে নেই। পুলিশ সেই গ্রামে গিয়ে দু তিনদিন লুকিয়ে থাকতেই বিলায়েতি ধরা পড়ে গেল। তারপর সব কিছুই স্বীকার করে ফেললো সে। তার কাছ থেকে ঠিকানা পেয়ে আসাম থেকে দলবল শুদ্ধু গুরুদেবকেও ধরে ফেলা হলো।

মলয়ের বাবা গুরুদেবকে দেখেই চিনতে পারলেন। তিনি বললেন, এ আবার গুরু হলো কবে? এর বাবা তো সোনাপুরার শ্মশানে মড়া পোড়াতো! তারপর তার ছেলে চোর হয়েছিল শুনেছিলাম। একেই বলে গুরু-চন্ডাল দোষ!

পাঁচ বছর করে জেল হয়ে গেল সকলের।

মলয়ের বাবা খবরের কাগজে মলয়ের জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। টিকিট-চেকারবাবু কিছুতেই সে টাকার অংশ নিতে চাইলেন না। তিনি তো কিছুই করেন নি!

নিত্যলালের বাবা হরিচরণও টাকা নিতে চায় না। বাড়িতে একজন অতিথি এসেছিল, সে জন্য আবার টাকা নেবে কি? তবু জোর করে তাদের জন্য এক জোড়া খুব ভালো জাতের গরু এবং দশ বিঘে জমি কিনে দেওয়া হলো।

শুধু তাই নয়, মলয়ের লাভের মধ্যে হলো এই, নিত্যলাল তার খুব বন্ধু হয়ে গেল। এরপর সে প্রায়ই নিত্যলালদের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যায়। মলয় খেজুরের গুড় খেতে খুব ভালোবাসে। ওখানে ভানুমতী খেজুরের রস জ্বাল দিয়ে গরম গরম গুড় বানায়—কী মিষ্টি তার গন্ধ!

নিত্যলালও কখনো কখনো কলকাতায় মলয়দের বাড়িতে আসে। নিত্যলাল এখন ইস্কুলে পড়ে, আর কিছুদিন পরে সে কলকাতায় থেকেই পড়াশুনো করবে।

দেখা হলেই ওরা সেই গুরুদেবের দল আর সেই রাত্তিরটার কথা বলে। একদিন মলয় বললো, ও একটা কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। তুই সেই রাত্তিরে আমি ভূত কিনা পরীক্ষা করার জন্য কী জোর চিমটি কেটেছিলি! সেটার তো শোধ নেওয়া হয় নি!

বলেই মলয় নিত্যলালকে জোরে চিমটি কাটে। নিত্যলাল ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললো, আমার একটুও লাগে নি।

মলয় বললো, তা হলে তুই নিশ্চয়ই ভূত।

তারপর দুই বন্ধু হো-হো করে হাসতে লাগলো।

আর একটা কথা বলা হয়নি। নৌকার মাঝিরা মলয়কে যে আংটিটা চার আনা দামের পেতলের আংটি ভেবে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, সেটার দাম সাড়ে ছশো টাকা!

কোলে
জ্যাম জেলী আচার
ও অরেঞ্জ স্কোয়াশ
নির্মাতা ঃ কোলে বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১০
KOLAY ORANGE SQUASH
KOLAY SYNTHETIC APPLE JELLY
KOLAY SYNTHETIC MANGO JELLY
KOLAY SYNTHETIC PINEAPPLE JELLY
KB-CON-473.B

নন্দগুপি

লীলা মজুমদার

ছবি এঁকেছেন সুবোধ দাশগুপ্ত

গুপি আমার সেজমামার ছেলে, আমার সঙ্গে বেজায় ভাব। গত বছর পুজোর সময়টা আমরা কালীঘাটে বড় মামার বাড়িতে কাটিয়েছিলাম। কলকাতা শহর তৈরি হবার অনেক আগে ও-সব পাড়ার পত্তন হয়েছিল। ভাঙা সব মন্দির, ঢিপি ঢিপি ইঁট, তার মধ্যে মানুষ থাকে। বড় মামার বাড়িটাও বেজায় পুরনো, আমার অতিবৃদ্ধ বুড়ো দাদামশাইয়ের বাপের ঠাকুরদার বাবা নাকি বানিয়েছিলেন। সেই ইস্তক আমার মামার বাড়ির লোকরা ওখানে বাস করে আসছে। অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটে ওখানে, তুকতাক, যাদুমন্ত্র, ভূতপ্রেত সাধুসন্ন্যাসী। সবাই সে-সব কথা বিশ্বাস করে। বড় মামারাও। বিশেষ করে বড়মামার ছেলে রামকানাইদা।

সে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে কোথায় কোন্ কারখানায় কাজ শেখে আর পাড়া চষে বেড়ায়। বাড়ির লোকে খাবার সময় ছাড়া তার টিকির ডগাটি দেখতে পায় না। কিন্তু আমরা যে দিন গেলাম রামকানাইদা বাড়ি থেকে বেরুল না। একটু খুশি না হয়ে পারলাম না। বিকেলে জল খাবারের পর আমাদের সঙ্গে শোবার ঘরে এসে বলল, "দেখি মনিব্যাগ।"

গুপি চটে গেল। "মনিব্যাগ আবার কি? আমরা না ছোট ভাই, কোথায় তুমি আমাদের কিছু দেবে, না মনিব্যাগ চাইছ!" রামকানাইদা কাষ্ঠ হাসল। "ট্যাঁক গড়ের মাঠ, চাইব না তো কি? পুজোর খরচা আছে না। তোরা তো দিব্যি এখানে আমার বাবার হোটেলে দুবেলা ভাত মারবি। আবার বিকেলে তোদের জন্য লুচি হালুয়া হল! নে, নে, বের কর।" গুপি বলল, "সেটি হচ্ছে না, বাপু, মনিব্যাগ বড় জ্যাঠার কাছে রেখেছি। আমাদের কেনাকাটা আছে, কালীঘাট থেকে মেলা জিনিস কিনে নিয়ে যেতে হবে।" রামকানাইদা বলল, "আচ্ছা দশটা টাকা দে তো।" গুপি বলল, "উঁহু।"

রামকানাইদার মুখটা কালো হয়ে গেল। "আচ্ছা, দেখা যাবে।" এই বলে সে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল। টাকাটা অবিশ্যি গুপির জামার ভিতরের গোপন পকেটেই ছিল। সে কথা সে বলতে যাবে কেন? দু তিন দিন গেল। রামকানাইদার দেখা নেই। টাকাটা খরচ করে ফেলতে পারলে বাঁচি। দশটি টাকা, গুপির পাঁচ, আমার পাঁচ। ভেবেছিলাম দুদিন সিনেমা দেখব, একটা পুজো বার্ষিকী কিনব, আর গুপি বলছিল একটা লটারির টিকিট কিনে যদি এক লাখ টাকা পাওয়া যায়, একেক জনের ভাগে হবে পঞ্চাশ হাজার। তাই বা মন্দ কি! এখন মনে হচ্ছিল টাকাটা ঝেড়ে ফেলতে পারলেই বাঁচা যায়।

আলিপুরের দিক থেকে এলে চেতলার পুল পার হয়েই বাঁ হাতে একটা সরু গলিকে বুড়িগঙ্গার ধার দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যেতে দেখা যায়। তাতে ঘেঁষাঘেঁষি দু-সারি অতি পুরনো বাড়ি কোনোরকমে পর পরকে ঠেকো দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। [illegible]লের দিকে থেকে থেকে খানিকটা ফাঁকা জায়গাও আছে, সেখানকার ইঁটের গাদা দোতলার সমান উঁচু, মোষগাড়ি, মোষ, কাদা। কিন্তু কোনোরকমে ইঁটের গাদা পার হয়ে একবার খালের ধারে পৌঁছতে পারলেই, ব্যস্ আর ভাবনা নেই। চুপচাপ, নিরিবিলি, বড়দের সাধ্য নেই যে দেখতে পায়।

সেই রকম একটা জায়গার ভাঙা পাথরের সিঁড়ির ওপর বসে পড়ে গুপি

বলল. "বেশ জায়গাটা না রে? ভারি বদ্‌নাম এর।" আমি একটু অবাক হলাম। "বদ্‌নাম কেন?" "বদ্‌নাম হবে না? তাকিয়ে দেখ্‌, ভিৎগুলো মাটির নিচে বসে গেছে। এদেশে ইংরেজরা এসে জমিদারি পত্তন করার অনেক আগে ও-গুলো তৈরি। এখানে হয় নি এমন দুর্ঘটনা নেই।"

ভাঙ্গা ঘাটের কয়েক ধাপ নিচে একটা রোগা সিড়িঙ্গে ছোকরা একটা বেজায় মোটা ছাগলের গলার দড়ি নিয়ে বসেছিল। সে ফিক্‌ করে একটু হেসে বলল, "হবে না দুর্ঘটনা! তখন বড় গঙ্গার ঘাটে নৌকো থেকে নেমে, এখন যেখানে বড় পোস্টাপিস সেখান থেকে দল বেঁধে, ঘোর বেঘো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে, যাত্রীরা আসত মা-কালীর পুজো দিতে। সারতে সারতে সন্ধ্যা হয়ে যেত, রাত কাটাবার আস্তানার দরকার হত। তখন এইসব বাড়িগুলোতে সামান্য খরচে আশ্রয় পাওয়া যেত। তবে ও-রকম আশ্রয়—"সে যাই হক, এখন সে-সব লোকের বংশধররা সব ভারি ভালোমানুষ হয়েছেন!!"

এই অবধি বলে ছেলেটা থেমে

ছাগল টানতে টানতে বোঁ দৌড় দিল।

ছাগলকে বলল, "হেট, হেট, ওদিকে নয়, দাদা। ঐ খ্যাঁদা ছেলেটা যেখানে বসেছে ওখানে গোখ্‌রোর বাসা।"

তাই শুনে আমি এক হাত লাফিয়ে উঠে সরে বসলাম। ভারি রাগ হল, "তুমি তো বেশ লোক হে! এতক্ষণ বসে আছি কিছু বলনি, আর যেই তোমার পেয়ারের ছাগল এদিকে এসেছে, অমনি বলছ গোখ্‌রোর বাসা! আমাকে যদি কামড়াত?"

ছেলেটা একটা খড় চিবুতে চিবুতে বলল, "কামড়াবে কেন? তবে হ্যাঁ, ছোবল মারতে পারে। তাতেই বা কি এমন হত? হয় তো তোমার মাথা ঘুরত, হাত-পা ঝিম-ঝিম করত, মুখ দিয়ে ফেনা উঠত, চোখ উল্টে যেত। তার বেশি কি-ই বা এমন হতে পারত? হ্যাঁ, মুখটা নীল হয়ে যেত বোধ হয়। কিন্তু তোমার বন্ধু যদি তক্ষুনি আমার হাতে দশটা টাকা গুজে দিত, আমি ছুট্টে গিয়ে ভন্ড গোঁসাইকে ডেকে আনতাম। তিনি একটা ফুঁ দিলেই তুমি চোগ রগড়ে উঠে বসতে। কি আর এমন ক্ষতি হত, তাই বল?"

গুপি এতক্ষণ হাঁ করে ওর কথা শুনছিল। এবার বলল, "তা হলে ছাগলের জন্যই বা অত ভাবনা কিসের? তাকেও তো ভন্ড গোঁসাই ফুঁ দিয়ে চাঙ্গা করে তুলতেন।"

ছেলেটা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "তা হয় না। আমার টাকাও নেই। তাছাড়া ওর উপর গোঁসাইয়ের রাগ আছে। নইলে উকীল মা হয়ে ও ছাগলই বা হয়ে থাকবে কেন?" এই বলে সে ফোঁৎ ফোঁৎ করে খানিকটা কেঁদে নিল।

আমরা বেজায় আশ্চর্য হয়ে গেলাম। হাফ প্যান্টের পায়া দিয়ে নাক মুছে ছেলেটা বলল, "কামিখ্যে পাহাড়ের নাম শুনেছ? সেখানে সহজে কেউ রাত কাটাতে চায় না। কাটালে মানুষ আর মানুষ থাকে না, ছাগল হয়ে যায়। গোঁসাই হলেন গিয়ে কামিখ্যের পান্ডা। ইঁটের গাদার ওপারে ঐ পোড়ো বাড়িতে ওঁর আস্তানা। পয়সাওলা লোক, পাঁঠার মস্ত ব্যবসা। আর—আর বেশি কিছু বলতে চাই না। আজকাল পাঁঠার বড্ড দাম।"

আমার চুল খাড়া হয়ে উঠল, "তবে কি—তবে কি"—ছেলেটা চোখ কটমট করে, ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে বলল, "শ্—শ্—শ্—চুপ। যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ, যত কানাঘুঁষো সব ওঁর কানে পৌঁছয়।"

তারপর উঠে ছাগলটাকে বলল, "চল, দাদা, আর দুঃখ করে কি হবে? দশ টাকা না পেলে তো গোঁসাই তোমার রূপ বদলাবে না।" তাই শুনে ছাগলটাও মহা ব্যা—ব্যা করতে করতে আমার কান চেবানো ছেড়ে দিয়ে, উঠে পড়ল।

চলেই যেত ছোকরা, গুপি আবার ওর গেঞ্জি ধরে টেনে বলল, "ভয় কিসের? খুলেই বল না।"

ছেলেটা ইদিক-উদিক দেখে নিয়ে নিচু গলায় বলল, "ও ছাগল নয়।" ছাগল নয়? বলে কি ছোকরা, দিব্যি আমার পকেট চেবাচ্ছে! চারটে দো-ভাগা খুর, বেঁড়ে ল্যাজ, ঝুলো কান, কেমন যেন গন্ধ, যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে! ছেলেটা বলল, "ছাগল বনে গেলে শুধু কি চেহারাটাই ছাগুলে হয় ভেবেছ? মনেও ছাগুলে ভাব ধরে। এই দাদা, ও কি হচ্ছে!" এই বলে ছাগলের দড়ি ধরে টেনে সরিয়ে নিল। বাস্তবিক ভালো করে দেখতে দেখতে ছাগলের মুখের সঙ্গে ছেলেটার একটু আদল আছে মনে হল।

"কিন্তু—কিন্তু—?"

ছেলেটা বলল, "আবার কিন্তু কি এর মধ্যে? স্রেফ কথা হল, দাদা গোঁসাইয়ের বেজায় ভক্ত। কারো বারণ

-শুনল না, ঠাকুমার বিছেহার, বাবার সোনার ঘড়ি, নিজের পৈতের সোনার বোতাম, সব নিয়ে গুরুর সঙ্গে কেটে পড়ল। নাকি তীর্থে যাচ্ছে। ছয় মাস পরে গোঁসাই ছাগলকে দিয়ে গেলেন, বললেন নাকি হাজার বারণ করা সত্ত্বেও দাদা কামিখ্যেতে রাত কাটাল। সকালে তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না, শুধু ঐ ছাগলটি ব্যা ব্যা করতে করতে যখন ওঁদের সঙ্গে পাণ্ডুঘাট অবধি হেঁটে এল, তখন আসল ব্যাপার বুঝতে কারো বাকি রইল না।"

গুপি বলল, "ওকে আবার মানুষ করা যায় না?"

ছেলেটা বলল, "এতক্ষণ কি বলছি। দশটাকা খরচ লাগে। সে আমি কোথায় পাব? বাবা দেবে না, বলছে ঐ ছাগলই ভালো।"

"আর ঠাকুমা?" "তিনি আরো খারাপ। বলছেন সের দরে গোঁসাইয়ের কাছে বেচে দিতে। উঃ!" ছাগলটাও তাই শুনে আকাশ পানে এমনি বেজায় ব্যা—ব্যা করতে লাগল যে, শেষ পর্যন্ত গুপি পকেট থেকে দশটাকার নোটটা বের করে ছেলেটার হাতে দিয়ে বলল, "যাচ্চলে!" ছেলেটা কৃতজ্ঞতায় ভেঙে পড়ল। "দাও, দাও, চটি পায়ের ধুলো দাও বাপ। কাল সন্ধ্যে নাগাদ ঐ আমাদের তেরো নম্বরের বাড়িতে খোঁজ নিলে, সুখবর পা'বে।" তারপর কাঁদো কাঁদো মুখ করে ছেলেটা বলল, "ভাই, গত চারশো বছরের মধ্যে আমাদের বাড়িতে একটাও ভালো কাজ হয় নি। তোমাদের দয়ায় এবার হবে।" এই বলে ছাগল টানতে টানতে বোঁ দৌড় দিল। ছাগলটাও আনন্দের চোটে ব্যা—ব্যা করতে করতে বেজায় ছুটতে লাগল।

গুপি বলল, "আহা! হাজার মন্দ লোক হক, এদ্দিন পরে মুক্তির আশা পেয়েছে, হবে না ফুর্তি! দশ টাকা দিয়ে এর চেয়ে আর ভালো কি হতে পারত!"

সেদিন রাতে রামকানাইদার দেখা পেলাম না। পরদিন ভোরে আমরা উঠবার আগেই হয়তো কারখানায় চলে গেছিল। মোট কথা দেখা পাইনি। ওর হাত থেকে টাকাটা বাঁচাতে পেরে দুজনেই খুব খুশি। তবু মাঝে মাঝে—যাক গে।

সন্ধ্যেবেলায় তেরো নম্বরের বাড়িতে সদর দরজায় টোকা দিতেই এক রুদ্রমূর্তি ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে বললেন, "কাকে চাও হে ছোকরারা? নাদু ভাদু বাড়ি নেই, নৌকো করে তারা পাঁঠাভাতি করতে গেছে, রামকানাই রাস্কেলের সঙ্গে। এখন যাও, আমার মন মেজাজ ভালো নেই। নেদো হতভাগা কোত্থেকে দশটাকা জুটিয়েছে, তাই দিয়ে নৌকো ভাড়া করেছে। ও কি হল?"

গুপি বলল, "যাচ্চলে।"

জগৎকে ভারতের শ্রেষ্ঠ অবদান

পুরাকালে মানুষ রকমারি পাথরের টুকরোর সাহায্যে জিনিসপত্র গুণতির কাজ চালাত। ক্রমে ক্রমে তারা আঙুলের সাহায্যে গুণতে শুরু করে, কিন্তু এভাবে দশ-এর বেশী গোণা যেত না।

ভারতই সর্বপ্রথম চিহ্ন দ্বারা মানুষকে গুণতে শেখায় এবং আঙুল দ্বারা গোণার গণ্ডী থেকে তাদের মুক্ত করে।

মানবজাতিকে দেওয়া ভারতের অবদানের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান হচ্ছে " শূন্য " চিহ্ন। গণনার ক্ষেত্রে "শূন্য" এক যুগান্তর আনল।

1 2 3 4 5

6 7 8 9 0

এই দশটি সংখ্যার চিহ্ন পূজায় ব্যবহৃত যজ্ঞকুণ্ডের চতুষ্কোণ আকার থেকে গৃহীত। প্রত্যেক সংখ্যা-চিহ্নের মূল্য তার অবস্থানের উপর নির্ভর করে। এই চিহ্নগুলি দ্বারা সব কিছুই গোণা যেত।

এই চিহ্নগুলি সম্রাট অশোকের যুগে (খ্রীঃ পূঃ ২৭৩-২৩২) খুব প্রচলিত ছিল। তার এক হাজার বছর বাদে মহম্মদ ইব্‌ন মুসা অলখ্বারিজমী বাগদাদ্-এ এর প্রবর্তন করেন। আরব দেশ থেকে এই চিহ্নের প্রচলন ইয়োরোপে যায়। এই চিহ্নগুলি গণনের কাজ সহজ ও সরল করে দিয়ে এক সময় যা ছিল গণনার অসাধ্য তা-ও সম্ভব করে তুলেছে।

সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার নিত্য নতুন প্রয়োজনানুসারে সংখ্যা ও গণিতের অন্যান্য সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য অনুশীলন করেআসছে।

আধুনিক যুগে আমরা কম্প্যুটারের সাহায্যে গণিতের কঠিনতম সমস্যার সমাধানও ক্ষণকালের মধ্যেই করে দিতে পারি। এই ভাবে জীবনের অনেক সমস্যারই সমাধান সম্ভব হচ্ছে, যা আগে ছিল স্বপ্নেরও অগোচর।

আই বী এম দ্বারা ভারতে প্রস্তুত কম্প্যুটার দেশের উন্নতির ক্ষেত্রকে লক্ষগুণ বৃদ্ধির কাজে সাহায্য করছে। মানবশক্তিকে আরও বেশী কাজে লাগাবার জন্য আজ জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে, প্রগতির প্রতি পদক্ষেপে মানুষ কম্প্যুটার ব্যবহার করছে।

IBM

mcm /120ben/72/IBM World Trade Corporation (Incorporated in the U.S.A)

বিমল মিত্র
ছেলেধরা

ছবি এঁকেছেন অসিত পাল

এখনও মনে পড়লে ভয় হয়।

কতকাল আগের ঘটনা। বয়েস তখন বোধহয় পাঁচ কি ছয়। ছ-বছর বয়েসের ছেলেদের সাধারণত কোনও সমস্যা থাকে না। আমারও সমস্যা ছিল না কিছু। একমাত্র ভয় ছিল লেখা-পড়ার। লেখা-পড়ার কথা ভাবলেই আমার ভয় হতো। বই ছিল যেন আমার কাছে যম। বই পড়তে বললেই আমি ঘুমের ভান করতুম। সঙ্গে সঙ্গে বাবার বকুনি। বাবা বলতেন—এ বড় হয়ে গাধা হবে—

আমাদের পাড়ার বস্তিতে এক ধোপা বাস করতো। তার একটা গাধা ছিল। মাঝে-মাঝে দেখতুম ধোপা তার গাধাটার পিঠে বোঝা চাপিয়ে খদ্দের-দের বাড়িতে চলেছে। গাধাটার অবস্থা দেখে আমার বড় মায়া হতো, আর বাবার কথাগুলো মনে পড়তো।

কেবল ভয় হতো বড় হয়ে যদি আমিও ওই ধোপার গাধা হই?

তখন বয়েস কম ছিল তাই হয়ত আমার ভয়টাই ছিল বেশি। তাই একটু রাত হলেই আর বাড়ি থেকে বেরোতুম

সন্ধ্যে হবার আগেই ফুটবল খেলার মাঠ থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসতুম। ভয় থেকে বাঁচবার জন্যে সেইটেই ছিল আমার একমাত্র পথ।

তারপর আর একটু বড় হলুম। বাবা-মা'র সঙ্গে সেবার গেলুম আগ্রার তাজমহল দেখতে।

বলতে গেলে কলকাতা থেকে সেই-ই আমার প্রথম বাইরে যাওয়া। প্রথম ছুটি। আমার মনের কাছে একেবারে নতুন জায়গা, নতুন দেশ, নতুন মানুষ সব। সমস্তই আমার কাছে নতুন লাগতে লাগলো। তাজমহলের নাম শোনা ছিল। পড়ার বইতে তাজমহলের ছবিও দেখা ছিল। কিন্তু আসল জিনিসটা যে কেমন তা দেখলুম সেই-ই প্রথম।

আমার ছোটাছুটি দেখে বাবা ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন—ওদিকে যেও না, হারিয়ে যাবে—

একটু চোখের আড়াল হতে পারার উপায় নেই। তাজমহলের বাগানের মধ্যে দৌড়তে দৌড়তে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলুম, বাবা ছুটে এসে এক ধমক দিলেন। বললেন—ওদিকে একলা-একলা কোথায় যাচ্ছো? হারিয়ে গেলে তখন কী হবে?

আমি যে কেন হারিয়ে যাব আর হারিয়ে গেলে কী যে সর্বনাশ হবে তা বুঝতে পারতুম না। হারিয়ে যাওয়া মানে যে কী তা বুঝতে পারতুম না।

আমি বাবাকে জিগ্যেস করতুম—হারিয়ে গেলে দোষ কী?

বাবা বলতেন—হারিয়ে গেলে তখন তুমি এখানে পড়ে থাকবে আর আমরা সবাই তোমাকে ফেলে ট্রেনে চড়ে কলকাতায় চলে যাবো, তখন মজা টের পাবে—

কথাটা শুনে সত্যিই আমার ভয় হতো। বাবা-মা কেউ কোথাও থাকবে না এটা ভাবতেও কষ্ট হতো। মনে হতো বাবা-মা না থাকলে কে খেতে দেবে!

আসলে বাবার যে এত ভয় তার কারণ ছিল। আমরা যে-হোটেলে উঠেছিলুম সে-হোটেলের মালিক বাঙালী। তাঁর নাম কিরণবাবু—নামটা এখনও মনে আছে। তিনি বাবাকে
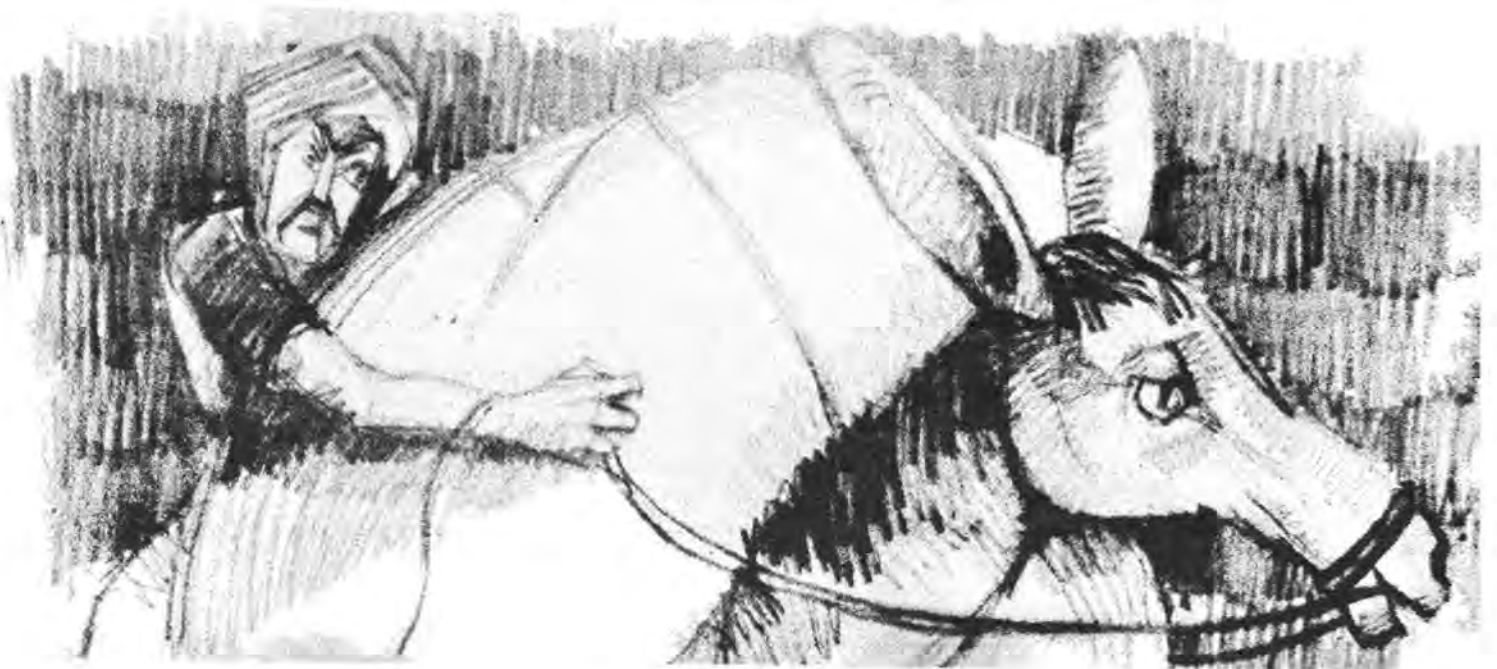
বলে দিয়েছিলেন—এখানে খুব সাবধানে থাকবেন আপনারা, এ-জায়গায় অনেক গুণ্ডা আছে—

আমি বাবাকে জিগ্যেস করতুম—গুণ্ডা মানে কী বাবা?

বাবা বলতেন—ছেলেধরা।

তবু বুঝতে পারতুম না। জিগ্যেস করতুম—ছেলেধরা মানে?

বাবা বলতেন—ছেলেধরা মানে এক ধরনের লোক থাকে যারা ছোট ছেলে দেখলেই ধরে নিয়ে যায়—

জিগ্যেস করতুম—ছেলে ধরে নিয়ে গিয়ে কী করে?

বাবা বলতেন—ছেলে ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে খোঁড়া করে দেয়, অন্ধ করে দেয়, তারপর অনেক দূরে দেশে নিয়ে গিয়ে রাস্তার ধারে বসিয়ে তাদের দিয়ে ভিক্ষে করায়, আর সেই ভিক্ষে করা পয়সা নিয়ে ছেলেধরারা আরাম করে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে খায়। আর ছেলেগুলো ক্ষিধের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করে। আর তারা যত ছট্‌ফট্‌ করে লোকে তাদের তত পয়সা দেয়—

বাবার কথায় আমি ছেলেধরার একটা ছবি এঁকে নিয়েছিলুম নিজের মনে। বেশ গোঁফ-দাড়িওয়ালা মুখ, গায়ে আলখাল্লা, মাথায় পাগড়ি আর হাতে একটা মোটা লাঠি!

রাস্তায় বাবার সঙ্গে টাঙ্গা বা এক্কায় যেতে যেতে দু-ধারে চেয়ে দেখতুম। ওই রকম কোনও পোশাক-পরা লোক দেখলেই বাবাকে দেখাতুম। বলতুম—ওই দেখ বাবা ছেলেধরা—

বাবা বলতেন—চুপ, চেঁচিও না—

আমি বাবার কথা শুনে চেঁচাতুম না। কিন্তু লোকটার দিকে বার বার ফিরে তাকাতুম।

সেদিন ঠিক হলো কার্তিক পূর্ণিমার রাত্রে তাজমহল দেখা হবে। পূর্ণিমার রাত্রে তাজমহলের আলাদা মেজাজ। সেদিন খুব ভিড় হয় তাজমহলের সামনে। কত লোক যে সেদিন সেখানে এসেছিল তার ঠিক নেই। রাত যেন তখন দিন হয়ে গেছে সেখানে। সেদিন হোটেলের ঘরের ভেতরে আর কেউ শোবে না। রাত দশটা এগারোটা বারোটা পর্যন্ত সবাই তাজমহল দেখবে। আবার কেউ কেউ হয়ত সমস্ত রাতই পড়ে থাকবে তাজমহলের দাওয়ায়।

দেখতে আমার বেশ লাগছিল। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেল তা বুঝতে পারিনি। চারদিকে চেয়ে দেখলুম অনেক লোক চলে গেছে। পূর্ণিমার চাঁদটা তখন আকাশের একপাশে ফ্যাকাশে হয়ে আসছে।

বাবা ঘড়ি দেখে বললেন—রাত এখন তিনটে—

আমার উঠতে ইচ্ছে না করলেও উঠতে হলো। ততক্ষণে ফাঁকা হয়ে গেছে জায়গাটা। সামনের বড় বড় গাছগুলো তখন মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া জটা নিয়ে কার জন্যে যেন ওৎ পেতে বসে আছে। থম্‌ থমে আবহাওয়া। বাইরের দোকান-পাট ফেরিওয়ালা টাঙ্গা এক্কা কোথায় যেন সব নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কেউ কোথাও নেই। আমাদের ক্যালকাটা হোটেল বেশি দূরে নয়। হেঁটে যেতে বেশি সময় লাগে না।

বাবা বললেন—ইস্‌, বড্ড দেরি হয়ে গেছে তো। এত দেরি হয়েছে বুঝতেই পারিনি—একটা গাড়ি-ঘোড়া কিছু নেই—

কথা শুনে মনে হলো বাবাও যেন ভয় পেয়ে গেছেন। এত রাত হয়েছে কেউ টেরই পাইনি আমরা। বাবা, মা আর আমি হাঁটিতে হাঁটতে চলেছি। হঠাৎ দূরে দেখলাম একটা টাঙ্গা আসছে আমাদের দিকে।

বাবা বললেন—ডাকো ডাকো, ওই টাঙ্গাটাকে ডাকো। এত রাত্তিতে আর হেঁটে হোটেলে যাওয়া যাবে না—

বাবার কথাটা শুনেই আমি টাঙ্গাটার দিকে দৌড়লুম।

খানিক দূর যেতেই টাঙ্গাওয়ালার চেহারাটা দেখে একটু থম্‌কে গেলুম। ছেলেধরাদের সম্বন্ধে যে-চেহারা কল্পনা করেছিলুম ঠিক তাই। মাথায় পাগড়ি, মুখময় গোঁফ-দাড়ি, পরনে আলখাল্লা। আমার কেমন ভয় করতে লাগলো তাকে দেখে।

কিন্তু কিছু ভাববার সময় না দিয়েই টাঙ্গাওয়ালা আমার সামনে এসে দাঁড়ালো, আর একটা হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরে নিজের টাঙ্গায় তুলে নিলে।

ঘটনাটা ঘটে গেল এক নিমেষে। টাঙ্গায় উঠে বসে আমি বাবাকে ডাকতে গেলুম, কিন্তু তার আগেই লোকটা আমার গলা টিপে ধরেছে আর তীর বেগে টাঙ্গার মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে উল্টোদিকে ছুটতে সুরু করে দিয়েছে!

সে কী ছুট! আমি হঠাৎ টাঙ্গা-ওয়ালার এই ব্যবহারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছি। পেছনে তখন বাবার চিৎকার শুনতে পাচ্ছি—খোকা—খোকা—

কিন্তু আমি যে সে-ডাকে সাড়া দেব তার উপায় নেই। আমি গলা ছেড়ে চিৎকার করতে চাইলুম। মনে হলো টাঙ্গা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি। কিন্তু ছেলেধরাটা আমাকে এক হাতে জোরে জাপটে ধরে আছে। আমি যে তার হাত থেকে ছাড়া পাবো তারও উপায় নেই। সে টাঙ্গাটাকে ঝড়ের বেগে ছুটিয়ে চলেছে। সমস্ত আগ্রা তখন ঘুমে অসাড়। রাস্তায় একটা প্রাণী নেই। আর আগ্রাতে আমিও নতুন মানুষ। এর আগে জীবনে কখনও আগ্রায় আসিনি। পুরো অচেনা জায়গা। কোথা দিয়ে কোন্‌ রাস্তা মাড়িয়ে যে সে আমাকে কোন্‌ দিকে কী উদ্দেশ্যে নিয়ে চলেছে তাও বুঝতে পারছি না।

সে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা তখন আমার। ভয়ে আমি কাঠ হয়ে গিয়েছি। আমি তখন বুঝতে পারছি যে আমি ছেলেধরার কবলে পড়েছি। আমার আর মুক্তি নেই। আমাকে লোকটা কোথাও নিয়ে গিয়ে চোখ দু'টো অন্ধ করে দেবে, তারপর অন্য কোনও দূরের শহরে নিয়ে গিয়ে রাস্তায় বসিয়ে আমাকে দিয়ে ভিক্ষে করাবে। আমি রাস্তার ধারে ফুটপাতে বসে বসে চেঁচাবো—বাবুরা দয়া করে অন্ধকে একটা পয়সা দিয়ে যান—

অবস্থাটা ভালো করে ভাবতে গিয়ে আমি ভয়ে আরো শিউরে উঠতে লাগলুম। কিন্তু কী করবো কিছুই বুঝতে পারলুম না। সমস্ত রাস্তাটা খাঁ-খাঁ করছে। সেখানে আমার জানা-শোনা কেউই নেই। আমি কাকে ডাকবো? কে আমায় উদ্ধার করবে? আর গলা ছেড়ে ডাকবার ক্ষমতাও তো আমার নেই তখন!

বুঝতে পারছিলুম না কোথায় যাচ্ছি। বুঝতে পারছিলুম না কোন্‌ দিকে সে আমায় নিয়ে চলেছে। দুঃখ হতে লাগলো কেন আমি বাবার কথা শুনিনি। শুধু বাবা নয়, আমি তো কখনও কারো কথাই শুনিনি। টাঙ্গাটা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে, দেখতে দেখতে শহর ছাড়িয়ে সেটা যেন গ্রামের মধ্যে ঢুকলো। চারদিকে আর পাকা-বাড়ি একটাও নেই, শুধু মাটির বাড়ি। আর রাস্তাটাও কাঁচা। কাঁচা রাস্তার ওপর খানা-খোঁদল পেরিয়ে টাঙ্গাটা তীর-বেগে ছুটছে, তাতে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝাঁকুনি লেগে বেদম যন্ত্রণা হচ্ছে।

শেষকালে মুখ থেকে লোকটার হাত জোর করে সরিয়ে চিৎকার করে উঠলুম—বা—বা—

কিন্তু আমার মুখ দিয়ে কোনও শব্দই বেরোল না। উল্টে একটা বিকট হাসি হেসে উঠলো লোকটা। সেই হাসির শব্দে আমি আরো ভয় পেয়ে গেলুম। কিন্তু সে আরো জোরে টাঙ্গাটা ছুটিয়ে দিলে। তখন আর কোনও দিকে তার জ্ঞান নেই। বন-বাদাড়, খানা-খন্দ, গর্ত-ডোবা

সে টাঙ্গাটাকে ঝড়ের বেগে ছুটিয়ে চলেছে।

কিছুই আর মানলে না সে। প্রাণপণে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলো তো ছুটতেই লাগলো। টাঙ্গাটাও ছুটছে আর আমিও তখন কিছু করতে না পেরে শুধু কাঁদছি। তারপর একটা উঁচু জঙ্গল-ঘেরা জায়গার ওপরে আসতেই টাঙ্গাটা নিচের খাদের ভেতরে উল্টিয়ে পড়ে গেল। তখন আমার আর জ্ঞান নেই। আমি আর কিছুই তখন টের পেলুম না।

যখন আমার জ্ঞান হলো চেয়ে দেখি সামনে বাবা-মা দাঁড়িয়ে। আর একেবারে মুখের সামনে দাঁড়িয়ে গলায় স্টেথিস্কোপ ঝোলানো ডাক্তার। কোথা থেকে কখন কে যে আমাকে হোটেলের ভেতরে তুলে এনেছে বুঝতে পারিনি। আমাকে চোখ খুলতে দেখে যেন সবাই নিশ্চিন্ত হলো।

ডাক্তারবাবু বললেন—যাক্ এ যাত্রা অল্পের ওপর দিয়ে গেল—

পাশেই ক্যালকাটা হোটেলের কিরণবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন—এ সব সেই রাজবাহাদুরের কাণ্ড—

বাবা বুঝতে না পেরে বললেন—রাজবাহাদুরের কাণ্ড মানে?

কিরণবাবু বললেন—রাজবাহাদুর নামে আগ্রায় সেকালে একজন টাঙ্গাওয়ালা ছিল. বুড়ো মানুষ, তার একমাত্র ছেলে একবার ঘোড়ার পায়ের চোট খেয়ে মারা যায়। তার পর থেকেই রাজবাহাদুর পাগল হয়ে গিয়েছিল—

ডাক্তারবাবু বললেন—হ্যাঁ, আমিও তাকে দেখেছি টাঙ্গা চালাতে—

কিরণবাবু বললেন—কিন্তু যারা জানতো তারা আর রাজবাহাদুরের টাঙ্গাতে চড়তো না। শেষকালে পুলিশ তার লাইসেন্স্ কেটে দিয়েছিল—

বাবা জিগ্যেস করলেন—সর্বনাশ.. তা......তারপর?

কিরণবাবু বললেন—তারপর পুলিশ তার লাইসেন্স্ কেটে দিলে কী হবে, রাজবাহাদুর লুকিয়ে লুকিয়ে গাড়ি বার করতো। শেষকালে যখন কিছুতেই সে শোনে না তখন একদিন তাকে ধরে এখানকার জেলে পুরে দিলে। তারপর সেখানেই সে একদিন মারা যায়—

—মারা গেছলো?

বাবা বললেন—মারাই যদি গেল তো তা হলে আবার টাঙ্গা চালাচ্ছে কী করে?

কিরণবাবু বললেন—ওই তো, মারা যাবার পর এক-একদিন হঠাৎ আবার রাজবাহাদুরকে অনেক রাত্তিরে তাজমহলের সামনে টাঙ্গা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। ছোট ছেলে-পুলে দেখলেই তাকে ছোঁ মেরে টাঙ্গায় তুলে নিয়ে উধাও হয়। তারপরে সকাল বেলা দেখা যায় ছেলেটা গাঁয়ের কোনও রাস্তায় মরে পড়ে আছে। এই রকম অনেকগুলো ছেলে এখানে মারা গেছে। পুলিশ তার কোনও কিনারা করতে পারেনি। আর পুলিশ ভূতের কী-ই বা কিনারা করবে!

বাবা তখন অবাক হয়ে গেছেন। বললেন—ভূত?

কিরণবাবু বললেন—হ্যাঁ ভূতই তো। ভূত না হলে এই কাণ্ড কেউ করে? রাজবাহাদুরের নিজের ছেলে মারা গিয়েছিল তো সেইজন্যেই এখন ভূত হয়ে পরের ছেলে চুরি করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। তাই তো আপনাকে গোড়াতেই বলেছিলুম একটু সাবধানে ঘোরাঘুরি করবেন।

—কিন্তু আপনি তো গুণ্ডার কথা বলেছিলেন!

কিরণবাবু বললেন—তা মানুষই বুঝি শুধু গুণ্ডা হয়, ভূত বুঝি আর গুণ্ডা হতে পারে না? □

শিবশঙ্কর মিত্র

গজরাজ

ছবি এঁকেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী

"টেটাং...টেটাং...টেটাং..."—ঢিমে তালে ভেসে আসা শব্দটা কানে যেতেই মহেশ ছুটলো বাড়ির ভেতরে।

উড়িষ্যার কটক জেলার বলতে গেলে এক গণ্ডগ্রামে এক অভাবী সংসার। তারই বার-বাড়ির চালাঘরের দাওয়ায় মাদুর পেতে মহেশ পাঠশালার পড়া পড়ছিল। কোথায় গেল তার পড়া, মা-কে চাপা গলায় ডাকতে ডাকতে ভেতর আঙিনায় ছুটেছে। চাপা গলা কিন্তু ভয় বা আশঙ্কার জন্য নয়। ভয় মিশ্রিত আনন্দের উৎফুল্লতায় মহেশের বয়সী ছেলেরা এমন সময়ে একজন আপনজনের সঙ্গ পেতে চায়। তাছাড়া, মায়েরও কিছু করণীয় ছিল এই ঘটনায়।

মা তাড়াতাড়ি একখানি কাঠের বারকোশে এক খুঁচি ধান সাজিয়ে ঘরের পোতায় কৃষ্ণকলি গাছটা থেকে কয়েকটি ফুল তুলে বারকোশের ওপর ছড়িয়ে দিলেন। তারপর একহাতে মাথার আঁচল ভাল করে জড়িয়ে নিলেন। মহেশ মুখে কিছু না বললেও মায়ের কানেও আগে থাকতে ঘণ্টা-ধ্বনি গেছে। তাই অমন দ্রুত এতগুলি কাজ সেরে ফেলেছেন। মহেশ ততক্ষণে মা-র কাছে এসে গেছে। এবার মা-র হাত ধরে প্রায় টেনে নিয়ে চলল বার-বাড়ির খিড়কি দুয়োরের কাছে।

—"ঐ দেখো, মা! কাঁটাল গাছের ফাঁকে দেখো! গজ্‌রা আসছে!"

—"দেখেছি, তুই অমন আগে যাস্‌না। এদিকে আয়!"

জমিদার ব্রজসুন্দরের পোষা হাতি—গজ্‌রা। হাতি বলতেই তো বিশাল কায়া। কিন্তু গজ্‌রা আরও বিশাল, গজরাজই বটে। তারপর যখন লাল ও সাদা রঙে তার প্রশস্ত কপাল ও শুঁড় সাজিয়ে নিয়ে আসে, তখন তো কথাই নেই।

বাড়ি বাড়ি যাবে, তাই মাহুত শুঁড়ের পরে হাত রেখে হেঁটে হেঁটে আসছে। গজ্‌রাও গজেন্দ্রগমনে হেলে দুলে আসছে, গলার ঘণ্টাও ঢিমে তালে ওর আগমন বার্তা জানিয়ে দিচ্ছে।

মা খিড়কি আর খুললেন না, হাত বাড়িয়ে বারকোশ খানি খিড়কির বাইরে ধরেছেন। অতো বড় জীব তার শুঁড়ের ডগা বাঁকিয়ে যেন ভিক্ষাথীর মতন হাত পাতলো। মা তাড়াতাড়ি মহেশের হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে জোড়াহাতে শুঁড়ের গায়ে বুলিয়ে হাতির চোখে চোখ রাখলেন। তাঁরও যেন কী প্রার্থনা আছে! তারপর তাড়াতাড়ি বারকোশ থেকে এক মুঠো ধান ও ফুল তুলে শুঁড়ের মুখে দিলেন। শুঁড় সরিয়ে নিতেই মাহুত

মুরলী বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে বারকোশখানি প্রায় টেনে নিয়ে বস্তায় ঢেলে দিল। বস্তাটি হাতির পিঠের সংগে ঝোলান ছিল। গজুরা দ্বিতীয়-বার শুঁড় না পেতে একবার দেখে নিল বারকোশ ভর্তি ধান বস্তায় ঢালা অবধি।

এমনি করেই গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায় গজুরা. আর ধান. কলাই নারকোল. কলা ও নানা ফলে. মুলে ও ফুলে বোঝাই হয়ে ওঠে বস্তা।

রোজ নয়. এক একদিন এক এক গ্রাম। যেদিন দূরের গ্রামের পালা থাকে তখন এই সব গ্রামের রাস্তা ধরে গজুরা যায় বটে, কিন্তু দ্রুতপায়ে। মুরলী তখন তার পিঠের ওপর। ঠিক পিঠের ওপর নয়, হাতির গলা বলতে যদি কিছু থেকে থাকে তো সেখানেই। অংকুশখানি হাতে নিয়ে দুলতে থাকে; আর ঘণ্টাও বাজতে থাকে দ্রুত লয়ে —সে শব্দে গ্রামবাসীরা ঠিকই বুঝে নেয়. আজ আমরা নই।

গ্রামের তোলা শেষ হলে গজুরা যায় পাহাড়ের কোলে ঢালু বনে। সেখানে ডাল ভেঙে ভেঙে দিনের খোরাকী নিয়ে আসে পিঠ বোঝাই করে।

গ্রামের তোলায় মেয়েদের দৌলতে তার নৈবেদ্যের সামান্য হলেও কিছু ভাগ গজুরা পেয়ে যায়; কিন্তু হাটের তোলায় তার বঞ্চনা প্রায় পুরোপুরি। সাপ্তা-হিক সব হাটগুলিতে মুরলী হাতিকে নিয়ে হাজির হয়। হাটের লোকের দৃষ্টির মধ্যে একটু দূরে ওকে দাঁড় করিয়ে বস্তা হাতে গজুরার নামে তোলা তুলতে থাকে। হাটের দোকানীরা কিছু না কিছু দেয় বটে কিন্তু না দেবার মত করেই দেয়। কেননা, ওদের নিশ্চিত ধারণা এই তোলার এক কণাও গজুরার ভাগে পড়বে না। তা না হলে কেন মুরলীর সংসার অমন করে দিনে দিনে ফুলে ফেঁপে উঠছে। তবু দেয় ওরা এবং দেবার আগে প্রায় সবাই একবার দেখে নেয়—গজরাজ এসেছে কিনা!

সেদিন নিয়াল-হাটের হাট বসেছে। গজরা ও মাহুত এসে গেছে। অংকুশ-খানি আর বস্তা হাতে করে মুরলী দোকানে দোকানে ঘুরছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি। চাষীদের এইবার চাষবাসের কাজে নেমে পড়তে হবে পুরোদমে। গোটা বর্ষাকালটাই ওরা তাই নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। খাদ্য মজুত করে রাখতে হবে আগামী তিন মাসের জন্য। এই তিনমাস ওদের খাদ্যের উপকরণ ভাত আর কুমড়োর তরকারি। তাই নিয়াল-হাটে আজ কুমড়োর দোকানের যেন পসার বসেছে। এমনটি যে হবে তা মুরলীর জানাই ছিল। আগে থাকতে বেশ বড় দেখে বস্তা আনতে ভোলেনি।

কুমড়োতে বস্তা বোঝাই। কোনমতে টানতে টানতে এনে গজুরার পাশে রেখেছে। গজুরার শুঁড় অস্বাভাবিক ভাবেই দুলতে থাকে; ঘরে ফিরবার আনন্দে. না ঐ বোঝাই বস্তা দেখে—তা বোঝা দায়।

"এই যা!!"—বলে মুরলী যেন চিৎকার করে ওঠে। হাতে তো অংকুশ-খানি নেই! কোনও দোকানে হয়ত ফেলে এসেছে! মুরলী ছুটে গেল হাটের মাঝে।

গালি দিতে দিতে চিৎকার করে অংকুশ প্রায় উদ্যত করে দূর থেকে ছুটে আসছে মুরলী। গজুরা ইতিমধ্যে হয়ত চোরাই মালের বহর দেখতে শুঁড় দিয়ে বস্তায় টান দিয়েছে। টান দিতেই কয়েকটি কুমড়ো গড়িয়ে আসে পায়ের ধারে। ক্ষণিকের জন্য ইতস্তত. তারপরই শুঁড়ে ধরে একটা কুমড়ো ছুড়ে দিয়েছে তার ক্ষুধার্ত মুখগহ্বরে।

মালিকের কাছে চোরাই মাল ধরা পড়াতে মুরলী যেন ক্ষিপ্ত। ছুটে এসে উদ্যত অংকুশ বসিয়ে দিল গজুরার কানের পাশে। গজুরা এবার যেন হঠাৎ নিশ্চল হয়ে গেছে। শুঁড়ের দোলানি স্তব্ধ. চিরচঞ্চল কান দুটিও অকম্পিত। নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুরলী তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়া কুমড়োগুলি আবার বস্তায় ভর্তি করে গজুরাকে বসবার জন্য আদেশ দিল—"টিট্. টিট্. টিট্।" না. গজুরা নিস্পন্দ। মুরলী পাশেই একহাতে বস্তার মুখটা ধরে অন্যহাতে অংকুশ নিয়ে হাতির বসবার অপেক্ষায় আছে। বসতেই বস্তাটা ওর পিঠে ঝুলিয়ে ফিরে যাবে হাট থেকে।

গজুরার অতবড় দেহের ছোট্ট চোখ-দুটি এই সময়ে কেউ লক্ষ্য করেছিল কিনা জানিনা. মাহুত লক্ষ্য করলেও তাকে উপেক্ষা করেই ভীষণ চিৎকারে আবার বসবার আদেশ দিল। সে-চিৎকারে মাহুতের অসহনীয়তা যেন ফেটে পড়ে।

গজরাজ তার দীর্ঘায়ত শুঁড় বস্তার দিকে এগিয়ে দিয়েছে। "আবার লোভ!!"—বলেই মুরলী ডান হাতের অংকুশ শক্ত মুঠোয় ধরতে গেছে। না. বস্তা তার লক্ষ্য নয়। ঝমাৎ করে এক কদম এগিয়ে শুঁড়ের বেষ্টনীতে মাহুতকে টেনে এনেছে। মুহূর্তে মধ্যে তার দেহখানা পায়ের তলায় ফেলে চেপে গুঁড়িয়ে দিল। হাড়গোড় গুঁড়িয়ে নাড়িভুঁড়ি চারিদিকে ছড়িয়ে ছিট্‌কে পড়ল।

চিৎকার. হাটময় চিৎকার! যে যার দোকান পাট. সওদার জিনিস-পত্র মাঠে ফেলে রেখেই ছুটে পালাচ্ছে অপর প্রান্তে। অতো চিৎকারে মাত্র দুটো কথাই কানে আসে—ক্ষেপা হাতি!...... পাগ্‌লা হাতি!.........

মহেশও হাটের মাঝে ছিল। সওদা করবে কি. বারবার গজুরার দিকে অবাক হয়ে দেখছিল—কেমন পোষা হাতি! না বেঁধে মাহুত ওকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে তো দাঁড়িয়েই আছে। শুধু কান নাড়িয়ে বাতাস দিচ্ছে আর শুঁড় দুলিয়ে বিশাল দেহকে একটু একটু দোল দিচ্ছে। এক কদমও এগিয়ে আসেনি!

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে এই কাণ্ড ঘটতে মহেশ হতবাক্। একছুটে পাশের বাড়ির খিড়কি দরজা পেরিয়ে উঁকি মেরে গজুরার প্রতি লক্ষ্য রেখেছে।

এদিকে রক্তাপ্লুত ছিন্নভিন্ন দেহের সামনে গজুরা দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। হাটের প্রাঙ্গণ ফাঁকা। শুধু কুমড়ো, লাউ, নারকোল সব রাশি রাশি ছড়িয়ে পড়ে আছে। মহেশ আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে—'ওর সামনে এতো খাদ্য, এবার নিশ্চয় মনের আনন্দে সব কিছু খেয়ে নেবে, আর খেলেই বোধহয় ক্ষ্যাপামি চলে যাবে—ও আবার হয়ে উঠবে সেই পোষা গজরাজ!'

না, গজুরার সেদিকে লক্ষ্য নেই। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে গজেন্দ্রগমনে এগিয়ে গেল হাটখোলার পাশেই ফাঁকা পুকুরটায়। গিয়ে ধীরে ধীরে জলে নেমে গেল। গভীর পুকুরের গভীরেই ধীরে ধীরে শরীরটা তলিয়ে দিল। তারপর শুঁড়ের ডগাটুকু মাত্র জলের উপর রেখে নিজেকে অদৃশ্য করে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল।

হাটুরে লোকেরা এতক্ষণে খানিকটা শান্ত হলেও বুঝে নিয়েছে আজকের মত হাট ভেঙে গেল। যে যার দোকান ও সওদা গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। ইতি-মধ্যে ব্রজসুন্দরের কাছে খবর পৌঁছে গেছে। তিনিও প্রায় পাগলা হয়ে উঠেছেন। রাইফেলটা নিয়ে সোজা ছুটে এসেছেন নিয়ালির হাটে। পাগলা হাতিকে বাঁচিয়ে রাখলে রক্ষা নেই!

রক্ষা নেই সত্য, পাগলা হাতি তোল-পাড় করে দেবে গোটা পরগণা। কিন্তু হাটুরে মানুষগুলি যেন ততোধিক ক্ষেপে উঠল,—"না, ওকে মারবেন না! গজুরার কোনও দোষ নেই!"

ব্রজসুন্দর মাহুতের ছিন্নভিন্ন মৃত-দেহের দিকে আঙুল দিয়ে দেখান। হাটুরে মানুষ যেন ক্ষিপ্তের মত বলতে থাকে—"না, মাহুতই নিজেই দায়ী। আমরা রোজ গজুরাকে কত কিছু খেতে দিই, মুরলী তার একটুও ওকে খেতে

"আমার মা-ও গজ্‌রাকে কত ধান দিয়েছে

দিতো না—একটুও দিতো না। আপনার বরাদ্দ দানার সিকি ভাগও ওর কপালে জুটতো কিনা সন্দেহ! সব...সব...!" মহেশও ছুটে এসে ব্রজসুন্দরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাত ছুড়ে ছুড়ে বলে,—"আমার মা-ও গজ্‌রাকে কতো ধান দিয়েছে......দেয়নি খেতে ওকে।"

ব্রজসুন্দর রাইফেলের লক্ সরিয়ে কুঁদো মাটিতে রেখে বলেন,—"তা তো হলো, গজ্‌রা কই? কোথায় গেল গজ্‌রা?"

পুকুরের পাশে গিয়ে ব্রজসুন্দর গজ্‌রাকে নাম ধরে চিৎকার করে ডাক দিতে থাকেন। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ নেই। শুঁড়ের মুখটাও এতটুকু নড়েচড়ে না!

নড়বে কি, ওর কানও যে জলে ডোবা। তখন সবাই মিলে ঢিল মারতে শুরু করে। মহেশের উৎসাহ যেন সব থেকে বেশি। দু-একটা ঢিল শুঁড়ে লাগতেই নড়ে উঠেছে। মাথাটাও উঁচু করেছে। সঙ্গে সঙ্গে গোটা হাটুরে লোক স্তব্ধ হয়ে গেছে। মুহূর্তের মধ্যে একটা কিছু অঘটন ঘটবে বুঝি। রুদ্ধ উৎকণ্ঠা নিয়ে সবাই প্রতীক্ষমাণ। সামনের সারির প্রায় সবার দুবাহু পার্শ্বে ঈষৎ প্রসারিত—একে অপরকে আগলে রাখতে চায় যেন।

ব্রজসুন্দর ঝটিতে রাইফেলের লক্ চালু করে গুলি করার জন্য তৈরি হলেন, কিন্তু রাইফেল তখনও কাঁধে তোলেন না। সামনে এগিয়ে হাতের ইঙ্গিতে ও চিৎকারে আদেশ দিলেন উঠে আসার জন্য।

গজ্‌রা এবার ধীরে ধীরে উপরে উঠছে। হাটুরে লোক আবার হুড়মুড় করে দৌড়ে পালায়। হাটখোলা আবারও ফাঁকা হয়ে পড়ে। ব্রজসুন্দর একাই দাঁড়িয়ে আছেন। রাইফেলটা শক্ত করে তুলে ধরে কয়েক কদম পিছিয়ে গেলেন। গজ্‌রা মন্থরগতিতে পুকুর ছেড়ে উপরে উঠেছে। উঠেই ব্রজসুন্দরের সামনে এসে শুঁড় তুলে কপালে ঠেকিয়ে দীর্ঘ সালাম দিল। তারপর আরও একটু এগিয়ে ব্রজসুন্দরের সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়লো। ব্রজসুন্দরের হাতের উদ্যত রাইফেল এবার ঢলে পড়েছে। ক্ষণকাল এইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ব্রজসুন্দর ধীরে ধীরে গজ্‌রার কাঁধে উঠে বসলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গজরাজ কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, না হাটের অজস্র বিক্ষিপ্ত ফলমূলের দিকে, না জমায়েত হাটুরে মানুষের দিকে, না মাহুতের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহের প্রতি—সোজা আপন ঘরে দ্রুতপায়ে চলে এলো।

এলো বটে, কিন্তু কিছুই খেতে চায়না। কত সাধাসাধি করেন ব্রজসুন্দর, তবুও নয়। খুব পীড়াপীড়ি করলে হয়ত একটু সামান্য কিছু মুখে দেয়—ব্যস্, তারপর কিছুতেই আর খাবে না। ব্রজসুন্দর শিকল পরিয়ে বেঁধে রাখলেন। নতুন মাহুতের কত খোঁজ করলেন, কিন্তু কেউই মাহুত-মারা হাতির কাজ করতে চায় না। গজরাজ অবশেষে কিসের অভিমানে, কিসের অনুশোচনায় বা কিসের প্রতিবাদে অমন করে না খেয়ে শুকিয়ে মারা গেল তা আজও দুর্বোধ্য হয়ে আছে।

ইতিমধ্যে চল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে। ব্রজসুন্দরের জমিদার-প্রাসাদ ভেঙে ভেঙে পড়েছে, বলতে গেলে প্রায় বসতিশূন্য। বহু চেষ্টার পর তবে সেই পুরনো হাতিশালের চিহ্ন মেলে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা আর আজকাল হাতির গর্বে গর্বিত মহেশের মত ছুটে আসে না। তবে তারা আজও ছুটে আসে। হাতির গলার ঘণ্টাধ্বনিতে নয়, আসে দুরন্ত বেগে চালিত যন্ত্রযানের গোঙানিতে।

আর মহেশ! পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ় মহেশ আজও যখন ব্রজসুন্দরের ভগ্নদশাগ্রস্ত প্রাসাদের পাশ দিয়ে কালেভদ্রে যায়, তখন তার অলিন্দে এসে একবার চুপ হয়ে দেখে নেয়, দেয়ালে টাঙানো ঝুলে আবৃত ময়লা একখানি ছবি—গজরাজের ছবি। দর্শকের দিকে তাকিয়ে তার দীর্ঘ শুঁড় ঊর্ধ্বে তুলে সালাম জানাচ্ছে।

পালোয়ান ভূত

মনোজ বসু

ছবি এঁকেছেন সুবোধ দাশগুপ্ত

মাতঙ্গী ঠাকরুনের দোর্দণ্ড প্রতাপ। বিধবা, খাটো খাটো চুল, বয়স হয়েছে, দেহে কিন্তু তাগত খুব। আপন কেউ নেই, মরে হেজে গেছে। ঘুরতে ঘুরতে নটবর তাঁর কাছে এসে পড়ল। খায়-দায়, সংসারের এটা-ওটা করে—মাস মাইনে তিন টাকা। ভাঙাচুরো সেকেলে বাড়িতে ঠাকরুন একলাটি থাকতেন, এখন আর একটি এসে জুটল—নটবর।

রকমারি রাঁধাবাড়া ও খাবার-দাবার বানানোয় ঠাকরুনের জুড়ি নেই। ঘোষেদের জামাই আসবে—বিকাল থেকে তিনি জলখাবার বানাতে লেগে গেছেন। চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের-ছাঁচ, নারকেলের চিঁড়া-জিরা—ঝঞ্ঝাটের কাজকর্ম, বড্ড সময় লাগে। শেষ হতে বেশ খানিকটা রাত হয়ে গেল।

রান্নাঘরের দরজায় শিকল তুলে দিয়ে নটবরকে বললেন, রইল সব। গরম লাগছে, চানটা সেরে আসি। এসে তুলে পেড়ে রাখব। নজর রাখিস, বেরাল-টেরাল না ঢুকে পড়ে।

বলে পুকুরঘাটে চললেন। খানিকটা গিয়ে মনে হল, খাবার জল কমে গেছে—কলসিটা নিয়ে এলে হয়, ঘাট থেকে অমনি কলসি ভরে আনা যাবে।

এসে অবাক। রান্নাঘরের দরজা হাঁ-হাঁ করছে—বেরাল ঢোকেনি, ঢুকে গেছে নটবর। নটবরের সব ভাল, খাবার জিনিস দেখলে মাথার ঠিক থাকে না। রান্নাঘরের ভিতর সে সদ্য-তৈরি খাবারগুলো পরখ করতে লেগে গেছে। সময় কম বলে যত রকম পদ আছে, একসঙ্গে মুখে ঢোকাচ্ছে। পায়ের শব্দে পিছন তাকাল—

ওরে বাবা, ওরে বাবা, আর করব না এমন কাজ—

দৌড়, দৌড়। বাঁশের চেলা নিয়ে মাতঙ্গী ঠাকরুন তাড়া করেছেন। ধরতে পারলে আস্ত রাখবেন না আজ। বাড়ির পিছনে কসাড় জঙ্গল, বাঁশবন। অন্ধকার এমন ঘন, নিজের হাত-পা-গুলো অবধি নজরে আসে না। তীরের বেগে নটবর ছুটছে। জঙ্গলটা পার হয়ে ঘোষেদের গোয়াল। গোয়ালা ঘোষ—দুধের ব্যবসা, বিস্তর গরু। গোয়ালে ঢুকে গরুর পালের মধ্যে নটবর গুটি-সুটি হয়ে রইল।

মাঝ রাত্রে চাঁদ উঠেছে। নির্মল জ্যোৎস্না, ঠিক যেন দিনমান। গরুর শিঙের গুঁতো ও পায়ের লাথি খেয়ে গোবর ও চোনার মধ্যে এমনভাবে আর থাকা যায় না। ঠাকরুনের রাগ এতক্ষণে ঠিক পড়ে গেছে। গুটিগুটি সে বাড়ির দিকে চলল।

বাড়িতে কেউ নেই, শোবার ঘর রান্নাঘর খোলা। মাতঙ্গী ঠাকরুন ফেরেন নি। এমন তো হয় না। ভাবনা হল। রাগের বশে অন্ধকারের মধ্যে তাড়া করেছিলেন—কোন বিপদ আপদ ঘটল না তো? যে দিক দিয়ে তারা ছুটেছিল, খুব সতর্কভাবে অন্ধিসন্ধি দেখতে দেখতে সে চলল। ভাঙাচোরা পরিত্যক্ত ইঁদারা—জলটল থাকে না কখনো, জঙ্গলে ঢেকে আছে—ক্ষীণ আওয়াজ আসে যেন সেখান থেকে। তবে কি ইঁদারায় পড়ে গেছেন ঠাকরুন?

ছুটে গেল নটবর, গিয়ে কান পাতল। হাঁ, পাতালতলে হুটোপুটি। ঠাকরুনের গলাও অস্পষ্ট যেন পাওয়া যায়। মাতঙ্গী ঠাকরুনই—সন্দেহমাত্র নেই। ছুটতে ছুটতে অন্ধকারে ঠাহর পান নি, ইঁদারায় পড়ে গেছেন। প্রাণের তাগিদে চেঁচামেচি লাগিয়েছেন।

মুহূর্তে নটবর মতলব ঠিক করে ফেলল—গেল চলে আবার ঐ ঘোষেদের গোয়ালে। চারটে গরুর গলার দড়ি খুলে একসঙ্গে মজবুত করে বাঁধল। এক প্রান্তে ইট বেঁধে নিল সহজে যাতে ইঁদারার তলায় দড়ির মাথা গিয়ে পড়ে। নামিয়ে দিল দড়ি। গর্তের দিকে মুখ করে চেঁচাচ্ছেঃ শক্ত করে দড়ি ধরুন—টেনে তুলব। ধরেছেনও তাই—আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে। টানছে নটবর প্রাণপণ শক্তিতে—উঃ, বিষম ভার। টানতে টানতে অবশেষে উঠে এলো—মাতঙ্গী ঠাকরুন

নন, কালোকালো দৈত্যাকার একজন। হাতে বাঁশের চেলা—মাতঙ্গী ঠাকরুনের হাতে যে বস্তু ছিল। দড়ি কড়কড় করছিল—ঐ ওজন টেনে তুলতে কেন যে ছেঁড়েনি, তাই আশ্চর্য।

ফোঁত ফোঁত করে কাঁদছে সেই প্রকাণ্ড পুরুষ। উপরে উঠে বাঁশের চেলা ছুঁড়ে দিল, চোখের জল মুছল। বলে, কে ভাই আমায় বাঁচালে? আমি তোমার কেনা হয়ে রইলাম।

নটবর বলে, কে আপনি? অত কাঁদছিলেন কেন

পালোয়ান-দারোগার নাম শুনেছ নিশ্চয়—

নটবর বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনেছি বই কি। সদর থানায় ছিলেন তিনি। ডনবৈঠক করে করে প্রকাণ্ড গতর বানিয়েছিলেন। পালোয়ান-দারোগার নামে চোর-ডাকাত থরহরি কাঁপত। শ্রাবণ মাসে হঠাৎ তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন।

আমিই সেই পালোয়ান-দারোগা, এখন পালোয়ান-ভূত। নিরুদ্দেশ হইনি রে ভাই, স্রেফ পটল তুলেছি। ডাকাতেরা গুম করে রেখে শেষটা এই ইঁদারায় ফেলে দিল। বাতিল ইঁদারা দেখতে পাচ্ছ। ওঠা-নামার জন্য গাঁথনির গায়ে লোহা পোঁতা থাকে—মরচে ধরে সে সব লোহার চিহ্নমাত্র নেই। উপরে উঠতে পারি নি, চাইও নি উঠতে। ইঁদারার মধ্যে তোফা ছিলাম এই আটমাস। উপরে এত গরম, ওখানে দিব্যি ঠাণ্ডা—এয়ার কণ্ডিসণ্ড। কিন্তু কাল রাত্তির থেকে সমস্ত সুখ বরবাদ। পালোয়ান বলে লোকে আমায় ডরায়—আরে সর্বনাশ! পালোয়ানের উপরেও চামুণ্ডা পালোয়ানী রয়েছে

বলছে পালোয়ান-ভূত, আর শিউরে শিউরে উঠছে বলে, বড্ড বাঁচান বাঁচিয়েছ। একটু জল খাওয়াতে পার ভাই?

নটবর ডাকেঃ চলে এসো। মাতঙ্গী ঠাকরুনের বাড়ি গিয়ে জলের কলসী দেখিয়ে দিল। চকচক করে পুরো-কলসী জল গলায় ঢেলে ভূত একটু আরামের নিশ্বাস ফেলে বলে, আঃ!

বলছে, তোফা ছিলাম ভাই। আজকেই সন্ধ্যারাত্রে উপর থেকে ধপাস করে এক মেয়েলোক পড়ল। পড়েই অক্কা—সঙ্গে সঙ্গে পেত্নী। অবলা নারী জেনে সাহস দিতে কাছাকাছি গেছি। ভয় নেই, ইঁদারার তলায় খাসা থাকবে—এমনি সব বলতে না বলতে, হাতে ঐ বাঁশের চেলা, চেলা বাঁশ নিয়েই উপর থেকে পড়েছে, মরে গিয়েও হাতের বাঁশ ছাড়েনি—আমার চুলের মুঠো না ধরে বাঁশের চেলায় দমাদম পিটুনি। বলে, কেন খেয়েছিলি চন্দোরপুলি? খাই নি বলে দিব্যিদিশেলা করছি—কে বা শোনে কার কথা—পিটিয়েই যাচ্ছে। দুঁদে দারোগা ছিলাম আমি—ডাকাত-খুনী-দাঙ্গাবাজ নিয়ে কাজকারবার—কিন্তু এমন মার-কুটে মেয়েলোক বাপের জন্মে দেখিনি ভাই।

নটবর বলে, আমার মনিব। তাঁরই এই ভিটে।

পালোয়ান-ভূত সবিস্ময়ে বলে, ওর কাছে ছিলে?

তিন বচ্ছর—

বাহাদুর তুমি। আমায় তো তিন ঘণ্টাতেই সর্ষেফুল দেখিয়ে দিল। না পেরে একটানে তখন হাতের বাঁশ কেড়ে

নিলাম। পেত্নী-মহিলার তারপরে যেন খুন চেপে গেল। হাতে আর পায়ে ওজনের কিল-চড়-লাথি ঝাড়তে লাগল। রক্ষে কোনমতেই ছিল না—ভাগ্যিস এই সময়ে তোমার দড়ি গিয়ে পড়ল দড়ি ধরে বেঁচে এসেছি।

গদগদকণ্ঠে পালোয়ান-ভূত বলে, যা তুমি করেছ, তোমায় অদেয় কিছু নেই। মনিব বাড়ি এখানেই থাকো কয়েকটা দিন, আমি আবার আসব। অনেক টাকা পাইয়ে দেবো তোমায়।

বলেই অদৃশ্য। কথা রেখেছে পালোয়ান-ভূত, কয়েকটা দিন পরে আবার দেখা দিল।

শোন, মতলব ঠাউরেছি। পগেয়াপটির হরিরাম সাউ কালোবাজারের রাজা। যেসব ভাল ভাল জিনিস চক্ষেও দেখতে পাও না, সাউর বাড়ি সমস্ত গোপন মজুত রয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করে বেড়াত, এখন নোটের গদি বানিয়ে তার উপরে শোয়। হরিরামের বউয়ের ঘাড়ে আমি চাপব। বড়লোক মানুষ—চিকিচ্ছেয় মেলা খরচপত্র করবে। ভূতের রোজা হয়ে চলে যাও তুমি সেখানে। মোটা টাকার চুক্তি করে নিয়ে চিকিচ্ছেয় নেমো। দরজা বন্ধ করে পালোয়ান-ভাই বলে ডেকো, বুঝবো এসে গেছ তুমি। মন্তোর হল—ক্রীং মীং ফুট। মন্তোর শুনলেই সরে পড়ব।

বলতে বলতে আবার কড়া সুরে সতর্ক করে দেয়ঃ রোজাগিরি খাটিও মাত্তোর এই একবার। বাইরে এসেছি, ভালা থাকা ভাল খাওয়া চাই এখন কিছুদিন। এর পরে আর আমার পিছনে লাগতে যেও না। মুণ্ডু ছিঁড়ে নেবো তাহলে—খবরদার!

পগেয়াপটির হরিরাম সাউর বাড়ি তুমুল হৈ-চৈ। বউয়ের ঘাড়ে ভূত লেগেছে। ওঝা-বদ্যি কত এলো, টাকার বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, ভূত কিছুতে নামে না।

নটবর এসে বলল, আমি নামিয়ে দেবো। একশ' খানি টাকা চাই—চিকিচ্ছে হয়ে গেলে তারপর টাকা দেবেন, এক পয়সাও অগ্রিম চাইনে।

হরিরাম এককথায় রাজি। ঘর থেকে সকলকে সরিয়ে নটবর দরজা বন্ধ করল। ঘরে শুধু রোজা আর রোগী—নটবর ও হরিরামের বউ।

নটবর বলে, এসে গেছি পালোয়ান-ভাই।

হরিরামের বউয়ের মুখ দিয়ে পালোয়ান-ভূত বলে, কতয় রফা হল?

একশ'—

আরে ছ্যা-ছ্যা, নজর বড্ড খাটো

তোমার।

নটবরও বুঝছে সেটা এখন। বলে, তিন টাকা মাইনের চাকরি করে এসেছি—একশ'র বেশি মুখ দিয়ে বেরুল না। বলে ফেলেছি, কী আর হবে! ক্লীং মীং—ফুট্—

হরিরামের বউ মুহূর্তে ভালমানুষ, কাপড় চোপড় সেরে সামলে লজ্জাশীলা হয়ে বসল। দরজা খুলে দিয়ে নটবর সকলকে ডাকলঃ চলে আসুন—

করকরে একশ' খানা টাকা নিয়ে নটবর বাড়ি চলে গেল। বিষম স্ফূর্তি—এত টাকা একসঙ্গে কখনো দেখেনি। হপ্তাখানেক যেতে না যেতে হরিরামের ম্যানেজার খোঁজে খোঁজে এসে হাজির। বলে, রোজামশায়, পগেয়াপটি আর একবার যেতে হচ্ছে। সেই ভূত খেপে কর্তাবাবুকে ধরেছে।

সে কি?

বউঠাকরুনকে ধরেছিল—সে তবু মন্দের ভালো। ঘরের বউ মিন মিন করে কি বলল, বাইরের লোকে শুনতে যায় না। কর্তাবাবু হাটে হাঁড়ি ভাঙছেন—ভূতাবিষ্ট হয়ে কোথায় কি মাল সরানো আছে ফাঁস করে দিচ্ছেন। সবসুদ্ধ আমাদের জেলে যাবার গতিক। এক্ষুনি গিয়ে ভূত নামিয়ে আসুন। ডবল ফী, দু-শ টাকা এবারে। অগ্রিম দিয়ে দিচ্ছি—

ব্যাগ খুলে ম্যানেজার দুটো এক-শ টাকার নোট মেলে ধরল। লোভ ঠেকানো কঠিন বটে। কিন্তু ভয়ও আছে—মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলবে, পালোয়ান-ভূত শাসিয়ে রেখেছে।

ম্যানেজার নাছোড়বান্দা। খপ করে নটবরের হাত জড়িয়ে ধরলঃ যেতেই হবে রোজামশায়। আরও এক-শ টাকা—মোটমাট তিন-শ' কবুল করছি।

ভাবছে নটবর। হাত ছেড়ে ম্যানেজার পা জড়িয়ে ধরতে যায়। যা থাকে কপালে—নটবর মন স্থির করে ফেলেছে। বলল, হাজারটি টাকা দেবেন—তবে বেরুব। দরাদরি করবেন তো পথ দেখুন। হাজারের অর্ধেক আগাম চাই—এক্ষুনি।

গুনে গুনে এক-শ' টাকার পাঁচখানা নোট অগ্রিম নিয়ে নটবর ভূত নামাতে চলল। হরিরাম সাউর সামনাসামনি হতে চোখ পাকিয়ে দাঁত-কিড়িমিড়ি করে উঠল সেঃ মানা করে দিয়েছি, তবু এসেছিস? মজা দেখাচ্ছি—ধড় থেকে মুণ্ডুটা খটাস করে ভেঙে ছুঁড়ে দেবো, হাওড়া ইস্টিশানে গিয়ে পড়বে।

তর্জন গর্জন শুনে সবাই থরথর কাঁপছে। নটবর অবিচল, লোকজন সরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। গলা নামিয়ে অভিমানের সুরে বলল, রোজাগিরি করতে আসিনি পালোয়ান-ভাই। থাকো না চিরকাল বড়লোকের ঘাড়ে চেপে—সাঙাৎ তুমি, তোমার সুখেই আমার সুখ। ওদিকে সাংঘাতিক বিপদ—তোমায় শুধু খবরটা দিতে এসেছি।

কি?

মাতঙ্গী ঠাকরুন ইঁদারা থেকে উঠে পড়েছেন।

চোখ বড়-বড় হল হরিরামের। মানে ভূতই ভয়ে বিস্ময়ে চোখ বড় করলঃ

বলো কি হে?

নটবর বলে, ঠাকরুনের অসাধ্য কাজ নেই। তিন বছর ছিলাম তো তার কাছে—দেখতাম আর চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যেত। তুমি বেটাছেলে, তায় পালোয়ান হয়েও আট মাস ইঁদারার গর্ভে বন্দীদশায় রইলে, আর উনি নিরামিষভোজী বিধবা হওয়া সত্ত্বেও দেয়াল বেয়ে বেয়ে উপরে উঠে পড়েছেন। বাঘিনীর মতন গজরাতে গজরাতে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন—হাত থেকে বাঁশের চেলা কেড়ে নিয়েছ, এত বড় আস্পর্ধা!

পালোয়ান-ভূত কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, কি করব, ঠেঙানি খেয়ে কুলোতে পারিনে যে।

ঠাকরুন সেই কথাই আমায় বলছিলেন—সেবারে তোর প্রাপ্য ঠেঙানি ভুল করে পালোয়ানের উপর ঝেড়েছিলাম, এবারে যা হবে ষোলআনা তারই পাওনা। একবার পেলে হয়—আগাপাস্তলা ধোলাই দিয়ে হাড়গোড় চূর্ণবিচূর্ণ করব।

আঁতকে উঠে পালোয়ান-ভূত বলে, হদিস বলে দাও নি তো ভাই?

ঘাড় নেড়ে নটবর না-না করে ওঠেঃ ক্ষেপেছ? হলে হবে কি—ঠাকরুনের হাড়ে হাড়ে বুদ্ধি, আন্দাজে ধরেছেন। বললেন, পগেয়াপটিতেই পেয়ে যাব মনে হচ্ছে। হরিরামের বউকে ভূতে পেয়েছিল, পিঠ পিঠ আবার হরিরামকে। তোমার বেরুনোর পর থেকেই এই রকম কাণ্ডকারখানা—সেইজন্যে সন্দেহ এসেছে। বলছি তো—ডিটেকটিভের কান কেটে নেন আমাদের ঠাকরুন।

পালাই। উপায় কি?

পালোয়ান-ভূত ফোঁস করে প্রবল এক নিশ্বাস ছাড়লঃ অট্টালিকা আর শাঁসালো মক্কেল পেয়ে ভেবেছিলাম, ভালো খেয়ে ভালো থেকে সুখ করে নেবো দিন কতক। হল না, কপাল খারাপ। দেশই ছাড়ব—তোমার ঠাকরুন যখন খোঁজাখুঁজি লাগিয়েছে।

নটবর প্রশ্ন করেঃ যাবে কোথায়?

আপাতত দমদম এরোড্রোমে। প্লেনের ছাতের উপর চেপে বসে পাহাড়-সমুদ্দুর পেরিয়ে যত দূর পারি চলে যাবো। দেশে থাকলে গন্ধে গন্ধে ঠিক ধরে ফেলবে।

ভূত নেমে গিয়ে হরিরাম সম্পূর্ণ সুস্থ। ভূতের রোজা বলে নটবরের খুব নাম পড়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরতে না ফিরতেই টুম্পু এসে ধরল—দুদিন কোথায় গিয়েছিলে, জ্যাজা? বললাম—উলোপুর!

কী বিচ্ছিরি নাম! টুম্পু খিলখিল করে হেসে উঠল—হুলোপুর।

হুলোপুর নয়, উলোপুর।

মানে কী? ঘাড় বেঁকিয়ে, চুল নাচিয়ে টুম্পু জিগেস করল।

বললাম—টুম্পু মানে কী?

জ্যাজাটা বড্ড বাজে কথা বলে। টুম্পু একলাফে বাগানে চলে গেল। বলে গেল দাঁড়াও, আসছি খেলে। তারপরে.........।

টুম্পু বড় হয়ে যাচ্ছে। আমার সাত বছরের ভাইঝি। টুম্পুর ভাল নাম ইন্দ্রিলা। টুম্পু জ্যাঠা উচ্চারণ করতে পারত না। আজও তাই আমি জ্যাজা রয়ে গেছি।

বাগানে ইজি চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়েছি। টুম্পু এসে একটা টুলের ওপর বসে পড়ে বলল—বল!

কিসের?

ডিটেক্‌টিভের।

মনে হোল এই কিছুদিন আগেও টুম্পু বলত দিতেক্‌তিভ্‌।

শুরু করলাম—অনেক অনেকদিন আগে.........

কতদিন? টুম্পু জিগেস করল।

তখনও দেশ স্বাধীন হয় নি।

টুম্পু বলল—দেশ তোমরা কেন স্বাধীন করলে, জ্যাজা?

তার মানে?

তার মানে তোমরা আমাদের জন্যে কিছুই রাখনি। তোমরা দেশ স্বাধীন করে ফেললে, চাঁদে চলে গেলে। আমাদের জন্যে আর কী রইলো?

হেসে ফেললাম—গল্প শুনবে না কি? যা বলছিলাম, অনেকদিন আগে উলোপুর থেকে আমার বন্ধু শঙ্করের একটা চিঠি এলো—খুব বিপদ। চলে আয়। এখানে খুব ভাল রসোগোল্লা পাওয়া যায়। ওঁকেও নিয়ে আসিস।

কাকে জ্যাজা? টুম্পু জিগেস করল।

সেই যে.........

টুম্পু বলে উঠল—ও বুঝেছি। সেই রসোগোল্লা দাদু না?

টুম্পুর রসোগোল্লা দাদু হলেন আমার মামাবাবু। রসোগোল্লা বস্তুটি তাঁর বড় প্রিয়। তাই যে কোন লোককেও
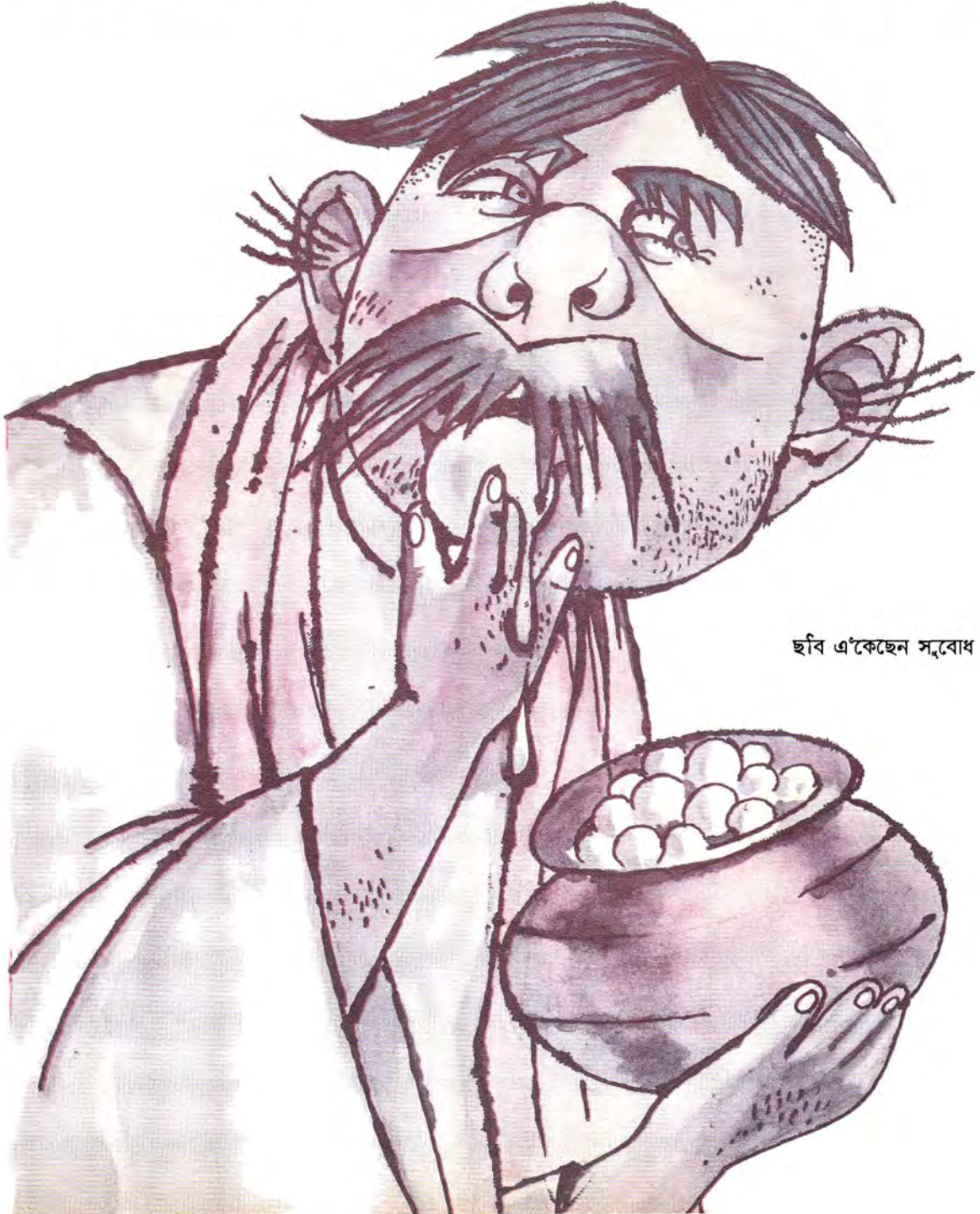
ছবি এঁকেছেন সুবোধ দাশগুপ্ত

তাঁর পছন্দ হলে, তাকে ডাকেন রসোগোল্লা বলে। নধর দশাসই চেহারা, ভুঁড়িটি নেয়াপাতি, আর মুখে ঝাঁপানো একমুখ ঠোঁট চাপা দেওয়া গোঁফ।

বল না! টুম্পু বলল।

হ্যাঁ, তোমার সেই রসোগোল্লা দাদুকে খবর দিলাম। মামাবাবু সব শুনে টুনে বললেন—হুঁঃ ডাকাতের আবার বিপদ! তবে ওই রসোগোল্লার কথাটা খাঁটি। চল বেরিয়ে পড়ি।

এই রাত্তির বেলায়?

হ্যাঁ রে হোঁদলকুতকুত! দেখছিস না লিখেছে ভাল রসোগোল্লা পাওয়া যায়।

জ্যাজা, টুম্পু বলল—তোমার বন্ধু ডাকাত?

মরা আলো আঁধারিতে আরও ধাঁধা।

হুঁঃ! মামাবাবু বললেন—জমীদার বাবু জোনাকীর আলোয় পথঘাট সাজিয়ে রেখেছেন। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন—এই রসোগোল্লা, আকাশের গায়ে উঁচু পাহাড়ের মত কালো ওটা কি দেখা যায় রে?

উঁকিমারা একফালি চাঁদ, পেছনে যেন সত্যিই একটা কালো পাহাড়ের চুড়ো।

ওটাই তো শঙ্করদের মন্দির। উলোপুরের নামকরা কালীমন্দির।

তাহলে শঙ্করদের বাড়ীটা কাছেই বল?

কাছেই তো।

চল্ চল্,পা চালা।

চলুন। রসোগোল্লার গন্ধ পাওয়া ছিলেন। শঙ্করই তখন জমিদারির মালিক। শঙ্করের মায়ের বয়েস হয়েছে। পাকা চুলের ওপর সাদা থানের ঘোমটা টানা। তখনও তাঁর দুধে আলতা রং। সব মিলিয়ে যেন এক দেবীমূর্তি।

মামাবাবুই প্রথম কথাটা পাড়লেন—কি ব্যাপার বলত শঙ্কর?

শঙ্কর মায়ের মুখের দিকে তাকাল—গিন্নীমা তুমি বলবে,না আমি বলবো? শঙ্করের মাকে সকলেই গিন্নীমা বলে ডাকে। শঙ্করও তাই ছেলেবেলা থেকে গিন্নীমাতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

গিন্নীমা বললেন—তুমিই বল।

শঙ্কর আস্তে আস্তে ঘর থেকে চলে গেল, এবং একটু পরেই ফিরে এল। হাতে তার একটা চিঠি। চিঠিটা মামাবাবুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো

সুকুমার দে সরকার

দেবীর অলঙ্কার

দূর বোকা, ওরা তখন উলোপুরের জমীদার ছিল। শঙ্কর খুব লেখাপড়া জানা ভাল ছেলে। তবে হ্যাঁ একবার একটা স্বদেশী ডাকাতির মামলায় জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু ওর বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ-ট্রমাণ পাওয়া যায়নি। শঙ্কর প্রথম দিকটায় খুব বোমা-টোমা বিপ্লব ইত্যাদিতে বিশ্বাস করত। পরে মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য হয়ে যায়। একবার জেলও খেটেছে।

তারপর কি হোল বল।

রসোগোল্লার টানে, সেই রাত্তিরের শেষ ট্রেনে আমরা উলোপুর পৌঁছলাম। উলোপুর তখন একটা ছোট গ্রাম। কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ কায়স্থ আর চাষীদের বাস। ভাল চালের জন্যে কিন্তু উলোপুর বিখ্যাত ছিল।

রাত দশটা বেজে গেছে। গ্রাম নিঝঝুম। ট্রেনটা চলে যাওয়ার পর অদ্ভুত চুপচাপ।

এই রসোগোল্লা? মামাবাবু ডাকলেন! কি?

শব্দে যে কান ফেটে যায় রে!

বললাম আর আলোয় সব ফট্ ফট্ করছে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমাবস্যের আর দেরী নেই। আকাশে চাঁদের ফালিটুকু ম্যাজিকওয়ালার হাতের টাকার মত একবার মেঘের আড়ালে উড়ে যাচ্ছে আবার ফুস মন্তরে হাজির হচ্ছে। যাচ্ছে।

টুম্পু বলল—একটু দাঁড়াবে জ্যাজা? কেন?

পাপিয়াকে একছুটে ডেকে আনছি।

পাপিয়া টুম্পুর প্রিয় বন্ধু। বুঝলাম রঙ চড়িয়ে বলতে হবে।

টুম্পু আর পাপিয়া এসে বসার পর আবার সুরু।

পাপিয়া বলল—গোড়া থেকে বলতে হবে কিন্তু।

না জ্যাজা টুম্পু বলল—তুমি বল। গোড়াটা আমি পাপিয়াকে বলে দেব'খন। এত রাত্তিরে খেতে পেয়েছিলে?

ওরে বাবা জমিদার বাড়ীর ভোজ! সেই রাত্তিরে পুকুর থেকে মাছ ধরা হলো। আরও কত কি। আর গরম রসোগোল্লা তো দিলই। শঙ্কর সেই রাত্তিরেই আমাদের দেখে প্রথমটা খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপরে খুব খুসি। কিন্তু খুসির মধ্যেও কেমন একটা দুশ্চিন্তার ছাপ তার মুখে ছিল।

ব্যাপার কি রে? জিগেস করেছিলাম।

পরে বলবো, আগে খেয়ে দেয়ে নে। মামাবাবুকে আগে ভালো করে রসোগোল্লা খাওয়াই।

খাওয়া দাওয়ার পর বাইরের ঘরে এসে সবাই বসলুম। শঙ্করের মাও এলেন। শঙ্করের বাবা মারা গিয়ে- দেখুন। চিঠিতে লেখা ছিলঃ—

শ্রীশ্রী কালীমাতা পদ শরণং

জমিদার মহাশয় শ্রীকমলেষু,

আগামী অমাবস্যা পূজার পর দেবীর স্বর্ণ সিংহাসন ও গহনাপত্রাদি ওই দিন রাত্রে আমাদের হস্তে তুলিয়া দিবেন। এত মূল্যের সম্পত্তি আপনারাও ভোগ করেন না বা কাহারও ভোগে লাগে না। উহা এক সময়ে আমরা লইতে যাইব। পুলিশে খবর দিবেন না। যদি দেন তাহা হইলে ধড় হইতে বিচ্ছিন্ন মুণ্ডু মা কালীর পদতলে শোভা পাইবে।

ইতি রঘুডাকাত।

তামাক! কল্কেতে ফুঁ দিতে দিতে যে লোকটা ঘরে ঢুকলো তাকে যে প্রথম দেখবে সে না চমকে পারবে না। লম্বাও নয়, বেঁটেও নয়। গায়ের রঙ মিশ কালো। চোখ দুটো বেজায় ছোট কিন্তু জ্বলজ্বলে লাল। আর শরীরের পেশীগুলো যেন কষ্টিপাথরে কোঁদা।

গিন্নীমা বললেন—মামাবাবুকে এগিয়ে দে উদ্ধব।

অবাক হয়ে মামাবাবুর মুখের দিকে তাকালাম। উনি আবার তামাক খান কবে? দেখলাম মামাবাবু বেশ নির্বিকারভাবে ভুড়ুক ভুড়ুক করতে করতে বললেন—হুঁ! বাংলাদেশের সব ডাকাতই দেখছি রঘু। চিঠিটা কি ডাকে এসেছে?

না। শঙ্কর বলল—একটা লোক হাতে

দিয়ে গেছে।
কার হাতে?
উদ্ধবের হাতে।
আচ্ছা, মামাবাবু আস্তে আস্তে বললেন—চিঠিটা কারও চালাকি নয়ত?
এবারে জবাব দিলেন গিন্নীমা—চালাকি হলে ত ভালই। কিন্তু না হলে? ভাবতে যে আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। দেবীর বড় সিংহাসন, গহনা, তৈজসপত্র সব সোনার। আজ প্রায় তিন পুরুষ ধরে জমেছে। তার ওপর লোভ হওয়া খুব আশ্চর্য নয়।
মামাবাবু বললেন— সেই গয়না, সিংহাসন টন কে কে দেখেছে? কারা সে সবের খোঁজ রাখে?
শঙ্কর বলল—গাঁসুদ্ধ লোক, ভিন গাঁয়ের লোক। আরও কত কে। কারণ প্রতি আমাবস্যেয় দেবীকে সাজিয়ে পুজো হয়।
এবার আমাবস্যে কবে?
আগামী পরশুদিন।
পুলিশকে নিশ্চয় জানান হয়নি।
না। শঙ্কর বলল—কারণ পুলিশের আমার ওপর নেক নজরটাও জানেনেই! তাছাড়া গিন্নীমায়ের আপত্তি।
কেন?
ওই যে ধড় থেকে মুণ্ডু। একদিন না হয় পুলিশ। রোজ ত তারা দুর্গ করে রাখবে না।
তাহলে কি জিনিসগুলো ডাকাতদের হাতে......মামাবাবুর কথা শেষ হলো না। গিন্নীমা গর্জে উঠলেন কক্ষনো না! পূর্ব পুরুষের দেওয়া দেবীর জিনিস! আমার প্রাণ থাকতে না।
এবারে আমি বললাম—তা হলে নিজেরাই দুর্গ গড়ে ফেলা যাক। কিছু বোমা টোমা.........
শঙ্কর বলল—না!
মামাবাবু বললেন—আপাতত রাত হোল, আমার ঘরে একটা লাঠি......
আমি শেষ করলাম—আর এক হাঁড়ি রসোগোল্লা।

পরের দিন সকাল থেকে আমাদের দুর্গ গড়ার কাজ সুরু হোল। মানে বাড়ীর সব মানুষজনকে সাবধান করে রাখা হোল। এবং সকলকেই অন্যান্য নানা ঘরের মধ্যে একটা করে কেরোসিন টিনের খালি ক্যানেস্তারা দেওয়া হলো, বিপদ দেখলেই বাজাবার জন্যে। কেরোসিন টিনেরও আর অভাব ছিল না। উদ্ধব রইল এই সব লোকজনের মাথায়। এক হাতে লাঠি আর এক হাতে সড়কি নিয়ে উদ্ধবকে যা মানিয়েছিল না! ধড় মুণ্ডু আলাদা হবার আগে কিছু মাথার ফটকাবাজি অন্তত হয়ে যাবে। উদ্ধব শঙ্করদের পুরোনো লোক। আর শঙ্করকে সে ত কোলেপিঠে না হোক, হাত ধরে খেলিয়ে মানুষ করেছে ত বটে।

বেলা আটটা নাগাদ মামাবাবু বললেন—চল্ গাঁটা একটু ঘুরে দেখে আসি।
মামাবাবুর গাঁ ঘুরে দেখা মানে ময়রার দোকানের খোঁজ করা। কিন্তু বেশীদূর এগোবার আগেই একটা ঝোপঝাড়ের সামনে মামাবাবু দাঁড়িয়ে গেলেন।
কি হোল মামাবাবু? জিগেস করলাম,—পেট খালি করতে হবে নাকি?
ধমকে উঠলেন—তুই থাম ত হোঁদল-কুৎকুৎ। তারপর গলা নামিয়ে—ওহে টিক্‌টিকি বেরিয়ে এস! দেখতে পেয়েছি।
ঝোপের ভেতর থেকে একজন লোক সড়াক করে উঠে এসে বললে—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ।
কে জ্যাজা? টুম্পু জিগেস করল।
বুঝতে পারছ না? বৃটিশ রাজের ডিটেকটিভ। শঙ্করের ওপর নজর রাখছিল। কখন বৃটিশ রাজত্ব উল্টে দেয়, বলাতো যায় না। যাই হোক, মামাবাবু বললেন—আর ঘোড়ার ডাক ডাকতে হবে না হে টিকটিকি। তা ওখানে কি পেট খালি করছিলে নাকি?
হেঁ হেঁ, বোঝেনই ত! তা ও বাড়ীতে যেন কিছু একটা তৈরী হওয়া চলছে মনে হোল।
রসোগোল্লার ভিয়েন হচ্ছে গো। তা নজরই যখন রাখছ একটু দেখো যেন পাচার না হয়ে যায়। বলতে বলতে মামাবাবু পা বাড়ালেন।
উলোপুরে ময়রার দোকান একটি। গন্ধে গন্ধে মামাবাবু হাজির। দোকানে পা বাড়াতে বাড়াতে বললেন—দেখছিস্ দেখছিস্ সব বাজে কথা। ময়রায় নাকি মিষ্টি খায়না! ভুঁড়িটা কম্‌পিটিশনে দেবার মত।
আসুন আসুন বাবু আসতে আজ্ঞা হোক। হরি ময়রার দোকান আজ ধন্যি হলেন। ভুঁড়ির নীচে আটহাতি ধুতিটা সামলাতে সামলাতে হরি ময়রা বলে উঠল।
সে কি হে? তুমি আমাকে চেন নাকি?
জিভ কেটে হরি ময়রা বলল—ছি ছি কি যে বলেন বাবু। রসোগোল্লা বাবুকে কে না জানে বলুন!
তা হলে আর দেরী কেন? বার কর।
কি জ্যাজা? পাপিয়া জিগেস করল।
পাপিয়াটা বড় বোকা। টুম্পু বলে উঠল—রসোগোল্লা রে রসোগোল্লা।

বাড়ী ফিরে দেখি বাইরের ঘরে শঙ্কর আর এক ভদ্রলোক বসে কথা বলছেন। দুজনেই একটু উত্তেজিত।

ভদ্রলোকের পরণে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী। মাথার চুলে কদম ছাঁট। চোখগুলো উজ্জ্বল।

আসুন পরিচয় করিয়ে দিই, শঙ্কর বলল। 'ইনি পদ্মলোচন ভড়, পাশের গাঁ ধর্মপুর ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং কংগ্রেস কর্মী। উনি এই গাঁয়ে একটা মেয়েদের ইস্কুল খুলতে চান।'

খুব ভাল কথা ত, আমি বললাম।

কিন্তু গিন্নীমার আপত্তি। কারণ এ গাঁয়ে একটাও ছেলেদের ইস্কুল নেই। ছেলেদের ইস্কুলের আগে মেয়েদের ইস্কুল হলে মেয়েরা সব ধিঙ্গী হয়ে যাবে।

এই সময় ভড় মশাই দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত বুঝি জাগেনা জাগেনা।

মামাবাবু শঙ্করকে জিগেস করলেন—তোমার কি মত?

আমি হেড মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে একমত।

তবে আর গিন্নীমায়ের আপত্তিতে কি এসে যাচ্ছে? কাজটা ত খারাপ কিছু নয়।

শঙ্কর জবাব দিল—অসুবিধে হোল টাকার। এখনই ত একটা মোটা টাকার দরকার।

তুমি দিতে পার না?

পারতাম, কিন্তু পুলিশের নজরবন্দী হওয়ার পর টাকা কড়ির সমস্ত ব্যাপার গিন্নীমার নামে করে দিয়েছি। গিন্নীমার মত না হোলে এগোন শক্ত। আর আমার গিন্নীমা কেমন একরোখা জানেন তো!

পাপিয়া বলল—বিচ্ছিরি।

টুম্পু বলল—খুব অন্যায়।

তারপরে এল সেই আমাবস্যে। বাড়ীর সকলে পুজোর যোগাড়ে ব্যস্ত। তার মধ্যেও সকলের ভেতর একটা চাপা উত্তেজনা। আমি, শঙ্কর আর মামাবাবু ঠিক করলাম দুপুরটা বেশ ভাল করে ঘুমিয়ে নেব।

বাইরে আম পাড়া রোদ। জানলা দিয়ে দেখা যায় নীল কাঁচের ঝকঝকে আকাশ। আকাশের কোন্ সুদূরে, চোখের জলে কাঁকর পড়ার মত এক কুটো চিল ভাসছে। ভেসে আসে সরু তীব্র চিলের ডাক। একটানা শানাই-এর ধুয়োর মত ভেসে আসে ঘুঘুর ডাক—ঘুঘু-ঘু, ঘুঘু-ঘু! মিষ্টি, ঘুমপাড়ানী।

ঘুম ভাঙল শঙ্করের ডাকে। বেলা তখন পড়ে এসেছে।

মামাবাবু কোথায় গেলেন?

নেই?

না তো! আমি ঘুম ভেঙে থেকে ওঁকে দেখছি না। পরণের পাঞ্জাবীটাও আলনায় ঝুলছে না।

তা হলে নির্ঘাৎ হরি ময়রার দোকানে।

বলতে বলতেই মামাবাবু ঘরে ঢুকলেন। হাতে একটা হাঁড়ি।

শঙ্কর বলল—এ আপনার খুব অন্যায় মামাবাবু। আপনি আমার অতিথি।

আমতা আমতা করে মামাবাবু বললেন—হ্যাঁ তোমরা ত নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলে, আমি ততক্ষণ লাঠিগুলোয় সরষের তেল মাখানোর ব্যবস্থা দেখছিলাম। কখন দেখি পা দুটো ঠেলে নিয়ে গেছে হরি ময়রার দোকানে। কি আর করি তখন বল?

হ্যাঁ দেখেছিলাম বটে উলোপুরের মাসিক কালীপুজো। অন্ধকার অমানিশার বুকে ঝলসে উঠেছিল যেন শত শত মণি-মাণিক্য। উঁচু মন্দিরটা আগাগোড়া প্রদীপ দিয়ে সাজান হয়েছিল। কত দূর-দূরান্তরের মানুষকে হাতছানি দিয়েছিল সেই দীপাবলি। আর দেবী সোনার সিংহাসনে দাঁড়িয়ে, গহনায় সেজে যেন হাসছিলেন। গ্রাম যেন ভেঙে পড়েছিল পুজো দেখতে। তারপর পুজো শেষ হয়ে গেল। লাঠিয়ালদের পাহারায় দেবীর সোনার আভরণ যেমন এসেছিল তেমনি বাড়ীর ভেতর ফিরে গেল। উদ্ধব প্রধান পাহারাদার। পুজো দেখার মানুষজন সব ফিরে গেল। মন্দির প্রাঙ্গণ আর জমীদার বাড়ীর আশেপাশে আবার নেমে এল নিস্তব্ধতা। সুরু হোল আমাদের পাহারা।

কী গভীর অন্ধকার বাইরে! প্রহর জাগা শেয়ালের ডাক ভেসে এল। তাও থেমে গেল একসময়। এমন

'ওহে টিকটিকি বেরিয়ে এসো—'

সময়.........

টুম্পু বলে উঠল—হা রে রে রে রে রে......

বললাম—না না বাতাসের খস খস শব্দ। অমনি চারদিকে ফট ফট করে মশাল জ্বলে উঠল। আমাদের পাহারাদাররা সজাগ ছিল। আবার গুমগুমে নিস্তব্ধতা। ঢুলুনি আসছিল। মাঝে মাঝে মামাবাবুর নাক একটু গর্জন করে উঠেই থেমে যাচ্ছিল। আবার প্রহর জানানো হুয়া হুয়া। শেয়ালের ডাক থেমে গেছে, এমন সময়......

টুম্পু বলে উঠল—হা রে রে রে রে...

বললাম—না, একটা হু-হু-হুম্ শব্দ ভেসে এল। আবার ফট ফট মশাল।

বললাম—ও কি?

শঙ্কর বলল—প্যাঁচা ডাকছে।

রাতের শেষ প্রহর। আকাশের অন্ধকারে ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে কুয়াশা। শুকতারা চোখ জ্বল জ্বল করে দপ দপ করছে। এমন সময়......

টুম্পু আর পাপিয়া দুজনেই হাততালি দিয়ে বলে উঠল—হা রে রে রে রে রে.........

মোটেই না। কে যেন কাঁদছে—ওঁয়া! ওঁয়া! ওঁয়া!

কে কাঁদে?

শঙ্কর বলল—শকুনের বাচ্চা ডাকছে।

ভোরের আলো ফুটতে সুরু করল। ভেসে এল প্রভাতী পাখিদের গান।

টুম্পু বলল—রঘু ডাকাত এল না?

দূরে ছাই বাজে গপ্প!

এমন সময় টিনের ক্যানেস্তারা বেজে উঠল গিন্নীমার ঘর থেকে। পড়িমরি করে ছুটে গিয়ে দেখলাম, গিন্নীমার ঘরের লাগা ছোট ঘরটায় সিন্দুক খোলা। পাশে একটা বড় তালা ভাঙা পড়ে রয়েছে।

গিন্নীমা শুধু একটি কথা বললেন—কিছু নেই!

তারপর জ্যাজা?

তারপর হুলস্থুল কান্ড। প্রথম ধাক্কাটা কাটলে শঙ্করই প্রথম দেখাল ঘরের জানলাটা খোলা। ঘরটা দোতলায় গিন্নীমায়ের শোয়ার ঘরের লাগোয়া একটা ছোট কুঠুরী। সেই কুঠুরীতে একটা লোহার সিন্দুকে দেবীর গহনা থাকত। ঘরে একটি মাত্র জানলা। দোতলার কোন জানলারই গরাদে নেই। এই ঘরের জানলায় গরাদে নেই বলে জানলাটা সব সময় ছিটকিনি দেওয়া থাকত। জানলার বাইরে একটু দূরেই একটা আমগাছের ডাল বাড়িয়ে এসেছে।

জানলাটা খুলল কে? শঙ্কর বলল।

মামাবাবু জবাব দিলেন—যে দেবীর অলংকার সরিয়েছে।

আমগাছের ডাল বেয়ে জানলা দিয়ে এসেছিল ডাকাতটা!

উঁহু, মামাবাবু বললেন—জানলা দিয়ে গেছে বলতে পার। ভুলে যেওনা জানলার ছিটকিনি বন্ধ ছিল। বাইরে থেকে আসতে হলে জানলা ভাঙতে হোত।

তা হলে, শঙ্কর বলল, কি মনে হচ্ছে?

কোন ভেতরের লোকের কাজ। আচ্ছা দেবীর অলংকারগুলো সিন্দুকে তুলেছিল কে?

শঙ্কর বলল—গিন্নীমা তো উপোস করে থাকেন। আমি আর উদ্ধবদাই তুলে রাখি। বরাবরই এই চলে আসছে।

চাবি?

উদ্ধবদা তালা বন্ধ করে চাবি আমাকে দেয়, আর আমি গিন্নীমাকে চাবি দিয়ে দিই।

মামাবাবু বললেন—আশ্চর্য! ঘরের ভেতরে তালা ভাঙ্গা হোল, কতকালের জানলা খুলে চোর পালাল আর পাশের ঘরে শুয়ে গিন্নীমা কিছুই টের পেলেন না?

গিন্নীমা এবার মামাবাবুকে উদ্দেশ করে বললেন—আপনার মনে হচ্ছে ভেতরের লোকের কাজ?

তাইত মনে হচ্ছে।

দাঁড়াও দেখাচ্ছি। গিন্নীমা হাঁক দিলেন—শঙ্কর রামকিঙ্কর বৈরাগীকে ডেকে পাঠা। কাঠি খেলা আর চালপড়া দুয়েরই ব্যবস্থা করে যেন আসে।

টুম্পু জিগেস করল—কাঠি খেলা আর চালপড়া কি জ্যাজা?

শোনো না। দুপুর বেলা হাজির হোল রামকিঙ্কর বৈরাগী। টাক মাথা, পরণে লাল ধুতি, গায়ে লাল চাদর।

আমি বললাম—এত বড় একটা চুরির ব্যাপারে এ সব কি? পুলিসে খবর দেওয়া হোক না।

শঙ্কর বলল—বৃটিশ রাজের পুলিশের সঙ্গে আমার ননকো-অপারেশন। তাছাড়া গাঁ দেশে এ সব ব্যবস্থাতেই কাজ হয়।

সদর দেউড়ির উঠোনে জড়ো হয়েছে বাড়ীর সব মানুষ আর লেঠেলরা। রামকিঙ্কর বৈরাগী সকলের হাতে একটা করে মন্ত্র পড়া বাঁশের কঞ্চি ধরিয়ে দিল। কঞ্চিতে তিনটে করে গাঁট। তারপর সুর করে মন্ত্র পড়তে লাগল। অনেকটা সত্যনারায়ণের পাঁচালীর মত। একটা ধুয়ো ছিল—চোরের হাতের কঞ্চি এক গাঁট বৃদ্ধি পাবে। মন্ত্র পড়া শেষ হলে বৈরাগী বলল—এক একজন করে কাঠিগুলো আমার হাতে দিয়ে যাও! এক একজন করে কাঠিগুলো হাতে দিয়ে যায় আর বৈরাগী বলে জয়স্তু! হঠাৎ বৈরাগী সিংহের মত গর্জন করে উঠল—জয় বাবা ভৈরব!

তখন তার সামনে দাঁড়িয়ে উদ্ধব। উদ্ধবের কাঠিটা এক গাঁট ছোট হয়ে গেছে।

টুম্পু বলল—বা রে, তবে যে বললে এক গাঁট বড় হয়ে যাবে।

বুঝলে না? চোর কাঠি বড় হয়ে যাবে ভেবে আগে থেকেই একগাঁট ছোট করে রেখেছিল। তখন সমস্ত উঠোনটা যেন থম থম করছে।

গিন্নীমা বললেন—বৈরাগী! চালপড়া দাও।

চালপড়াটা এই রকম। বৈরাগী মন্ত্র পড়ে দুটি দুটি চাল সকলের হাতে দিল। চালগুলো পাঁচবার চিবিয়ে আবার হাতের চেটোয় নিয়ে নিতে হবে। এখন কোন কিছু চিবোলেই তার সঙ্গে লালা মাখামাখি হয়ে যায়। কিন্তু মনে যদি ভয় থাকে বা দুশ্চিন্তা থাকে তা হলে মুখের লালা শুকিয়ে যায়। যে চোর তার চিবোন চাল শুকনো থাকবে। তাতে লালা প্রায় থাকবেই না।

টুম্পু বলল—চালপড়া খাইয়ে কি হোল?

আর কি? এবারেও উদ্ধব।

গিন্নীমা বলে উঠলেন—ছি ছি উদ্ধব!

উদ্ধব পাথরের মত দাঁড়িয়ে। তার মুখে কোন রকম ভাব নেই। কিন্তু হঠাৎ তার দুচোখ বেয়ে জল নেমে এল।

তুমি কর্তার আমলের পুরোণ লোক, গিন্নীমা বললেন—তোমার বিচারের ভার আমি এখনকার কর্তা শঙ্করের ওপর ছেড়ে দিলাম।

পাপিয়া বলল—বত্রিশ ঘা বেত, না জ্যাজা?

টুম্পু বলল—উঁহু! হেঁটে কাঁটা, মাথায় কাঁটা দিয়ে একেবারে শূলে।

না না ওসব কিছুই হোল না। শঙ্কর একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল—ইস্ সূয্যি একেবারে মাথায় উঠে গেছে। মামাবাবুর খাওয়ার কত দেরী হয়ে গেল। তারপর উদ্ধবের দিকে ফিরে বলল—উদ্ধবদা আমরা খেতে যাচ্ছি। তোমাকে পাঁচটা অবধি সময় দিলাম। তখন যেন দেখি দেবী সেজে, সোনার সিংহাসনে দাঁড়িয়ে

আছেন।

খেতে যাওয়ার সময় আমি চুপি চুপি শঙ্করকে বলেছিলাম—যদি পালায়?

পালাবে না শঙ্কর জবাব দিল।

আগের রাত জেগে কেটেছে। ভাল রকম পেট পুজোর পর আর বসতে পারা যায়নি। মামাবাবুর আবার বোঝার ওপর শাকের আঁটির মত একথালা রসোগোল্লা। ঘুম থেকে উঠতে উঠতে সন্ধ্যে।

উঠেই শঙ্কর বলল—ইস্ সন্ধ্যে হয়ে এল। চলুন মামাবাবু মন্দিরে যাই, চল্ রে।

আর মন্দিরে এসে দেখি বাইরে পাথরে কোঁদা মূর্তির মত লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে উদ্ধব। মন্দিরের ভেতরে প্রদীপ দেওয়া হয়েছে আর সেই প্রদীপের কাঁপা কাঁপা আলোয় সোনার সিংহাসনে দাঁড়িয়ে, রত্ন অলঙ্কার পরে দেবী যেন হাসছেন।

শঙ্কর সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে প্রণাম করল। আমরাও প্রণাম করলাম। মামাবাবু বললেন—উদ্ধব দেবীর সোনা শুধু ফেরতই দেয়নি, ঘসে মেজে পালিশ করে সাজিয়ে দিয়েছে। শঙ্কর ভুরু কুঁচকে মামাবাবুর দিকে তাকিয়েছিল।

হয়ে গেল? টুম্পু জিগেস করল।

বারে, অত দামী সোনা হারাল, আবার পাওয়া গেল। আর কি চাও?

এ মা, ডিটেক্‌টিভ কোথায়?

বললাম—ডিটেক্‌টিভ আসত না যদি না মামাবাবুর রসোগোল্লায় টান পড়ত। সেদিন রাত্তিরে খাওয়ার শেষে দেখি মামাবাবু উসখুস করছেন। আমিও একটু অবাক হয়ে দেখলাম মামাবাবুর রসোগোল্লার থালা এল না।

পরের দিন সকালে মামাবাবু আমাকে বললেন—এই হোঁদলকুতকুত, চল্ বেড়িয়ে আসি। মামার বেড়াবার দৌড় তো জানাই ছিল। সেই হরি ময়রার দোকান।

কই হে হরি গামলাটা বার কর।

আজ্ঞে না বাবু রসোগোল্লা হয় নি।

মামাবাবুর মুখে আষাঢ়ের মেঘ জমেছে। শুধু বললেন—চলে আয় সুকুমার। নাম ধরে ডেকেছেন হোঁদলকুতকুত না বলে। বড়ই মনে লেগেছে মামাবাবুর। যেতে পথে একটা রাখাল ছেলেকে ডেকে মামাবাবু বললেন—এই রসোগোল্লা খাবি? যা দেখি নিয়ে আয় এক টাকার। ছেলেটা এক ছুটে চলে গেল আর একটু পরে একঠোঙা রসোগোল্লা এনে হাজির করল।

চারটে রসোগোল্লা ছেলেটার হাতে দিয়ে, শালপাতার ঠোঙা হাতে মামাবাবু আবার হরি ময়রার দোকানে হাজির। হরি ময়রার চোখগুলো তখন রসোগোল্লা হয়ে গেছে। ঠোঙা থেকে দুটো রসোগোল্লা গালে ফেলে চিবুতে চিবুতে মামাবাবু বললেন—রসোগোল্লা হয়নি না? কিন্তু কেন কেন কেন?

আমতা আমতা করে হরি ময়রা বলল—আমার দোষ নেই বাবু, জমীদার বাবু খবর পাঠিয়েছেন, আপনার চিনির রোগ হয়েছে আপনাকে রসোগোল্লা না বিক্রী করতে।

মামাবাবু বাড়ীর দিকে হাঁটা দিলেন। কিন্তু বাড়ী না গিয়ে ঝোপে ঝাড়ে কি যেন খুঁজতে লাগলেন। একজন দাড়িওয়ালা মুসলমান পোলো হাতে খালের ভেতর মাছ ধরছিল। মামাবাবু বলে উঠলেন—ওহে টিকটিকি, চিনতে পেরেছি। পাঁকের ভেতর কি খুঁজছ? হেঁ হেঁ হেঁ, পদ্ম মামাবাবু পদ্ম!

ওখানে পদ্ম কোথায় দেখলে হে?

আজ্ঞে লোচন খুলে রাখলে যা খুঁজবেন সবই মেলে।

হুঁ! মামাবাবু বললেন—চল্ রে হোঁদলকুতকুত। এবারে পাত্‌তাড়ি গুটোন যাক। টিকটিকি বৃটিশ সাম্রাজ্য পাহারা দিক। শুধু চোরটাকে একবার জানিয়ে যাই যে ঘুঘুরও ফাঁদ আছে।

আমি বললাম—চোর? কে চোর?

ওই যে ওই ডাকাতটা। শঙ্কর।

পাপিয়া বলল—তোমার বন্ধু শঙ্কর চোর?

টুম্পু বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলল—আমি জানতাম।

কি করে জানলি? পাপিয়া জিগেস করল।

রসোগোল্লা দাদুর রসোগোল্লা চুরি করেনি?

সব মেনে নিয়েছিল শঙ্কর।

মামাবাবু শঙ্করকে বলেছিলেন—তোমার জিনিস তুমি চুরি করবে আমার কি? কিছু বলব না ভেবেছিলাম কিন্তু যখন রসোগোল্লা বন্ধ করে তুমি আমাকে এখান থেকে চলে যাওয়াতে চাইছিলে তখন থাকতে পারলাম না।

শঙ্কর হেসে বলল—আপনি যে সন্দেহ করতে সুরু করেছিলেন।

সন্দেহ আমি এখন করিনি। তোমার ওই বন্ধু ডাকাতের চিঠি পড়েই করতে সুরু করেছিলাম। ডাকাত আবার কোন সম্পত্তি ভোগে লাগছে না লাগছে দেখে ডাকাতি করতে আসে হে? উদ্ধব ছিল তোমার দোসর, নয়?

উদ্ধবদার মত লোক হয় না। শঙ্কর বলল—সারাজীবন চোর নাম নিয়ে থাকবে।

মামাবাবু বললেন দেবীর যে অলংকার ফেরৎ দিল উদ্ধব সেগুলো সব পেতলের ওপর গিল্টি করা নয়? বড় চক্‌চক্ করছিল। আসল অলংকারগুলো ভোর রাত্রে হেডমাস্টার পদ্মলোচনের হাতে পাচার হয়েছিল।

কি করে জানলেন?

পুজোর দিন দুপুরে তোমরা যখন ঘুমোচ্ছিলে তখন আমি বেরিয়েছিলাম জান? টিকটিকিকে একটু নজর রাখতে বলেছিলাম যে রাত্তিরে কোন সন্দেহজনক ঘটনা ঘটে কিনা।

আমি বললাম—টিকটিকি কে মামাবাবু?

পুরন্দর বোস। গভর্মেন্টের ডিটেক্‌টিভ ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। আমার কাছে মাঝে মাঝে সাহায্য পেয়েছে। লোকটা খুব ঝানু। যাই হোক আজ সকালে দেখলিই ত, ও জানিয়ে দিল পদ্মলোচনকে রাতে দেখা গেছে।

শঙ্কর হাঁক দিল—উদ্ধবদা! মামাবাবুর জন্যে একহাঁড়ি রসোগোল্লা।

মামাবাবু বললেন—না। আমার চিনির রোগ হয়েছে।

মামাবাবুর রাগ কতক্ষণে পড়ত জানিনা। আমি জিগেস করলাম—কিন্তু এত সব ঘোরাল প্যাঁচালো কাণ্ড কেন?

শঙ্কর বলল—গিন্নীমার জন্যে। ভেবে দেখ, পূর্ব পুরুষ থেকে জমানো দেবীর ওই সোনাদানায় কি গিন্নীমা হাত দিতে দিতেন? অথচ ভেবে দ্যাখ্ অত সোনা কোনো কাজে না লেগে শুধু শুধুই পড়ে আছে। আমি ব্যবস্থা করেছি ওই সোনা দিয়ে দেবীর নামে কোম্পানীর কাগজ কেনা হবে। দেবীর সম্পত্তি ঠিক থাকবে। আর কোম্পানী কাগজের আয়ে পুজোও চলবে আর মেয়েদের ইস্কুলও চলবে।

মামাবাবু হাঁক দিলেন—কই উদ্ধব হাঁড়িটা নিয়ে এস। দেরী কিসের?

আমি তবু বললাম—কিন্তু আমাদের ডেকে পাঠাবার কি দরকার ছিল।

মামাবাবু আর তোর সামনে হলে, শঙ্কর বলল, গিন্নীমার বিশ্বাস হবে। তারপর একটু হেসে বলল, মামাবাবুকে রসোগোল্লা খাওয়াবার ইচ্ছে ছিল।

রসোগোল্লা না ঘোল? মামাবাবু বললেন।

একটু থেমে বললাম—আজ সেই উলোপুরে মেয়েদের ইস্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস ছিল! তাই গিয়েছিলাম।

কি দেখলে? টুম্পু জিগেস করল।

কতবড় ইস্কুল হয়ে গেছে। আর সব ছাত্রীরা, সবাই যেন এক একজন ভবিষ্যতের ইন্দিরাজী।

মতি নন্দী

স্টপার

সম্পূর্ণ উপন্যাস

ছবি এঁকেছেন সুধীর মৈত্র

"এসে গেছেন! আচ্ছা এক মিনিট, আপনি বরং এখানেই বসুন।"

অনুরোধ নয় যেন নির্দেশ। তরুণ সাংবাদিক ঢোক গিলে ঘাড় নাড়ল এবং নড়বড়ে লোহার চেয়ারটায় বসে সপ্রতিভ হবার জন্য রুমাল দিয়ে ঘাড়-গলা মুছে, পায়ের উপর পা তুলে প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করল, তারপর কী ভেবে সিগারেটটা প্যাকেটে ভরে রাখল।

তার দশ গজ দূরেই ছড়িয়ে রয়েছে হাফপ্যান্টপরা, কতকগুলো আদুড় দেহ। তারা ঘাসের উপর চিৎ হয়ে, উপুড় হয়ে বা পা ছড়িয়ে বসে। ঘাম শুকিয়ে এখন ওদের চামড়ার রঙ ঝামা ইঁটের মত বিবর্ণ খসখসে। সন্তর্পণে তারা শ্রান্ত হাত পা বা মাথা নাড়ছে। চোখের চাহনি ভাবলেশহীন এবং স্থির। ওদের একজন গভীর মনোযোগে পায়ের গোছে বরফ ঘষছে; ধুতি-পাঞ্জাবি পরা স্থূলকায় এক মাঝবয়সী লোক তার সামনে উবু হয়ে দুবার কি বলল, মাথা নিচু করে ছেলেটি বরফ ঘষেই যাচ্ছে, জবাব দিলনা। উপুড় হয়ে দুই বাহুর মধ্যে মাথা গুঁজে এতক্ষণ শুয়েছিল যে ছেলেটি হঠাৎ উঠে বসে কর্কশস্বরে চীৎকার করল, "কেষ্ট কতক্ষণ বলেছি জল দিয়ে যেতে।" তাঁবুর পিছন দিক থেকে একটা চাপা গজগজানি এর জবাবে ভেসে এল।

তরুণ সাংবাদিক তাঁবুর ভিতরে তাকাল। তাঁবুর মাঝখানে সিমেন্টের একফালি চত্বর। পাতলা কাঠের পাল্লা দেওয়া স্প্রিং-এর দরজা দুধারে। দরজাগুলো ঝাপট দিচ্ছে ব্যস্ত মানুষের আনা-গোনায়, চত্বরটার পিছনটা খোলা। সেখান দিয়ে পাশের তাঁবু এবং একটা টিউবওয়েল দেখা যাচ্ছে। একটা গোল স্টিলের টেবল চত্বরের মাঝখানে, সেটা ঘিরে সাত-আটজন লোক বসে এবং গলা চড়িয়ে তারা তর্ক করছে। কয়েকটা চায়ের কাপ টেবিলে। একজন চোখ বুঁজে টোস্ট চিবোচ্ছে। পাখা ঘুরছে। বাইরে থেকে বোঝা যায় তাঁবুর ভিতরটায় ভ্যাপসা গুমোট।

"আপনার চা।"

সাংবাদিক চমকে তাকাল। গেঞ্জিপরা একটা ছেলে হাতে ময়লা কাপ। দুটি বিস্কুট কোনক্রমে কাপের কিনারে পিরিচে জায়গা করে রয়েছে।

"আমার! আমি তো—"

"কমলবাবু পাঠিয়ে দিলেন।"

সাংবাদিক হাত বাড়িয়ে পিরিচটা ধরল, আর চা খেতে খেতে মনের মধ্যে গুছিয়ে নিতে লাগল গত দুদিন ধরে তৈরী করে রাখা প্রশ্নগুলো।

"তোকে পইপই বললাম, ডানদিকটা চেপে থাক তবু ভেতরে চলে আসছিলিস।"

"আমি কি করব, শম্ভুটা বারবার বলছে রাখতে পাচ্ছিনা, রাখতে পাচ্ছিনা, বলাই একটু এধারে এসে আগলা। সাইড আর মিডল দুটো ম্যানেজ করব কি করে?"

"সলিলটা যদি চোট না পেত! ভালই খেলছিল। সুকল্যাণের ওই শট গোললাইনে বুক দিয়ে আটকানো, বাপ্‌স। আমি তো ভাবলাম বুকটা ফেটে গেল বুঝি।"

"সলিলের লেগেছে কেমন?"

"কে জানে, কমলদা তো ভেতরে নিয়ে গিয়ে কিসব ওষুধ টষুধ দিচ্ছে।"

"পুষ্যি পুত্তুর কিনা তাই ওর বেলা ওষুধ আর আমাদের বেলা বরফ ঘষো।"

"ট্যালেন্ট। ওর মধ্যে ট্যালেন্ট আছে আর আমাদের মধ্যে গোবর। যাক্‌গে ছোটমুখে বড় কথা বলে লাভ নেই; বলাই, মনে থাকে যেন কাল ঠিক সাড়ে পাঁচটায় বসুশ্রীর গেটে।"

"এখনো তোর কাছে চার আনা পাই।"

"কিসের চার আনা?"

"ভুলে মেরে দিচ্ছ বাবা, 'দিলকো দেখো'-র টিকিট কাটার সময় ধার নিয়েছিলি না?"

"উঃ, কবেকার কথা ঠিক মনে রেখে দিয়েছিস তো। চার আনা আবার পয়সা নাকি!"

সাংবাদিক কান খাড়া করে ওদের কথা শুনছিল। ডিগডিগে লম্বা যে ছেলেটি এতক্ষণ চিৎ হয়ে দুহাতে চোখ ঢেকে শুয়েছিল, অস্ফুট একটা শব্দ করে হাত নামিয়ে তাকাতেই সাংবাদিকের সঙ্গে চোখাচোখি হল।

"রেজাল্ট কি?" সাংবাদিক চাপাগলায় জানতে চাইল।

"পাঁচ।"

সাংবাদিক সমবেদনা জানাতে চোখমুখে যথাসম্ভব দুঃখের ভাব ফুটিয়ে তুলল। ছেলেটি শুকনো হেসে বলল, "ডজন দিতে পারত, দেয়নি।"

"সিজনের প্রথম খেলা এটা?"

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে উঠে বসল। ঢোক গিলল, শুকনো ঠোঁট চাটল, জিরজিরে বুক। কাঁধে উঁচু হয়ে রয়েছে হাড়। কোমর থেকে পাতা পর্যন্ত পা দুটো সমান। পেশীর ওঠানামা কোথাও ঘটেনি। সাংবাদিকের মনে হল ছেলেটিকে গোল পোস্টের মাঝখানে ছাড়া মাঠের আর কোথাও ভাবা যায় না।

"সরি, অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। চা দিয়ে গেছে তো?"

একটা চেয়ার টানতে টানতে কমল গুহ সাংবাদিকের পাশে এনে রাখল।

"আর এক কাপ হোক।"

"না না, আমি বেশি চা খাইনা।"

"ভাল। বেশি চা খেলে স্বাস্থ্য থাকেনা। গত ২৫ বছরে আমি ক'কাপ চা খেয়েছি বলে দিতে পারি। ফুটবলারের সব থেকে আগে দেখা উচিত নিজের শরীরটাকে। নয়তো বেশিদিন খেলা সম্ভব নয়। ফার্স্ট ডিভিশনেই কুড়ি বছর, হ্যাঁ, প্রায় কুড়ি বছরই খেলেছি।"

সাংবাদিক ইতিমধ্যে তার নোটবই খুলে বল পেনের আঁচড়ে দুচার কথা লিখে ফেলেছে

"আপনার বয়স কতো এখন?"

"আপনিই বলুন।"

"কুড়ি বছর যদি ফার্স্ট ডিভিশনে হয় তাহলে অন্তত চল্লিশ।"

কমলের চোখে আশাভঙ্গের ছাপ ফুটে উঠল। "আপনি আমার কেরিয়ার থেকে হিসেব করে বললেন। কিন্তু আমায় দেখে বলুন তো বয়স কত?"

ভ্রূ কুঁচকে সাংবাদিক, বোর্ডে দুরূহ অঙ্কের দিকে তাকানো

মেধাবী ছাত্রের মত ওর দিকে তাকাল। চুল গুলো কোঁকড়া, মোটা, ছোট করে ছাঁটা। দু'কানের উপরে অনেক চুল পাকা। কপালে রেখা পড়েছে তিন-চারটি। সাংবাদিকের মনে পড়ল, একটা বইয়ে পাতাজোড়া স্ট্যানলি ম্যাথুজের মুখের ছবি সে দেখেছিল। তলায় লেখা—'দি ফেস অফ থারটিফাইভ ইয়ারস অফ টেনশন ইন ফুটবল।' ম্যাথুজের কপালে পাঁচটি রেখা; ঠোঁটের কোলে একটি, তার পরেই আর একটু বড় আকারের, টানাপোড়েনে থরথর দুটি ঢেউ যেন আছড়ে পড়েছে। এরপর চোখের কোণ পর্যন্ত সারা গাল বেলাভূমির মত কুঞ্চিত। কিন্তু কমল গুহর চোখ ম্যাথুজের মতন বিশ্রামপ্রত্যাশী অবসন্ন নয়। গোল এবং গর্ত থেকে অনেকটা বেরিয়ে এসেছে। অসন্তুষ্ট বিক্ষুব্ধ এবং চ্যালেঞ্জ জানায়।

সাংবাদিক নোটবইটা কাত করে, কমল গুহর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা অবস্থায়ই পাতার কোণায় চট্ করে লিখল—রাগী, ভোঁতা, সেন্টিমেন্টাল। বেশি দুধ দেওয়া চায়ের মতন গায়ের রঙ কিংবা মেদহীন মধ্যমাকৃতি এই বাঙালি ফুটবলারের চেহারার মধ্যে সাংবাদিক কোন বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেল না। গলার স্বর ঈষৎ ভারী ও কর্কশ। শুধু চোখে পড়ে হাঁটার সময় দেহটি বাহিত হয় শহিদ মিনারের মত খাড়া মেরুদণ্ড দ্বারা। হাঁটার মধ্যে ব্যস্ততা নেই।

"আটাশ বড়জোর তিরিশ।" সাংবাদিক ইতস্তত করে বলল।

আচমকা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল কমল গুহ। সাংবাদিকের অস্বস্তি দেখে হাসিটা আরো বেড়ে গেল। তাঁবুর সামনে দিয়ে দুটো ঘোড়সওয়ার পুলিস ডিউটি সেরে ফিরছিল। তারা বাধ্য হল ঘোড়ার রাশ টেনে ফিরে তাকাতে। "বড্ড কমালেন কিন্তু। আমার অফিসের বয়স কমানো আছে বটে কিন্তু এতটা কমাতে সাহস হয়নি। কিছু মনে করবেন না, আপনার বয়স কত?"

সাংবাদিক গলা খাঁকারি দিয়ে খুব গম্ভীর হতে হতে বলল, "পঁচিশ।"

কমল গুহ ভুরু নাচিয়ে বলল, "আসুন মাঠটা দশপাক দৌড়ে আসি।"

"তা কি করে সম্ভব!" সাংবাদিক প্রতিবাদ করল। "একজন ফুটবলারের সঙ্গে আমি পারব কেন। আপনাকে যদি বলি একপাতা লিখতে পারবেন কি আমার মতন?"

কমল গুহর মুখ থেকে মজার ভাবটা আস্তে আস্তে উবে গেল।

"ঠিক। বলেছেন ঠিকই। আমি পারব না একপাতা লিখতে। কিন্তু আপনি আমার বয়স জানতে চাইলেন কেন? আমার শরীরের ক্ষমতা সম্পর্কে একটা ধারণা পাবার জন্যই তো? যদি বলি পঁচিশ তাহলে আপনি ভেবে নেবেন, অন্তত ১১ সেকেন্ডে আমি ১০০ মিটার দৌড়তে পারি। যদি বলি চল্লিশ তাহলে সেটা ১৫ সেকেন্ড হয়ে যাবে। কিন্তু যদি আমরা দুজনে দৌড়োই এবং আপনাকে হারিয়ে দিই তাহলে কি আমার বয়স ২৫ বছর বলে আপনি মেনে নেবেন না? সন তারিখ দিয়ে কি বয়স ঠিক করা যায়, শরীরের ক্ষমতাই হচ্ছে বয়স। বুঝলেন, এখন আমার বয়স সাতাশ।"

সাংবাদিক টুক্ করে তার নোট বইয়ে 'হামবাগ' কথাটা লিখে প্রশ্ন করল, "আপনার লাস্ট ম্যাচ কোনটা যেটা খেলে রিটায়ার করেন?"

"রিটায়ার, আমি? লাস্ট ইয়ারেও দুটো ম্যাচ খেলেছি হাফ টাইমের পর। দরকার হলে এ বছরও খেলব। সলিলটা আজ হাঁটুতে চোট পেয়েছে, সারতে মাসখানেক লাগবে। হয়তো আমাকে নামতে হতে পারে। স্টপারে খেলা, ছোট একটা জায়গা নিয়ে খুব একটা অসুবিধে হয় না।"

"স্ট্যানলি ম্যাথুজ তো প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত ফার্স্ট ডিভিশন ফুটবল খেলে গেছেন। ইংল্যান্ডের হয়েই তো খেলেছেন তেইশ বছর।"

"মহাপুরুষ ওরা। তাও উইং ফরোয়ারডে। অত বয়সে ওই

"আসুন, মাঠটা দশ পাক দৌড়ে আসি—"

পজিশনে খেলা ভাবতে পারি না। আমি প্রথম যখন ফার্স্ট ডিভিশনে শুরু করি, রাইট ইনে খেলতাম।"

"কোন ক্লাবে?"

"এখানে, শোভাবাজার স্পোরটিংয়েই প্রথম দু বছর তারপর ভবানীপুর, দু বছর পর এরিয়ানে, সেখানে এক বছর কাটিয়ে যুগের যাত্রীতে চার বছর, মোহনবাগানে এক বছর, আবার যুগের যাত্রীতে দু বছর তারপর আবার শোভাবাজারে। টু ব্যাক সিস্টেমে খেলা শুরু করে, থ্রি ব্যাক পার করে ফোর ব্যাকে পৌঁছে গেছি। রাইট ইন থেকে পল্টুদা আমাকে স্টপারে আনেন।"

"কে পল্টু দা?" সাংবাদিক বল পেন উঁচিয়ে প্রশ্ন করল।

"চিনবেন না আপনি। পল্টু মুখারজি, আমার গুরু। থারটি ফাইভে উনি খেলা ছেড়েছেন। দুখিরাম বাবুর হাতে তৈরী, খেলতেনও এরিয়ানে। ওর আড্ডা ছিল এই শোভাবাজার টেনটে তাস খেলার। জুয়া, রেস, নেশাভাঙ করে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। কিন্তু তৈরী করেছেন অনেক ফুটবলার। ফুটবলের যতটুকু শিখেছি বা যতটুকু খ্যাতি পেয়েছি সবই ওর জন্য। গুরুর ঋণ আমি কোনদিনই শুধতে পারব না। বলতে গেলে, রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আমাকে মানুষ করেছেন। কতদিন ওর বাড়িতেই খেয়েছি, থেকেছি। উনিই আমাকে ম্যাট্রিক পাশ করিয়েছেন।"

কমল গুহ হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে জামা খুলতে শুরু করল। সাংবাদিক অবাক হয়ে থাকার মধ্যেই চট করে নোটবইয়ে লিখে ফেলল, 'গুরুবাদী।'

জামাটা গলা পর্যন্ত তুলে কমল গুহ পিছন ফিরে বলল,

ভরত অযথা একটা লোক দেখানো ডাইভ দিল...

"দেখছেন ঘাড়ের নীচে শিরদাঁড়ার কাছে?"

একটা বহু পুরনো, প্রায় দু ইঞ্চি দাগ দেখতে পেল সাংবাদিক। "হ্যাঁ, বুটের দাগ।"

"বুটের নয়, কাঁসার বগিথালা দিয়ে পিটিয়েছিলেন।"

"থালা দিয়ে!"

কথাটা কে বলল দেখার জন্য সাংবাদিক পিছন ফিরে তাকাতেই তার শরীর সিরসিরিয়ে উঠল। একটা বনমানুষ জামা-প্যান্ট পরে দাঁড়িয়ে। নিকষ কালো রঙ, ভুরুর এক ইঞ্চি উপর থেকে শুরু মাথার চুল, চোখ দুটো কুতকুতে গর্তে ঢোকান। নীচের ঠোঁট এত পুরু যে ঝুলে পড়েছে। কমল গুহ সামনে ফিরে, দুহাতে মাথার চুলগুলোকে দুধারে টেনে বলল, "এখানে আছে একটা। খড়ম পরতেন তারই প্রমাণ রেখে দিয়েছেন।"

"এইভাবে মার খেয়েছেন, কই কখনো তো বলেন নি!" ছেলেটির মুখ দেখে বোঝা যায় না তার মনে ভয় আর শ্রদ্ধার উদয় হয়েছে। কপাল থেকে চিবুক পর্যন্ত মুখের জমি প্রায় সমান। যেন ভূমিষ্ঠ হবার সময়ই মুখে প্রচণ্ড থাবড়া খেয়েছে। কণ্ঠস্বর ওর মনের ভাব প্রকাশ করে।

"খেলা শেখার মাশুল; দস্তুরমত মার খেয়ে শিখেছি। থালাটা পিঠে পড়েছিল আমাকে সিনেমা হল থেকে বেরোতে দেখে, খড়মটা মাথায় পড়ে টেস্ট পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে।" বলতে বলতে কমল গুহর গলার স্বর ভারী হয়ে এল। চিকচিক করে উঠল চোখের শাদা অংশ। "গুরু হতে গেলে যা হতে হয়, তাই ছিলেন। এখন এভাবে খেলা শেখার কথা ভাবাই যায় না। শট মারতেও শিখল না, বলে, কত টাকা দেবেন। যদি বলো ট্রেনিংয়ে আসনি কেন, অমনি চোখ রাঙিয়ে বলবে, আমি কি ক্লাবের চাকর? ওই জন্য কিছু আর বলি না। পচা পচা, সব পচা। যে হতে চায় তাকে তাগিদ দিতে হয় না।"

কমল গুহ কথাগুলো বলল ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে। মুখ নামিয়ে ছেলেটি দাঁড়িয়ে।

"আজই ডাক্তারের কাছে যাবি। হাঁটু খুব বিশ্রি ব্যাপার,

কোনরকম গাফিলতি করবি না। বহু ভাল ফুটবলারকে শেষ করে দিয়েছে এই হাঁটু। ট্যাক্সিতে যা, টাকা আছে তো?"

ছেলেটি ঘাড় নাড়ল। কমল গুহ সন্দিহান হয়ে বলল, "কই টাকা দেখি?"

"ঠিক চলে যাবোখন।" ছেলেটি ব্যস্ত হয়ে বলল। কমল গুহ পকেট থেকে একটা পাঁচটাকার নোট বার করে এগিয়ে ধরল।

"না না, বাসেই চলে যেতে পারব।"

"যা বলছি তাই কর্।"

ছেলেটিই শুধু নয় সাংবাদিকও সেই গম্ভীর আদেশ শুনে কুঁকড়ে গেল। নোটটা নিয়ে ছেলেটি কমল গুহকে প্রণাম করল। কমল গুহ আলতো হাত রাখল পিঠে তারপর ও চলে গেল বাঁ পা-টা টেনে টেনে।

"ছেলেটা সিরিয়াস। গুড মেটিরিয়াল। পড়াশুনা হয়নি, বুদ্ধি কম কিন্তু খাঁটি সোলজার। যা হুকুম হবে তাই পালন করবে। প্রাণ দিতে বললে দেবে। এমন প্লেয়ারও দরকার হয়। দেখি কতখানি তৈরী করা যায়।" কমল গুহের স্বর এই প্রথম কোমল শোনা গেল।

"আপনি কি ওর কোচ?" সাংবাদিক আবার বল পেন বাগিয়ে ধরল।

"কোচ? ওহ্ না, ক্লাবে এন আই এস থেকে পাস করা কোচ একজন আছে। তবে সলিলকে আমি নিজের হাতে গড়ছি। বস্তিতে থাকে, নটা ভাইবোন, যতটুকু পারি সাহায্য করি। বেঁচে থাকার লোভ তো সকলের মধ্যেই আছে কিন্তু একটা সময় আসে যখন মানুষকে মরতেই হয়। তখন সে বেঁচে থাকে বংশধরের মধ্য দিয়ে। ফুটবলারকেও একসময় মাঠ ছাড়তে হয়। কিন্তু সে বাঁচতে পারে ফুটবলার তৈরী করে। সলিলই আমার বংশধর।"

"আপনার ছেলেমেয়ে কটি?"

কমল গুহর মুখের উপর দিয়ে ক্ষণেকের জন্য বেদনা ও হতাশার মেঘ ভেসে চলে গেল। "একটি মাত্র ছেলে। বয়স সতেরো, প্রি-ইউ পড়ে। আমার বিয়ে হয়েছিলো খুবই অল্প বয়সে।"

"কোথায় খেলে এখন?"

"কোথাও না। জীবনে কোনদিন ফুটবলে পা দেয়নি। হি হেটস ফুটবল। এমনকি খেলা পর্যন্ত দেখেনা। আমার খেলাও দেখেনি কখনো। ভাবতে খুব অবাকই লাগে, তাই নয়?"

"আপনার স্ত্রীর ইনটারেসট নেই আপনার খেলা সম্পর্কে?"

কমল গুহ মাথা নাড়ল ক্লান্ত ভঙ্গিতে। নেই নয়, ছিলনা। দশ বছর আগে সুইসাইড করে মারা গেছে, আমার খেলার জীবনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে না পেরে। অমিতাভ তার মার কাছ থেকেই ফুটবলকে ঘৃণা করতে শিখেছে। পলিটিকসের কথা বলে, তাই নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করে, গান গায়, কবিতা লেখার চেষ্টা করে কিন্তু ফুটবল সম্পর্কে একদিনও একটি কথা বলেনি।"

"স্ট্রেঞ্জ!" সাংবাদিক তারপর নোটবইয়ে লিখল, 'স্যাড লাইফ।' কমল গুহ আনমনা হয়ে স্থির চোখে বহুদূরে এসপ্ল্যানেডের একটা নিওন বিজ্ঞাপনের দিকে তাকিয়ে। সাংবাদিক অপেক্ষা করতে লাগল। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। যেসব ফুটবলার খালি গায়ে শুয়ে-বসে ছিল তারা স্নান সেরে ফিটফাট হয়ে এখন পাঁউরুটি দিয়ে মাংসের স্টু খাওয়ায় ব্যস্ত। তাঁবুর মধ্য থেকে ভেসে আসা টুকরো টুকরো কথা শোনা যাচ্ছে।

"কালিঘাটের খেলার রেজাল্ট কি হল রে......চলে না দাদা চলে না, ওসব প্লেয়ার কলকাতা মাঠে সাতদিন খেলবে। বৃষ্টি নামুক দেখবেন তখন কিরকম মাল ছড়াবে.........একশো টাকা হারবো যদি কখনো নিমু হেড করে গোল দেয়.........আমাদের নেক্সট ম্যাচ কার সঙ্গে রে.........তুই বলটা শ্রীধরকে না দিয়ে গোপালকে চিপ করলি কেন, এয়ারে নায়িমের সঙ্গে কি ও পারে?"

"আপনার আর কি প্রশ্ন আছে?"

সাংবাদিক ইতস্তত করে বলল, "বহু প্রশ্ন ছিল।"

"যেমন?" কমল গুহ নিরুৎসুক স্বরে জানতে চাইল।

"আপনি ফিফটি সিক্স ওলিম্পিকে যাবেন বলেই সবাই ধরে নিয়েছিল কিন্তু যেতে পারেননি। কি তার কারণ? আপনি চারবার সন্তোষ ট্রফিতে খেলেছেন, রাশিয়ান টিমের সঙ্গে দুটো ম্যাচ খেলেছেন, ইনডিয়ার সেরা স্টপার হিসেবে আপনার নাম ছিল অথচ কত আজে বাজে প্লেয়ার এশিয়ান গেমসে বা মারডেকায় খেলতে গেল আর আপনি একবারও ইন্ডিয়ার বাইরে যেতে পারেননি, কেন?"

"আর কি প্রশ্ন?" কমল গুহের নিরুৎসুক স্বর একটুও বদলায়নি। সাংবাদিক তাইতে গম্ভীর হয়ে ওঠা উচিত মনে করল। "কলকাতার মাঠে আপনাদের মত ফুটবলার আর পাওয়া যাচ্ছেনা, তার কারণ কি? নব্বই মিনিটের ফুটবল আমাদের পক্ষে খেলা সম্ভব কিনা?"

সাংবাদিক থেমে গেল। তাঁবুর মধ্যে ফোন বাজছিল। একজন চীৎকার করে ডাকল, "কমলদা আপনার ফোন।"

কমল গুহ চেঁচিয়ে তাকে বলল, "আসছি, একমিনিট ধরতে বল্।"

তারপর দ্রুত সাংবাদিককে বলল, "আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে অনেকক্ষণ সময় লাগবে, আপনি বরং আর একদিন আসুন।"

"যদি আপনার বাড়িতে যাই?"

তাঁবুর দিকে যেতে যেতে কমল গুহ বলল, "তাও পারেন। ছুটির দিনে আসবেন। সকালে।"

সাংবাদিক তার নোটবইটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে কিছু একটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করল এবং গভীর বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত অবস্থায় শোভাবাজার স্পোর্টিংয়ের বেড়ার দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে একবার পিছু ফিরে তাকাল। তাঁবুর একটা জানালার মধ্যে দিয়ে কমল গুহকে দেখা যাচ্ছে, ঘাড় নিচু করে ফোনে কথা বলছে।

"অরু! অরুণা? কি ব্যাপার, হঠাৎ যে......অ্যাঁ! পল্টুদা পড়ে গেছেন? ব্লাড প্রেশার আবার.........ডাক্তার কি বলেন......দেখান হয়নি......হ্যাঁ হ্যাঁ যাচ্ছি, এখুনি রওনা হচ্ছি। টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে, তুমি ডাক্তার আনো।" ফোন রেখে কমল ঘরের একমাত্র লোক শোভাবাজারের সহ-সম্পাদক অবনী মণ্ডলকে বলল, "কিছু টাকা এখুনি চাই, শ'খানেক অন্তত।"

"এ্যাক......শো! এখন কোথায় পাব?"

"যেখান থেকে হোক, যেভাবে হোক এখুনি।"

"চাই বললেই এখন কোথায় পাই, শোভাবাজারের ক্যাশে কত টাকা তাতো আপনাকে বলার দরকার নেই।"

কমল একটা অসহায় রাগে আচ্ছন্ন হয়ে কথা বলতে পারল না কিছুক্ষণ। অবনী যা বলল তা সত্যি। কিন্তু এখনি টাকাও চাই। এই তাঁবুতে যারা গল্প করছে বা তাস খেলছে তারা কেউ একশো টাকা পকেটে নিয়ে ঘোরে না।

"পল্টুদার স্ট্রোক হয়েছে, এই নিয়ে তিনবার। ওর বড় মেয়েই ফোন করেছে। কিন্তু কি করে এই মুহূর্তে টাকা পাওয়া যায় বলুন তো? বাড়িতে আছে কিন্তু এখন বাগবাজারে গিয়ে আবার নাকতলায় যেতে গেলে দেরী হয়ে যাবে।"

"তাইতো, গড়ের মাঠে এই সময় একশো টাকা—" অবনী মণ্ডলের চিন্তিত গলা থেমে গেল। কমল ফোনটা তুলে দ্রুত ডায়াল করছে।

"রথীন মজুমদার আছে, আমি কমল, কমল গুহ শোভাবাজার টেন্ট থেকে বলছি। খুব দরকার......হ্যাঁ ধরছি।"

মিনিট দুয়েক অধৈর্য প্রতীক্ষার পর ওদিক থেকে সাড়া পেয়ে কমল বলল, "কমল বলছি।" সংক্ষেপে একশো টাকা চাওয়ার

কারণটা জানিয়ে বলল, "যদি পারিস তো দে, চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব তোর কাছে। অনেক তো করেছিস আমার জন্যে, এটাও কর্। গুরু দক্ষিণা তো জীবনে দেওয়া হল না, চিকিৎসাটুকুও যদি করতে পারি। কালই অফিসে নিশ্চয়ই টাকাটা দিয়ে দেব।"

ওধার থেকে জবাব শোনার জন্য অপেক্ষা করে কমল বলল, "যুগের যাত্রী টেন্টে? এখুনি? হ্যাঁ হ্যাঁ দশ মিনিটেই পৌঁছচ্ছি।"

কমল রিসিভারটা ছুঁড়েই ক্রেডলের উপর ফেলল। তাঁবু থেকে দ্রুত বেরিয়ে বেড়ার দরজা পার হয়ে ময়দানের অন্ধকারে ঢোকার পর সে প্রায় ছুটতে শুরু করল যুগের যাত্রীর তাঁবুর দিকে।

দুই

গত পনেরো বছরে কমল দুবার চাকরি, ছয়বার বাসা এবং ছয়বার ক্লাব বদল করেছে। শোভাবাজার স্পোর্টিং, ভবানীপুর, এরিয়ান, যুগের যাত্রী, মোহনবাগান, এবং আবার যুগের যাত্রী হয়ে এখন শোভাবাজারে আছে। এই সময়ে সে দর্জিপাড়া, আহিরিটোলা, শ্যামপুকুর, কুমারটুলি আবার শ্যামপুকুর হয়ে এখন বাগবাজারে বাসা নিয়েছে। ক্লাবের জন্ম শোভাবাজারে এবং নাম শোভাবাজার স্পোর্টিং হলেও তার কোন অস্তিত্ব জন্মস্থানে এখন আর নেই যেমন কমলের জন্ম তার দেশ ফরিদপুরে হলেও, তিন বছর বয়সে সেখান থেকে চলে আসার পর আর সে দেশের মুখ দেখেনি। শোভাবাজার স্পোর্টিং এখন ময়দানের তাঁবুতে আর বেলেঘাটায় কেষ্টদার অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রসাদ মাইতির বাড়িতেই বিদ্যমান।

কমল যুগের যাত্রীর তাঁবুতে শেষবার পা দিয়েছিল সাত বছর আগে। মোহনবাগান থেকে যাত্রীতে আসার জন্য ট্রান্সফার ফরমে সে সই করে এক হাজার টাকা আগাম নিয়ে। কথা ছিল পাঁচ হাজার টাকা যাত্রী তাকে দেবে।

বছর শেষে সে মোট পায় চার হাজার টাকা। দিল্লিতে ডুরাণ্ডে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে আসার পরই সে গুলোদার কাছে বাকি টাকাটা চায়। যুগের যাত্রীর সব থেকে ক্ষমতাশালী এই গুলোদা অর্থাৎ ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রতাপ ভাদুড়ি। সকালে প্র্যাকটিসের পর প্লেয়াররা কি খাবে, কোন্ ম্যাচে কোন্ প্লেয়ার খেলবে, কোন প্লেয়ারকে যাত্রীতে নেওয়া হবে, এবং কত টাকায় এসব স্থির করা ছাড়াও গুলোদা এবং তার উপদলের নির্দেশেই নির্বাচিত হয় ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক, ফুটবল সম্পাদক, এমনকি প্রেসিডেন্টও। ফুটবল চ্যারিটি ম্যাচের বা ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচের টিকিট গুলোদার হাতেই প্রথমে আসে, তারপর মেম্বারদের বিক্রি করা হয়। আই এফ এ এবং সি এ বি-র তিন-চারটি সাব

কমল গুহ যতদিন বল নিয়ে নামবে ততদিন এই জার্সিকে সে...

কমিটিতে গুলোদা আছে। একটি ছোট্ট প্রেসের মালিক গুলোদা গত ১০ বছরে দুটি বাড়ি করেছে ভবানীপুরে ও কসবায়।

গুলোদা নম্রস্বরে বিনীত ভঙ্গিতে কথা বলে।

"সে কি, তুই টাকা পাসনি এখনো!" গুলোদার বিস্ময়ে কমল অভিভূত হয়ে যায়।

"ছি ছি, অন্যায় খুব অন্যায়। আমি এখুনি তপেনকে বলছি।"

গুলোদা অ্যাকাউনট্যান্ট তপেন রায়কে ডেকে পাঠাল। সে আসতেই ঈষৎ রুষ্টস্বরে বলল, "একি, কমলের টাকা পাওনা আছে যে? না না, যত শিগ্‌গির পার দিয়ে দাও, কমল আমাদের ডিফেনসের মূল খুঁটি, ওকে কমজোরি করলে যাত্রী শক্ত হয়ে দাঁড়াবে কি করে!"

কমল সতর্ক হয়ে বলে, "গুলোদা, টাকাটা রোভার্সে যাবার আগেই পাচ্ছি তো?"

"তুই ভাই তপেনের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে নে।" বলতে বলতে গুলোদা ফোন তুলে ডায়াল করতে শুরু করে দেয়

তপেন তিনদিন ঘুরিয়ে টাকা দেয়নি। কমলও রোভার্সে যায়নি। ফুটবল সেক্রেটারির কাছে খবর পাঠায় হাঁটুর ব্যথাটা বেড়েছে। তাই শুনে গুলোদা শুধু বলেছিল "বটে।" পরের মরশুমের জন্য ফুটবল ট্রান্সফার শুরু হবার আগে গুলোদা ডেকে পাঠায় কমলকে। ও আসামাত্র ড্রয়ার থেকে একশো টাকার দশটি নোট বার করে একগাল হেসে গুলোদা বলে, "গুণে নে। তোরা যদি রাগ করিস তাহলে যাত্রী চলবে কি করে বলতে পারিস?

"না না কমল ছেলেমানুষি তোর পক্ষে করা শোভা পায় না। দশবছরের ওপর তুই ফার্স্ট ডিভিশন খেলছিস। ইন্ডিয়া কালার, বেঙ্গল কালার পরেছিস। চ্যাংড়া ফুটবলারদের মত তুইও যদি টাকা নিয়ে......না না তোকে দেখেই তো ওরা শিখবে, ক্লাবকে ভালবাসবে। ইউ মাস্ট বী ডিগনিফায়েড। এবার ভাল করে গুছিয়ে টিম কর্। কাকে কাকে নিতে হবে সে সম্পর্কে ভেবেছিস?"

গুলোদা সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বসতে ইসারা করল। কমল হাতের নোটগুলো প্যান্টের পকেটে রেখে চেয়ারে বসতেই গুলোদা আবার শুরু করে, "প্লেয়ার কোথায়? মেম্বাররা লীগ চায়, শীল্ড চায়, আরে বাবা যে কটা প্লেয়ার সবই তো মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল নিয়ে বসে আছে। প্লেয়ার না হলে ট্রফি আনবে কে! একা কমল গুহ যা খেলে তার সিকিও যদি দুটো ব্যাক খেলতে পারত তাহলে ইন্ডিয়ার সব ট্রফি আমরা পেতাম। ক্লাস ক্লাস, ক্লাসের তফাৎ। তোর ক্লাসের প্লেয়ার কলকাতা মাঠে এখন কটা আছে আঙুলে গুণে বলা যায়। তুই কিন্তু ট্রান্সফারের প্রথম দিনেই উইথড্র করবি।"

কমল বলতে শুরু করে "কিন্তু টাকার কথাটা তো......"

"আহ্ ওসব নিয়ে তোর সঙ্গে কি দর কষাকষি করতে হবে! গত বছর যা পেয়েছিস এবারও তাই পাবি।"

কমল ট্রান্সফারের প্রথম দিনেই ওল্ড ফ্রেন্ডসে সই করেই উইথড্র করে। লীগে সাতটি ম্যাচে তাকে ড্রেস করিয়ে সাইড লাইনের ধারে বসিয়ে রাখা হয়। অষ্টম ম্যাচ স্পোরটিং ইউনিয়নের সঙ্গে পাঁচ গোলে এগিয়ে থাকা অবস্থায় খেলা শেষের দশ মিনিট আগে কোচ বিভাস সেন এসে বলে, "কমল নামতে হবে, ওয়ারম আপ করো।"

শোনা মাত্রই ঝাঁঝিয়ে ওঠে কমলের মাথা। দিনের পর দিন হাজার হাজার লোকের সামনে আনকোরা প্লেয়ারের মত সেজেগুজে লাইনের ধারে বসে থাকার লজ্জা আর অপমানের ক্ষতে যেন নুনের ছিটে এই দশ মিনিটের জন্য খেলতে নামানো।

"এতদিনে হঠাৎ মনে পড়লো যে?" কমল অস্বাভাবিক ঠাণ্ডাস্বরে বলে।

"রাগ করিস নি ভাই, বুঝিসই তো আমার কোন হাত নেই। সবই একজনের ইচ্ছেতেই তো হয় এখানে।" বিভাস চোরের মত এধার ওধার তাকিয়ে বলে "খেলার আগেই গুলোদা বলে দেয় কমলকে দশ মিনিট আগে নামিও।"

কমল বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরে গ্যালারির দিকে তাকায়। একেবারে উপরে গুলোদা তার নির্দিষ্ট জায়গাটিতে বসে। কমল সটান উঠে এসে গুলোদার সামনে দাঁড়াল। জার্সিটা গা থেকে খুলে হাতে ধরে বলল, "বয়স হয়েছে, খেলাও পড়ে এসেছে। কিন্তু কমল গুহ যতদিন বল নিয়ে ময়দানে নামবে ততদিন এই জার্সিকে সে ভয়ে কাঁপাবে।"

জার্সিটা হতবাক গুলোদার কোলে ছুঁড়ে দিয়ে, খালি গায়ে কমল শত শত লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির ভীড় কাটিয়ে গ্যালারি থেকে নেমে আসে। তাঁবুতে এসে জামা প্যান্ট পরে নিজের বুট এবং অন্যান্য জিনিসগুলো ব্যাগে ভরে যখন সে বেরোচ্ছে তখন খেলা শেষের বাঁশির সঙ্গে সঙ্গে হাউইয়ের মত একটা উল্লাস আকাশে উঠে প্রচণ্ড শব্দে ফেটে পড়ল। কমল থমকে পিছন ফিরে তাকাল। দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুটে বলল, "এই শব্দকে কাতরানিতে বদলে দেব।"

যুগের যাত্রী তাঁবুর চৌহদ্দিতে কমল আর পা দেয়নি। পরের বছর ট্রান্সফারের প্রথম দিনেই সে সই করে আসে শোভাবাজার স্পোরটিংয়ে খেলার জন্য। লীগ তালিকায় শেষের যে পাঁচ-ছটি দল প্রথম ডিভিশনে টিকে থাকার জন্য জোট পাকায় আর পয়েন্ট ছাড়াছাড়ি করে, শোভাবাজার তাদেরই একজন। তিনটি খেলায় ১১ গোল খেয়ে সে বছর ওদের খেলা পড়ে যাত্রীর সঙ্গে। কমল খেলতে নেমেছিল এবং শুধু তারই জন্য যাত্রীর ফরোয়ারডরা পেনালটি বক্সের মাথা থেকেই বারবার ফিরে যায়। খেলা ০—০ শেষ হয়। শেষ বাঁশির সঙ্গে মাঠে থমথমে গাম্ভীর্য নেমে আসে। কমল শোভাবাজারের দুজন প্লেয়ারের কাঁধে ভর দিয়ে টলতে টলতে মাঠ থেকে বেরোবার সময় বলে, "শরীরে আর একবিন্দুও শক্তি নেই রে, নইলে এখন আমি একটা দারুণ চীৎকার করতুম।"

ফিরতি লীগে শোভাবাজারের যখন পঁচিশটা খেলায় ১৪ পয়েন্ট তখন পড়ল যাত্রীর সামনে। লীগ তালিকায় যাত্রী তখন মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান, এরিয়ানের পরে বি এন আরের উপরে। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কোন আশা নেই। এটা শুধু ছিল মান-রক্ষার খেলা।

হাফ টাইমে যাত্রীর মেম্বাররা কুৎসিত গালিগালাজ করতে করতে গুলোদার দিকে জুতো, ইঁট, কাঠের টুকরো ছুঁড়তে শুরু করে। তাদের চীৎকারের মধ্যে একটা গলা শোনা গেল, "কমলকে কেন ছেড়ে দেওয়া হল?" খেলার ফল তখন ০—০।

এরপর গুলোদার এক পার্শ্বচর দ্রুত গ্যালারি থেকে নেমে গিয়ে শোভাবাজারের সম্পাদক কৃষ্ণ মাইতির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে এল।

হাফ টাইমের পর মাঠে নামতে গিয়ে কমল অবাক হয়ে দেখল, যে সিধু এতক্ষণ দারুণ খেলে অন্তত তিনটি অবধারিত গোল বাঁচাল তাকে বসিয়ে নতুন ছেলে ভরতকে গোলে নামান হচ্ছে। খেলা শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যাত্রীর লেফট হাফ প্রায় ৩০ গজ থেকে একটি অতি সাধারণ শট গোলে দিল। কমল শিউরে উঠে দেখল বলটা ধরতে ভরত সামনে এগিয়ে এসে হঠাৎ থমকে গেল, তার সামনেই ড্রপ পড়ে মাথা ডিঙিয়ে বল গোলে ঢুকল। মিনিট দশেক পর কমলের পায়ে বল। যাত্রীর দুটো ফরোয়ার্ড দুপাশ থেকে এসে পড়েছে। ওদের আড়াল করে কমল ফাঁকায় দাঁড়নো রাইট ব্যাককে বলটা দিতেই ছেলেটি কিছু না দেখে এবং না ভেবে আবার কমলকেই বলটা ফিরিয়ে দিল। যাত্রীর লেফট ইন ছুটে এল বল ধরার জন্য পরিস্থিতিটা এমনই দাঁড়াল যে কর্নার করা অথবা গোলকীপারকে বলটা ঠেলে দেওয়া ছাড়া কমলের আর কোন পথ নেই। সে

গোলের দিকে বলটা ঠেলে দেখল ভরত অযথা একটা লোক দেখানো ডাইভ দিল এবং বল তার আঙুলে লেগে গোলে ঢুকল, ০-২ গোলে শোভাবাজার হেরে গেল। গ্যালারির মধ্যেকার সরু পথটা দিয়ে কমল যখন মাথা নিচু করে বেরোচ্ছে, উপর থেকে চীৎকার করে একজন বলল, "কিরে কমল, যুগের যাত্রীকে কাঁপাবি না?"

তিন দিন পর ভরতকে আড়ালে ডেকে কমল জিজ্ঞাসা করেছিল, "এ রকম করলি কেন?"

ভরতের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তর্ক করার ব্যর্থ চেষ্টা করে অবশেষে স্বীকার করে, "কেষ্টদা বলল রেগুলার খেলতে চাস যদি তাহলে দুটো গোল আজ ছাড়তে হবে। রাজি থাকিস তো নামাবো। আমি লোভ সামলাতে পারলুম না কমলদা। দু বছর রিজার্ভেই কাটালুম, মাত্র চারটে পুরো ম্যাচ খেলেছি।" তারপরই সে ঝুঁকে কমলের পা দুহাতে চেপে ধরল। "আমাকে মাপ করুন কমলদা, এমন কাজ আর করব না।" কমল তখন আপন মনে নিজেকে উদ্দেশ করেই বলে, "স্টপার কোন্ দিকের আক্রমণ তুমি সামলাবে!"

পরের বছর যাত্রীর সঙ্গে লীগের প্রথম খেলায়, শুরুর সাত মিনিটেই কমল পেনালটি বকসের একগজ বাইরে নিরুপায় হয়ে একজনকে ল্যাং দিয়ে ফেলে দেয়। বাঁশি বাজাতে বাজাতে রেফারী রাধাকান্ত ঘোষ ছুটে এল পেনাল্টি স্পটের দিকে আঙুল দেখিয়ে, তাজ্জব হয়ে কমল জিজ্ঞাসা করল, "পেনাল্টি কিসের জন্য?"

"নো নো, ইটজ পেনাল্টি।" রাধাকান্ত বলটা হাতে নিয়ে দাগের উপর বসাল।

"বক্সের অনেক বাইরে ফাউল হয়েছে।" কমল নাছোড়-বান্দার মত তর্ক করতে গেল।

"নো আরগুমেন্ট। আই অ্যাম কোয়ায়েট শ্যিওর অফ ইট।"

"বুঝেছি।" কমল তির্যককণ্ঠে বলল। রাধাকান্ত না শোনার ভান করে বাঁশি বাজাল। কমল চোখ বন্ধ করে দু'কানের পাশে তালু দুটো চেপে ধরল। এখুনি সেই মর্মান্তিক চীৎকারটা উঠবে।

একটা প্রবল দীর্ঘশ্বাস মাঠের উপর গড়িয়ে পড়ল। কমল অবাক হয়ে চোখ খুলে দেখল ভরত বলটা দুহাতে বুকের কাছে আঁকড়ে উপুড় হয়ে। এরপর শোভাবাজার দ্বিগুণ বিক্রমে যাত্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হাফ টাইমের আগের মিনিটে রাইট উইং বল নিয়ে টাচ লাইন ধরে তরতরিয়ে ছুটে চমৎকার সেন্টার করে। বলটা পেনাল্টি বক্সের মাথায় দাঁড়ানো রাইট ইন বুক দিয়ে ধরেই সামনে বাড়িয়ে দেয়। লেফট উইং যাত্রীর দুই ব্যাকের মধ্যে দিয়ে ছিটকে ঢুকে এসে বলটা গোলে প্লেস করা মাত্র রাধাকান্ত বাঁশি বাজিয়ে ছুটে আসে। অফসাইড। তখন কমল মনে মনে বলে, "আক্রমণ, স্টপার কি করে এই আক্রমণ রুখবে!"

যুগের যাত্রী খেলাটা ১—০ জিতেছিল। প্রায় শেষ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে শোভাবাজার গোলের মুখে বল পড়েছিল। ভরত এগিয়ে এসে পাঞ্চ করতেই যাত্রীর রাইট উইংয়ের মাথায় বল আসে। সে হেড করে গোলের দিকে পাঠাতেই ভরত পিছু হটে বলটা ধরতে গিয়ে আটকে যায়। যাত্রীর লেফট-ইন্ তার প্যান্ট ধরে আছে। বিনা বাধায় বল গোলে ঢোকে।

খেলা শেষে মাঠের মধ্যে শোভাবাজার প্লেয়াররা ভিড় কমার জন্য অপেক্ষা করছিল। এমন সময় রথীনকে দেখতে পেয়ে কমল হেসে এগিয়ে এসে বলল, "আজ আমরা একগোলে জিতেছি।"

রথীন শুকনো হেসে বলল, "এ বছর আমি যাত্রীর ফুটবল সেক্রেটারি।"

"ওহ্, তাইতো। মনেই ছিলনা। সরি, আমার বরং বলা উচিত রেফারি আজ জিতেছে। এভাবে না জিতে ভাল করে টিম কর্। খেলার খেলা খেলে জেত্।"

"এভাবে কদ্দিন তুই আমাদের জ্বালাবি বল্‌তো?"

"আমি জ্বালাচ্ছি! তুই তাহলে ফুটবলের 'ফ'-ও বুঝিস না। তোদের গুলোদাকে জিজ্ঞেস কর্, তিনি বোঝেন বলেই আমাকে দুবছর আগেই ড্রেস করিয়ে সাইড লাইনের বাইরে বসিয়ে রাখতেন।"

"তোকে দেখলে হিংসে হয়, এখনো দিব্যি খেলাটা রেখেছিস আর আমরা কেমন বুড়িয়ে গেলুম।"

"তার বদলে তুই আখেরটা গুছিয়ে নিতে পেরেছিস। শুনেছি প্রগ্রেসিভ ব্যাঙ্কে এখন বেশ বড় পোস্টে আছিস। একটা চাকরি-বাকরি দে না।" হাসতে হাসতে কমল বলল, "তাহলে আর যাত্রীকে জ্বালাব না। খেলে কি আর তোদের মত বড় ক্লাবের সঙ্গে পারা যায়!"

"আর ইউ সিরিয়াস, চাকরি সম্পর্কে? তাহলে টেন্টে আয়, কথা বলা যাবে।"

"সরি রথীন।" কঠিন হয়ে উঠল কমলের মুখ। "চাকরি আমার দরকার, দুমাস ধরে বেকার। কিন্তু যাত্রীর টেন্টে যাব না।"

আর কথা না বলে কমল সরে আসে রথীনের কাছ থেকে। এসব পাঁচ বছর আগের ঘটনা।

তিন

যুগের যাত্রীর টেন্টের সামনে রাস্তায় একটা সবুজ পুরনো ফিয়াট মোটর দাঁড়িয়ে। কমল দেখা মাত্র চিনল, এটি রথীনের। মাস ছয়েক আগে রথীনের পদোন্নতি হয়ে ডিপারটমেন্টাল ইন-চার্জ হয়েছে। এখন মাইনে সতেরো শো। ব্যাঙ্কে রীতিমত ক্ষমতাবান। চলাফেরা কথাবার্তায় সেটা সে সর্বদা বুঝিয়েও দিতে চায়। তাছাড়া রথীন সুদর্শন, যদিও এখন ভুঁড়ি হয়ে আগের মত আর ততটা কমবয়সী দেখায় না।

পাঁচবছর আগে সেদিন রথীনকে নিছকই ঠাট্টা করে কমল চাকরির কথা বলেছিল। পরের দিনই রথীন শোভাবাজার টেন্টে ফোন করে তাকে দেখা করতে বলে। কমল খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল। গোঁয়ারের মত এক কথায় বেঙ্গল জুট মিলের চারশো টাকার চাকরিটা ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে দুমাস ধরে অবস্থাটা শোচনীয় হয়ে আসছিল। কমল ব্যাঙ্কে গিয়ে রথীনের সঙ্গে দেখা করে। রথীন বলে, "আমাদের অফিস টিমে তোকে খেলতে হবে। অফিস স্পোর্টস ক্লাবের সেক্রেটারির সঙ্গে কথা হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি পারিস দরখাস্ত দিয়ে যা। ডেসপ্যাচ সেকশন-এ লোক নেওয়া হবে।"

"মাইনে কত?" কমল প্রশ্ন করে। রথীন ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলে, "যদি বলি একশো টাকা! দু-মাস বেকার আছিস, মাইনে যদি পঞ্চাশ টাকাও হয় সেটাও তো তোর লাভ।"

কমল আর কথা বাড়ায়নি। পরদিনই দরখাস্ত নিয়ে হাজির হয় এবং যে চাকরিটি পায় তার বেতন এই পাঁচ বছরে ৪৬১ টাকায় পৌঁছেছে। কমল জানে তার যা শিক্ষাগত যোগ্যতা তাতে এই চাকরি কোনভাবেই তার পক্ষে পাওয়া সম্ভব হোত না, যদি না রথীন পাইয়ে দিত। পঞ্চান্ন থেকে ষাট সাল নাগাদ কমল গুহের যে নাম ছিল এখন তার অর্ধেকও নেই। ফুটবল ভাঙিয়ে চাকরি পাওয়ার দিন তার উতরে গেছে। তবু পেয়েছে একমাত্র রথীনের জন্যই।

পাঁচবছর পর যাত্রীর টেন্টে আবার ঢুকতে গিয়ে কমলের মনে হল, তাকে দেখে সবাই নিশ্চয়ই অবাক হবে। কিন্তু কেউ যদি অপমান করার চেষ্টা করে? অবশ্য নিজের জন্য টাকা চাইতে নয় এবং ফুটবল সেক্রেটারি আসতে বলেছে বলেই এসেছি সুতরাং, কমল মনে মনে বলল, আমার মনে গ্লানি থাকার কোন কারণ নেই।

টেন্টের বাইরে ইতস্তত ছড়ানো বেঞ্চে যাত্রীর প্রবীণ মেম্বাররা গল্পে ব্যস্ত। তারা কেউ কমলকে লক্ষ্য করল না।

'...যাত্রীকে কিন্তু কাঁপাতে পারেনি কমল। আমরা ফ‍ুল পয়েন্ট তুলেছি।'

টেন্টের মধ্যে ঢ‍ুকে কমলের সঙ্গে প্রথম চোখাচোখি হল য‍ুগের যাত্রীর অ্যাকাউন্ট্যান্ট তপেন রায়ের। টেবিলে আরো দ‍ুজন লোক বসে। একজনকে কমল চেনে। গ‍ুলোদার 'চামচা' হিসাবে খ্যাতি আছে তার।

"আরে, কমল যে কি ব্যাপার!"

"রথীন কোথায়? এইমাত্র ফোনে আমায় এখানে আসতে বলল।"

"হ্যাঁ, আমার কাছে একশো টাকা চেয়েছে তোমাকে দেবার জন্য।"

বলতে বলতে তপেন ব‍ুক পকেট থেকে একটি নোট বার করে এগিয়ে ধরল। কমলের মনে হল টাকা নিয়ে তপেন যেন তার জন্যই অপেক্ষা করছে।

গ‍ুলোদার চামচাটি ব্যস্ত হয়ে বলল, "ভাউচারে সই করাতে হবে না?"

তপেন তাচ্ছিল্যভরে বলল, "না, এটা ক্লাবের টাকা নয়। কমল তো যাত্রীর টাকা ছোঁবে না, আমার পকেট থেকেই দিচ্ছি।"

কমল গম্ভীর গলায় বলল, "টাকাটা কালই রথীনের হাতে দিয়ে দেব। ও এখন কোথায়?"

"ঘরে কথা বলছে প্লেয়ারদের সঙ্গে। কাল রাজস্থানের সঙ্গে খেলা।"

কমল ইতস্তত করল। রথীনকে একবার বলে যাওয়া উচিত। কিন্তু প্লেয়ারদের সঙ্গে হয়তো কালকের খেলা সম্পর্কে আলোচনা করছে, তাহলে যাওয়াটা উচিত হবে না বাইরের লোকের।

"কমল এ বছর খেলছো তো?" তপেন রায় হাই চাপার জন্য ম‍ুখের সামনে হাত তুলে রেখে বলল। তারপর স্বগতোক্তির মত মন্তব্য করল "আর কতদিন চালাবে।"

কমল হাসল মাত্র।

"তপেনদা কমলের বডিটা দেখেছেন!" চামচা বলল। "এখনকার একটা ছেলেরও এমন ফিট বডি নেই।"

তপেন কথাগ‍ুলো না শোনার ভান করে তার আগের কথার জের ধরে বলল, "চারব্যাক হয়ে বয়স্ক ডিফেন্সের প্লেয়ারদের স‍ুবিধেই হয়েছে। কেরিয়ারটার সঙ্গে সঙ্গে রোজগারটাও বাড়াতে পেরেছে। শোভাবাজার থেকে এখন পাচ্ছ কতো?"

"একটা আধলাও নয়।"

তপেনের ভ্র‍ু কুঞ্চিত হল কয়েক সেকেন্ডের জন্য।

"ফ্রি সার্ভিস এই বাজারে!" চামচা অবাক হল। "অবশ্য কমল লীগে দ‍ুটো ছাড়াতো ম্যাচই খেলে না।"

"শ‍ুধ‍ু দ‍ুটো ম্যাচ! কেন, আর খেলে না?" তপেন প্রশ্ন করল চামচাকে।

"লাস্ট ট‍ু ইয়ার্স তো কমল শ‍ুধ‍ু আমাদের এগেনস্টেই খেলেছে।" চামচা চোখ পিটপিট করল। "যাত্রীকে কিন্তু কাঁপাতে পারেনি কমল। আমরা ফ‍ুল পয়েন্ট তুলেছি। যাত্রীর জার্সি সকলের সামনে খ‍ুলে ছ‍ুঁড়ে ফেলেছিল বটে কিন্তু দম্ভ রাখতে পারে নি। ফ‍ুটবল কি একজনের খেলা!"

রথীন স্প্রিংয়ের পাল্লা ঠেলে এই সময় ঘর থেকে বেরোল। সঙ্গে চারটি ছেলে। কমলকে দেখে সে বলল, "অঃ, কখন এলি? তপেনদা দিয়ে দিয়েছেন?"

তপেন ঘাড় নাড়তেই রথীন বলল, "আমি টালিগঞ্জের দিকেই এখন যাব। কমল তুই তো নাকতলায় যাবি, যদি মিনিট কয়েক অপেক্ষা করিস তাহলে আমার সঙ্গে যেতে পারিস।"

কমল বলল, "আমি তোর গাড়িতে গিয়ে বসছি। তুই তাড়াতাড়ি কর।"

তপেন ম‍ৃদ‍ুস্বরে বলল, "টাকাটা ফেরত দেওয়ার জন্য তোকে ব্যস্ত হতে হবে না, কমল।"

"কেন?"

"যখন দরকার হবে আমি চেয়ে নেব। তোমার প্রয়োজনের সময় দিতে পেরেছি শ‍ুধ‍ু এইট‍ুকু মনে রাখলেই আমি খ‍ুশি হব। তুমিও বিপদে পড়ে যাত্রীর কাছেই এসেছ এটা ভাবতে আমার ভালই লাগছে।"

শ‍ুনতে শ‍ুনতে কমলের ম‍ুখ ফ্যাকাসে হয়ে এল। সে বলল, "আমি টাকা চেয়েছি রথীনের কাছে, যাত্রীর কাছে নয়। চেয়েছি অন্যের জন্য, নিজের জন্য নয়।"

কমল বলতে যাচ্ছিল, এ টাকা যদি যাত্রীর হয় তাহলে এখ‍ুনি ফিরিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু পল্ট‍ুদার ম‍ুখটা ভেসে উঠতেই আর বলতে পারল না। তার মনে হচ্ছে, অদ্ভুত একটা খাঁচার মধ্যে সে ঢ‍ুকে পড়েছে যার চারদিকটাই খোলা অথচ বেরনো যাচ্ছে না।

তপেন তার স্মিত হাসিটা কমলের ম‍ুখের উপর অনেকক্ষণ ধরে রেখে বলল, "যদি আরো টাকার দরকার হয় আমাকে বাড়িতে ফোন কোরো। পল্ট‍ু ম‍ুখারজির চিকিৎসায় আমাদেরও সাহায্য করা কর্তব্য। এ টাকা ধার নয় কমল, পল্ট‍ুদাকে আমার...য‍ুগের যাত্রীর প্রণামী।"

কমল শ‍ুনতে শ‍ুনতে হঠাৎ নিজেকে অসহায় বোধ করল। তার মনে হচ্ছে পেনালটি বকসের মধ্যে বল নিয়ে দ‍ুটো ফরোয়ারড

এগিয়ে আসছে। সে একা তাদের মুখোমুখি। ব্যাকেরা কোথায় দেখার জন্য চোখ সরাবার সময়ও নেই।

গাড়িতে দুজনের কেউই অনেকক্ষণ কথা বলল না। রেড রোড ধরে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের পশ্চিম দিয়ে যখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের কাছে পৌঁছেছে তখন রথীন মুখ ফিরিয়ে বলল, "অফিসের দুটো খেলায় তুই খেলিস নি!"

"এসব খেলা অর্থহীন, আমার ভালো লাগে না খেলতে। তাছাড়া শোভাবাজারের প্র্যাকটিস ম্যাচ ছিলো। কতকগুলো নতুন ছেলে কেমন খেলে দেখার জন্যই গেছলুম।"

"কিন্তু ব্যাঙ্ক চাকরি দিয়েছে তার হয়ে খেলার জন্য।"

কমল চুপ করে রইল।

"এই নিয়ে কথা উঠেছে। তাছাড়া রোজই তুই কাজ ফেলে সাড়ে তিনটে-চারটেয় বেরিয়ে যাস।"

"কে বলল, নিশ্চয় রণেন দাস?"

"যেই বলুক, সেটা কোনো কথা নয়। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি তারা মিথ্যে বলেনি।"

পুলিশ হাত তুলেছে। রথীন ব্রেক কষল। ডানদিকে মোড় ফিরে হরিশ মুখার্জি রোডে এবার গাড়ি ঢুকবে। কমল পুলিশটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। রথীন মোড় ঘুরে গিয়ার বদল করে শান্ত মৃদুস্বরে বলল, "বুঝিস না কেন, তোর আর আগের মত নাম নেই, খেলা নেই। এখনকার উঠতি নামী প্লেয়াররা যে অ্যাডভান্টেজ অফিসে পায় বা নেয়, তোর পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। তোকে এখন চাকরিটাকেই বড় করে দেখতে হবে। তার জন্য যেসব নিয়ম মানতে হয় মেনে চলতে হবে। অন্য পাঁচজনের থেকে তুই এখন আর আলাদা নোস্।"

"আমি আর পাঁচজনের মত, কোন তফাৎই নেই?" কমল প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বলল।

রথীনের মুখে অস্বস্তিকর বেদনার ছাপ মুহূর্তের জন্য পড়ে মিলিয়ে গিয়েই কঠিন হয়ে উঠল।

"বিপুল ঘোষ, রণেন দাস কি সতু সাহার মত কেরানীদের সঙ্গে আমার তফাৎ নেই, রথীন এ তুই কি বলছিস! আমি ইন্ডিয়ায় খেলেছি, দেশের জন্য আমার কন্ট্রিবিউশন আছে। জীবনের সেরা সময়ে দিনের পর দিন পরিশ্রম করেছি, কষ্ট করেছি, লেখাপড়া করার সময় পাইনি, জীবনের নিরাপত্তার কথা ভাবিনি, সংসারের দিকে তাকাইনি। ওরা কি স্যাক্রিফাইস করেছে, বল্? ওরা আর আমি সমান হয়ে যাব কোন্ যুক্তিতে?"

রথীন চুপ করে থাকল। গাড়ি চালানোয় ওর মনোযোগটাও বেড়ে গেল হঠাৎ।

"আমি এখনো ফুটবলের জন্য কিছু করতে চাই। প্লেয়ার তৈরী করতে চাই। তাই অফিস থেকে আগে বেরোই। আর অফিস লীগে খেলাটা তো এলেবেলে।"

"কমল, আমাদের দেশে খেলোয়াড়কে ততদিনই মনে রাখে যতদিন সে মাঠে নামে। তারপর স্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। নতুন 'হিরো' আসে, তাকে নিয়ে নাচানাচি করে। দ্যাখ না, যাত্রীতে এখন প্রসূন ভটচাজকে নিয়ে কি কান্ড চলছে অথচ ওর বাবাকেই একদিন সাপোরটাররা মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল ঘুষ খেয়েছে বলে। তোকে মনে রাখবে এমন একটা কিছু কর্।"

"রথীন আমার বয়স হয়ে গেছে। এখন আর কিছু করার মত সামর্থ্য নেই। ফুটবলারের সামর্থ্য তো তার শরীর।"

"তাহলে মন দিয়ে চাকরিটা কর্। তোকে চাকরি দেওয়ায় ইউনিয়ন থেকে পর্যন্ত অপোজিশন এসেছিল। সবাই বলেছিল উঠতি নামী অল্প বয়সীকে চাকরি দিতে। তুই তো জানিসই সেকেন্ড ডিভিশনে খেলে অপূর্ব ছেলেটাকে চাকরি দেওয়া হবে বলে গত বছর আটটা ম্যাচ খেলানো হয়। ভালোই খেলে কিন্তু এখনো চাকরি পায়নি। কমিটি মেমবাররা বড় বড় নাম চায়। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের চার জনের নাম

উঠেছিল। আমি তর্ক করে বলি, অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে অফিসের খেলায় এইসব বড় ক্লাবের নামী প্লেয়াররা একদমই খেটে খেলেনা। ওরা থেকেও টিম হারে। এতে অফিসের কোনো লাভ হয়না। বরং পড়তি প্লেয়াররা ভালো সার্ভিস দেয়। তোর জন্য এ-জি-এম পর্যন্ত ধরাধরি করেছি। এখন তুই যদি অফিসের হয়ে না খেলিস তাহলে আমার মুখ থাকে কোথায়? অফিসে নানাদিকে নানাকথা উঠছে, এ রকম ফাঁকি দিলে তো আমাকে তোর এগেনস্টে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নিতেই হবে।"

"কিন্তু আমার পক্ষে শোভাবাজারের ম্যাচের দিন পাঁচটা পর্যন্ত অফিসে থাকা কি অফিসের হয়ে খেলা সম্ভব নয়।"

কমল গোঁয়ারের মত গোঁজ হয়ে বসল। রথীনের মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল।

"অনেক গুলো চাকরি তো ছেড়েছিস। এই বয়সে এই চাকরিটা যদি হারাস তাহলে কি হবে ভেবে দেখিস। আমার তো মনে হয় না আর কোথাও পাবি। দেশের লেখাপড়া জানা বেকার ছেলেদের সংখ্যাটা কত জানিস?"

"না জানিনা, জানার ইচ্ছেও নেই। এখানে থামা।"

কমল অধৈর্য ভঙ্গিতে প্রায় চিৎকার করে উঠল। রথীন একটু অবাক হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ব্রেক কষে গাড়ি থামাল।

"আরো এগিয়ে তোকে নামিয়ে দিতে পারি।"

"না এখানেই নামব আর টাকাটা কাল তোকে অফিসেই দিয়ে দেব।"

কমল গাড়ি থেকে নেমে অনাবশ্যক জোরে দরজাটা বন্ধ করে, হনহনিয়ে পিছন দিকে হাঁটতে শুরু করল বাস স্টপের জন্যে।

বাসে উঠে দমবন্ধ করা ভীড়ে কমল মাথার উপরের রড্ ধরে মনে করতে চেষ্টা করল পুরণো কথা। তেরো বছর আগে প্রথমবার যুগের যাত্রীতে খেলার সময় রথীন ছিল রাইট ব্যাক, কমল স্টপার। রথীন সে বছর ক্যালকাটা ইউনিভারসিটির ক্যাপ্টেন হয়ে লখনৌ থেকে স্যার আশুতোষ ট্রফি এনেছে। মোটামুটি কাজ চালাবার মত খেলতো। তখন ডাকতো 'কমলদা'। রথীন ছিল গুলোদার খুবই প্রিয় পাত্র। মালয়েশিয়ায় নতুন টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে মারডেকা নামে। ইন্ডিয়া টিম খেলতে যাবে। বোমবাইয়ে ট্রেনিং ক্যাম্পে বাংলা থেকে বারোজন গিয়েছিল। যাত্রী থেকে তিনজন—রথীন, আমিরুল্লা আর সুনীত। বলা হয়েছিল কমলের হাঁটুতে চোট আছে তাই ট্রায়ালে পাঠান হয়নি, তাছাড়া চোখেও নাকি কম দেখছে। দুটোই ডাহা মিথ্যে কথা।

কমল সামান্য একটু চোট পেয়েছিল ইস্টারন রেলের সঙ্গে খেলায়। পরের ম্যাচে কমল বসে, রথীন স্টপারে খেলে

পল্টুদা ইজিচেয়ারে খাড়া হয়ে বসেছেন। নাকের পাটা ফুলে উঠেছে।

কালিঘাটের বিরুদ্ধে।

ভালোই খেলেছিল। তার পরের ম্যাচে এরিয়ানসের কাছে একগোলে যাত্রী হারে। কমল একটা হাই ক্রসের ফ্লাইট বুঝতে না পেরে হেড করতে গিয়ে ফসকায়। সেনটার ফরোয়ারড পিছনে ছিল, বলটা ধরেই গোল করে। খেলার পর ক্লাবে কানাঘুষো শোনা যায় কমল চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছে না।

কমল ছুটে গেছল পল্টু মুখারজির কাছে।

"পল্টুদা, এরা আমায় বসিয়ে দিল একেবারে।"

"সেকি রে, একেবারে বসে গেছিস!" পল্টুদা সদর দরজার বাইরে একচিলতে সিমেন্টের দাওয়ায় ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে কাগজ পড়ছিলেন। খুব একচোট প্রথমে হো হো করে হাসলেন।

"বসে গেছিস? কই দেখছি না তো, দিব্বি তো দাঁড়িয়ে আছিস।"

"না পল্টুদা ঠাট্টা নয়। আমার আর ভালো লাগছে না কিছু। আমি খেলা ছেড়ে দেব।"

"ভালো লাগছে না বুঝি! আচ্ছা ভালো লাগার ব্যবস্থা করছি। এখান থেকে একদৌড়ে যাদবপুর স্টেশন যাবি আর একদৌড়ে আসবি। এখুনি।"

কমল কথাটাকে আমল না দিয়ে বলল, "আমি সত্যিই খেলা ছেড়ে দেব। এমন জঘন্য অন্যায়, আমার নখের যুগ্যি নয় রথীন সে——"বলতে বলতে কমল থেমে গেল।

পল্টুদা ইজিচেয়ারে খাড়া হয়ে বসেছেন। নাকের পাটা ফুলে উঠেছে। দুচোখে ঘনিয়ে উঠেছে রাগ।

"অরু।" পল্টুদা ঘরের দিকে তাকিয়ে গুরুগম্ভীর গলায় ডাকলেন। "অরু, শুনে যা।"

পল্টুদার বড় মেয়ে অরুণা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই পল্টুদা বললেন, "আমার লাঠিটা নিয়ে আয়।"

কমল শোনা মাত্র অজান্তে একপা পিছিয়ে গেল। অরুণা অবাক হয়ে বলল, "এখন আবার কোথায় বেরোবে?"

"লাঠিটা নিয়ে আয় বলছি।" পল্টুদা হুঙ্কার দিলেন।

বাচ্চা ছেলের মত কমলের সন্ত্রস্ত মুখটা দেখে অরুণা আঁচ করতে পারল লাঠি আনার কাজটা উচিত হবে না। এ রকম দৃশ্য সে ছোট বেলা থেকে দেখে আসছে। শুধু মজা করার জন্য বলল, "মোটা লাঠিটা আনব বাবা?"

পল্টুদা উত্তর দিলেন না। অরুণা ঘরের দিকে পা বাড়ানো মাত্র কমল আর একটিও কথা না বলে দ্রুত ঘুরেই ছুটতে শুরু করল। যতক্ষণ দেখা যায় অপসৃয়মান ছুটন্ত কমলকে দেখতে দেখতে পল্টুদা এগিয়ে গেলেন। রাস্তার ধারে এসে থুতনি তুলে চেষ্টা করলেন কমলকে দেখার।

অবাক হয়ে রাস্তার লোকেরা তাকিয়ে। বহুলোক কমলকে চেনে। এতবড় এক নামকরা ফুটবলারকে জুতো জামা ফুলপ্যান্ট পরা অবস্থায় সকাল আটটার সময় গিজগিজে ভীড়ের রাস্তা দিয়ে ছুটতে দেখবে, এমন দৃশ্য তারা কল্পনাও করতে পারে না।

পল্টুদা অবসন্নের মত ফিরে এসে ইজিচেয়ারে বসলেন। বাঁ হাতটা চোখের উপর রাখলেন। অরুণা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাবার কপালে সে হাত রাখতেই পল্টুদা চোখ থেকে বাঁ হাতটা নামালেন। জলের শীর্ণ ধারা দুটি গাল বেয়ে নেমে আসছে।

"মনে বড় দাগা পেয়েছে ছেলেটা। দুঃখ তো জীবনে আছেই, কিন্তু এমন অন্যায় পথ ধরে দুঃখগুলো কেন যে আসে!" পল্টুদা আবার চোখের উপর হাত রাখলেন।

অনেকক্ষণ পর পল্টুদার রান্নাঘরের জানালায় উঁকি দিল দরদর ঘামঝরা, পরিশ্রমে লাল হয়ে ওঠা কমলের মুখ।

"অরু!"

অরুণা মুখ তুলল বাটনা বাটা বন্ধ করে।

"পল্টুদা ?"
"এখনো।"
"অ্যাঁ, এখনো ?"
"লাঠিটা তো হাতেই রেখেছে দেখলাম। তুমি যাদবপুর স্টেশন পর্যন্ত ঠিক গেছ তো ?"
"ফুটবলের দিব্যি।"
"দাঁড়াও দেখে আসি।"
আধ মিনিট পরেই অরুণা ফিরে এসে বলল, "সদর দরজা দিয়ে এসো। হাতে লাঠি নেই।"
পল্টুদা ছুঁচ-সুতো নিয়ে জামায় বোতাম লাগাতে ব্যস্ত। কমলকে একনজর দেখে বললেন, "খেয়ে এসেছিস ?"
"হ্যাঁ।"
"ছেলে কেমন আছে ? বয়স কত হল ?"
"ভালো, পাঁচ বছর পূর্ণ হবে এই সেপ্টেম্বরে।"
"প্র্যাকটিসটা আরো ভালো করে কর্। হতাশা আসবে, তাকে জয় করতেও হবে। ইন্ডিয়া টিমে খেললেই কি বড় প্লেয়ার হয় ? বড় তখনই হয়, যখন সে নিজে অনুভব করে মনের মধ্যে আলাদা এক ধরনের সুখ, প্রশান্তি। সেখানে হতাশা পৌঁছয় না। তুই খেলা ছেড়ে দিবি বলছিস, তার মানে তুই বড় খেলোয়াড় হতে পারিসনি।"
কমল মাথা নিচু করে কাঠের মত দাঁড়িয়ে থাকে। একটা অদ্ভুত ক্ষোভ আর কান্না মিলেমিশে তখন তার বুকের মধ্যে দুলে উঠেছিল।

বাস থেকে নেমে মিনিট চারেক হেঁটে কমল যখন পল্টুদার বাড়িতে ঢুকল তখন একটা অদ্ভুত মমতা আর বেদনা কমলের বুকের মধ্যে ফেঁপে উঠছিল। থাক্ দেওয়া তিনটে বালিশের উপর হেলান দিয়ে পল্টুদা। ওকে দেখে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।
"ভালই আছি।" মৃদুস্বরে পল্টুদা বললেন।
"কথা বলা একদম বারণ।" অরুণা কথাটা বলল কমলকে লক্ষ্য করে। কমল তাকাল অরুণার দিকে। সাদা থান পরনে। পাঁচ বছর আগে বিধবা হয়ে একটি ছেলে নিয়ে বাপের বাড়িতেই রয়েছে। এখন প্রাইমারি স্কুলে পড়ায়। পল্টুদা আরো তিনটি মেয়ের বিয়ে দিয়ে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছেন। স্ত্রী দুবছর আগে মারা গেছেন। সংসারে ছোট মেয়ে বরুণা ছাড়াও আছে এক বিধবা বোন। শুকনো মুখে তারা খাটের ধারে দাঁড়িয়ে। অরুণার ছেলে পিন্টু দাদুর খাটের একধারে বসে।
"কেমন আছেন ?" কমল ফিসফিস করে অরুণাকে জিজ্ঞাসা করল। "ডাক্তার দেখান হয়েছে ?"
"হ্যাঁ, বললেন কিছু করার নেই।"
"ওষুধ ?"
"দিয়েছেন লিখে। আনা হয়নি। বাবাই বারণ করলেন।"
"প্রেসক্রিপসানটা দাও।" কমল হাত বাড়াল।
পল্টুদা ওদের দিকেই তাকিয়েছিলেন। কঠিন এবং গম্ভীর স্বরে বললেন, "আমার জন্য আর টাকা নষ্ট করার দরকার নেই।"
বাড়ানো হাতটা কমল সন্তর্পণে নামিয়ে নিল।
"আর কেউ আসেনি?" কমলের প্রশ্নে অরুণা মাথা নাড়ল। পল্টুদার হাতে গড়া চারজন ইন্ডিয়া টিমে খেলেছে, পনেরোজন বেঙ্গল টিমে।
"ব্যালান্স, কমল, ব্যালান্স কখনো হারাসনি। আমি ব্যালান্স রাখতে পারিনি তাই কিছুই রেখে যেতে পারছিনা একমাত্র তোকে ছাড়া।" পল্টুদা ডান হাতটা পিন্টুর মাথায় রেখে চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে বললেন, "এই পৃথিবীটা ঘুরছে ব্যালান্সের ওপর। মানুষ হাঁটে ব্যালান্সে, দৌড়য়, ড্রিবল করে এমন কি মানুষের মনও রয়েছে ব্যালান্সের ওপর। চালচলন ব্যবহার চিন্তায় কখনো ব্যালান্স হারাসনি কমল। কে আমায় দেখতে এলো কি এলো না তাই নিয়ে আমার আর কিছু যায়-আসে না। তুই এসেছিস, জানতুম তুই আসবি।" একমুহূর্ত থেমে বললেন, "এদের তুই একটু দেখিস। আজ তোর কাছে এইটেই আমার শেষ চাওয়া।"
"পল্টুদা আমি থাকলে আপনি কথা বলেই যাবেন, তার থেকে আমি বরং চলে যাই।"
"পারবি যেতে ?" মুচকি হাসলেন পল্টুদা, "যদি বলি আমার সামনে তুই শুধু দাঁড়িয়ে থাক্। আমি তোকে দেখব আর সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠবে তোর বল কন্ট্রোল, মুখ তুলে বলটাকে পায়ে স্ট্রোক দিতে দিতে এগিয়ে যাওয়া, এধার ওধার তাকানো। আমার তখন কেন জানিনা অভিমন্যুর কথা মনে পড়ত। শুটিংয়ের পর ফলো থ্রু-র ভঙ্গিটা, আর সেই ডজটা। ডান দিকে হেলে, বাঁ দিকে ঝুঁকেই আবার ডান দিকে—একটুও স্পিড না কমিয়ে। পারিস এখনো ?"
"না। আমার বয়স হয়ে গেছে পল্টুদা।"
"না হয়নি। চেষ্টা করলেই পারবি। করবি ?"
কমল বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল পল্টুদার মুখের দিকে, শীর্ণ মুখে দুটি চোখ কোটরে ঢুকে গেছে। কিন্তু কি অদ্ভুত জ্বলজ্বল করছে। প্রায় কুড়ি বছর আগে অমন করে তাকাতেন।
"তুই আমার কাছ থেকে যা শিক্ষা পেয়েছিস সেটা দেখাবি ?" পল্টুদার সেই হুকুমের গলা নয়, মিনতি।
কমলের হাত অদৃশ্য সুতোর টানে পুতুলের মত মাথায় উঠে গেল। চুলগুলো ফাঁক করে মাথা হেঁট করল পল্টুদাকে দেখাবার জন্য। তারপর আস্তে আস্তে মাথাটা হেলিয়ে অস্ফুটে বলল, "হ্যাঁ করব।" তার চোখে পড়ল খাটের নীচে একটা রবারের বল, সম্ভবত পিন্টুর। কমল বলটা পা দিয়ে টেনে আনল। চেটোর তলা দিয়ে বলটাকে ডাইনে বাঁয়ে খেলালো। তাই দেখে পিন্টু খাট থেকে নেমে গুটি গুটি কমলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ কচি পা-টা বাড়িয়ে দিল। বলটা ছিটকে দেয়ালে গিয়ে লাগল। ঘরে একমাত্র পিন্টু ছাড়া আর কেউ হেসে উঠল না।
ছিলে টানা ধনুকের মত কমল কুঁজো হয়ে গেল নিজের অজান্তেই। সামনে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বল কেড়ে নিতে অপেক্ষা করছে। কমল একদৃষ্টে পিন্টুর দিকে তাকিয়ে বলটাকে চেটো দিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পিছনে গড়িয়ে গড়িয়ে সারা ঘরটা ঘুরতে লাগল, পিন্টু এলোপাথাড়ি লাথি ছুঁড়ছে, বলে পা লাগাতে পারছে না। কমল হঠাৎ একটা পাক দিয়ে পিন্টুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোমর থেকে শরীরের উপরটা ডাইনে ঝাঁকিয়ে, বাঁয়ে হেলেই সিধে হয়ে গেল। পিন্টু ব্যালান্স হারিয়ে মেঝেয় পড়ে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে সকলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর লাফ দিয়ে উঠে অরুণাকে জড়িয়ে ধরল লজ্জা লুকোবার জন্য।
কমলের কোন খেয়াল নেই। আপন মনে সে বলটাকে নিয়ে দুলে দুলে সারা ঘর ঘুরছে। কাল্পনিক প্রতিপক্ষকে একের পর এক কাটাচ্ছে। বলটাকে পায়ের পাতার উপর তুলে নাচাতে নাচাতে উরুর উপর, সেখান থেকে কপালে। আবার উরু, আবার পাতায়—কমলের সর্বাঙ্গে বল খেলা করছে। পল্টুদা নির্নিমেষে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। মুখ হাসিতে ভরে রয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে চোখ বুঁজলেন।
কিছুক্ষণ পর মৃদুস্বরে অরুণা বলল, "কমলদা বাবা বোধহয় মারা গেলেন।"

কমলের কোন খেয়াল নেই।
আপনমনে সে বলটাকে নিয়ে—

চার

সকাল নটায় অফিসে বেরিয়ে পরদিন রাত নটায়, ছত্রিশ ঘণ্টা পর কমল বাড়ি ফিরল। চোখ দুটি লাল, চুল এলোমেলো, ক্লান্তিতে নুয়ে পড়েছে সটান শরীরটা।

একতলায় দুটি ঘর নিয়ে কমল থাকে। একটিতে সে, অপরটিতে অমিতাভ। দুটি লোকের এই সংসারের যাবতীয় কাজ ও রান্না করে দিয়ে কালোর মা রাতে চলে যায়। দশবছর আগে শিখা বিষ খেয়ে মারা যাবার পরই সাত বছরের অমিতাভকে তার দিদিমা গোহাটিতে নিয়ে চলে যান। দুবছর আগে সে বাবার কাছে ফিরেছে। প্রথমে দুজনের সম্পর্কটা ছিল স্কুলে ভর্তি হওয়া নতুন দুটি ছেলের মত।

দু বছরেও কিন্তু ওদের মধ্যে ভাব হয়নি। ওরা কথা কমই বলে, দুজনে দুজনকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলে। কেউ কারুর ঘরে পর্যন্ত ঢোকে না। তবে একবার রেজেস্ট্রি চিঠি সই করে নেবার জন্য অমিতাভের ঘরে কমল ঢুকেছিল কলমের খোঁজে। একটা খাতার মধ্যে কলম পায়। তখন দেখেছিল খাতাটা কবিতায় অর্ধেক ভরা আর টেবিলের উপর থাক দিয়ে রাখা বইয়ের ফাঁকে অমিতাভের মায়ের ফোটো। ছবিটা কমলের ঘরে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে ছিল। কমল দুঃখ পেয়েছিল। অমিতাভ তার মা'র ছবিটা চুরি না করে যদি চেয়ে নিত তাহলে সে খুশিই হতো। মেধাবী গম্ভীর মৃদুভাষী ছেলেকে কমল

ভালোবাসে। শুধু অস্বস্তি বোধ করে তার দুর্বল পাতলা শরীর ও পুরু লেন্সের চশমাটার দিকে তাকালেই। অমিতাভ তার বাবাকে 'আপনি' বলে। কমলের ইচ্ছে ও 'তুমি' বলুক।

অমিতাভের ঘরে দুটি ছেলে বসে কথা বলছে। কমল একবার সেদিকে তাকিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল। ইজিচেয়ারটা পাতাই ছিল, তাতে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করল। একে একে তার মনে ভেসে উঠতে লাগল গত চব্বিশ ঘণ্টার ব্যাপারগুলো। কান্না, ছোটাছুটি, টেলিফোন করা, শ্মশান যাওয়া, আবার পল্টুদার নাকতলার বাড়ি। পল্টুদার জামাইরা এসেছিল, তাদের আর্থিক সঙ্গতিও ভাল নয়। একশোটা টাকা খুবই কাজে লেগেছে।

পায়ের শব্দে কমল চোখ খুলল। অমিতাভ, তার পিছনে ছেলে দুটি।

"এরা আমার কলেজের বন্ধু, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে।" অমিতাভর বিব্রত স্বর কমলের কানে বিশ্রী লাগল। ক্লান্ত ভঙ্গিতে সে বলল, "আজ থাক, অন্য আর একদিন এসো। আজ আমার শরীর মন দুটোই খারাপ।"

কথা না বলে ওরা চলে গেল। কমল আবার চোখ বন্ধ করল এবং মিনিট দশেকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

প্রতিদিনের মত ঠিক পাঁচটায় ওর ঘুম ভাঙল। ঘরের আলোটা নেভান হয়নি, জামা-প্যান্টও বদলান হয়নি। কমল তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে হীটারে চায়ের জল বসিয়ে প্রতিদিনের মত অমিতাভের ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে দালানের খাওয়ার টেবিলে এসে অপেক্ষা করতে লাগল। অমিতাভ এসে যখন চেয়ার টেনে বসল তখন চা তৈরী হয়ে গেছে।

"পরশু আমার গুরু মারা গেলেন, তাই বাড়ি ফেরা হয়নি।"

অমিতাভ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল, "কে?"

"পল্টু মুখারজি।" কমল আর কিছু না বলে অমিতাভের একমনে রুটিতে জেলি মাখানো দেখতে লাগল।

"তুমি অবশ্য ওঁর নাম নিশ্চয় শোনোনি।"

"না। খেলার আমি কিছুই জানিনা।"

"পল্টুদা হচ্ছেন," কমল উৎসাহ দেখিয়ে বলে উঠল, "সাহিত্যে যেমন ধরো......"

অমিতাভের পুরু লেন্সের ওধারে চোখ দুটোকে কৌতুক-ভরে তাকিয়ে থাকতে দেখে কমল ঘাবড়ে গেল।

"যেমন রবীন্দ্রনাথ?"

"না না, অতবড় নয়!" কমল অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। এবং অবস্থাটা কাটিয়ে ওঠার জন্য মরিয়া হয়ে বলল, "কিন্তু আমার জীবনে উনি রবীন্দ্রনাথের মতই।"

"তাহলে আপনি খুবই আঘাত পেয়েছেন।"

কমল চুপ করে রইল।

"মা মারা যেতে আঘাত পেয়েছিলেন কি?"

কমল তীব্র দৃষ্টিতে অমিতাভের দিকে তাকাল। সে মাথা নামিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিল।

"তোমার মা মানিয়ে নিতে পারে নি আমার জীবনকে, আকাঙ্ক্ষাকে। একজন ফুটবলারের স্ত্রী হতে গেলে তাকে অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়, সহ্য করতে হয়। তা করার মত মনের জোর তার ছিল না। ট্রেনিং ক্যাম্পে গিয়ে থেকেছি, টুর্নামেন্ট খেলতে বাইরে গেছি—এ সব সে পছন্দ করত না। তাই নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া হত। ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যাত্রীর সঙ্গে রোভার্সে খেলতে যাই। তখনি ঘটনাটা ঘটে।"

"মাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর আপনাকে টেলিগ্রাম

করা হয়েছিল। কিন্তু আপনি আসেন নি।" অমিতাভ কঠিন ঠান্ডা গলায় অভিযুক্ত করল কমলকে। 'আসেননি'-র পর নিঃশব্দে একটি 'কেন' আপনা থেকেই ধ্বনিত হল কমলের কানে। সঙ্গে সঙ্গে রাগে পুড়ে গেল তার মুখের কোমল বিষাদটুকু।

"আগেও বলেছি তোমায়, সেই টেলিগ্রাম আমাদের ম্যানেজার গুলোদার হাতে পড়ে। সেটাকে তিনি চেপে রাখেন, কেননা পরদিনই ছিল হায়দ্রাবাদ পুলিশের সঙ্গে সেমি-ফাইনাল খেলা। আমাকে বাদ দিয়ে যাত্রীর পক্ষে খেলতে নামা সম্ভব ছিল না।" কথাগুলো বলতে বলতে কমল তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল অমিতাভের দিকে।

বাঁকানো ঠোঁটের কোলে মোটাদাগে আগের মতই অবিশ্বাস ফুটে রয়েছে। আজও ওকে বোঝানো গেলনা টেলিগ্রামটা পেলে সে অবশ্যই খেলা ফেলে বোম্বাই থেকে ছুটে আসত।

কমল খাওয়ার টেবিল থেকে উঠে পড়ল। ঘরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়িতে হাত বোলাল। বেশ বড় হয়েছে। কিন্তু অফিসে যেতে ইচ্ছে করছে না। দাড়ি না কামালেও চলে। গালে কয়েকটা পাকা চুল। কমল কাঁচি দিয়ে সেগুলো সাবধানে কাটতে বসল।

সদর দরজা খোলার শব্দ হল। কালোর মা বোধহয় কিংবা খবরের কাগজওলা। কমল কাঁচি রেখে প্যান্টের পকেট থেকে টাকা বার করতে লাগল। বাজার করে কালোর মা। টাকা পেতে দেরী করলে গজগজ শুরু করে।

"কমল দা।"

সলিল ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে।

"কি রে, এত সকালে?"

"মাঠ থেকে আসছি। প্র্যাকটিশ করতে গেছলুম।"

"তোর না পায়ে চোট!"

"ডাক্তারবাবু বললেন কিছু নয়, রেস্ট নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।" সলিল খাটের উপর বসল। কমলের মনে হল ও যেন অন্য কিছু বলতে এসেছে।

"পল্টুদা মারা গেলেন?"

"হুঁ। তিয়াত্তর বছর বয়স হয়েছিল।" কমল দাড়ি কাটতে কাটতে আয়নার মধ্যে দিয়ে সলিলকে লক্ষ্য করতে লাগল।

"কিছু বলবি আমায়?"

সলিল মাথা নিচু করে পায়ের বুড়ো আঙুলটা মেঝেয় কিছুক্ষণ ঘষাঘষি করে ধরা গলায় বলল, "কমলদা, দুদিন আমাদের কিছু খাওয়া হয় নি। আমাদের সংসারে আটটা লোক।"

কমল ভেবে পেলনা এখন সে কি বলবে। এ রকম কথা প্রায়ই সে শোনে ময়দানে। প্রথম প্রথম একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের মধ্যে কেঁপে উঠত, এখন শুধু তার চোয়ালটা শক্ত হয়ে যায়।

"একটা কার্ডবোর্ড কারখানায় কাজ পেয়েছি, হপ্তায় আঠারো টাকা। আজ থেকেই কাজে লাগতে হবে।"

"ফুটবল?"

সলিল আবার মাথা নামিয়ে চুপ করে রইল। কমল দেখল টসটস করে ওর চোখ বেয়ে জল পড়ছে। তারপর নিঃসাড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওকে ডাকবে ভেবেও কমল ডাকল না।

জীবনে প্রথম বড় সংকটের মুখোমুখি হয়েছে ছেলেটা। এখন ওর মধ্যে লড়াই শুরু হয়েছে ফুটবলের সঙ্গে সংসারের। আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মায়া-মমতা-ভালবাসার। যদি ফুটবলকে ভালবাসে, বড় খেলোয়াড় হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যদি থাকে তাহলে ওকে নিষ্ঠুর হতে হবে। সংসারের সুখ-দুঃখ থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। বাঙালীরা বড় কোমল। বেশির ভাগ ছেলেরাই তা পারে না। সংসারের সর্বগ্রাসী হাঁ-এর মধ্যে ঢুকে যায়। ও নিজেই সিদ্ধান্ত নিক। দু-চার টাকা দিয়ে করুণা করে ওকে ফুটবলার হয়ে ওঠার সাহায্য করা যাবে না।

কমলের নিজের কথা মনে পড়ে গেল। মা মারা যাবার পর সংসার দেখাশুনোর জন্য জোর করে বাবা তার বিয়ে দেয়। তখন বয়স মাত্র কুড়ি। তারপর অদ্ভুত একটা লড়াই তাকে করে যেতে হয় অমিতাভের মায়ের সঙ্গে। কিন্তু ছেলে সে সব কথা বুঝবে না। ওর বন্ধুরা আগ্রহ নিয়ে আলাপ করতে আসে অথচ অমিতাভ তার বাবার খেলা সম্পর্কে উদাসীন। একদিনও বলেনি, টিকিট দেবেন, খেলা দেখতে যাব? কমলের বহু দিনের সাধ ছেলে তার খেলা দেখতে আসুক।

"বাবা, দর্জির দোকান থেকে আজ প্যান্টটা আনার তারিখ।"

"আজকেই," কমল ব্যস্ত হয়ে চাবি নিয়ে দেরাজের দিকে এগোল। "কতটাকা?"

"কুড়ি।"

টাকাটা অমিতাভের হাতে দেবার সময় কমলের মুহূর্তের জন্য মনে পড়ল, সলিল হপ্তায় আঠারো টাকা মাইনের একটা চাকরি নিচ্ছে। অমিতাভ আর সলিল প্রায় একই বয়সী।

বিকেলে কমল শোভাবাজার টেন্টে এল। পল্টু মুখারজির মারা যাবার খবর সবাই জেনে গেছে। কমলকে অনেকের কৌতূহলী প্রশ্নের জবাব দিতে হল। শোভাবাজারের কোচ সরোজ বলল, "কমলদা কাল রাজস্থানের সঙ্গে খেলা। একবার তো বসতে হয় টিমটা করার জন্য।"

"বসার আর কি আছে! আগের ম্যাচে যারা খেলেছে তাদেরই খেলাও। শুরুতেই বেশি নাড়াচাড়া করার দরকার কি?"

"সলিল বলছে খেলবে। কিন্তু আমি মনে করি না ও ফিট। সকালে প্র্যাকটিসে দেখলাম দুটো ফিফটি মিটার স্প্রিন্ট করার পর লিম্প্ করছে। লাফ দেওয়ালাম, পারছে না।"

"অন্তত দু-সপ্তাহ রেস্ট দাও।"

"কিন্তু রাইট স্টপারে খেলবে কে? প্লেয়ার কোথায়? সত্য বা শম্ভু জানেনই তো কেমন খেলে। স্বপনকে হাফ থেকে নামিয়ে আনতে পারি কিন্তু ফরোয়ারড লাইনকে ফিড করাবে কে? রুদ্রকে দিয়ে আর যাই হোক বল ডিসট্রিবিউশনের কাজ চলে না।"

"তাহলে?" কমল চিন্তিত হয়ে সরোজের মুখের দিকে তাকাল এবং ম্লান হেসে বলল, "অগত্যা আমি?"

সরোজ মাথা হেলাল।

"কিন্তু এ সিজনে দু-তিনদিন মাত্র বলে পা দিয়েছি। ভালোমত ট্রেনিং করিনি।"

"তাতে কিছু এসে যায় না।" সরোজ উৎসাহভরে বলল। "এক্সপিরিয়েনসের কাছে সব বাধা ভেসে যাবে। আমার ডিফেনসে সব থেকে বড় অভাব অভিজ্ঞতার। মোহনবাগানের দিন দেখেছেন তো চারটে ব্যাক একলাইনে দাঁড়িয়ে, এক একটা থ্রু পাশে চারজনই কেটে যাচ্ছে। ওরা প্রচন্ড পেসে খেলা শুরু করল আর এরাও তার সঙ্গে তাল দিয়ে মাঠময় ছোটাছুটি করে আধ ঘণ্টাতেই বে-দম হয়ে গেল। গেমটাকে যে স্লো ডাউন করবে, বল হোল্ড করে করে খেলবে—কেউ তা জানে না।"

"জানবে, খেলতে খেলতেই জানবে। আচ্ছা, আমি কাল খেলব। কাল সকালে ছেলেদের আসতে বলে দিও মাঠে। একটু প্র্যাকটিস করব।"

"খেলার দিনে?"

"সামান্য। দু-চারটে মুভ প্র্যাকটিস করাব। ভয় নেই তোমার প্লেয়ারদের এক ঘণ্টার বেশি মাঠে রাখব না।"

সরোজের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কমল বুঝল ব্যাপারটা

ও পছন্দ করছে না। কোচের আত্মমর্যাদায় লেগেছে। কমল সুর বদল করে মৃদু এবং বন্ধুর মত বলল, "আমাদের মত ছোট ক্লাব, সংগতি কিছুই নেই, প্লেয়াররা অত্যন্ত কাঁচা, অমার্জিত, সিজনের শেষ দিকে ম্যাচ গট আপ করে ফাস্ট ডিভিশনে টিঁকে থাকতে হয়—এদের নিয়ে আর্টিস্টিক ফুটবল খেলতে গেলে পরিণাম কি হবে তা কি ভেবেছ? এই বছর প্রথম গড়ের মাঠে কোচিং করছ, তুমি কি চাও এটাই তোমার শেষ বছর হোক?"

সরোজের মুখ ক্ষণিকের জন্য পান্ডুর হয়েই কঠিন হয়ে উঠল। "আমি ফুটবল খেলাতে চাই, কমলদা। ফুটবল খেলে শোভাবাজার নেমে যাক্ আমার দুঃখ নেই, আমিও যদি সেই সঙ্গে ডুবে যাই আফশোষ করব না। কিন্তু শুরুতেই আত্মসমর্পণ করব না।"

"তোমার এই মনোভাব শোভাবাজারের অফিসিয়ালরা জানে? কেষ্টদা জানে?"

"জানলে এই মুহূর্তে ক্লাবে ঢোকা বন্ধ করে দেবে।" সরোজ হাসিটা লুকোল না।

হঠাৎ সরোজকে ভাল লেগে গেল কমলের। সেও হেসে ফেলল।

"সরোজ তোমায় বলাই বাহুল্য তবু দু-চারটে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। তোমার থেকে বোধ হয় আমি বেশি খেলেছি, বড় বড় ম্যাচের অভিজ্ঞতাও বেশি। সেই সূত্রে, বরং বলা ভালো আলোচনা করতে চাই।"

"কমলদা এ সব বলছেন কেন, আপনার সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না। আপনার কাছে আমার অনেক কিছু শেখার আছে।" সরোজ বিনীতভাবে বলল।

"তুমি যেভাবে খেলাতে চাও, সেইভাবে খেলার মত প্লেয়ার আমাদের আছে কি?"

"নেই।" সরোজ চটপট জবাব দিল।

"তাহলে আমরা একটার পর একটা ম্যাচ হারবো। শেষে পয়েন্ট ম্যানেজ করার নোংরা ব্যাপারে ক্লাব জড়াবেই অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। লাভ নেই সরোজ আর্টিস্টিক ফুটবলে। যতদিন না উপযুক্ত ছেলেদের পাচ্ছ ততদিন তোমার চিন্তা শিকেয় তুলে রাখ। আগে ক্লাবকে বাঁচাও তারপর খেলা। আগে ছেলে জোগাড় করো, তাদের তৈরী করো। আগে ডিফেন্ড করো তারপর কাউন্টার অ্যাটাক। সর্বক্ষেত্রে এইটাই সেরা পদ্ধতি, জীবনের ক্ষেত্রেও।"

"তার মানে যেমন চলছে চলুক।"

"হ্যাঁ, তবু এর মধ্যেই ডিফেন্সটাকে আরো শক্ত করে তোলার চেষ্টা করতে হবে। তোমার যা কিছু ট্যাকটিকস, সত্তর মিনিটের পুরো খেলাটা, সব কিছুর মূলেই জমি দখলের, স্পেস কভার করার চেষ্টা। ফাঁকা জমিতে বল পেলে বল কন্ট্রোল করার সময় পাওয়া যায়। স্পেসই হচ্ছে সময়। অপোনেন্টকে জমির সুবিধা না দেওয়া মানে সময় না দেওয়া। তাই এখন ম্যান টু ম্যান টাইট মার্কিং খেলা হয়। আমি তিন ব্যাকে খেলেছি, অনেক গলদ তখন ডিফেন্সে ছিল। চার ব্যাকে সেটা বন্ধ হয়েছে। আগে উইঙ্গাররা পঁচিশ গজ পর্যন্ত ছাড়া জমি পেত, চার ব্যাকে সেটা পাঁচ গজ পর্যন্ত কমিয়ে আনা যায়। কিন্তু চার ব্যাকেও লক্ষ্য করেছ, শোভাবাজার সামলাতে পারে না।"

"আপনি কি পাঁচ ব্যাকে খেলাতে চান!"

"প্রায় তাই। চার ব্যাকের পিছনে একজন ফ্রি ব্যাক রেখে খেলে দেখলে কেমন হয়। ফরোয়ারড থেকে একজনকে হাফে আনা যায়, দুজনকেও আনা যায়। ফরমেশানটা ১—৪—৩—২ হবে।"

"আপনি কাতানাচ্চিও ডিফেন্স চাইছেন অর্থাৎ ফুটবলকে খুন করতে চাইছেন?"

সরোজ হঠাৎ গোঁয়ারের মত রেগে উঠল। কমল এই রকম একটা কিছু হবে আশা করেছিল। সে বলল, "মোহনবাগানের কাছে আমরা পাঁচ গোল খেয়ে দুটো পয়েন্ট হারাতুম না এই ফরমেশনে খেললে। একটা পয়েন্ট পেতুমই। সেটা কি মন্দ ব্যাপার হত? তুমি মিড ফিলড খেলার ওপর বড় বেশি জোর দাও কিন্তু এখন ওটার আর কোন গুরুত্বই নেই। এখন লড়াই পেনালটি এরিয়ার মাথায়—অ্যাটাকিং অ্যাঙ্গেলকে সরু করে গোলে শট নেওয়ার পথ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। তুমি এটা বুঝছ না কেন, গোল করাই হচ্ছে খেলার একমাত্র উদ্দেশ্য, খেলা জেতা যায় গোল করেই। শোভাবাজারের ক্ষমতা নেই গোল দেওয়ার কিন্তু গোল খাওয়া তো বন্ধ করতে পারে।"

"কমলদা আপনার আর আমার চিন্তাধারা এক খাতে বোধহয় বইছে না। শোভাবাজার টিম যতদিন আমার হাতে থাকবে, আমি আমার চিন্তা অনুসারেই খেলাতে চাই।"

সরোজ কঠিন এবং দৃঢ়স্বরে যেভাবে কথাগুলি বলল তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না, আর তর্ক করতে সে রাজী নয়। কমল মুখটা ঘুরিয়ে আলতো স্বরে বলল, "বেশ।"

"কাল তাহলে খেলছেন?"

কমল মাথা হেলিয়ে হাসল।

পাঁচ

দুদিন কামাই করে কমল অফিসে এল। রণেন দাসকে চেয়ারে দেখতে পেল না। খাটো চেহারার ঘোষদা অর্থাৎ বিপুল ঘোষকে অবশ্য প্রতিদিনের মত কাঁটায়-কাঁটায় দশটায় চেয়ারে বসে কাগজে লাল কালিতে 'শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়' লিখতে দেখা যাচ্ছে। প্রায় সাড়ে চারশো লোকের বিরাট পাঁচতলা অফিস বাড়িটা হট্টগোলে মুখর। সাড়ে দশটার আগে কেউ কলম ধরে না। কমলদের ডেসপ্যাচ বিভাগে তারা মাত্র তিনজন।

বিপুল তার নিত্যকর্ম সেরে কমলকে বলল, "দুদিন আসেননি, অসুখ বিসুখ করেছিল?"

"এক আত্মীয় মারা গেলেন তাতেই ব্যস্ত ছিলাম। ঘোষদা, আপনার কাছে লীভ অ্যাপ্লিকেশন ফরম আছে?"

বিপুল ড্রয়ার থেকে ছুটির দরখাস্তের ফরম বার করে দিল। কমল তাতে যা লেখার লিখে সেটা নিয়ে নিজেই গেল চারতলায় লীভ সেকশনে জমা দিতে। সেখানে অনুপম ঘোষালকে ঘিরে অল্পবয়সীরা জটলা করছে। অনুপম যুগের যাত্রীর উঠতি রাইট উইঙ্গার। রথীনই চাকুরি করে দিয়েছে। কাল অনুপম হ্যাট-ট্রিক করেছে কুমারটুলির বিরুদ্ধে।

"আর একটা গোল অনুপমের হোত না! সেকেন্ড হাফের শুরুতেই প্রসূন তিনজনকে কাটিয়ে যখন সেলফিশের মত একাই গোলটা করতে গেল, তখন অনুপম তো ফাঁকায় গোল থেকে পাঁচ হাত দূরে। প্রসূন ওকে বলটা যদি দিতো, তাহলে কি অনুপমের আর একটা গোল হোত না? কি অনুপম, হতো কি না?"

মৃদু হেসে অনুপম বলল, "ফুটবল খেলায় কিছুই বলা যায় না।"

"প্রসূনকে তুই দোষ দিচ্ছিস কেন? অনুপমকে বল দেবে কি, ওতো তখন ক্লিয়ার অফ সাইডে!"

"বাজে কথা, অনুপম, তুই তখন অফ সাইডে ছিলিস কি?"

অনুপম গম্ভীর হয়ে মুখটা পাশে ফিরিয়ে বলল, "লেফটব্যাক আর আমি এক লাইনেই ছিলুম।"

"তবে, তবে! আমি কতদিন বলেছি প্রসূনটা নামবার ওয়ান সেলফিশ। বল পেলে আর ছাড়েনা, একাই গোল দেবে। ওর জন্য যাত্রীর অনেক গোল কমেছে। বালি প্রতিভার দিন পাঁচটা গোল হলো বটে কিন্তু প্রসূন ঠিক্‌ঠিক্ যদি বল দিত অনুপমকে অন্তত আরো পাঁচটা গোল হতো। অনুপম হার্ডলি চারটে বলও প্রসূনের কাছ থেকে পেয়েছে কিনা সন্দেহ। কি অনুপম, ঠিক বলেছি কিনা?"

অনুপম উদাসীনের মত হেসে বলল, "যাকগে ওসব কথা।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ বাদ্ দে তো ফালতু কথা। প্রসূন বল দিলো কি না দিলো তাতে অনুপমের কিছু আসে যায় না। নেক্স্ট ম্যাচ ইস্টারন রেল। অনুপম, আগেই কিন্তু বলে রাখছি আমার ভাগ্নেটা ধরেছে খেলা দেখার জন্য।"

"সত্যদা, আজকাল ঢোকানো বড্ড শক্ত হয়ে পড়েছে। ডে-স্লিপ দেওয়ার ব্যাপারেও গোণাগুনতি।"

"ওসব কোন কথা শুনব না। তোমায় ব্যবস্থা করে দিতেই হবে।"

অনুপম সেকশনাল ইন-চারজ নির্মল দত্তর টেবিলের দিকে এগোবার উদ্যোগ করে বলল, "আচ্ছা দেখি।" দত্তর কাছে বসে কিছুক্ষণ গল্প করে অনুপম রোজই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে।

"অনুপম ইসট বেঙ্গলের দিন কিন্তু এই রকম খেলা চাই।"

অনুপম এগিয়ে যেতে যেতে হাসল মাত্র।

এবার ওদের চোখ পড়ল কমলের ওপর। দরখাস্তটা হাতে একটু দূরে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করছে।

"কি ব্যাপার কমলবাবু, ক্যাজুয়াল? এই টেবিলে রেখে যান।"

কমল রেখে দিয়ে চলে যাচ্ছিল, একজন ডেকে বলল, "আচ্ছা আপনার কি মনে হয় অনুপমের খেলা সম্পর্কে? দারুণ খেলে তাই নয়?"

"হ্যাঁ, দারুণ খেলে।"

"আপনি ওর এ বছরের সব কটা খেলাই দেখেছেন?"

"একটাও না।"

"তাহলে যে বললেন দারুণ খেলে!"

"আপনারা বলছেন তাই আমিও বললাম।"

"না না ঠাট্টা নয়, সত্যি বলুন, ছেলেটার মধ্যে পার্টস আছে কি না। আপনার চোখ আর আমাদের চোখ তো এক নয়।"

কমল কয়েক মুহূর্ত ভাবল। তারপর কঠিনস্বরে বলল, "শুধু খেলা দেখেই প্লেয়ার বিচার করবেন না। খেলা সম্পর্কে তার অ্যাটিটিউড, চিন্তা, সাধনা কেমন সেটাও দেখবেন। হয়তো ভাল খেলে। কিন্তু গোল থেকে পাঁচ হাত দূরে ফাঁকায় যে দাঁড়িয়ে, সে যদি বলে গোল করতে পারতুম কিনা কিছুই বলা যায় না, তাহলে আমি তাকে প্লেয়ার বলে মনে করব না।"

"পৃথিবীর বহু বড় প্লেয়ার একহাত দূর থেকেও তো গোল মিস করেছে।"

"করেছে কিনা জানি না, কিন্তু তারা কখনোই বলবে না পাঁচ হাত দূরের থেকে গোল করতে পারব কিনা—এই 'কিনা' অর্থাৎ অনিশ্চয়তা, নিজের উপর অনাস্থা, কখনোই তাদের মুখ থেকে বেরোবে না। দুইকে দুই দিয়ে গুণ দিতে বললে, আপনার কি সন্দেহ থাকতে পারে উত্তরটা চারের বদলে আর কিছু হবে?"

ঝোঁকের মাথায় কথাগুলো বলে কমল লক্ষ্য করল শ্রোতাদের মুখে অসুখী ছায়া পড়েছে।

"আপনার কথাগুলো একদিক দিয়ে ঠিক, তবে কি জানেন, যোগ বিয়োগটা শিশুকাল থেকে করে করে শ্বাসপ্রশ্বাসের মত হয়ে যায়, আজীবন দুই দুগুণে চারই বলব। কিন্তু ফুটবল খেলাটাতো তা নয়, একটা বয়সে রপ্ত করে একটা বয়সে ছেড়ে দিতেই হয়। যতবড় প্লেয়ারই হোক একইভাবে সে খেলতে পারে না চিরকাল। আপনি যেভাবে একদিন চুনী কি প্রদীপ কি বলরামকে রুখতেন, পারবেন কি আজ সেইভাবে অনুপমকে আটকাতে?"

বক্তার বলার ভঙ্গিতে তেরছা বিদ্রূপ ছিল। কমলের রগ দুটো দপদপ করে উঠল। পিছন দিক থেকে কে মন্তব্য করল, "নখদন্তহীন বৃদ্ধ সিংহ!"

পেছন থেকে কে মন্তব্য করল, 'নখদন্তহীন বৃদ্ধ সিংহ!'

কমলের ইচ্ছে হল ঘুরে একবার দেখে কথাটা কে বলল। কিন্তু বহু কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে বলল, "শিক্ষায় যদি ফাঁকি না থাকে তাহলে যে স্কিল মানুষ পরিশ্রম করে অর্জন করে তা কখনো সে হারায় না, বয়স বাড়লেও।"

"তার মানে আপনি আগের মতই এখনো খেলতে পারেন?"

"না। কিন্তু অনুপমদের আটকাবার মত খেলা বোধহয় এখনো খেলতে পারি।"

প্রত্যেকের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠে তারপর সেটি অবিশ্বাস্যতা থেকে মজা পাওয়ায় রূপান্তরিত হল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে। কমলের মনে হল সে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

"বুড়োবয়সে ল্যাজে-গোবরে করে ছেড়ে দেবে।"

দাঁতে দাঁত চেপে কমল বলল, "যাত্রীর সঙ্গে লীগে শোভাবাজারের তো দেখা হবেই, তখন দেখা যাবেখন।"

কমল যখন চারতলার হলঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে, শুনতে পেল কে চেঁচিয়ে বলছে, "ওরে চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেল। অনুপমকে জানিয়ে দিতে হবে।"

কমল নিজের সেকশনে আসামাত্রই রণেন দাস তাকে ডাকল, "এই যে, ছিলেন কোথায় এই দুদিন? ডুব মারবেন তো

আগেভাগে বলে যেতে পারেন না? লোক তো তিনজন অথচ কাজ থাকে বারোজনের। তার মধ্যে একজন কামাই করলে কি অবস্থাটা হয়? এর উপর তিনটে বাজতে না বাজতেই তো প্লেয়ার হয়ে যাবেন।"

যে বিশ্রী মেজাজ নিয়ে কমল চারতলা থেকে নেমে এসেছে সেটা এখনো অটুট। তিক্তস্বরে সে বলল, "দরকার হয়েছিল বলেই ছুটি নিয়েছি। ছুটি নেবার অধিকারও আমার আছে।"

"অ। অধিকার আছে? রোজ তিনটের সময় বেরিয়ে যাওয়াটাও বুঝি অধিকারের মধ্যে!"

কমল জবাব দিল না। রণেন দাসকে সে একদমই পছন্দ করে না। লোকটা অর্ধেক সময় সীটে থাকে না। ক্যান্টিন অথবা ইউনিয়ন অফিস ঘরে কিংবা চারতলা বা পাঁচতলায় গিয়ে পরচর্চায় সময় কাটায়, চুকলি কাটে আর ওভারটাইম রোজগারের তালে থাকে। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছে, তিরিশ বছর প্রায় চাকরি করছে, এগারোশো টাকা মাইনে পায় কিন্তু সিগারেটটা পর্যন্ত চেয়ে খায়। রণেন দাশ ডেসপ্যাচের কর্তা।

দুপুর দুটো নাগাদ গেমস সেক্রেটারি নতু সাহা খাতা হাতে কমলের কাছে হাজির হল।

"কাল আপনাকে খুঁজে গেছি, আপনি আসেন নি। আজ খেলা আছে বেঙ্গল টিউবের সঙ্গে ভবানীপুর মাঠে।" বলতে বলতে নতু সাহা খাতাটা খুলে এগিয়ে দিল। খাতায় টিমের খেলোয়াড়দের নাম লেখা। কমলের নামটি দুজনের পরেই। সকলেরই সই আছে নামের পাশে।

প্রথমেই কমলের মনে পড়ল আজ শোভাবাজারের খেলা আছে, তাকে খেলতেই হবে। কিন্তু সেকথা বললে নতু সাহা রেহাই দেবে না। রথীনের কথাগুলো মনে পড়ল, 'অফিসের দুটো খেলায় তুই খেলিসনি......এই নিয়ে কথা উঠেছে...... তোকে চাকরি দেওয়ায় ইউনিয়ন থেকে পর্যন্ত অপোজিশন এসেছিল......তোর জন্য এ-জি এম পর্যন্ত ধরাধরি করেছি।"

কমল খাতায় নিজের নামটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ভাবল, কি করি এখন। শোভাবাজারে আজ তাকে দরকার। সেখানকার টিমেও তার নাম আছে। ওই খেলারই গুরুত্বটা বেশি কিন্তু এই খেলাটা চাকরির জন্য। অবশ্য খেলব না বলে দেওয়া যায় নতু সাহাকে। তাহলে তিনটে-চারটের সময় অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুবিধেটা চিরকালের মত বন্ধ হয়ে যাবে।

"কি হল, সইটা করে দিন। একটু পরেই তো বেরোতে হবে।" অধৈর্য হয়ে নতু সাহা বলল।

"আমাকে আজ বাদ দেওয়া যায় না কি?"

"না না, আমাদের ডিফেনসে আজ কেউ নেই। ফরোয়ারডে শুধু অনুপম। গোবিন্দ তো এক হপ্তার ছুটিতে গেছে, জহরের পায়ে চোট্, আজ তো টিমই হচ্ছিল না।"

কমল আর কথা না বলে নিজের নামের পাশে সই করে দিল। সেই মুহূর্তে একবার সরোজের মুখটা সে দেখতে পেল—অসহায় এবং রাগে থমথমে।

প্রগ্রেসিভ ব্যাঙ্কের ভ্যান ওদের চারটের সময় মাঠে পৌঁছে দিল। কমল লক্ষ্য করে ভ্যানের এককোণে অনুপম বসে মাঝে মাঝে তার দিকে তাকাচ্ছিল, তাইতে ওর মনে হয়, নিশ্চয় কথাটা কানে গেছে। কমল অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে। ড্রেস করে মাঠে নামতে গিয়ে সে দেখল অনুপম ড্রেস করেনি। নতু সাহাকে কমল জিজ্ঞাসা করল, "অনুপম নামবে না?"

"বলছে দরকার হলে নামব। বড় প্লেয়ার, বুঝলে না।" তির্যকস্বরে নতু সাহা বিরক্তি চাপতে চাপতে বলল, "কিছু বলাও যাবে না, সারা অফিস জুড়ে অমনি ভক্তরা হৈ হৈ করে উঠবে।"

কমল হাসল। তার মনে পড়ল, এমন মেজাজ একদিন সে-ও দেখিয়েছে।

হাফ টাইমে প্রগ্রেসিভ ব্যাঙ্ক তিন গোলে হারছে। বেঙ্গল মেটাল চারবার মাত্র বল এনেছিল আর তাতেই তিনটি গোল! একমাত্র রাইট আউট আর সেন্টার ফরোয়ার্ডটিই যা কিছু খেলছে এবং তাদের গোলের দিকে এগোনোর পথ কমল অনায়াসেই বন্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু তা সে করল না ইচ্ছা করেই। দুবার সে ট্যাকল করতে গিয়ে কাঁচা খেলোয়াড়ের মত হুমড়ি খেয়ে পড়ল, আর একবার হেড করতে উঠল দু সেকেন্ড দেরী করে। তাতেই গোল তিনটি হয়ে যায়।

হাফ টাইমে মাঠ থেকে বেরিয়ে এসেই কমলের চোখে পড়ল অনুপম ড্রেস করে তার জনাচারেক ভক্তর সঙ্গে কথা বলছে। কমল মনে মনে হাসল। নতু সাহা বিরক্ত উত্তেজিত হয়ে ছুটে এসে কমলকে বলল, "এভাবে গোল খাওয়ার মানে হয়? অ্যালেন লীগের প্লেয়ারও অমন করে চার্জ করে না আপনি যা করলেন।"

কমল কথা না বলে ঘাসের উপর বসে লিমনেডের একটা বোতল তুলে নিল।

"লোকে যে কেন আপনাকে বড় প্লেয়ার বলতো বুঝি না।"

মুখ থেকে বোতলটা নামিয়ে কমল হেসে নিচু গলায় বলল, "আর গোল হবে না। আপনারা যাকে বড় প্লেয়ার বলেন তাকে এবার গোল দিতে বলুন।"

"সেজন্য ভাবছি না। অনুপম খানপাঁচেক অনায়াসেই চাপিয়ে দেবে। কিন্তু দোহাই আর গোল খাওয়াবেন না।"

কমল খালি বোতলটা রেখে উঠে দাঁড়াল। একটু দূরে বেঙ্গল মেটালের খেলোয়াড়রা বসে জিরোচ্ছে। কমল লক্ষ্য করেছে ওদের লেফট হাফ বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা ছেলেটি এলোপাথাড়ি পা চালায়, পাস দিতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলে, বিন্দুমাত্র কন্ট্রোল নেই বলের উপর কিন্তু প্রচণ্ড দম আর বেপরোয়া গোয়ার্তুমিটা আছে। যার ফলে যেখানে বল সেখানেই ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত গুঁতোতে ছুটছে। বল ধরতে গিয়েও ওকে দেখে অনেকেই বল ছেড়ে সরে যাচ্ছে। কমল ওর কাছে গিয়ে বলল, "দারুণ খেলছো তো। প্রগ্রেসিভকে তো দেখছি তুমি একাই রুখে দিয়েছ।"

আনন্দে এবং লজ্জায় ছেলেটি মাথা চুলকোতে লাগল। কমল গুহর কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়া সাধারণ ব্যাপার নয়।

"তবে এবার তোমার কপালে দুঃখু আছে।"

সচকিত হয়ে ছেলেটি বলল, "কেন, কেন?"

"এবার অনুপম নামছে। ও বলেছে পাঁচখানা চাপাবো বেঙ্গল মেটাল আবার টিম নাকি?"

কমল লক্ষ্য করল ছেলেটির মুখ রাগে থমথমে হয়ে উঠল।

"দেখি তুমি কত ভাল প্লেয়ার এইবার বুঝব।" এই বলে কমল সরে এল।

খেলা আবার শুরু হয়ে বল মাঝমাঠেই রইল মিনিট পাঁচেক। অনুপম কোমরে হাত দিয়ে ডান টাচ্ লাইনের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বিরক্ত হয়ে ভিতরে ঢুকে এল বলের আশায়।

বল পেল অনুপম। কাটাল একজনকে, পরের লোকটাকেও। কমল দেখল মেটালের লেফট হাফ প্রায় চল্লিশ গজ থেকে ছুটে আসছে। সামনে তিন ডিফেণ্ডার। অনুপম বল থামিয়ে দেখছে কাকে দেওয়া যায়। চোখে পড়ল বুলডোজারের মত আসছে লেফট হাফ। অনুপম তাড়াতাড়ি বলটা নিজেদের সেন্টার ফরোয়ার্ডকে ঠেলে দিয়ে সরে দাঁড়াল। লেফট হাফ ব্রেক কষতে কষতে ১৫ গজ এগিয়ে গেল এবং তারপরই ঘুরে আবার বলের দিকে তাড়া করল।

অনুপমের দেওয়া বল সেন্টার ফরোয়ার্ড রাখতে পারে নি।

সবাই দেখল অনুপম বল ধরতে পারল না।

বল এল কমলের পায়ে। অবহেলায় সে ছোট্ট জায়গার মধ্যে পাঁচ-ছয়ব্যর কাটিয়ে নিতে নিতে দেখে নিল অনুপম ও তার প্রহরী লেফট হাফটি কোথায়। তারপর অনবদ্যভাবে ঠিক দুজনের মাঝ বরাবর বলটা ঠেলে দিল, যাতে ছুটে গিয়ে অনুপমকে পাসটা ধরতে হয়।

অনুপম ছুটে গিয়ে বলে পা দিতে যাবে, তখন আর একটি পা সেখানে পৌঁছে গেছে। টায়ার ফাটার মত চার্জের শব্দ হল। বলটা ছিটকে এল প্রগ্রেসিভের হাফ লাইনে। পরপর তিনবার কমল থ্রু দিল অনুপমকে অবশ্যই লেফট হাফের দিকে ঘেঁষে। সবাই দেখল অনুপম বল ধরতে পারল না বা ছুটেও থমকে পড়ল। রাইট উইং থেকে সে লেফট উইংয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে লেফট হাফও ডানদিকে চলে এল। মাঠের বাইরে মুখ টিপে অনেকে হাসল। কমল দেখল অনুপমের মুখে রাগ বিরক্তি হতাশা।

আবার অনুপমকে বল বাড়ালো কমল। মেটাল যেন জেনে গেছে সব বল অনুপমকেই দেওয়া হবে। তিনজন ওর উপর নজর রেখে ওর কাছাকাছি ঘুরছে। অনুপম বলটা ধরার জন্য এক হাতও এগোলো না। বরং দুহাত নেড়ে চীৎকার করতে করতে সে কমলের কাছে এসে বলল, "আমাকে কেন, আমাকে কেন। বল দেবার জন্য আর কি মাঠে লোক নেই?"

অবাক হয়ে কমল বলল, "সে কি, অফিসে শুনলুম কাল প্রসূন বল দেয়নি বলে তুমি তিনটের বেশি গোল পাওনি!"

অনুপম আর কথা বলেনি। মাঠের মধ্যে সে ছোটাছুটি শুরু করল লেফট হাফের পাহারা থেকে মুক্তি পাবার জন্য। তার তখন একমাত্র চিন্তা চোট্ যেন না লাগে। এরপরই কমল বল নিয়ে উঠল। এগোতে এগোতে মেটালের পেনাল্টি এরিয়ার কাছে পৌঁছে অনুপমকে বল দেবার জন্য তার দিকে ফিরে হঠাৎ ঘুরে গিয়ে একজনকে কাটিয়েই প্রায় ১৬গজ থেকে গোলে শট নিল। মেটালের কেউ ভাবতে পারেনি অনুপমকে বল না দিয়ে কমল নিজেই আচমকা গোলে মারবে। বল যখন ডান পোস্টের

গা ঘেঁষে গোলে ঢুকছে গোলকীপার তখনো অনুপমের দিকে তাকিয়ে বাঁ পোস্টের কাছে দাঁড়ানো।

তিন মিনিট পরে ঠিক একইভাবে কমল আবার গোল দিল। মেটাল এবার অনুপমকে ছেড়ে কমল সম্পর্কে সজাগ হয়ে পড়ল। খেলা শেষ হতে চার মিনিট বাকি, রেজাল্ট তখন ৩—২। প্রগ্রেসিভ হারছে। কমল বল নিয়ে আবার উঠতে শুরু করল। তিন জনকে কাটিয়ে সে বল দিল রাইট-ইনকে। সে আবার ফিরিয়ে দিল কমলকে। অনুপমের প্রহরী তেড়ে আসছে। কমল বলটা পায়ে রেখে অপেক্ষা করল এবং শেষ মুহূর্তে নিমেষে বল নিয়ে সরে দাঁড়াল। লেফট হাফ ফিরে দাঁড়িয়ে আবার তেড়ে এল। কমল আবার একইভাবে সরে গেল। তিনবার এই দৃশ্য ঘটতেই মেটালের দুজন খেলোয়াড় এগিয়ে এল। কমল ডান পায়ে বল মারার ভঙ্গি করে চেঁচিয়ে উঠল "অনুপম।"

অনুপম বাঁ দিক দিয়ে এগিয়ে গেল বলের আশায়। তার সঙ্গে গেল মেটালের তিনজন। কমল বাঁ পায়ে বলটা ঠেলে দিল দুজন ডিফেণ্ডারের মাঝ দিয়ে পেনাল্টি বক্সের মাঝখানে। আর রাইট-ইন যে বল সে একশোটার মধ্যে আটানব্বুইটা গোলের বাইরে মারবে, সেই বল গোলে পাঠিয়ে দিল।

খেলা শেষে নতু সাহা হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল কমলের দিকে। কমল থমকে দাঁড়িয়ে অনুপমকে বলল, "পাস কখন দেবে, কেন দেবে এবং দেবে না, সেটা প্রসূন জানে। বল পেয়ে খেলা যেমন, না পেয়েও তেমন একটা খেলা আছে। সেটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

অনুপমের কাঁধে একটা চাপড় দিয়ে কমল নতু সাহার হাতটা সরিয়ে টেন্টের দিকে এগিয়ে গেল।

বাড়ি ফেরার পথে সে ট্রামে শুনল শোভাবাজার তিন গোলে রাজস্থানের কাছে হেরেছে।

ছয়

পরদিন অফিসে পেঁছিন মাত্র কমল শুনল রথীন তাকে দেখা করতে বলেছে।

ওর চেম্বারে ঢুকতেই রথীন টেলিফোনে কথা বলতে বলতে ইশারায় কমলকে বসতে বলল।

"তারপর," রথীন টেলিফোন রেখে বলল, "কাল নাকি দারুণ খেলেছিস!"

"কে বলল!" কমল ভাবতে শুরু করল রথীনকে এর মধ্যেই কে খবর দিতে পারে।

"যেই বলুক না। তিন গোল খাইয়ে অনুপমকে মাঠে নামিয়েছিস, এমন থ্রু বাড়িয়েছিস যাতে না ও ধরতে পারে, তারপর গোল দিয়ে মান বাঁচিয়েছিস। সাবাস, অসাধারণ! একঢিলে তিন পাখি একেই বলে।"

কমল কথা না বলে ফিকে হাসল। রথীনের মুখ থমথম করছে।

"একজন সিনিয়ার প্লেয়ার জুনিয়ারকে মাঠের মাঝে অপদস্থ করবে ভাবা যায় না। আনস্পোরটিং।"

কমল শক্ খেয়ে সিধে হয়ে বসল। রাগটা কয়েকবার দপদপ করে উঠল চোখের চাউনিতে।

"ব্যাপারটা কি? অনুপম তোর ক্লাবের প্লেয়ার বলেই কি আমি আনস্পোরটিং?"

"আমার ক্লাব বলে কোন কথা নয়। একটা উঠতি প্রমিসিং ছেলে, তাকে হাস্যকর করে তুললে সাইকোলজিক্যালি তার একটা সেটব্যাক হয়। এ বছর যাত্রীর ফরোয়ার্ড লাইনে অনুপম অত্যন্ত ইম্পর্টান্ট রোল প্লে করছে। যাত্রী শিল্ড পেয়েছে কিন্তু লীগ পায়নি কখনো। আমার আমলে যাত্রীকে আমি লীগ এনে দেব। এ বছর নিখুঁত যন্ত্রের মত যাত্রী খেলছে। আমি চাইনা এর সামান্য একটা পার্টসও বিগড়ে যাক্। আমি তা হতে দেব না।"

রথীনের মুঠো করা হাতটার দিকে কমল তাকাল। হিংস্র আঘাতের জন্য মুঠোটা তৈরী। কমল নির্লিপ্তস্বরে বলল, "আমি কি এবার উঠতে পারি?"

কঠিন চোখে রথীন তাকাল। কমলও।

"আমার কথাটা আশা করি বুঝিয়ে দিতে পেরেছি।"

কমল ঘাড় নাড়ল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গি করে বলল, "একশো টাকাটা এখনো শোধ দিতে পারিনি, হাতে একদমই টাকা নেই। সামনের মাসে মাইনে পেলেই দিয়ে দেব।"

"না দিলেও চলবে। একশো টাকার জন্য যাত্রী মরে যাবে না।"

"কত টাকার জন্য তাহলে মরতে পারে?"

"মানে!"

"পাঁচ হাজার?"

রথীনের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। কমল সেটা লক্ষ্য করে বলল, "আমার মনে হয় না যুগের যাত্রী খুব একটা স্পোরটিং ক্লাব।"

"এখন তুমি যেতে পার।" রথীন দরজার দিকে আঙুল তুলল।

কমল নিজের চেয়ারে এসে বসা মাত্র বিপুল ঘোষ ফিস ফিস করে বলল, "কাল কি রকম খেলেছেন মশাই, অফিসের ছোকরারা খাপ্পা হয়ে গেছে। আপনি নাকি খুব বড় এক প্লেয়ারকে খেলতে না দিয়ে একাই খেলেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কত বড় প্লেয়ার সে?"

"মস্ত বড়। আট হাজার টাকা নাকি পায়।"

"আ—ট! বলেন কি! মশাই সাত ঘণ্টা চোদ্দ বছর ধরে কলম পিষে আজ পাচ্ছি বছরে আট হাজার। আর এরা একটা বলকে লাথি মেরে পাচ্ছে আট হাজার টাকা। তার সঙ্গে চাকরির টাকাটাও ধরুন।"

"পাক্ না টাকা। ভালই তো। কলম পেষার থেকে ফুটবল খেলা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়।"

কমল আলোচনা বন্ধের জন্য চিঠির গোছা সাজাতে শুরু করল। এগুলোর কুষ্ঠি ঠিকুজি এখন খাতায় এন্ট্রি করতে হবে। তারপর খামে ভরে দপ্তরির কাছে পাঠানো স্ট্যাম্প দিয়ে তাকে পাঠাবার জন্য। ভুল হয়ে গেলে একের চিঠি অন্যের কাছে চলে যাবে। চাকরি নিয়ে তখন টানাটানি পড়বে।

রণেন সাহা এতক্ষণ একমনে কাজ করছিল। মাথা না তুলে এবার বলল, "আজও তিনটের সময় চলে যাবেন নাকি?"

"কেন!" কমল বলল।

"কাল যে দুটো গোল করেছেন।"

কমল হেসে উঠল।

ছুটির কিছু আগে ফোন এল কমলের। অরুণার গলাঃ "কমলদা একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। বেলেঘাটায় একটা স্কুলে টিচার নেওয়া হচ্ছে। তোমাদের ক্লাবের সেক্রেটারির সঙ্গে একবার আলাপ করিয়ে দেবে? উনি ঐ স্কুলের কমিটিতে আছেন। যদি চাকরিটা পাই তা হলে এখন যেটা করি সেটা বরুণাকে দিয়ে দেব।"

কমল ওকে জানাল, ক্লাবে গিয়ে কেষ্টদার সঙ্গে সে আজকেই কথা বলবে।

অফিস থেকে বেরিয়ে কমল হেঁটেই ময়দানে যায়। আজ সে যাবার পথে সারাক্ষণ রথীনের কথাগুলো, তার আচরণের পরিবর্তন এবং সব থেকে বেশি 'আনস্পোরটিং' শব্দটি কমলের মাথার মধ্যে ঠক্‌ঠক্ করে আঘাত করতে লাগল।

"এই যে। আপনার কাছেই যাব ভাবছিলুম। দেখা হয়ে ভালই হল।"

চমকে উঠে কমল দেখল সাংবাদিকটি সামনে দাঁড়িয়ে। হেসে বলল, "কেন?"

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করা হয়নি, আপনি কি রিটায়ার করেছেন?"

"সে কি! কোথায় শুনলেন?"

"কাল যুগের যাত্রীর টেন্টে গেছলুম। সেখানে প্রতাপ ভাদুড়ী বলল আপনি নাকি রিটায়ার করেছেন।"

চলতে চলতে কমল বলল, "আচ্ছা, তাই নাকি! আর কি শুনলেন?"

যাত্রীর কে যেন কাল অফিস লীগে আপনার খেলা দেখতে গিয়েছিল। তার সঙ্গেই আলোচনা করছিল প্রতাপ ভাদুড়ী। আপনি অনুপমকে নাজেহাল করেছেন শুনে বলল, "কমল তো শুনেছি রিটায়ার করে গেছে। ওকে কিছু টাকা বেনিফিট হিসাবে দেব ভাবছি, অনেক বছর যাত্রীতে খেলে গেছে তো।"

"কত টাকা দেবে কিছু বলেছে?"

"না।"

"শোভাবাজারের পরের ম্যাচেই আমি খেলছি।"

"তা হলে রিটায়ার করেন নি!"

কমল জবাব না দিয়ে হনহনিয়ে এগিয়ে গেল বিস্মিত সাংবাদিককে ভীড়ের মধ্যে ফেলে রেখে।

শোভাবাজার টেন্টে ঢোকার মুখেই কমলের সঙ্গে দেখা হল সত্য আর বলাইয়ের।

"কাল আপনি এলেন না কমলদা? খেলা আরম্ভ হবার পাঁচ মিনিট আগে পর্যন্ত সরোজদা আপনার জন্য অপেক্ষা করেছে।"

"অফিস আটকে দিল।" কমল অপ্রতিভ হয়ে বলল। "খেললি কেমন তোরা?"

বলাই হেসে বলল, "আর খেলা। আপনার জায়গায় স্বপনকে নামান হয়েছিল। তিনটে গোল ওই খাওয়াল।"

"লাস্ট গোলটা, বুঝলেন কমলদা, যদি দেখতেন তো হাসতে হাসতে মরে যেতেন। ওদের শ্যামল বোস দুটো গোল করেছে। রাইট আউট বল নিয়ে এগোচ্ছে। স্বপন ট্যাকল করতে কর্ণার ফ্ল্যাগের দিকে এগিয়ে হঠাৎ ঘুরে পেনালটি বক্সের মধ্যে শ্যামল বোসের কাছে দৌড়ে এসে দাঁড়াল। ওদিকে রাইট আউট ফাঁকা এগিয়ে এসে গোল করে দিল। আমরা তো অবাক। বললুম, স্বপন তুই ওভাবে ছেড়ে দিয়ে এদিকে দৌড়ে এলি কেন? কি বলল জানেন! যদি শ্যামল বোসকে বল দিত আর যদি শ্যামল বোস গোল করত তা হলে ওর হ্যাটট্রিক হয়ে যেত না?"

বলতে বলতে সত্য হো হো করে হেসে উঠল। বলাইও। "বুঝলেন কমলদা, উফ্‌ফ, স্বপন হ্যাটট্রিক করতে দেয়নি। ওহঃ, গোল খাও পরোয়া নেহি, হ্যাটট্রিক হোনে নেহি দেগা।"

কমলও হাসল তারপর চোখে পড়ল ভরত টেন্টের মধ্যে চেয়ারে বসে তাদের দিকেই তাকিয়ে। কমল এগিয়ে এসে বলল "সরি ভরত।"

"আপনি থাকলে কাল গোল খেতুম না।"

"কি করব, অফিসের খেলা ফেলে আসতে পারলুম না।"

"কমলদা, শোভাবাজারে ন-বছর আছি। ফার্স্ট গোলি সাত বছর ধরে। এমন জঘন্য টিম কোন বার দেখিনি। থার্ড ডিভিশনেও এরা খেলার যোগ্য নয়। না আছে স্কিল না আছে ফুটবল সেন্স। পারে শুধু গালাগালি আর লাথি চালাতে। বলাই, সত্য, শ্রীধর তিন জনকেই রেফারি ওয়ার্ন করেছে। স্বপন যতই বোকামি করুক, প্রাণ দিয়ে খেলেছে ওর সাধ্য মত।"

"নেকস্ট ম্যাচ কার সঙ্গে? বাটা?"

"হ্যাঁ।"

সেক্রেটারির ঘর থেকে এই সময় সরোজ বেরোল। কমলকে দেখেই গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ।

হতেই হবে। পয়েন্ট দে, আমিও তাহলে চেষ্টা করব।'

"আসতে পারলাম না সরোজ।"

"জানি, অফিসের হয়ে খেলেছেন।"

"পরের ম্যাচে অবশ্যই খেলব। তাতে চাকরি যায় যদি যাবে।"

"সরি কমলদা, টিম হয়ে গেছে। স্বপনই খেলবে।"

"সরোজ আমি রিটায়ার করেছি বলে গুজব ছড়ান হচ্ছে। ওটা মিথ্যা রটনা প্রমাণ করতে আমাকে নামতেই হবে মাঠে।"

"টিম আর বদলান যাবে না।" সরোজ স্বরে কাঠিন্যের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "অন্য ম্যাচে খেলবেন।"

শোভাবাজারের মত নগণ্য টিমের অতি নবীন কোচ যে এভাবে তার সঙ্গে কথা বলবে কমলের তা কল্পনার বাইরে। কথা না বাড়িয়ে সে সেক্রেটারির ঘরে ঢুকল।

কৃষ্ণ মাইতি আস্ত চিকেন রোস্ট নিয়ে ধস্তাধস্তি করছিলেন। কথা না বলে তাকালেন শুধু।

"সামনের ম্যাচ বাটার সঙ্গে। কেষ্টদা, আমি খেলতে চাই।"

"বেশ তো, নিশ্চয় খেলবি।"

"সরোজ টিমে আমার নাম রাখেনি।"

"সে কি!" কৃষ্ণ মাইতি চীৎকার করে উঠলেন "সরোজ, সরোজ।"

সরোজ ঘরে ঢোকা মাত্র বললেন, "কমল বাটা ম্যাচ খেলবে।"

"কিন্তু——"সরোজ কড়া চোখে কমলের দিকে তাকাল।

"কিন্তু টিন্তু নয়। কমল কলকাতা মাঠের সব থেকে সিনিয়ার প্লেয়ার। বড় বড় টিম এখনো মাঠে ওকে দেখলে ভয়ে কাঁপে। ও খেলতে চেয়েছে, খেলবে।"

"কিন্তু কেষ্টদা আমি টিমটা অনেক ভেবেই করেছি একটা বিশেষ প্যাটার্নে খেলাব বলে। তা ছাড়া কমলদা তো একদিনও প্র্যাকটিস করলেন না ছেলেদের সঙ্গে।"

"প্র্যাকটিস!" কেষ্টদা বিষম খেলেন। কয়েকবার ব্রহ্মতালু থাবড়ে ধাতস্থ হয়ে বললেন, "প্যাটার্ন, প্র্যাকটিস সব হবে, সব হবে। যা বললুম তাই করো। কমল খেলবে।"

"আচ্ছা।"

সরোজ বেরিয়ে যাবার সময় কঠিন দৃষ্টি হেনে গেল কমলের দিকে।

"বুঝলে কমল, বাবুরা কোচিং করে ক্লাবকে উদ্ধার করবে। শেষ দিকে পয়েন্ট ম্যানেজ করে তো রেলিগেশন থেকে বাঁচতে হবে। ওঠা-নামা যদ্দিন বন্ধ ছিল বুঝলে, শান্তিতে ছিলুম।"

"কেষ্টদা আপনি যে মেয়ে স্কুলের কমিটি মেমবার সেখানে টিচার নেওয়া হচ্ছে। আমার একজন পরিচিত অ্যাপ্লাই করেছে। আপনি একটু দেখবেন?"

"কে হয় তোর?"

"পল্টু মুখারজির বড় মেয়ে।"

ভ্রূ কুঁচকে কৃষ্ণ মাইতি আঙুলে লাগা ঝোল চাটতে চাটতে কি যেন ভাবল। তারপর বলল, "আচ্ছা দেখব'খন। কিন্তু তোর সঙ্গে একটা কথা আছে। যুগের যাত্রীর সঙ্গে লীগের প্রথম খেলা সতেরোই। পয়েন্ট নিতে হবে। যদি নিতে পারিস তা হলে চাকরিটা হবে।"

কমল অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। চাকরি দেবার এ রকম অদ্ভুত সর্তের কারণ সে বুঝতে পারছে না।

"কেষ্টদা তা কি করে হয়।"

"হতেই হবে। পয়েন্ট দে, আমিও তা হলে চেষ্টা করব। গুলোকে আমি একবার দেখে নেব। গত বছর কথা ছিল ম্যাচ ছেড়ে দিলে আর গভরনিং বডির মিটিংয়ে কালিঘাটের সঙ্গে গণ্ডগোলে বন্ধ হয়ে যাওয়া খেলাটা রি-প্লে হওয়ার পক্ষে ভোট দিলে সাতশো টাকা দেবে টেন্ট সারাতে। ম্যাচ ছাড়ার আর দরকার হয়নি, এমনিতেই যাত্রী চার গোল দিয়েছে। ভোট দিয়েছিলুম কিন্তু যাত্রী জিততে পারেনি। ব্যাস, ব্যাটা আর টাকা ঠেকাল না। যদি পারিস ফার্স্ট ম্যাচে পয়েন্ট নিতে তা হলে ভয় খাবে, রিটার্ন লীগ ম্যাচে সুদে-আসলে তখন কান মুলে আদায় করে নেব। পল্টু মুখুজ্জের মেয়ের চাকরি, কমল এখন তোর হাতে।"

কমল কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না, শুধু তাকিয়ে রইল চশমার পিছনে পিটপিটে দুটো চোখের দিকে। যাত্রীকে পয়েন্ট থেকে বঞ্চিত করার ইচ্ছাটা তারও প্রবল। কিন্তু কৃষ্ণ মাইতির ইচ্ছাটার সঙ্গে তারটির কি ভীষণ অমিল। সব থেকে অস্বস্তিকর ও ভয়ের ব্যাপার এই সর্তটা। যাত্রীর কাছ থেকে পয়েন্ট নেওয়া একার সাধ্যে সম্ভব নয়। বয়স হয়েছে, দমে কুলোয় না। এজিলিটি কমে গেছে, স্পীডও। শুধু অভিজ্ঞতা সম্বল করে একটা তাজা দলের সঙ্গে একা লড়াই করা যায় না। তার থেকেও বড় কথা, অরুণার চাকরি পাওয়া যদি যাত্রীর সঙ্গে খেলার ফলের উপর নির্ভর করে তবে সেটা একটা বাড়তি চাপ হবে মনের উপর।

কমলের মনের মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল এক বৃদ্ধের ছবি। কি যেন বলছেন, কমল মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করল, তারপর বিড়বিড় করে বলল, "ব্যালানস! হ্যাঁ পল্টুদা, ব্যালানস রাখতে হবে।"

"ব্যালানস কি রে, পয়েন্ট চাই।"

কমল উঠে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত স্বরে বলল. "আমি চেষ্টা করব।"

সাত

কিক্ অফের বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে কমলের শরীরে হালকা একটা কাঁপন লাগল। গত বছর আই এফ এ শীলডের প্রথম রাউন্ডে এই মহমেডান মাঠেই শেষবার খেলেছে। তারপর ঘেরা মাঠে আজ প্রথম। প্রত্যেকবার, গত কুড়ি বছরই, কিক্ অফের বাঁশি শুনলেই তার শরীর মুহূর্তের জন্য কেঁপে ওঠে। স্নায়ুগুলো নাড়াচাড়া খেয়ে আবার ঠিক হয়ে যায়। তারপর প্রত্যেকটা কোষ ফেটে পড়ার জন্য তৈরী হয়ে উঠতে শুরু করে।

কমল অনুভব করল আজকেও সে তৈরী। বাটা আলস্যভরে খেলা শুরু করেছে। বল নিয়ে ওরা মাঝখান দিয়ে ঢুকছিল, রাইট হাফ সত্য চার্জ করে বলটা লম্বা শটে ডান করনার ফ্ল্যাগের কাছে পাঠিয়ে দিল। কমল বিরক্ত হল। অযথা বোকার মত বলটা নষ্ট করল। রাইট উইং রুদ্র তখন সেন্টার ফ্ল্যাগের কাছে, তার পক্ষে ওই বল ধরা সম্ভব নয়। তবু রুদ্র দৌড়িয়ে খানিকটা দম খরচ করল।

পেনালটি এরিয়ার ১৮×৪৪ গজ জায়গা নিয়ে কমল খেলতে থাকে। দুবার তাকে বল নিয়ে আগুয়ান ফরোয়ার্ডকে চ্যালেঞ্জ করতে হয়েছে এবং দুবারই বল দখল করেছে। নির্ভুল বল দিয়েছে ফরোয়ার্ডদের, কাঁচা ছেলে স্বপন নিজের জায়গা ছেড়ে বলের পিছনে যত্রতত্র ছুটছে, তাকে কোথায় পজিশন নিতে হবে বারবার চেঁচিয়ে বলেছে, বল নিয়ে ওঠার মত ফাঁকা জমি পেয়েও সে প্রলোভন সামলেছে। খেলা পনেরো মিনিটে গড়াবার আগেই কমল নিজের সম্পর্কে আস্থাবান হয়ে উঠল।

সবুজ গ্যালারিতে দুটি মাত্র লোক। হাওড়া ইউনিয়নের মেম্বার গ্যালারিতে জনা পনেরো লোক। ওরা রোজই আসে, খেলার পরও সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকে। মহমেডান মেম্বার গ্যালারিতেও কিছু লোক। খেলা চলছে উদ্দেশ্যবিহীন, মাঝ মাঠে। কিন্তু এরই মধ্যে কমল লক্ষ্য করল শোভাবাজারের তিন চারজনের যেন খেলার ইচ্ছাটা একদমই নেই। বিপক্ষের পায়ে বল থাকলে চ্যালেঞ্জ করতে এগোয় না, ট্যাকল করতে পা বাড়ায় না, বল নিয়ে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলে তাড়া করে না। কমল ক্রমশ অনুভব করতে লাগল তার উপর চাপ পড়ছে। মাঝমাঠে যে বাঁধটা রয়েছে তাতে একটার পর একটা ছিদ্র দেখা দিচ্ছে আর অবিরাম বল নিয়ে বাটা এগিয়ে আসছে।

কিন্তু অবাক হল কমল, রাইট ব্যাকে স্বপনেব খেলা দেখে। যেখানে বল সেখানেই স্বপন। এলোপাথাড়ি পা চালিয়ে, ঝাঁপিয়ে, লাফিয়ে সে নিজেকে হাস্যকর করে তুললেও, কমল বুঝতে পারছে ওর এইভাবে খেলাটা ফল দিচ্ছে। নিজের জায়গা ছেড়ে ছোটাছুটি করলেও কমল ওকে আর নিষেধ করল না। তবে ডান দিকের বিরাট ফাঁকা জায়গাটা বিপজ্জনক হয়ে রইল।

হাফ-টাইমের পর প্রথম মিনিটেই শোভাবাজার গোল-কিক পেয়েছে। ভরত বলটা গোল এরিয়ার মাথায় বসাবার সময় কমলকে বলল, "সত্য শম্ভু বলাই মনে হচ্ছে বেগোড়বাই শুরু করেছে। কমলদা আপনি রুদ্রকে নেমে এসে ডানদিকটা দেখতে *বলুন।"*

কমল কিক করার আগে শুধু বলল, "আর একটু দেখি।"

কিন্তু এক মিনিটের মধ্যেই বাটা পেনালটি কিক পেল। লেফট ব্যাক বলাই অযথা দুহাতে বলটা ধরল, যেটা না ধরলে ভরত অনায়াসেই ধরে নিত। ভরত তাজ্জব হয়ে বলল, "এটা তুই কি করলি?"

বলাই মাথায় হাত দিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "একদম বুঝতে পারিনি। ভাবলুম তুই বোধহয় পজিশনে নেই বলটা গোলে ঢুকে যাবে।"

ভরত বিড়বিড় করে কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করে গোলে দাঁড়াল এবং পেনালটি কিক হবার পর গোলের মধ্য থেকে বলটা বার করে প্রবল বিরক্তিতে মাটিতে আছাড় মারল।

"বলাই।" গম্ভীর স্বরে কমল বলল, "তুমি রাইট উইংয়ে যাও। আর রুদ্র তুমি নেমে এসে খেলো।"

বলাই উদ্ধতভাবে প্রশ্ন করল, "কেন? আমি পজিশান ছেড়ে খেলব কেন?"

"আমি বলছি খেলবে।"

"আপনি অর্ডার দেবার কে? ক্যাপ্টেন দেবীদাস কিংবা কোচ সরোজদা ছাড়া হুকুম দেবার অধিকার কারুর নেই।"

কমল চুপ করে সরে গেল। সত্য চেঁচিয়ে বলাইকে জিজ্ঞাসা করল, "কি বলছে রে?"

রাগে অপমানে ঝাঁঝিয়ে উঠল কমলের মাথা। শুধুমাত্র স্বপন আর প্রাণবন্ধুকে দুপাশে নিয়ে সে লড়াই শুরু করল। রুদ্র নেমে এসে খেলছে। এখন বটাকে গোল দেবার কোন কথাই ওঠেনা। শোভাবাজার গোল না খাওয়ার জন্য লড়ছে সাত-আটজনকে সম্বল করে।

পঞ্চাশ মিনিটের পর থেকেই শোভাবাজার ডিফেন্স ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়তে শুরু করল। সত্য, শম্ভু, বলাই অযথা ফাউল করছে। তিনটে ফ্রি কিকের দুটি ভরত দুর্দান্ত-ভাবে আটকেছে, অন্যটি ফিস্ট করে কর্নার করেছে। কমল দাঁতে-দাঁত চেপে পেনাল্টি এরিয়ার ফোকরগুলো ভরাট করে চলেছে আর চীৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে স্বপন আর প্রাণবন্ধুকে। বাটার ছয়জন কখনো আটজন উঠে আসছে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আরো তিনটি গোল তারা দিল।

"কমলদা, আর আমি পাচ্ছি না।" হাঁফাতে হাঁফাতে স্বপন বলল। ছেলেটার জন্য কষ্ট হচ্ছে কমলের। কিন্তু সেটা প্রকাশ করার বা ওকে ঢিলে দিতে বলার সময় এখন নয়। চার গোল খেয়েছে শোভাবাজার, বাটার দুজনের জন্য তারা একজন লড়ছে। সংখ্যার অসমত্ব নিয়ে লড়াই অসম্ভব। খেলাটা এখন এলোপাথাড়ি পর্যায়ে নেমে এসেছে। বাটা গোল না দিয়ে শোভাবাজারকে নিয়ে এখন ছেলেখেলা করছে।

"তোর থেকে আমার ডবল বয়েস। আমি পারছি, তুই পারবি না কেন?"

স্বপন ঘোলাটে চোখে কমলের দিকে তাকিয়ে মাথাটা দুবার ঝাঁকিয়ে আবার বলের দিকে ছুটে গেল। কমলের মনে হল, যদি এখন সলিলটাও পাশে থাকত। প্রাণবন্ধু, স্বপন এবং রুদ্রও এখন পেনালটি এরিয়ায় এসে খেলছে। ফরোয়ার্ডরা—দেবীদাস, গোপাল, শ্রীধর হাফ লাইনে নেমে এসেছে। বাটার গোলকীপার পোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। কমল কখনো যা করতে চায় না, যা করতে সে ঘৃণা বোধ করে, তাই শুরু করল। সময় নষ্ট করে কাটাবার জন্য, বল পাওয়া মাত্র গ্যালারিতে পাঠাতে লাগল। গ্যালারিতে লোক নেই, বল কুড়িয়ে আনতে সময় লাগে।

চার গোলেই শোভাবাজার হারল। খেলার শেষে মাঠের বাইরে এসেই স্বপন আছড়ে পড়ল। কমল এক গ্লাস জল মাথায় ঢেলে শুধু একবার সরোজের দিকে তাকাল। সরোজ মুখ ঘুরিয়ে নিল। বলাই হাসতে হাসতে সরোজকে বলল, "শুধু চিকেন চৌ-মিনে হবে না বলে রাখছি, এক প্লেট করে *চিলি চিকেনও।"*

কমল ঝুঁকে স্বপনের হাতটা তুলে নিয়ে নাড়ি দেখল। গতি অসম্ভব দ্রুত। মনে হল মিনিটে দেড়শোর উপর। ওর পাশে উবু হয়ে বসা রুদ্র আর প্রাণবন্ধুর দিকে তাকিয়ে কমল ম্লান হেসে বলল, "রেস্ট নিক আর একটু। পরশু থেকে তোদের নিয়ে প্র্যাকটিসে নামব।"

টেন্টে এসে স্নান করে কমল যখন ড্রেসিং রুমে পোষাক পরছে তখন শুনতে পেল বাইরে ক্লাবের দুই একজিকিউটিভ মেম্বার বলাবলি করছেঃ

"সরোজ তো তখনই বলেছিল চলে না, বুড়ো ঘোড়া দিয়ে

আর চলে না। মডার্ন ফ্টবল খেলতে হলে খাট্নি কত!"

"কেষ্টদার যে কি দ্বর্বলতা ওর উপর বুঝি না। ইয়াং ছেলেরা চান্স না পেলে টিম তৈরী হবে কি করে, কোচ রাখারই বা মানে কি? পাওয়ার ফ্টবল এখন পৃথিবীর সব জায়গায় আর আমরা—"

"সরোজ বলছে এভাবে তার উপর হস্তক্ষেপ করলে সে আর দায়িত্ব নিতে পারবে না।"

"কেষ্টদার উপর তো আর এখানে কথা চলে না, ডুবলো, ক্লাবটা ডুবলো।"

কমল ঘর থেকে বেরোতেই ওরা চুপ করে ভ্যাবাচাকার মত তাকিয়ে রইল। তারপর একজন তাড়াতাড়ি বলল, "অ্যাঁ, তা হলে চারগোল হল।"

"হ্যাঁ চারগোল।" কমল গম্ভীরস্বরে জবাব দিয়ে ওদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। টেন্টের বাইরে এসে দেখল ক্যান্টিনের কাউন্টারে সরোজ চা খাচ্ছে। ওকে ডাকতে গিয়ে কমল ইতস্তত করল। কয়েকটা কথা এখন তার সরোজকে বলতে ইচ্ছে করছে। তারপর ভাবল, থাক্, তর্কাতর্কি করে ভীড় জমিয়ে লাভ নেই। কমল বেরিয়ে এল ক্লাব থেকে।

বাসে দমবন্ধ ভীড়ে কমল মাথার উপরের হাতল ধরে দাঁড়িয়েছিল। সামনেই মাঝবয়সী একটি লোক বারবার তার দিকে তাকাতে তাকাতে অবশেষে বলল, "আজ খেলা ছিল বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"কি রেজাল্ট হল?"

বুকের মধ্যে ডজনখানেক ছুঁচ ফোটার ব্যথা কমল অনুভব করল। ভাবল, না শোনার ভান করে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। কিন্তু লোকটির প্রত্যাশাভরা মুখটি অগ্রাহ্য করতে পারল না। আস্তে বলল, "ফোর নীল।" তারপর বলল, "হেরে গেছি।"

লক্ষ্য করল সঙ্গে সঙ্গে লোকটির মুখ বেদনায় কালো হয়ে গেল। ধীরে ধীরে মুখ ঘুরিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। কমলের দিকে আর মুখ ফেরাল না। মুঠোর মধ্যে হাতলটা দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে ফেলতে চাইল কমল। হয়তো এই লোকটি তার দশ কি বারো বছর আগের খেলা দেখেছে। তারপর নানান কাজে জড়িয়ে পড়ে আর মাঠে যায় না। কিন্তু মনে করে রেখেছে কমল গুহর খেলা। হয়তো একদিন এই লোকটিও তাকে কাঁধে তুলে মাঠ থেকে টেন্টে বয়ে নিয়ে গেছে খেলার পর।

ভাবতে ভাবতে কমল নিজের উপরই রাগে ক্ষোভে আর অদ্ভুত এক অপমানের জ্বালায় ছটফট করে বাস থেকে নেমে হেঁটে বাড়ি ফিরল।

পরদিন অফিসে নিজের চেয়ারে বসতেই চোখে পড়ল, খড়ি দিয়ে তার টেবলে বড় বড় অক্ষরে লেখাঃ

৪—০

যুগের যাত্রীর সঙ্গেও এই রেজাল্ট হবে।

কমল কিছুক্ষণ টেবলের দিকে তাকিয়ে রইল। লেখাটা মুছল না।

"চ্যাংড়াদের কাজ। মুছে ফেলুন কমলবাবু।" বিপুল তার টেবল থেকে ঝুঁকে বলল।

"না থাক্।" কমল ম্লান হাসল।

"আপনি বরং যুগের যাত্রীর দিন খেলবেন না।"

কমল শোনামাত্র আড়ষ্ট হয়ে গেল। বিপুল তার শুভার্থী। বিপুল চায় না সে আর অপমানিত হোক। বিপুল ধরেই নিয়েছে সে পারবে না যুগের যাত্রীকে আটকাতে, তাই বন্ধুর মতই পরামর্শ দিয়েছে। কমল মুখ নামিয়ে বলল, "আমার ওপর কনফিডেন্স নেই আপনার?"

"না না সে কি কথা। আমি তো খেলাটেলা দেখিনা, বুঝিও না। তবে আজকালকার ছেলেপুলেরা বোঝেনই তো, মানীদের মান রাখতে জানে না।"

"কিন্তু আমি যাত্রীর সঙ্গে খেলব।" কমল দৃঢ়স্বরে বলল। "আমাকে অন্য কারণেও খেলতে হবে।"

একঘণ্টা পরেই বেয়ারা একটা খাম রেখে গেল কমলের টেবলে। খুলে দেখল মেমোরাণ্ডাম। গতকাল অফিস ছুটির নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কমল বিভাগীয় ইনচার্জের বিনা অনুমতিতে অফিস ত্যাগ করার জন্য এই চিঠিতে তাকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। এ রকম আবার ঘটলে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কমল দেখল চিঠির নীচে রথীনের সই। চিঠিটা ভাঁজ করে খামে রাখার সময় লক্ষ্য করল রণেন দাস মুচকি হাসছে। কমল মনে মনে বলল, ব্যালানস, এখন আমার ব্যালানস রাখতে হবে।

আট

অফিস থেকে বাড়ি ফিরেই কমল শুয়ে পড়ে। শরীর গরম, জ্বর-জ্বর ভাব। ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। অমিতাভর ডাকে চোখ মেলল।

"খাবেন না, রাত হয়েছে।"

কমল উঠে বসার সময় অনুভব করল তার সারা গায়ে ব্যথা। অমিতাভ দেখল কমলের চোখদুটি লাল।

"তোমার খাওয়া হয়েছে?"

ইতস্তত করে অমিতাভ বলল, "না, একসঙ্গেই খাব।"

"আমার বোধহয় ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে, আমি কিছু খাব না।"

অমিতাভ চলে যাচ্ছে, কমল তাকে ডাকল।

"তোমার অ্যালার্ম ঘড়িটা আমায় দেবে? কাল খুব ভোরে উঠতে হবে। প্র্যাকটিসে যাব।"

"প্র্যাকটিসে!" অমিতাভের চোখ বড় হয়ে গেল। "আপনার তো জ্বর হয়েছে!"

এই বলে অমিতাভ এগিয়ে এসে কমলের কপালে হাত রাখল। "প্রায় একশো।"

কমল চোখদুটি বন্ধ করে অমিতাভর শীর্ণ আঙুলের স্পর্শ অনুভব করতে করতে বলল, "আমাকে খেলতে হবে।"

"এই শরীরে?"

"হ্যাঁ। প্র্যাকটিস না করলে খেলা যায় না। আমি আর সময় নষ্ট করতে পারি না।"

"কিন্তু—" অমিতাভ চুপ করে গিয়ে একরাশ প্রশ্ন তুলে ধরল।

কমল হাসল, যতটা সম্ভব হয় এই মুহূর্তে। "সারাজীবন পারফেকশন খুঁজেছি, কিন্তু পাইনি। যে যার নিজের ক্ষেত্রে পারফেক্ট হতে চায়, আমার ক্ষেত্রটা ফুটবল। আমি মানুষ হতে পারব না জেনে ফুটবলার হতে চেয়েছি। কিন্তু দুঃখের কথা কি জান, ফুটবলারের সময়টা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তার শরীর, তার যৌবনই তার সময়, কিন্তু বড্ড ছোট্ট সময়টা। আমার মত তৃতীয় শ্রেণীর ফুটবলার অল্প সময়ের মধ্যে কি করতে পারে যদি না খাটে, যদি না পরিশ্রম করে?"

"কিন্তু আপনি অসুস্থ।"

"হোক্। চ্যালেঞ্জ এসেছে, আমি তা নেবই। বহু অপমান সহ্য করেছি, তার জবাব না দিতে পারলে বাকি জীবন আমি কি করে কাটাব?"

কমল উঠে দাঁড়াল। কুঁজো হয়ে খাটের তলা থেকে ধুলোয় ভরা নীল রঙের কেডস জুতোজোড়া বার করে বুরুশ দিয়ে ঘষতে শুরু করল। হঠাৎ অমিতাভ বলল, "আপনি ফুটবলকে এত ভালবাসেন!"

মাথা হেলিয়ে কমল কয়েক সেকেন্ড থেমে বলল, "হ্যাঁ, এজন্য আমায় দাম দিতে হয়েছে। অনেক কিছুই হারিয়েছি তার বদলে, কিছুই পেলাম না যা দিয়ে আমার লোকসান পূরণ করতে

পারি। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ খেলার জীবনে অনেক শুনেছি কিন্তু মূর্খ, বোকা, বদমাস অহঙ্কারীদের অপমানের জবাব না দিয়ে আমি রিটায়ার করব না। আমি খেলব, যেমন করেই হোক, যদি মরতে হয় তবুও।"

"যদি না পারেন? সময় তো ফুরিয়ে এসেছে বললেন।"

"আমি ভয় পাই এ কথা ভাবতে। আমাকে পারতেই হবে, একাই আমায় চেষ্টা করতে হবে। আমি জানি, ঠিক সময়ে বল এগিয়ে দেব কিন্তু তখন বল ধরার লোক থাকবে না। নিখুঁত পাস দেব কিন্তু কন্ট্রোলে আনতে পারবে না, বল পাব কিন্তু এত বিশ্রিভাবে আসবে যে কাজে লাগাবার উপায় তখন থাকবে না। নানান অসুবিধা নিয়ে আমার চারপাশের প্লেয়ারদের সঙ্গে মানিয়ে খেলতে হবে। কেউ কারুর খেলা বোঝে না, ওরা এক একজন এক একরকমের। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। এজন্য প্র্যাকটিস চাই একসঙ্গে।"

"তাহলেই আপনি সফল হবেন?"

কমল তীব্র কৌতূহল দেখতে পেল অমিতাভর চোখে। এতক্ষণ ধরে এতকথা তারা আগে কখনো বলেনি। কমলের মনে হল, তার কথা শুনতে অমিতাভর যেন ভাল লাগছে। যে ভয়ঙ্কর ঔদাসীন্য এবং চাপা ঘৃণা নিয়ে সে বাবার সঙ্গে কথা বলতো সেটা সরে গিয়ে একটা কৌতূহলী ছেলেমানুষ বেরিয়ে এসেছে। আর একটা ব্যাপার কমল বুঝতে পারল তার জ্বর-জ্বর ভাব এবং গায়ের ব্যথা এখন আর নেই।

স্কিপিং-এর দড়িটা টেনে পরীক্ষা করতে করতে কমল বলল, "সফল? তোমার কি মনে হয়?"

অমিতাভ গম্ভীর হয়ে গেল।

কমল উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে রইল।

"আমি ফুটবলের কিছু বুঝিনা।"

"কিন্তু এটা ফুটবল হিসাবে দেখছ কেন, জীবনের যেকোন ব্যাপারেই তো এ রকম পরিস্থিতি আসে। যে মানুষ একা, যার কেউ নেই সে তখন সফল হবার জন্য কি করতে পারে?"

অমিতাভ চুপ করে রইল।

কমল উত্তেজিত হয়ে বলল, "সে তখন পারে শুধু লড়তে। তুমি কি নিজেকে একা বোধ করো অমিতাভ?"

অমিতাভ জবাব দিল না।

কমলের উত্তেজনা ধীরে ধীরে কমে এল। আস্তে আস্তে সে বলল, "যোগাযোগ করো। মাঠে আমি খেলার সময় তাই করি। কিন্তু বাড়িতে ফিরে আর তা পারি না। বড় একা লাগে।"

খাটের উপর বসে মেঝের দিকে তাকিয়ে কমল বলল, "অনেক কথা বললাম, হয়তো এর মানে আমরা কেউই জানি না। তুমি আমাকে ভালবাসনা, আমাকে ঘৃণা করো এটা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু আমি তোমায় ভালবাসি।"

কমলের চোখ জলে চিকচিক করছে। স্বর ভারি। অমিতাভ পাথরের মূর্তির মত একইভাবে দাঁড়িয়ে। কমল মুখ নামিয়ে মেঝের দিকে তাকাল।

"ফুটবল খেলা একদিন আমায় শেষ করতেই হবে, তারপর আমি কি নিয়ে, কাকে নিয়ে থাকব?"

একথা শুনে অমিতাভর মুখে কোন্ ভাব ফুটে ওঠে দেখার জন্য মুখ তুলে কমল দেখল ঘরে অমিতাভ নেই। নিঃসাড়ে সে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে।

ভোর সাড়ে পাঁচটায় কমল কিটব্যাগ হাতে বাড়ি থেকে বেরোল। বাগবাজার থেকে ময়দান সে ধীরগতিতে জগ্ করে পৌঁছল যখন, শোভাবাজারের টেন্টে তিনটি ছেলে তখন সদ্য পৌঁছেছে। ওরা, স্বপন রুদ্র আর শিবশম্ভু চটপট তৈরী হয়ে নিল।

"এখান থেকে চৌরঙ্গি রোড ধরে ভিকটোরিয়া, তারপর পশ্চিমে বেঁকে রেসকোর্সের দক্ষিণ দিয়ে ট্রামলাইন পেরিয়ে প্রিনসেপ ঘাট। সেখান থেকে গঙ্গা ধরে উত্তরে তারপর বেঁকে মোহনবাগান মাঠের পাশ দিয়ে নেতাজী স্ট্যাচু ঘুরে আবার এখানে।" কমল দৌড়ের পথ ছকে দিল রওনা হবার আগে। ওরা ঘাড় নাড়ল।

চৌরঙ্গী দিয়ে দৌড়বার সময় একটা বাস থেকে লাফিয়ে নামল ভরত। ওরা থমকে দাঁড়াল।

"কমলদা আপনারা বেরিয়ে পড়েছেন, আমিও তো প্র্যাকটিস করব বলে এলুম।"

"ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আ‌সছি। তুই রেডি হয়ে থাক।"

ওরা চারজন আবার ছুটতে শুরু করল। কিছুক্ষণ ছোটার পর কমল পাশে তাকিয়ে স্বপনকে বলল, "সাত-বারো কত হয় রে?"

বিস্ময় ফুটে উঠল স্বপনের মুখে। ছুটতে ছুটতে একি বেয়াড়া প্রশ্ন! ক্লাস এইটে ফেল করার পর স্বপন আর স্কুল মুখো হয়নি এবং মাথা খাটানোর মত কোন ঝঞ্ঝাটে ব্যাপারে ব্যস্ত হয়নি। কমলের প্রশ্নের জবাব দিতে সে বিড়বিড় করে সাতের ঘরের নামতা শুরু করল।

কিছুক্ষণ পর স্বপন বলল, "চুরোআশি।"

"দেশ কোথায় ছিল, যশোরে?"

স্বপন একগাল হাসল।

ওরা ছুটতে ছুটতে রবীন্দ্রসদন পার হয়ে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের পিছন দিয়ে পশ্চিমে চলেছে। কমল এবার রুদ্রকে বলল, "পাখিসব করে রব পদ্যটা মুখস্থ আছে?"

"না, পড়িনি।"

"পঞ্চনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে?"

"মুখস্থ নেই।"

"এগারোর উপপাদ্য কিংবা ভারতের জলবায়ু মনে আছে? তুইতো গতবছর বি কম্ পরীক্ষা দিয়েছিস, বলতো।"

ছুটতে ছুটতে রুদ্রর ভুরু কুঁচকে গেল। প্রাণপণে সে মনে করার চেষ্টা শুরু করল। কমল তখন শিবশম্ভুকে কর্মধারয় ও দ্বিগু সমাসের ধাঁধায় ফেলে স্বপনকে একটি সহজ মানসাঙ্কের জট ছাড়াতে দিল। কমল ট্রেনিংয়ের অঙ্গ হিসাবে মাথার কাজ ও শরীরের খাটুনি একসঙ্গে করার এই পদ্ধতিটা শিখেছে পল্টুদার কাছে। তাকে দিয়ে তিনি এইভাবে কাজ করাতেন। কমল নিষ্ঠার সঙ্গে বরাবর তা পালন করে এসেছে। পল্টুদা বলতেন, শরীর যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন মাথাও আর কাজ করতে পারে না। ফুটবলে মাথা খাটাতে হয় ক্লান্তির মধ্যেও। সেইজন্যে ব্রেনটাকে তৈরী করতে হয়, তারও ট্রেনিং লাগে। যখন দৌড়বি তখন মাথাকে অলস রাখবি না কখনো।

গঙ্গার ধার দিয়ে ছোটার সময় মালভর্তি লরী যেতে দেখে কমল বলল, "তাড়া কর্ লরীটাকে, দেখি কে ধরতে পারে।"

চারজনে একসঙ্গে স্প্রিন্ট শুরু করল। প্রায় তিনশো মিটার দৌড়ে লরীটাকে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করে ওরা দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল। একটা বাস ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল। কমল হঠাৎ বলল, "স্বপন এটাকে ধর্,"

হকচকিয়ে স্বপন বলল, "আবার?"

"কুইক্"

স্বপন প্রাণপণে ছুটে পঁচিশ মিটার যেতেই কমল চেঁচিয়ে তাকে দাঁড়াতে বলল। এইভাবে রুদ্র ও শিবশম্ভুকেও আচমকা সে ছুটতে বলল বাস বা লরীর পিছনে পাল্লা করে। এরপর ওরা আবার ছুটতে শুরু করল। কমল তিনজনের আগে দৌড়চ্ছে। ইডেনের কাছে এসে কমল বলল, "চল্ গাছে চড়ি।"

একটা জামরুল গাছ বেছে নিয়ে কমল বলল, "কে আগে চড়ে ওই ছড়ানো ডালটা ধরে ঝুলে নীচে লাফিয়ে পড়তে পারে।"

চারজনে একসঙ্গে গাছটাকে আক্রমণ করল। স্বপন ধাক্কা দিয়ে কমলকে ফেলে দিয়ে সবার আগে গাছে উঠল, তারপর রুদ্র। শিবশম্ভুর পর কমল যখন গাছে উঠে ডালের প্রান্তে পৌঁছে প্রায় ১২ ফুট উঁচু থেকে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন স্বপন কাঁচুমাচু মুখে কমলকে কিছু বলার জন্য এগোতেই সে হেসে বলল, "ঠিক আছে, খেলার সময়ও ওই রকম শোল্ডার চার্জ করবি।"

শোভাবাজারের মাঠে ওরা যখন পৌঁছল, ভরত তখন শূন্যে উঁচু করে বল মেরে দৌড়ে গিয়ে লাফিয়ে মাথার উপর থেকে বল ধরা প্র্যাকটিস করছিল একা একাই। ওদের দেখে সে চেঁচিয়ে বলল, "আমাকে কেউ একটু প্র্যাকটিস দিয়ে যাও।"

"হবে হবে, আগে একটু জিরোতে দে।" কমল এই বলে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এই পর্যন্ত সে প্রায় দশ-বারো মাইল ছুটেছে। ফুটবল মরশুমের মাঝামাঝি এমন পরিশ্রমী ট্রেনিং কেউ করে না।

ঘণ্টা দেড়েক বল দেওয়া, বল ধরা, দুজনের বিরুদ্ধে একজনের ট্যাকলিং, হেডিং এবং শুটিংএর পর কমলের খেয়াল হল অফিস যেতে হবে। অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ারই নয় এখন থেকে অফিসে হাজিরা দেওয়ার সময় সম্পর্কেও তাকে সাবধান হতে হবে। তাছাড়া ছেলেগুলো পরশু খেলবে মহমেডানের সঙ্গে। এখন আর খাটানো ঠিক হবে না। কমল টেন্টেই স্নান করে, ক্যান্টিনে ভাত খেয়ে হেঁটেই অফিস রওনা হয়ে গেল।

দুপুরে নতু সাহা তাকে জানাল, কাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে খেলা আছে। কমল বলল, "শরীর খারাপ, খেলব না।"

গম্ভীর হয়ে নতু সাহা চলে গেল।

নয়

যুগের যাত্রীর পনেরোটা ম্যাচ খেলে ২৮ পয়েন্ট। মোহনবাগানের চৌদ্দটি খেলায় ২৪, ইস্টবেঙ্গলের চৌদ্দটি খেলায় ২৬, মহমেডানের পনেরোটি খেলায় ২৫ পয়েন্ট। আর শোভাবাজারের ষোলটি খেলায় ছয় পয়েন্ট। লীগের প্রথমার্ধ শেষ হয়ে আসছে। ইতিমধ্যে ময়দানে গুলতানি শুরু হয়ে গেছে,—দ্বিতীয় ডিভিশনে শোভাবাজার অবধারিত নামছে। বালি প্রতিভা, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, জর্জ টেলিগ্রাফ, কালিঘাট দু-তিন পয়েন্টে শোভাবাজারের উপরে।

যুগের যাত্রীর সঙ্গে লীগের প্রথম খেলার আগের দিন, অফিসের লিফটে ওঠার জন্য কমল যখন দাঁড়িয়ে, পিছনে থেকে একজন বলল, "কমলবাবু কাল খেলছেন তো?"

গলার স্বরে চাপা বিদ্রূপ বিচ্ছুরিত হয়। কমল জবাব দিল না। প্রশ্নকারী তাতে উত্তেজিত হয়ে উঠল। এবার রেগে বলল, "আরে মশাই, যেটুকু নাম এখনো লোকে করে সেটা ডুবিয়ে কোন লাভ আছে? অনেক তো খেললেন সারা জীবনে।"

লিফটের দরজা খুলে গেল। লাইন দেওয়া লোকেরা ঢুকল, তাদের সঙ্গে কমলও। দরজা বন্ধ হবার সময় সে শুনতে পেল লাইনে দাঁড়ান প্রশ্নকারী সকলকে শুনিয়ে বলছে, "বুঝলেন এরা ফুটবলের ইজ্জৎ নষ্ট করে।"

টিফিনের সময় কমল নিজের চেয়ার থেকে উঠল না। আবার কে তাকে শুনিয়ে বিদ্রূপাত্মক কথা বলবে কে জানে! একমনে মাথা নিচু করে সে কাজ করে চলেছে। চমকে উঠলে যখন তার সামনে একটা লোক হাজির হয়ে বলল, "কমল আছ কেমন?"

মুখ তুলে কমল দেখল যুগের যাত্রীর তপেন রায়। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল, একশো টাকা ধার নেওয়ার কথাটা। মুখটা পাংশু হয়ে গেল।

"খেলাটেলা কেমন চলছে, শুনলুম দারুণ প্র্যাকটিস করছ?" চেয়ার টেনে বসতে বসতে তপেন রায় বলল।

"তপেনদা আপনার টাকাটা এখনো দিতে পারিনি, এবার মাইনে পেলেই দিয়ে দেব।"

"টাকা! কিসের টাকা?" তপেন রায় আকাশ থেকে পড়লো।

কমল আরো কুণ্ঠিত স্বরে বলল, "মনে আমার ঠিকই আছে, তবে একেবারে একশোটা টাকা দেওয়ার সামর্থ্য তো নেই।"

তপেন রায় কিছুক্ষণ কমলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে যেন অতিকষ্টে মনে করতে পারলো। তারপর বলল, "ও হো, সেই টাকাটা! আমি তো ভুলেই গেছলুম। আরে দূর, ওটা তোমায় ফেরৎ দিতে হবে না।" তারপর গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, "যাত্রীর কাছে কত টাকা তুমি পাও, সেটা তো আমি ভাল করেই জানি। তোমায় ঠকিয়েছে কি ভাবে তার সাক্ষী আমি ছাড়া আর কে! এ টাকা তো আর মামলা করে যাত্রী আদায় করতে পারবে না। যা পেয়েছ তাই নিয়ে নাও।"

মুহূর্তে কমল সাবধান হয়ে গেল। এতদিন ফুটবল খেলে সে মাঠের লোকেদের চিনেছে। হঠাৎ তপেন রায়ের আবির্ভাব এবং খুবই বন্ধুর মত কথাবার্তা তার ভাল লাগল না। সে সতর্কস্বরে বলল, "তারপর কি মনে করে হঠাৎ.........।"

"বলছি।" তপেন রায় সিগারেট বার করল, ধরাল এবং প্রথম ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "যুগের যাত্রীকে কমল গুহ যে সার্ভিস দিয়েছে তা ভোলার নয়। কিন্তু যাত্রী তার বিনিময়ে তাকে কি দিয়েছে? কিছুই নয়। এই নিয়ে ক্লাবে অনেকে অনেক কথা বলেছে। কমিটি মিটিং ডাকা হয়েছিল। ঠিক হয়েছে তোমাকে এবারের লীগের শেষ খেলার দিন মাঠেই পাঁচ হাজার টাকার চেক্ দেওয়া হবে।"

"যাত্রীর সঙ্গে লীগের শেষ খেলা শোভাবাজারের।"

"তাই নাকি! তাহলে তো ভালোই। কিন্তু সবার আগে তোমার অনুমতি চাই, তুমি গ্রহণ করবে কি না। অবশ্য বলে রাখছি পরশু দিনই কমিটির একটা মিটিং আছে, ব্যাপারটা তখনই পাকাপাকি ঠিক করা হবে।"

কমল একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিল তপেন রায়ের চোখদুটি। অতি সরল। ভিতর থেকে আন্তরিকতা ঠিক্‌রে বেরোচ্ছে। কমল মনে মনে হেসে বলল, "কাল যাত্রীর সঙ্গে খেলার পর আপনাকে জানাবো।"

"কাল তুমি খেলছো না কি?"

"হ্যাঁ।"

তপেন রায় ঘনঘন সিগারেটে টান দিয়ে কি যেন ভাবতে ভাবতে বলল, "এই বাজারে পাঁচ হাজার টাকার দাম কম নয়। বলতে গেলে এক রকম পড়েই পাওয়া। মাথা গরম করে হারিও না এটা। যাত্রী তো নাও দিতে পারে, তবু দেবে বলে মনস্থ করেছে। এতে তোমাকে যেমন সম্মান দেওয়া হবে তেমনি যাত্রীর উপরও প্লেয়ারদের কনফিডেনস আসবে, তাই নয় কি?"

কমল ঘাড় নাড়ল।

"এখনকার ক্লাবগুলো যা হয়েছে, বুঝলে কমল, একেবারে নেমকহারাম। প্লেয়াররাও সেই রকম। পয়সা ছাড়া মুখে কোন কথা নেই। কিন্তু যাত্রী তো সে রকম ক্লাব নয়। প্লেয়ারদের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক না থাকলে ক্লাব চলে না।" তপেন রায় আবেগ চাপতে চুপ করল। কমল কথা বলল না।

"তাহলে তুমি এখন বলবে না টাকা নিতে রাজী কি না?"

"না। কাল খেলার পর এ নিয়ে ভাবব।"

তপেন রায় চলে যাবার পর বিপুল ঘোষ গলা বাড়িয়ে বলল, "পাঁচ হাজার টাকা! ব্যাপার কি?"

"পরীক্ষা দিলাম। স্টপারে খেলি, নানান দিক থেকে আক্রমণ আসে। এটাও একটা।"

"তার মানে?"

"আমরা সবাই তো স্টপার ঘোষদা, কেউ মাঠের মধ্যে কেউ মাঠের বাইরে। ঠেকাচ্ছি আর ঠেকাচ্ছি। এটাও ঠেকালাম— লোভকে। ঘুষ দেবার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল লোকটা। কাল ওদের টিমের সঙ্গে খেলা। আমাদের মজুমদার সাহেবের টিম। এ বছর লীগ চ্যাম্পিয়ন হবার জন্য খেলছে, ভালই খেলছে। হয়তো হয়েও যাবে। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হবার পথে যাতে একটিও কাঁটা না থাকে সেই ব্যবস্থা করতে এসেছিল। আমাকে ওরা একটা কাঁটা ভাবে।"

"ঘুষ দিয়ে? না না মশাই কাল আপনি ভাল করে খেলুন। দারুণ খেলুন। আচ্ছা করে জব্দ করে দিন।"

কমল দেখল বিপুল ঘোষের সারা মুখ আন্তরিকতায় কোমল ও উজ্জ্বল।

"কাল অফিসে আসছেন তো?" দূর থেকে রণেন দাস প্রশ্ন করল।

"কেন?" কমল সচকিতে বলল।

"সেটা আপনি ভালই জানেন। তবে বলে রাখছি পাঁচটার আগে আপনাকে আমি ছাড়তে পারব না।"

"জানি আমি। তবে কাল আমি ক্যাজুয়াল নিচ্ছি।"

অফিস ছুটির পর শোভাবাজার টেন্টে আসা মাত্র কৃষ্ণ মাইতি হাত ধরে বলল, "গুলোকে শিক্ষা দিতে হবে কমল। ব্যাটা টাকা মেরেছে কাজ হাসিল করে নিয়ে। পয়েন্ট চাইই চাই। তুই কিন্তু প্রধান ভরসা। ক্লাবের সবাই তোকে খেলানোর এগেনস্টে. আমি জোর করে বলেছি, কমলকে খেলাতেই হবে।"

নার্ভাস বোধ করল কমল। বিব্রত স্বরে বলল, "কিন্তু কেষ্টদা একা আমার ওপর এতটা ভরসা করবেন না, করা উচিত নয়। ফুটবল একজনের খেলা নয়।"

"তুই একাই এগারোজন হয়ে খেলতে পারিস, যদি মনে করিস খেলবো। তাছাড়া—মনে আছে সেই চাকরির কথাটা. পল্টু মুখুজ্যের মেয়ের চাকরি! যদি কাল একটা পয়েন্ট আনতে পারিস, গ্যারান্টি দিচ্ছি চাকরিটা হবে।"

কমল তর্ক করে কথা বাড়ালো না। হঠাৎ সে ক্লান্ত বোধ করতে শুরু করল। অনেক কিছু নির্ভর করছে কালকের খেলার উপর। এখন যার সঙ্গেই দেখা হবে সে মনের উপর একটা দায়িত্বের পাথর চাপিয়ে দেবে। কমল চেয়ার নিয়ে টেন্টের বাইরে বেড়ার ধার ঘেঁষে বসল।

ভরত এসে বলল, "কমলদা একটা কথা বলার ছিল। খুবই জরুরি কিন্তু এখানে বলব না। আপনি বাইরে আসুন, মিনিট পাঁচেক পর আমি টাউন ক্লাব টেন্টের সামনে থাকব।"

এই বলেই ভরত হন হন করে বেরিয়ে গেল। অবাক কমল চারপাশে তাকাল। ক্যান্টিনের কাছে সত্য আর দেবীদাস হাসাহাসি করছে। স্বপন একটু আলাদা দাঁড়িয়ে ঘুগনি খাচ্ছে। টেন্টের মধ্যে যথারীতি টেবিল ঘিরে গুলতানি। ভরতের কি এমন কথা থাকতে পারে যা একান্তে বলা দরকার!

কমল টাউন টেন্টের কাছে পৌঁছতেই অপেক্ষমাণ ভরত বলল, "কমলদা আমাদের দুজন কাল গট আপ হয়েছে।"

শোনামাত্র কমল জমে গেল। "গট আপ! কারা?"

"আজ সকালে যাত্রীর লোক এসেছিল আমার বাড়িতে। সঙ্গে ছিল শম্ভু। টেরিলিন স্যুট করে দেবে যাত্রী। শম্ভু আর সত্য গোলাম আলিতে মাপ দিয়ে এসেছে।"

"তুই গেলি না?"

ভরত শুধু হাসল। কমলও হাসল। তারপর ভরতের পিঠ চাপড়ে বলল, "এখন কাউকে বলিসনি এসব কথা। আগে

না না মশাই কাল আপনি ভাল করে খেলুন। দারুণ খেলুন।

খেলাটা হোক্।"

"সলিলের কিছু খবর জানেন, আসে না কেন? ও থাকলে খানিকটা সামলানো যেত।"

"সলিল একটা কাজ পেয়েছে, খেলার জন্য আর সময় পায় না। হয়তো আর কোন দিনই পাবে না। কিন্তু ভরত, কাল যেন বাটার সঙ্গে খেলার মত অবস্থা হবে মনে হচ্ছে।"

"কি জানি।" অনিশ্চিত স্বরে ভরত বলল, "আমাদের আর একটা ছেলেও নেই যাকে নামানো যায়। নইলে কেষ্টদাকে বলে সত্য আর শম্ভুকে বসিয়ে দেওয়া যেত।"

ম্লান হেসে কমল বলল, "তাহলে কাল ভাগ্যের উপরই ভরসা করতে হবে।"

"হ্যাঁ ভাগ্যের উপরেই।"

যুগের যাত্রী ৫—০ গোলে শোভাবাজারকে হারালো।

অন্ধকারে ঘরে বিছানায় উপুড় হয়ে কমল শুয়ে। অ্যালার্ম ঘড়ির টিকটিক শব্দ একটানা তার মাথার মধ্যে হাতুড়ির ঘা মেরে চলেছে। কমল হাত দিয়ে দু'কান চেপে অস্ফুটে কাতরালো। এখনো কানে বাজছে ভয়ঙ্কর চীৎকারগুলো। ঘড়িটা আছড়ে ভেঙে ফেলা যায় কিন্তু পাঁচটা গোলের চীৎকার!

গ্যালারীর মাঝখানের সরু পথ দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় উপর থেকে তার মাথায় থুথু পড়ে, ইঁটের টুকরো লাগে পিঠে। একটা চীৎকারও শুনেছিল, "কিরে কমল, অনুপমকে আটকাতে পারিস বলেছিলি না!"

আজ অনুপম তিনটি গোল দিয়েছে। তবে হ্যাট-ট্রিক হয়নি। কমল বিছানায় বারকয়েক কপালটা ঠুকল। অজান্তে একটা গোঙানি মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

"কি গো কমল, যাত্রীর জার্সিকে ভয়ে কাঁপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছেটা এবার ছাড়ো, এবার ছাড়ো।"

গুলোদার হাসিখুশি মুখ আর চিবিয়ে চিবিয়ে বলা কথাগুলো বিছানার মধ্য থেকে উঠে আসছে। বিছানাটাকে ছিঁড়েখুড়ে একশা করা যায় কিন্তু কথাগুলোকে!

"আমি কি করব, যিনি টিম করেছেন তাকে গিয়ে বলুন। বুড়ো প্লেয়ার দিয়ে যদি ফুটবল খেলাতে চান তা হলে খেলান। বলিহারি সখ্! নিজেরও তো একটা আক্কেল-বিবেচনা থাকে।" সরোজ খেলাশেষে মাঠের উপর দাঁড়িয়ে একজনকে যখন কথাগুলো বলছিল কমল মুহূর্তের জন্য দেখেছিল চাপা তৃপ্তির আমেজ তার চোখে মুখে ছড়িয়ে রয়েছে।

খেলার শেষ বাঁশি বাজতেই ভরত ছুটে গিয়ে মাঠের মধ্যেই শম্ভুকে চড় কষায়। শম্ভু লাথি মারে ভরতকে। দু'জনকে যখন সরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল তখন চীৎকার করে শম্ভু বলে, "গোল কি আমার দোষে হয়েছে? ওই লোকটা, ওই লোকটার জন্য।"

শম্ভুর আঙুল একটা ছোরার মত উঠে কমলকে শিকার করে। কোনদিকে না তাকিয়ে কমল মাঠ থেকে বেরিয়ে আসে।

"এত ভরসা করেছিলুম তোর ওপর। আমায় একেবারে ডুবিয়ে দিলি।" কেষ্টদার হতাশ এবং বিরক্ত কণ্ঠস্বরে কমলের চকিতে মনে পড়েছিল অরুণার চাকরিটা আর তা'হলে হল না।

মুখ দেখাবার উপায় কোথাও আর রইল না। বাটার সঙ্গে খেলাটাই আবার অনুষ্ঠিত হল। তবে যাত্রী আরো দক্ষ, আরো কঠিন এবং উদ্দেশ্যপরায়ণ। কমল চোখ বুঁজে এখনো দেখতে পাচ্ছে অনুপম আর প্রসূন তার দু'পাশ দিয়ে ঢুকছে আর ফাঁকা মাঝমাঠ দিয়ে বল নিয়ে উঠে আসছে যাত্রীর রাইট ব্যাক। স্বপন আর রুদ্র কোন্‌দিকে কাকে আটকাবে ভেবে পাচ্ছে না। কমল স্থির করেছিল আজ সে অনুপমকে রুখবে। কিন্তু অনুপমের পাশাপাশি প্রসূন সবসময় ছিল তাকে ধাঁধায় ফেলার জন্য। যেখানেই বল প্রসূন সেখানে তার দলের খেলোয়াড়ের পাশে গিয়ে হাজির হয়েছে। শোভাবাজারের একজনের সামনে যাত্রীর দু'জন ফরোয়ারড সব সময়ই। লোক পাহারা দেবে না জমি আগলাবে কমল এই সমস্যা সমাধান করতে পারেনি লোকের অভাবে। এবং কেন এই অভাব ঘটল একমাত্র সে আর ভরত তা জানে।

কিন্তু সে-কথা এখন বললে লোকে বলবে সাফাই গাইছে। উপায় নেই, মুখ দেখাবার কোন উপায় আর রইল না। বিদ্রূপ আর ইতর মন্তব্য শুনতে হবে বহুদিন। কমল বিছানায় মুখটা চেপে ধরে থরথরিয়ে কাঁপতে শুরু করল।

হঠাৎ ঘরের আলোটা কে জ্বালল। কমল ছিটকে উঠে বসল।

"কমলদা আমি এসেছি।" ঘরের মধ্যে সলিল দাঁড়িয়ে। মুখে লাজুক বিব্রত হাসি।

"কেন?"

"শুনলুম আজ পাঁচ গোলে শোভাবাজার হেরেছে।"

কথা না বলে কমল এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

"আমি খেলব কমলদা। আমি আর বাড়িতে ফিরব না। কাজ আমি করতে চাই না, আমি খেলতে চাই। আমাকে শুধু দুমুঠো খেতে দেবেন আর একটু ঘুমোবার জায়গা।"

উঠে দাঁড়াল কমল।

"আমি বাড়ির জন্য আর ভাবব না। ওদের বাঁচানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি—"

এরপরই সলিল পেটটা চেপে ধরে ছিটকে দেয়ালে আছড়ে পড়ল কমলের লাথি খেয়ে।

"কি জন্য এসেছিস এখানে। রাসকেল, করুণা দেখাতে এসেছিস? পাঁচ গোল খেয়েছি বলে সাহায্য করতে এসেছিস? ফুটবল খেলে আমায় উদ্ধার করতে এসেছিস?" বলতে বলতে কমল আবার লাথি কষাল। সলিল কাত হয়ে মেঝেয় পড়ে গেল। তার পিঠে কোমরে মাথায় কমল পাগলের মত এলোপাথাড়ি লাথি মারতে শুরু করল। চুল ধরে টেনে তুলে মুখে ঘুসি মারল।

"আমায় মারবেন না কমলদা, আমি চলে যাচ্ছি, আমি চলে যাচ্ছি।" সলিল উঠে বসতেই কমল ওর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল।

"কেন এসেছিস, বল্, কেন এসেছিস?"

সলিল হাঁ করে মুখটা তুলে তাকিয়ে। ঠোঁটের কোণ বেয়ে, নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে আর চোখ বেয়ে জল, ও কথা বলার আগেই দরজার কাছ থেকে অমিতাভ বলে উঠল, "ছাড়ুন, ওকে ছাড়ুন।"

দ্রুত ঘরে ঢুকে সে সলিলের চুল-ধরা কমলের হাতে ধাক্কা দিল।

"তোমার কি দরকার এখানে?"

"আপনি এ-ভাবে মারছেন কেন ওকে?"

"আমি যা করছি তাতে তোমার নাক গলাতে হবে না।"

"একজনকে এ-ভাবে মারবেন আর তাই দেখে বাধা দেব না? দেখুন তো কি অবস্থা হয়েছে ওর। জানোয়ারকেও এভাবে মারে না।"

"না না, কমলদা আমায় মারেনি।" সলিল দু'হাত তুলে অমিতাভের কাছে আবেদন জানাল ঘড়ঘড়ে স্বরে। "কমলদা আমায় কখনো মারেন না, শুধু আমায় শাস্তি দেন।"

"চুপ করো তুমি।" অমিতাভ ধমক দিল সলিলকে। তারপর ঝুঁকে তার শীর্ণ হাতটা বাড়িয়ে সলিলের কাঁধে আঙুল ছোঁয়াল। "এসো আমার ঘরে মুখ ধুইয়ে মলম লাগাতে হবে।"

অমিতাভ বেরিয়ে যাবার সময় থমকে একবার কমলের দিকে তাকাল। অদ্ভুত একটা ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে কমলের মুখে ফুটে উঠেছে দীনতার ছাপ। বয়সটা যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। কমল কুঁজো হয়ে ধীরগতিতে এসে খাটের উপর বসল। শূন্য দৃষ্টিতে সলিলের দিকে তাকিয়ে থেকে অন্যমনস্কের মত চুলে আঙুল চালাতে লাগল।

সলিল ওঠবার চেষ্টা করে যন্ত্রণায় কাতরে উঠে পেট চেপে বসে পড়ল। আবার চেষ্টা করল ওঠবার। আবার বসে পড়ল অসহায়ভাবে কমলের দিকে তাকাল। এক দৃষ্টে কমল তার দিকে তাকিয়ে, চোখে কোন অভিব্যক্তি নেই।

"আপনার মাথায় দাগটা এখান থেকেও আমি দেখতে পাচ্ছি কমলদা।"

কমল নিরুত্তর রইল। সলিল হাসবার চেষ্টা করল, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কমল চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে যেতে লাগল। অনেকক্ষণ পর অমিতাভ ঘরে ঢুকে মৃদুস্বরে বলল, "আপনি শুয়ে পড়ুন।"

কমল মুখ তুলে কিছুক্ষণ ধরে অমিতাভর মুখের উপর চোখ রাখল। ক্রমশ সম্বিৎ ফিরে এল তার চাহনিতে। মুখটা দুমড়ে গেল বেদনায়। ফিসফিস করে সে বলল, "আমি শেষ হয়ে গেলাম।"

অমিতাভ আলো নিভিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে

দিল।

পরদিন থেকে কমল যেন বদলে গেল। চেহারায় এবং মনেও। অফিসে সারাক্ষণ নিজের চেয়ারে থাকে। কথা বলে না প্রয়োজন না হলে। ছুটির পর সোজা বাড়ি চলে আসে। গড়ের মাঠের পথ আর মাড়ায় না। অফিসে অরুণা ফোন করেছিল। কমল কথা বলেনি। বিপুল ঘোষকে সে বলতে বলে, 'অফিসে আসেনি, জানিয়ে দিন।'

কমল যতটা ভেবেছিল তেমন কোন বিদ্রূপ অফিসে বা অন্য কোথাও তাকে শুনতে হয়নি। সবাই যেন ধরেই নিয়েছে এমনটিই হবে। ওর মনে হয় এইরকম ঔদাসীন্যের থেকে বরং বিদ্রূপই ভাল ছিল। মাসের মাইনে পেয়েই সে রথীনের ঘরে গিয়ে একশো টাকার একটি নোট টেবলে রেখে বলে, "ধার নিয়েছিলাম, সেই টাকাটা।"

"ধার! আমি তো দিইনি। যে দিয়েছে তাকে দিয়ে এসো।" রথীন নোটটা এবং কমলের দিকে আর না তাকিয়ে কাজে মন দেয়।

কমল দ্বিধায় পড়ে। অফিসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভেবে সে স্থির করে তপেন রায়ের হাতেই টাকাটা দিয়ে আসবে। ছুটির পর সে যাত্রীর টেন্টের দিকে রওনা হয়। যখন পৌঁছল যাত্রীর প্লেয়াররাও ঠিক তখনই এরিয়ান মাঠ থেকে ফিরল বি এন আর-কে ২—০ গোলে হারিয়ে। প্রায় শ'খানেক লোক হৈ-চৈ করছে টেন্টের মধ্যে ও বাইরে। কমল একধারে দাঁড়িয়ে খুঁজতে লাগল তপেন রায়কে।

"আরে কমলোবাবু, ইখানে দাঁড়িয়ে!" ক্লাবের বুড়ো মালি দয়ানিধি কমলকে দেখে এগিয়ে এল।

"তপেনবাবুকে খুঁজছি, কোথায় বলতে পার?"

"ভিতরে আছে বোধ হয়, যান না।"

ইতস্তত করে কমল ভিতরে গেল।

তপেন রায় কয়েকটি ছেলের পথ আটকে প্লেয়ারদের ড্রেসিং-রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলছে, "না না এখন নয়। ওরা এখন টায়ার্ড। এখন কোন কথাবার্তা নয়।"

কমল এগিয়ে গেল। তাকে দেখে তপেন রায় অবাক হয়েও স্বাভাবিক স্বরে বলল, "কি খবর কমল?"

"একটু দরকার ছিল।"

"দেখছো তো কি অবস্থা, এখান থেকে নড়ার উপায় নেই, যা বলার বরং এখানেই বলো।"

কমল নোটটা পকেট থেকে বার করে এগিয়ে ধরে বলল, "টাকাটা দিতে এসেছি।"

তপেন রায় কি ভেবে নিয়ে তাচ্ছিল্যভরে বলল, "ও টাকা তুমিই রাখো। এত বছর যাত্রীতে খেলে গেলে ট্রফি-ফ্রফি তো কিছুই ক্লাবকে দিতে পারোনি, টাকা ফেরৎ দিয়ে ক্লাবের কি আর এমন উপকার করবে? এ-বছর যাত্রী লীগ পাচ্ছেই, শুধু বড় টিম দুটোর সঙ্গেই আসল যা খেলা বাকি; তারপর শুধু বাজিই পুড়বে দশ হাজার টাকার। একশো টাকার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই।"

শুনতে শুনতে কমলের পা দুটো কেঁপে উঠল। মাথার মধ্যে লক্ষ গোলের চীৎকার। তবু ঠান্ডা গলায় বলল, "বাজি পোড়ানো দেখতে আমি আসব। কিন্তু টাকা আপনাকে ফেরৎ নিতে হবে। যাত্রীর কাছে আমি ঋণী থাকব না, থাকতে চাই না।"

ওদের ঘিরে বহু লোকের ভিড় জমে গেছে। গুলোদা এই সময় টেন্টে ঢুকলো। ভিড় দেখেই কৌতূহলভরে এগিয়ে এল।

"ব্যাপার কি? আরে কমল যে!"

"এক সময় দরকারে টাকা নিয়েছিলুম। ফেরৎ দিতে এসেছি কিন্তু তপেনদা নিচ্ছেন না।"

"সেই টাকাটা গুলোদা, আপনিই তো বলেছিলেন দরকার নেই ফেরৎ নেবার।" তপেন রায় মনে করিয়ে দিল ব্যস্ত ভঙ্গিতে।

"অ। দিতে চায় যখন নিয়ে নাও তবে," গুলোদা অতি মিহি স্বরে বলল, "যাত্রীর শেষ খেলা শোভাবাজারের সঙ্গে, যদি কমল কথা দেয় সেদিন খেলবে না তা হলেই ফেরৎ নেব।"

ভীড়ের মধ্য থেকে একজন বলল, "খেললেই বা কমল গুহ, যাত্রী এবার দশ গোল ভরে দেবে শোভাবাজারকে।"

স্মিতমুখে গুলোদা বলল, "সেইজন্যই তো বলছি, কমলের মত এতবড় প্লেয়ারের টিম দশ গোল খাচ্ছে, এ দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারব না। এটা যাত্রীর পক্ষেও বেদনাদায়ক হবে। হাজার হোক এক সময় কমল তো যাত্রীর-ই ছিল।"

"ঠিক্ ঠিক্, গুলোদা ঠিক বলেছেন।" ভিড়ের একজন মাথা নেড়ে বলল, "কমলদা আপনি কিন্তু সেদিন খেলতে পারবেন না। আপনার ইজ্জতের সঙ্গে যাত্রীর ইজ্জতও জড়িয়ে আছে।"

পাংশু কালো মুখ নিয়ে কমল হাসল। এরা আজ অপমান করার জন্য পন্থা নিয়েছে করুণা দেখাবার। ওর ইচ্ছে করল নোটটা টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিয়ে চীৎকার করে বলে উঠতে, আমি এখনো শেষ হয়ে যাইনি, যাইনি। কিন্তু ঠিক তখনই কমলের বুকের মধ্যে এক বৃদ্ধ কণ্ঠ ফিসফিস করে উঠল—

ব্যালানস, কমল, ব্যালানস কখনো হারাসনি।

ম্লান চোখে কমল সকলের মুখের উপর দিয়ে চাহনি বুলিয়ে ধীর স্বরে বলল, "টাকাটা ফেরৎ নিন্। আমার আর খেলার ইচ্ছে নেই।"

নোটটা তপেন রায়ের হাতে গুঁজে দিয়ে কমল বেরিয়ে এল যাত্রীর টেন্ট থেকে। মাথার মধ্যেটা অসাড় হয়ে গেছে। হাঁটু দুটো মনে হচ্ছে মাখনে তৈরী, এখনি গলে গিয়ে তাকে ফেলে দেবে। বুকের মধ্যে দপ্‌দপ্ করে জ্বলে উঠতে চাইছে শোধ নেবার একটা প্রচন্ড ইচ্ছা। যে বিমর্ষতা, হতাশা তাকে এই কদিন দমিয়ে রেখেছে সেটা কেটে গিয়ে এখন সে অপমানের জ্বালায় ছটফট করে উঠতে চাইছে। উদ্দেশ্যহীনের মত ময়দানের মধ্য দিয়ে এলোপাথাড়ি হাঁটতে হাঁটতে কমল কখন যে শোভাবাজার টেন্টে পেঁাছে গেছে খেয়াল করেনি। ডাক শুনে তাকিয়ে দেখল ভরত আর সলিল ক্যান্টিনের সামনে দাঁড়িয়ে। ভরত এগিয়ে এল, সলিল এল না।

"আপনার কি অসুখ করেছে কমলদা? কেমন যেন শুকনো দেখাচ্ছে। অনেকদিন আসেন না, ভেবেছিলুম আপনার বাড়িতে যাব।"

প্রশ্নটা এড়িয়ে কমল বলল, "ক্লাবের খবর কি বল্।"

"খবর আর কি, যা হয়ে থাকে প্রতিবছর তাই হচ্ছে। তিনটে ড্র করে তিন পয়েন্ট ম্যানেজ হয়েছে, তবু এখনো ভয় কাটেনি।" ভরত বিপন্ন হয়ে বলল, "ভাল লাগেনা কমলদা। এইভাবে ফার্স্ট ডিভিশনে খেলার কোন মানে হয় না।"

"সলিল কি খেলছে?"

"কেন, আপনি জানেন না! ও তো লাস্ট চারটে ম্যাচে খেলেছে, বেশ ভাল খেলছে। ইস্ট বেঙ্গলের দিন হাবিবকে নড়াচড়া করতে দেয়নি। সব কাগজে ওর কথা লিখেছে।"

"তাই নাকি, আমি কাগজ পড়া ছেড়ে দিয়েছি। আর কি খবর আছে?"

"আর যা আছে সেটা খুব মজার। সত্য আর শম্ভু তো গোলাম আলিতে সুটের মাপ দিয়ে এসেছিল। সাত দিন পর ট্রায়াল দিতে গিয়ে শোনে, গুলোদা টেলিফোন করে আগেই জানিয়ে রেখেছিল তার অর্ডার না পাওয়া পর্যন্ত কাঁচি ধরবে না, শুধু মাপটা নিয়ে রেখে দেবে। ওরা জানালো গুলোদা আর দেখা করেনি। শুনে সত্য আর শম্ভু তো ফুঁসছে, এভাবে বোকা বনে যাবে ওরা কল্পনাও করতে পারেনি। কথাটা কাউকে বলতেও পারছে না, কিল খেয়ে কিল চুরি করা ছাড়া ওদের আর উপায় নেই। এখন বলছে রিটার্ন ম্যাচটায় যাত্রীকে দেখে নেবে।"

কমল ফিকে হাসল মাত্র কথাগুলো শুনে। বলল, "সরোজ কোথায়, প্র্যাকটিস কেমন চলছে?"

"কোথায় প্র্যাকটিস! সরোজদা তো প্রায় দশ দিন হলো

টেণ্টই মাড়ায় না। শুনেছি জামসেদপুর না দুর্গাপুরে চাকরি পেয়েছে। সলিল, স্বপন, রুদ্র, এরাই যা বল নিয়ে সকালে নাড়াচাড়া করে। সকালে এখন এক কাপ চা আর দুটো টোস্ট ছাড়া আর সব বন্ধ করে দিয়েছে কেষ্টদা।"

"সলিল চাকরিটা করছে কি এখনো?"

"একদিন ওর বাবা এসেছিল খুঁজতে। সলিল কাজ ছেড়ে দিয়েছে, বাড়িতেও থাকে না। কোথায় থাকে কেউ জানে না। ওকে জিজ্ঞাসা করেছি, ঠিকানা দেয়নি।"

"সলিলকে বলিস আমার সঙ্গে দেখা করতে।"

কমল বাড়ি ফেরার জন্য রওনা হতেই ভরত মাথা চুলকে বলল, "সেদিনের পর থেকে আর আপনি আসেন না।"

"হ্যাঁ, আর ভাল লাগেনা। মাঠ থেকে এবার চলে যাওয়াই উচিত। আমার কোন ফোন এসেছিল কি?"

"জানিনা তো।"

বাড়ি ফিরেই কমল শুনলো কালোর মা গজগজ করে চলেছে, "বাইরের লোকের প্যাণ্ট আমি কেন কাচবো? বাইরের লোকের খাওয়া এঁটো বাসন মাজতে হবে, এমন কথা তো বাপু ছিল না। মাইনে না বাড়ালে আমি আর বাড়তি কাজ করতে পারব না" ইত্যাদি ইত্যাদি।

"বাইরের লোকটা আবার কে?" কমল কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করে।

"কেন দাদাবাবুর যে বন্ধুটি থাকে!"

"থাকে! দাদাবাবুর বন্ধু?"

"কেন আপনি জানেন না?" কালোর মা বিস্ময়ে চোখ কপালে তোলার উপক্রম করতে কমল আর কথা বাড়ালো না।

রাত্রে কমলের মনে হল অমিতাভর ঘরে চাপা স্বরে কারা কথা বলছে। সকালে অমিতাভর ঘরের সামনে দিয়ে যাতায়াত করার সময় খুঁটিয়ে ঘরের মধ্যে লক্ষ্য করে সে কিছুই বুঝতে পারল না। ভাবলো, অমিতাভকে জিজ্ঞাসা করবে।

অফিসে বেরোবার সময় অমিতাভ তার কাছে কুড়িটা টাকা চাইলো। এক সপ্তাহে চল্লিশ টাকা দিয়েছে তাই কমল অস্বস্তিভরে বলল, "হঠাৎ এত ঘন ঘন টাকার দরকার হচ্ছে যে? আমি যা মাইনে পাই তাতে এভাবে চললে কুলিয়ে ওঠাতো সম্ভব হবে না।"

"এক বন্ধুর অসুখ তাকে ওষুধ কিনে দেবার জন্য—" অমিতাভ ঢোঁক গিলে বলল।

"কালোর মা বলছিল তোমার এক বন্ধু নাকি এখানে খায়?"

"তিন-চারদিন খেয়েছে। আর খাবে না।"

টাকা দেবার সময় কমল বলল, "খাওয়ার জন্য আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না।"

এরপর কমল লক্ষ্য করল অমিতাভ যেন ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। গম্ভীর ভারিক্কি ভাবটা আর নেই, চলাফেরায় চঞ্চলতা দেখা যাচ্ছে, চেঁচিয়ে হঠাৎ গানও গেয়ে ওঠে, এমনকি একদিন সকালে উঠে চা তৈরী করে সে কমলকে ডেকে তুলেছে। কমল লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে, "খেলা ছেড়ে দিয়ে দেখছি অভ্যাস খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সকালের একসারসাইজটা আবার শুরু করতে হবে কাল থেকে।"

"আপনি খেলা ছেড়ে দিয়েছেন?" অবাক হয়ে অমিতাভ জিজ্ঞাসা করে।

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

কমল জবাব না দিয়ে বাজার রওনা হয়। সেইদিন শোভাবাজার টেণ্টে গিয়ে সে শোনে মহমেডানের সঙ্গে খেলায় বলাই ও অ্যামব্রোজ মারপিট করায় রেফারী দুজনকেই মাঠ থেকে বার করে দিয়েছে, আর শ্রীধরের হাঁটুর পুরনো চোটটায় আবার লেগেছে যার ফলে তার দাঁড়াবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। টেণ্টে সকলেরই মুখ শুকনো, দুশ্চিন্তায় কপালে কুঞ্চন। খেলার মত এগারজন প্লেয়ার এখন শোভাবাজারের নেই। সহ-সম্পাদক অবনী মণ্ডল ওকে দেখে ছুটে এসে বলে, "কমলবাবু আপনার কাছেই যাব ভাবছিলুম। আপনাকে বাকি ম্যাচ তিনটে খেলতে হবে।"

"না।" কমল গম্ভীর স্বরে বলে, "আমি আর খেলব না।" তারপর সে টেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়ে হতভম্ব অবনী মণ্ডলকে ফেলে রেখে।

অস্বস্তিপূর্ণ মন নিয়ে কমল বাড়ি ফিরল। শোভাবাজার এখন সত্যিই দুরবস্থায়। অথচ সে খেলবে না বলে এল। এই ক্লাব থেকেই সে গড়ের মাঠে খেলা শুরু করেছিল। ব্যাপারটা নেমকহারামির মত লাগছে। ইচ্ছে করলে তিনটে ম্যাচ এখন সে অনায়াসে খেলে দিতে পারে। শেষ ম্যাচটা যাত্রীর সঙ্গে। গুলোদার বিদ্রূপভরা কথাগুলো কমলের কানে বেজে উঠল। তপেন রায়ের হাতে একশো টাকার নোটটা দেবার আগে সে বলেছিল, আর খেলব না। তখন দাউদাউ আগুন জ্বলছিল মাথার মধ্যে। আর এখন শুধু ছাই হয়ে পড়ে আছে তার প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছাটা।

অমিতাভর ঘর অন্ধকার। কমল নিজের ঘরে ঢুকে জামা-প্যাণ্ট বদলে ইজিচেয়ারে গা ঢেলে দিল আলো নিভিয়ে। কুড়ি বছরের খেলার জীবনের অজস্র কথা আর দৃশ্য মনের মধ্যে ভীড় করে ঠেলাঠেলি করছে। তার মধ্যে বারবার দেখতে পাচ্ছে, পল্টুদাকে, শুনতে পাচ্ছে গলার স্বর—"প্র্যাকটিসটা আরো ভালো করে কর্। হতাশা আসবে তাকে জয় করতেও হবে...তুই খেলা ছেড়ে দিবি বলছিস, তার মানে তুই বড় খেলোয়াড় হতে পারিসনি।"

না পারিনি। কমল বারবার নিজেকে শোনাতে থাকে, পারিনি, আমি হতে পারিনি। আমার মধ্যে প্রশান্তি আসেনি। অনেক কিছুই অপূর্ণ রয়ে গেছে।

অমিতাভর ঘরের দরজা খোলার এবং আলো জ্বালানোর শব্দ হল। কমলের মনে পড়ল আজ সকালে সে স্কিপিং দড়িটা খুঁজে পায়নি। অমিতাভ কি কোন কাজে নিয়ে গেছে তার ঘরে! জিজ্ঞাসা করার জন্য সে উঠল। আলো জ্বালল। চটি পরে 'অমিত' বলে ডেকে ঘর থেকে বেরোবার সময় তার মনে হল পাশের ঘরে দ্রুত একটা ঘষড়ানির শব্দ হল। দ্রুত অমিতাভর ঘরের দরজায় পৌঁছে সে দেখল খাটের নীচে কেউ ঢুকে যাচ্ছে, পলকের জন্য দুটি পা শুধু দেখতে পেল।

চোর! কমল থমকে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও চেঁচাল না। পা দুটো তার চেনা মনে হল। প্যাণ্টের যতটুকু দেখতে পেয়েছে সেটাও খুব পরিচিত। সলিল!

দুহাতে পাঁউরুটি নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে অমিতাভ থমকে তারপর আড়ষ্ট হয়ে গেল কমলকে খাটে বসে একটা বইয়ের পাতা ওল্টাতে দেখে।

"পাঁউরুটি! কেন ভাত রান্না হয়নি?"

"আজ শরীরটা ভাল নয়, তাই—"

"এতগুলো? এ তো প্রায় দুজনের মত দেখছি!"

"কালকের জন্যও এনে রাখলুম।"

কমল গম্ভীর মুখে আবার কয়েকটা পাতা উলটিয়ে গেল। অমিতাভ সন্তর্পণে ঘরের চারধারে চোখ বুলিয়ে নিল।

"ফুটবল যারা খেলে তাদের তুমি ঘৃণা করো। যেমন আমায় করো।" কমল অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে কিন্তু প্রতিটি শব্দ স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল। "তোমার মা-র মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী এই ভেবে তুমি কখনো আমায় সহজভাবে নিতে পারোনি, বাপ-ছেলের সম্পর্ক আমাদের হয়নি। হ্যাঁ স্বীকার করি, তাকে অবহেলা করে আমি ফুটবলকেই বড় করে দেখেছি। আমি শুধু জানতে চাই আমার প্রতি ঘৃণাটা তোমার আছে কি এখনো?"

অমিতাভ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, "আমি বুঝতে পারছি না হঠাৎ এসব কথা বলছেন কেন?"

"কৌতূহলে। তোমার কি কখনো কৌতূহল হয় না, খেলার জন্য তোমার মাকে অগ্রাহ্য করেছে যে লোক তার খেলা একবারও দেখার?"

"হয়, কিন্তু ওই কারণে নয়। ফুটবলকে এত ভালবেসে শেষে অপমান তাচ্ছিল্য নিয়ে খেলা থেকে সরে যাচ্ছে যে লোকটি তার খেলা একবার দেখতে ইচ্ছে করে।"

কমল তীব্র চোখে তাকাল ছেলের দিকে। অমিতাভ অচঞ্চল।

"শুধু এইজন্য ইচ্ছে করে?"

"না। খেলাকে ভালবাসলে মানুষ কি পরিমাণ পাগল হয় সেটা দেখতে দেখতেই আমার কৌতূহল জেগেছে।"

"কাকে দেখে, সলিলকে?"

অমিতাভ চমকে উঠে কমলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বিস্ময় তার সারা মুখে।

"তুমি ওকে আশ্রয় দিয়েছ কেন?" কমল কঠিন স্বরে প্রশ্ন করল।

"ও আমাকে অবাক করেছে। সেদিন অমানুষিক মার খাবার পর বলেছিল, কমলদার মত আমার মাথায় দাগ তৈরী হবে না, আমার মাথা ফাটেনি। এই বলে ও কেঁদেছিল। ও আশ্রয় চেয়েছিল,, আমি আশ্রয় দিয়েছি। এই ঘরে। ভোরে বেরিয়ে যায়, দুপুরে আসে, বিকেলে বেরিয়ে রাত্রে আসে। ও নিজের বাপ-মা ভাই-বোনদের ত্যাগ করেছে। ওর মধ্যে আমি অনেক কিছু না-বোঝা ব্যাপার বুঝতে পেরেছি।"

"কি বুঝেছ, কি বুঝেছ?" কমল উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠল। "আমার কোন দোষ ছিল না। খেলা শুধু শারীরিকই নয় একটা মানসিক ব্যাপারও এটা বুঝেছ কি?"

"আপনার খেলা দেখার পর সেটা বুঝব।"

"তুমি আমার খেলা দেখবে! কমল হাত বাড়িয়ে ধীরে ধীরে হাতটা নামিয়ে নিল। অমিতাভ মাথাটা কাত করল।"

কমল পরদিন অফিস থেকে শোভাবাজার টেন্টে ফোন করল, "আমি খেলব, যাত্রীর সঙ্গে খেলাটায়।"

এগারো

কাঁসর, শাঁখ, পটকা নিয়ে যাত্রীর 'সমর্থকরা ইসটবেঙ্গল মাঠের সবুজ গ্যালারী ছেয়ে রয়েছে। দশ গজ পরপর হাতে উড়ছে যাত্রীর পতাকা। যুগের যাত্রী আজ লীগ চ্যাম্পিয়ন হবে। যাত্রীর ইতিহাসে প্রথম। আর দুটি পয়েন্ট তাদের দরকার। যাত্রীর সমান খেলে ইস্টবেঙ্গল এক পয়েন্টে পিছিয়ে, মোহনবাগান তিন পয়েন্টে, মহমেডান ছয় পয়েন্টে। প্রত্যেকেরই একটি করে খেলা বাকি। যাত্রীকে আর ধরা যাবে না। যদি আজ যাত্রী ড্র করে এক পয়েন্ট খোয়ায় তা হলে ইস্টবেঙ্গল সমান-সমান হবার সুযোগ পাবে, কেন না তাদের শেষ ম্যাচ জর্জ টেলিগ্রাফের সঙ্গে। প্রথম খেলায় টেলিগ্রাফকে চার গোলে হারিয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

গ্যালারীতে একজন দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলল, "যাত্রী আজ যদি হেরে যায়! খেলার কথা তো কিছুই বলা যায় না।"

অবশ্য লোকটি কয়েক মুহূর্ত পরেই বুদ্ধিমান হয়ে গেল এবং সবাইকে শুনিয়ে বলল, "পি সি সরকার কিংবা পেলে ছাড়া যাত্রীকে আজ হারাবার ক্ষমতা কার আছে! আগের ম্যাচে কিভাবে শোভাবাজার পাঁচ গোল খেয়েছিল মনে পড়ে?"

"শোভাবাজারের সেই টিমই খেলবে।" খুব বোদ্ধার মত আর একজন বলল, "সিজন যত শেষ হয়ে আসে, বর্ষা নামে, ছোট টিম ততই টায়ার্ড হয়, খারাপ খেলে। আমার তো মনে হয় রেকর্ড গোল দিয়ে যাত্রীর লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আজই সুযোগ।"

"দাদা, আগের ম্যাচে তো কমল গুহ খেলেছিল আজও খেলবে কি?"

"কে জানে? অনেক দিন তো কাগজে নামটাম চোখে পড়েনি। আর খেললেই বা কি আসে যায়?"

"জানেন তো যাত্রী ছেড়ে যাবার সময় কমল গুহ কি বলেছিলো?"

"আরে রাখুন ওসব বলাবলি। অনুপম আর প্রসুন আজ ওর পিন্ডি চটকে ছাড়বে। দম্ভ নিয়ে মশাই কজন তা রাখতে পেরেছে? রাবণ পারেনি, দুর্যোধন পারেনি, হিটলার পারেনি আর কমল গুহ পারবে?"

আজ শোভাবাজারের সমর্থক শুধু ইস্টবেঙ্গল মেম্বার গ্যালারি। তাদের মনে একটা ক্ষীণ আশা—যদি যাত্রী হারে। হারলে, ইস্টবেঙ্গলের চ্যাম্পিয়ন হওয়া পেলে বা পি সি সরকারও বন্ধ করতে পারবে না।

"অসম্ভব, হতি পারে না। যাত্রীর হার হতি পারে না। শোভাবাজারের আছেডা কে? লীগটা লইয়াই গেল শ্যাস পর্যন্ত।" কপালে করাঘাত হল।

"চ্যাচাইয়া যদি জেতন্ যায় তো আজ কল্‌জে ফাটাইয়া দিমু। কি কস্?"

"তাই দে।"

"নিচ্চয়, আজ যেমন কইরা হোক জেতাইতে হইবই। ক্যান্. স্পোর্টিং ইউনিয়নের দিন জেতাই নাই ইস্টবেঙ্গলেরে।"

"আরে মহাই চেঁচিয়ে জেতাবেন স'বাজার সে টিম নয়। পহাকড়ি দিয়ে দু-চারটে প্লেয়ারকে যাত্রী ঠিক ম্যানেজ করে রেকেছে। সোলো বচ্চরতো খেলা দেখচি।"

"ছারপোকা! আমাগো গ্যালারিতে?"

"ছাইড়া দে। অগো আর আমাগো আজ কমন ইন্টারেস্ট। ইংরাজি বোঝোস তো?"

"চার বছ্ছর আই এছ্ছি পড়ছি। ইন্টারেস্ট মানে সুদ তা আর জানি না?"

পাশেই এরিয়ানের গ্যালারীর অংশে রয়েছে যুগের যাত্রীর মেম্বাররা। সেখানে হৈহৈ পড়ে গেছে বিপুল কলেবর 'ফিল্ড-মার্শাল'কে দেখে। বিরাট গোঁফওলা লোকটি, চারটি সিগারেট মুঠো করে রাখা পাঁচ আঙুলের ফাঁকে। এক একটি টান দিচ্ছে আর মুখ থেকে পাট কলের চিমনীর মত ধোঁয়া বার করছে। যাত্রী ম্যাচ জেতার পর 'ফিল্ড মার্শাল' এইভাবে সিগারেট খায়। আজ খেলা শুরুর আগেই খাচ্ছে।

'ফিল্ড মার্শালে'র পিছন পিছন দুটি চাকর বিরাট এক হান্ডা নিয়ে গ্যালারিতে এসেছে। ওতে আছে ১৫ কিলো রান্না করা মাংস। খেলা শেষে ভাঁড়ে বিতরণ করা হবে। হুটোপটি পড়ে গেল হান্ডার কাছাকাছি থাকার জন্য।

"বড় খিদে পেয়েছে দাদা, ব্যাপারটা অ্যাডভান্সই চুকিয়ে ফেলুন না। রেজাল্ট তো জানাই আছে তবে আর আমাদের কষ্ট দেওয়া কেন?"

"নো নো। এখন নয়।" ফিল্ড মার্শাল দুহাত তুলল। "অফিসিয়াল ভিকট্রির পর।"

মাঠের এক কোণায় গ্যালারীতে রয়েছে শোভাবাজার স্পোরটিংয়ের ডে-স্লিপ নিয়ে যারা এসেছে। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই অবশ্য মনে মনে যাত্রীর সমর্থক। বিপুল ঘোষ আজ প্রথম মাঠে এসেছে কমলের কাছ থেকে স্লিপ নিয়ে। তারপাশেই বসেছে অমিতাভ। চুপচাপ একা। সলিল তাকে স্লিপ দিয়েছে। ফুটবল মাঠে আজই প্রথম আসা। ওদের পিছনে বসে অরুণা আর পিন্টু। গতকাল কমল গেছল ওদের বাড়িতে; পল্টু মুখারজির ছবির সামনে চোখ বুঁজে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, ছবিতে মাথা ঠেকিয়ে সে বিড়বিড় করে কিছু বলে। পিন্টুও তার দেখাদেখি প্রণাম জানায়। পিন্টুই বায়না ধরে, কমল মামার খেলা সে দেখবে।

গ্যালারিতে পিন্টু অধৈর্য হয়ে ছটফট করে, কখন টিম নামবে? অরুণা ছোটবেলায়, পিন্টুরই বয়সে, বাবার সঙ্গে মাঠে এসে দেখেছে কমলের খেলা, শুধু মনে আছে সারা মাঠ উচ্ছ্বসিত হয়েছিল কমলকে নিয়ে। আজ তারও প্রচন্ড কৌতূহল। বিপুল ঘোষ ঘড়ি দেখে পাশের অমিতাভকে বলল, "খেলা ক'টায় আরম্ভ বলতে পারেন?" অমিতাভ মাথা নাড়ল। শোভাবাজারকে কতকটা বিদ্রূপ জানাতেই প্রচন্ড শব্দে মাঠের মধ্যে পটকা পড়ল, তারপর

পিণ্টু প্রবল উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "মা, ওই যে কমল মামা।"

কয়েক দিন ধরে কমল বারোটি ছেলেকে নিয়ে রীতিমত ক্লাস করেছে তার শোবার ঘরে। মেঝেয় খড়ি দিয়ে মাঠ এঁকে, তার মধ্যে ঢিল সাজিয়ে (ঢিলগুলি প্লেয়ার) সে যাত্রীর এক একটা মুভ দেখিয়ে কি ভাবে সেগুলো প্রতিহত করতে হবে বুঝিয়েছে। ওরা গোল হয়ে মাঠটাকে ঘিরে বসে গভীর মনোযোগে শুনেছে। যাত্রীর অ্যাটাক প্রধানত কাকে ঘিরে, কোথা থেকে বল আসে, কি কি ফন্দি এঁটে ওরা শ্যুটিং স্পেস তৈরী করে. পাহারা দেওয়া ডিফেন্ডারকে সরাবার জন্য কি ভাবে ওরা বল-ছাড়া দৌড়োদৌড়ি করে, ওভারল্যাপ করে ওদের ব্যাক কি ভাবে ওঠে কমল ওদের দেখিয়েছে ঢিলগুলি নাড়াচাড়া করে। তারপর বুঝিয়েছে কার কি কর্তব্য। যাত্রীর প্রতিটি প্লেয়ারের গুণ এবং ত্রুটি এবং শোভাবাজারের কোন্ প্লেয়ারকে কি কাজ করতে হবে বারবার বলেছে। খেলার দিন সকালেও সে সকলকে ডেকে এনে শেষবারের মত বলে, "চারজন ব্যাকের পিছনে থাকবো আমি। যখনই দরকার তখনই প্রত্যেক ডিফেন্ডারকে কভার দেবো। ডিফেন্ডাররা নিজের নিজের লোককে ধরে রাখবে। মুহূর্ত দেরী না করে ট্যাকল করবে। বল ওরা কন্ট্রোলে আনার আগেই চ্যালেঞ্জ করবে। বিশেষ করে প্রসূনকে। যেখানে ও যাবে সলিল ছায়ার মত সঙ্গে থাকবে। অনুপমকে দেখবে স্বপন। চারজন ব্যাকের সামনে থাকবে শম্ভু। প্রত্যেকটা পাস মাঝপথে ধরার চেষ্টা করবে যেন যাত্রীর কোন ফরোয়ার্ডের কাছে বল পৌঁছতে না পারে। অ্যাটাক কোত্থাও থেকে শুরু হচ্ছে দেখামাত্র গিয়ে চ্যালেঞ্জ করবে। শম্ভুর সামনে তিনজন হাফব্যাক থাকবে। যাত্রীর অ্যাটাক শুরু হবার মুখেই ঝাঁপিয়ে পড়বে, আবার দরকার হলে নেমে এসে হেল্প করবে, আবার কাউন্টার অ্যাটাকে বল নিয়ে এগিয়ে যাবে। আর যাত্রীর পেনাল্টি বক্সের কাছে থাকবে গোপাল। মোট কথা আমাদের ছকটা হবে ১—৪—১—৩—১।"

"কমলদা আমি কিন্তু ওদের দু-একটাকে বার কোরবই।" শম্ভু গোঁয়ারের মত বলেছিল। কমল কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলে, "ওদের একজনকে বার করার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও বেরিয়ে যেতে হবে। তাতে ক্ষতি হবে শোভাবাজারেরই। শম্ভু, আজ সব থেকে দায়িত্বের কাজ তোমার উপর। তুমি কি দায়িত্বের ভয়ে পালিয়ে যেতে চাও?"

"কে বললো?" শম্ভু লাফিয়ে উঠল। চোখ দিয়ে রাগ ঠিকরে পড়ল। দেয়ালে ঘুষি মেরে সে বলল, "আমি পালাবো, আমি পালিয়ে যেতে চাই? আমার বাপ দেশ ভাগ হতে পালিয়ে এসেছিল। শেয়ালদার প্ল্যাটফর্মে আমি জন্মেছি কমলদা, আমার মা মরেছে উপোষ দিয়ে, বড় ভাই মরেছে খাদ্য আন্দোলনে গুলি খেয়ে। আমি চুরি-চামারি অনেক করেছি। আজ ছিঁড়ে খাবো সবাইকে।"

কমল পরপর সকলের মুখের দিকে তাকায়, তারপর ফিসফিসে গলায় বলে, "আজ শোভাবাজার লড়বে।"

ওরা চুপ করে শুধু কমলের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল।

তারপর শোভাবাজার লড়াই শুরু করল।

কিক্ অফের সঙ্গে সঙ্গে অনুপম ছুটতে শুরু করল আর প্রসূন ডান টাচ লাইনে লম্বা শটে বল পাঠাল, ছোটার মাথায় অনুপম বলে পা দেওয়া মাত্র স্বপন বুলডোজারের মত এগিয়ে এসে ধাক্কা মারল। ফাউল। গ্যালারীতে বিশ্রি কথাবার্তা আর চীৎকার শুরু হয়ে গেল। যাত্রীর রাইট ব্যাক ফ্রিকিক করে পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে বল ফেলামাত্র প্রাণবন্ধু হেড দিয়ে ক্লিয়ার করার জন্য উঠল, আর প্রায় ১৫ গজ ছুটে এসে ভরত তার মাথার উপর থেকে বলটা তুলে নিয়ে একগাল হাসল।

"ভরত হচ্ছে কি, গোলে দাঁড়া।" কমল ধমক দিল।

কিক্ করে বলটা মাঝ মাঠে পাঠিয়ে ভরত বলল, "কমলদা পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে কাউকে আজ মাথায় বল লাগাতে দেব না।"

যাত্রী শুরুতেই ধাক্কা দিয়ে তারপর ক্রমশ এগিয়ে এসে শোভাবাজারের পেনাল্টি এরিয়াকে ছয় জনে ঘিরে ধরল এবং

কমল হাত তুলে কৃষ্ণ মাইতিকে চুপ করতে ইশারা করল।

দুই উইং ব্যাকও উঠে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। শোভাবাজারের গোপাল ছাড়া আর সবাই গোলের মুখে নেমে এসেছে। কমল বিপদের গন্ধ পেল। আঠারো জন লোক একটা ছোট জায়গার মধ্যে গোঁতাগুঁতি করতে করতে হঠাৎ কখন কে ফাঁক পেয়ে গোলে বল মেরে দেবে এবং এইরকম অবস্থায় সাধারণত ভীড়ের জন্য গোলকীপারের দৃষ্টিপথ আড়াল থাকে। তা ছাড়া ট্যাকল করার আগে কোন রকম বিচার বোধ ব্যবহার না করায় এবং যথেষ্ট স্কিল না থাকায় শোভাবাজারের ডিফেন্ডাররাও বেসামাল হতে শুরু করেছে।

এতটা ডিফেনসিভ হওয়া উচিত হয়নি। কমল দ্রুত চিন্তা করে যেতে লাগল। শুধু গোয়ার্তুমি সাহস বা দমের জোরে একটা স্কিলড অ্যাটাককে ঠেকানো যায় না। কাউন্টার অ্যাটাক চাই। বল নিয়ে উঠতে হবে। গোপাল উঠে আছে কিন্তু ওকে বল দিয়ে কাজ হবে না। একা বল নিয়ে দুটো স্টপারকে কাটিয়ে বেরোনোর ক্ষমতা ওর নেই। বল আবার ফিরে আসবে।

প্রাণবন্ধুর একটা মিসকিক্ কমল ধরে ফেলল। সামনেই যাত্রীর আব্রাহাম। কোমর থেকে একটা ঝাঁকুনির দোলা কমলের শরীরের উপর দিকে উঠে যেতেই আব্রাহাম টলে পড়ল। বল নিয়ে কমল পেনালটি এরিয়া পার হল।

"ওঠ্ সলিল।"

কমলের পিছনে প্রসূন, অনুসরণ করছে সলিল। কমলের ডাকে সে এগিয়ে এল। যাত্রীর হাফ-ব্যাক অমিয় এগিয়ে আসতেই কমল বলটা ঠেলে দিল সলিলকে। দ্রুত শোভাবাজারের চারজন উঠছে। বল ডান থেকে বাঁ দিকে আবার ডান দিকে এল। শেষ পর্যন্ত যাত্রীর কর্ণার ফ্ল্যাগের কাছে রুদ্রর কাছ থেকে বল কেড়ে নিল আনোয়ার।

কমল এগিয়ে এসেছে। প্রায় দশ মিনিট যাত্রীর চাপ তারা ধরে রেখেছিল। খেলাটাকে মাঝমাঠে আটকে রেখে যাত্রীর গতি মন্থর করাতে হবে। কমল বল ধরে পায়ে রাখতে শুরু করল। রুদ্র সত্য আর দেবীদাস মাঠের মাঝখানে, শম্ভু ঠিক ওদের পিছনে। তার কাছে বল পাঠিয়ে কমল চার ব্যাকের পিছনে পেনালটি এরিয়া লাইনের উপর দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগল যাত্রীর কে কোথায় কি ভাবে নড়াচড়া করছে।

আঠার মত লেগে আছে শোভাবাজারের চারটি ব্যাক যাত্রীর চার ফরোয়ার্ডের সঙ্গে। অনুপমের কাছে চারবার বল এসেছে এবং প্রতিবার সে বলে পা লাগাবার আগেই স্বপন ছিনিয়ে নিয়েছে। বল যখন যাত্রীর বাম কর্ণার ফ্ল্যাগের কাছে অনুপম তখন শোভাবাজারের রাইট হাফের কাছাকাছি ডান টাচ লাইন ঘেঁষে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। ওর পাঁচ হাত দূরে স্বপন। অনুপম হাঁটতে লাগল সেন্টার লাইনের দিকে, ওর পাশাপাশি চলল স্বপনও। অনুপম হঠাৎ ঘুরে আবার আগের জায়গায় ফিরে এল, স্বপনও ওর সঙ্গে ফিরে এল। গ্যালারীতে যাত্রীর সমর্থকরা পর্যন্ত ব্যাপারটা দেখে হেসে উঠল। অনুপম ডান দিক থেকে বাঁ দিকে নিমাইয়ের জায়গায় ছুটে গেল, স্বপনও। যতবার বল তার দিকে আসে স্বপন হয় টাচ লাইনের বাইরে ঠেলে দেয়, নয়তো মাঠের যেখানে খুশি কিক্ করে পাঠায়। অনুপম দুবার স্বপনকে কাটিয়েই দেখে কমল স্বপনকে কভার করে এগিয়ে এসে তার পথ জুড়ে। কি করবে ভেবে ঠিক করার আগে স্বপনই ঘুরে এসে ছোঁ মেরে বলটা নিয়ে গেল।

শম্ভু পাগলের মত মাঝমাঠটাকে ফালা ফালা করে দিচ্ছে যাত্রীর ফরোয়ার্ডদের উদ্দেশ্যে পিছন থেকে পাঠানো বল ধরার জন্য, ডাইনে-বামে যেখান থেকেই আক্রমণ তৈরী হয়ে ওঠার গন্ধ পেয়েছে সেখানেই ছুটে যাচ্ছে বুলডগের মত। সব সময়ই যে সফল হচ্ছে তা নয়, কিন্তু ওর জন্য বল নিয়ে যাত্রীর কেউ সহজে উঠে আসতে পারছে না। যদিও বা ওয়াল-পাস করে উঠে আসে, প্রাণবন্ধু নয়তো সলিল এগিয়ে আসে চ্যালেঞ্জ করতে।

প্রসূন পিছিয়ে নেমে এসেছে। সলিলও তার সঙ্গে যাচ্ছিল, কমল বারণ করল।

"মাঝ মাঠে যত ইচ্ছে প্রসূন খেলুক, তুই এখানে থাক। যখনই উঠে আসবে আবার লেগে থাকবি।"

এরপরই যাত্রীর দুই উইং ব্যাক দুদিক থেকে উঠতে শুরু করল। কমল বিপদ দেখতে পেল। নিমাই, আব্রাহাম আর অনুপম

ছোটাছুটি করে ছড়িয়ে যাচ্ছে বলাই প্রাণবন্ধু আর স্বপনকে নিয়ে। প্রসূন বল নিয়ে উঠছে, দুপাশ থেকে উইং ব্যাক দুজন। কমল দুদিকে নজর রাখতে লাগল, কোন্ দিকে প্রসূন বল বাড়িয়ে দেয়।

চার ব্যাকের পিছনে মাঝামাঝি জায়গায় কমল দাঁড়ালো। প্রসূন দেবীদাসকে কাটালো, শম্ভুর স্লাইডিং ট্যাকল ব্যর্থ হলো। সলিল এগোচ্ছে। প্রসূনের বাঁ কাঁধ সামান্য ঘুরেছে গোলের দিকে এবার ডানদিকে বল বাড়াবে। কমল তার বাঁ দিক চেপে সরে গিয়ে উঠে আসা রাইট ব্যাকের দিকে নজর দিল আর প্রসূন অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় শরীর মুচড়ে তার বাঁ দিকে বল পাঠাল যেখানে লেফট ব্যাক বাঁ দিক থেকে ফাঁকায় উঠে এসেছে।

প্রায় পঁচিশ হাজার কণ্ঠ চীৎকার করে উঠল, গো-ও-ল গো-ও-ল। সেই প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে জ্বালা ধরানো কোন খবর ছিল যা কমলের স্নায়ুকেন্দ্রে মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটালো। বাঁ দিকে ঝোঁকা দেহভারকে সে চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতায় ডান দিকে ঘুরিয়ে ছুটে এল লেফট ব্যাকের সামনে। প্রায় ১২ গজ দূরত্ব গোল থেকে। শট নিলে নিশ্চিত গোল। হঠাৎ সামনে কমলকে দেখে সে শট নিতে গিয়েও নিতে পারল না। পলকের মধ্যে কমল বলটা কেড়ে নিয়ে যখন রুদ্রর কাছে পাঠালো তখন গ্যালারীর চীৎকার চাপা হতাশায় কাতরে উঠেছে। প্রায় ৩০ মিনিট খেলা হয়ে গেল এখনো গোল হল না! শোভাবাজার একবারও যাত্রীর গোলের দিকে যায়নি।

কিন্তু হাফ-টাইমের কয়েক সেকেণ্ড আগে শম্ভুর পা থেকে ছিটকে যাওয়া বল পেয়ে গোপাল অভাবিত যাত্রীর গোলের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যায় আনোয়ার ও অমিয়কে পিছনে ফেলে। গোলকীপার শ্যাম এগিয়ে এসেছে। গোপাল প্রায় চোখ বুঁজেই শট নেয়। শ্যামের ঝাঁপানো হাতের নাগাল পেরিয়ে বল ক্রসবারে লেগে মাঠে ফিরে এল।

সারা মাঠ বিস্ময়ে নির্বাক। অকল্পনীয় ব্যাপার, শোভাবাজার গোল দিয়ে ফেলেছিল প্রায়। বিস্ময়ের ঘোর কাটল রেফারীর হাফ-টাইমের বাঁশিতে। মাঠের সীমানার বাইরে এসে শোভাবাজারের ছেলেরা একে একে বসে পড়ল। কৃষ্ণ মাইতি জলের গ্লাস আর তোয়ালে নিয়ে ব্যস্ত। প্লেয়াররা কেউ কথা বলছে না। পরিশ্রান্ত দেহগুলো ধুঁকছে। অবসন্নতায় পিঠগুলো বেঁকে গেছে।

কৃষ্ণ মাইতি হাত নেড়ে বক্তৃতা দেওয়ার ঢঙে বলল, "এবার লং পাসে খেলে যা, শর্ট পাস বন্ধ কর্। সত্য, তুই অত নেমে খেলছিস কেন, উঠে খেল্। সলিল, আরো রোবাস্টলি খেলতে হবে, বার কয়েক পা চালা, আব্রাহামটা দারুণ ভীতু।"

কমল হাত তুলে কৃষ্ণ মাইতিকে চুপ করতে ইসারা করল, "এখন ওদের কিছু বলবেন না।"

সলিল বলল, "কমলদা ওটা আমারই দোষ ছিল। প্রসূন পাসটা অত আগেই দেবে বুঝতে পারিনি, নয়তো আগেই ট্যাকল করতুম। আপনি না থাকলে গোল হয়ে যেত।"

কমল কথাগুলো না শোনার ভান করে গ্যালারীর শেষপ্রান্তে তাকাল। চেষ্টা করল একটা মুখ খুঁজে বার করতে। ব্যর্থ হয়ে বলল, "অমিতাভ এসেছে কি?"

সলিল বলল, "হ্যাঁ, ওই তো। একজন মেয়েছেলে বসে ঠিক তার সামনে। বল আনতে গিয়ে আমি দেখেছি।"

কমল আবার তাকাল।

যাত্রীর মেম্বারদের মধ্যে থমথমে ভাব। কেউ কেউ উত্তেজিত। 'অনুপমের এ কি খেলা!' 'ডিফেন্স যখন ক্লাউডেড করেছে তা হলে ওদের টেনে বার করে ফাঁকা করুক!' 'প্রসূন নিজে গোলে না মেরে পাস দিতে গেল কেন?'

'শম্ভুর ট্যাকলিং প্রত্যেকটা ফাউল, রেফারি দেখেও দেখছে না। আব্রাহামকে যে অফসাইডটা দিল দেখেছেন তো?' 'একবার বল এনেছে তাতেই গোল হয়ে যাচ্ছিল; চলে না, আনোয়ার-ফানোয়ার আর চলে না।'

কমল উঠে দাঁড়িয়ে তাকাল। কানে এল কচি গলায় পিন্টু

ডাকছে, "কমলমামা, কমলমামা, এই যে আমরা এখানে।"

রেফারী বাঁশি বাজাল।

"মনে আছে, শোভাবাজার আজ লড়বে।" মাঠে নামার সময় কমল মনে করিয়ে দিল। ওরা কথা বলল না।

কমল আশা করেছিল যাত্রী ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু সাবধানে ওরা মাঝমাঠে বল রেখে খেলছে। মিনিট পাঁচেক কেটে যাবার পর অনুপম বল পেয়ে কর্ণার ফ্ল্যাগের দিকে ছুটে থমকে স্বপনকে কাটিয়ে নিয়ে ঢুকতে গিয়ে কমলের কাছে বাধা পেল। সেন্টার করল সে। ভরত সহজেই আব্রাহামের মাথা থেকে বল তুলে নিল।

"স্বপন কি ব্যাপার! অনুপম বিট করে গেল?" কমল কথাগুলো বলতে বলতে এগিয়ে গেল। আবার অনুপম এগোচ্ছে বল নিয়ে।

স্বপন এবারও পিছনে পড়ে ঘুরে এসে আর চ্যালেঞ্জ করল না। কমল বুঝে গেল স্বপন আর পারছে না। এবং লক্ষ্য করল বলাই এবং প্রাণবন্ধুও মন্থর হয়ে এসেছে। সলিলের মধ্যে ক্লান্তির ছাপ এখনো দেখা দেয়নি। শম্ভু মাঝমাঠে দোর্দণ্ড হয়ে রয়েছে। যেখানে বল সেখানেই ছুটে যাচ্ছে। দেবীদাস আর সত্য বল দেওয়া-নেওয়া করে যাত্রীর হাফ লাইন পর্যন্ত বার কয়েক পৌঁছতে পেরেছে।

ফাউল করেছে শম্ভু। যাত্রীর রাইট ব্যাকের বুকে পা তুলে দিয়েছে। সে কলার ধরেছে শম্ভুর। গ্যালারি থেকে কাঠের টুকরো আর ইঁট পড়ছে মাঠে শম্ভুকে লক্ষ্য করে। এর এক মিনিট পরেই শম্ভুকে মাঠের বাইরে যেতে হল। আব্রাহাম অমিয় আর শম্ভু একসঙ্গে বলের উদ্দেশ্যে ছুটে গিয়ে একসঙ্গেই মাটিতে পড়ে। দুজন উঠে দাঁড়াল, শম্ভুকে ধরাধরি করে বাইরে আনা হল। এবং মিনিট তিনেক পর যখন সে মাঠে এল তখন খোঁড়াচ্ছে।

মাঝ মাঠে এখন যাত্রীর রাজত্ব। শম্ভু ছুটতে যায় আর যন্ত্রণায় কাতরে ওঠে।

"কমলদা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। আমাকে শেষ করে দিয়েছে। ওদের একটাকে নিয়ে বরং আমি বেরিয়ে যাই।"

"না। তুই বোস্। রতনকে নামতে বল্।"

"আমি বরং প্রসূনকে নিয়ে—ও ভাল খেলছে।"

"খেলুক্। খেলতে হবে ওকে।" কমলের রগের শিরা দপদপ করে উঠল। "না খেললে কমল গুহকে টপকানো যাবে না।"

শম্ভু বসলো এবং তৃতীয় ডিভিশন থেকে এই বছরই আসা নতুন ছেলে রতন নামল। তখন গ্যালারিতে পটকা ফাটলো। যাত্রীর আক্রমণে আটজন উঠে এলো এবং ক্লান্ত শোভাবাজার সময় গুনতে লাগল কখন গোল হয়। এবং—

একটা প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের মত কমল গুহ তখন শোভাবাজারের পেনালটি এরিয়ার মধ্যে শাখা বিস্তার করে দিল। কখনো সে বন্য মহিষ কখনো বন্‌বিড়াল, কখনো গোখরো সাপ। শোভাবাজার পেনালটি এলাকা ভয়ঙ্কর করে তুলল কমল তার ক্রুদ্ধ চতুর হিংস্র বিচরণে। একটার পর একটা আক্রমণ আসছে, প্রধানত সলিলকে নিয়ে কমল সেগুলো রুখে যাচ্ছে। আর গ্যালারীতে অশ্রান্ত গর্জন ক্রুদ্ধ-হতাশায় আর্তনাদে পরিণত হচ্ছে।

এইবার, এইবার যাত্রী, আমি শোধ নেব। কমল নিজের সঙ্গে কথা বলে চলে। আমার মাথা নোয়াতে পারনি, আজও উঁচু করে বেরোব মাঠ থেকে। গুলোদা, রথীন, সব ব্যঙ্গ সব বিদ্রূপ আজ ফিরিয়ে দেব। বল আনছে প্রসূন, এগোক, এগোক, সলিল আছে। ওর পিছনে আমি। আহ্ লেফট উইং নিমাইকে দিল, বলাই চেজ করছে, ওর পিছনে আমি আছি।

কমলের সামনে বল নিয়ে নিমাই থমকে দাঁড়াল। ডাইনে ঝুঁকল, বাঁয়ে হেলল। কমল নিস্পন্দের মত, চোখ দুটি শুধু

বলের দিকে স্থির। নিমাই কাকে বলটা দেওয়া যায় দেখার জন্য মুহূর্তের জন্য চোখ সরাতেই ছোবল দেবার মত কমলের ডান পা নিমাইয়ের হেফাজত থেকে বলটা সরিয়ে নিল।

কমল বল নিয়ে উঠছে। আয় আয় কে আসবি. গুলোদা সরোজ রথীন রণেন দাস কোথায় অনুপমের ভক্তরা আয়, কমল গুহর পায়ে বল. আয় দেখি কেড়ে নে।

রাইট হাফকে কাটিয়ে কমল দাঁড়িয়ে পড়ল। সাইড লাইনের ধারে বেঞ্চে রথীন। ওর সুশ্রী মুখটা যন্ত্রণায় মুচড়ে রয়েছে। কমল একবার মুখ ফিরিয়ে রথীনের দিকে তাকিয়ে হাসল। আজও জ্বালাচ্ছি তোদের। বছরের পর বছর আমি জ্বলেছি রে। আমাকে বঞ্চিত করে যাত্রী তোকে ইণ্ডিয়ার জারসি পরিয়েছে, আমাকে প্রাপ্য টাকা থেকে বঞ্চিত করেছে যাত্রী, আমাকে সাধারণ প্লেয়ারের মত বসিয়ে রেখে অপমান করেছিল......কমল মাঠের মধ্যে সরে আসতেই, দুজন এগিয়ে এল চ্যালেঞ্জ করতে। হঠাৎ গতি বাড়িয়ে কমল দুজনের মধ্যে দিয়ে পিছলে এগিয়ে গেল, বলটা আঠার মত পায়ে লেগে রয়েছে...অমিতাভর মায়ের মৃত্যুর খবরটা যাত্রী আমাকে দেয়নি রে রথীন। ট্রফি জিততে কমল গুহকে দরকার তাই খবরটা চেপে গেছল।.........আর একজন সামনে এগিয়ে এল কমলের। ডান দিকে সরে যেতে লাগল কমল। বল নিয়ে দাঁড়ালো। গোল প্রায় তিরিশ গজ। বলটা আর একটু এগিয়ে নিয়ে কমল শট নিল। নিখুঁত মাপা শট। বার ও পোস্টের জোড় লক্ষ্য করে বলটা জমি থেকে উড়ে যাচ্ছে। গ্যালারিতে হাজার হাজার হৃদস্পন্দনের শব্দ মুহূর্তের জন্য তখন বন্ধ হয়ে গেল।. শ্যাম লাফিয়ে উঠে চমৎকারভাবে আঙুলের ডগা দিয়ে বলটা বারের উপর তুলে দিতেই মাঠের চার ধারে আবার নিঃশ্বাস পড়ল।

কর্ণার। শোভাবাজারের আজ প্রথম। যাত্রী পেয়েছে আটটা। তার মধ্যে সাতটাই ভরত লুফে নিয়েছে। বল বসাচ্ছিল দেবীদাস। সত্য ছুটে এসে তাকে সরিয়ে দিল। যাত্রীর ছ'জন গোলের মুখে। শোভাবাজারের পাঁচজনকে তারা আগলে রেখে দাঁড়ালো।

সত্য কিক্ নিল। মসৃণ গতিতে বলটা রামধনুর মত বক্রতায় গোলমুখে পড়ছিল। গোপাল লাফালো। তার মাথার উপর থেকে পাঞ্চ্ করল শ্যাম। প্রায় পনেরো গজ দূরে বল পড়ছে। সেখানে দেবীদাস। দুজন তার দিকে ছিটকে এগোল।

"দেবী।"

বাঁ পাশ থেকে ডাকটা শুনেই দেবীদাস বলটা বাঁ দিকে ঠেলে সরে গেল। পিছন থেকে ঝলসে বেরিয়ে এল একটা চেহারা। তার বাঁ পা-টা উঠল এবং বলে আঘাত করল। বাম পোস্টে ঘেঁষে বলটা যাত্রীর গোলের মধ্যে ঢুকল। এমন অতর্কিতে ব্যাপারটা ঘটে গেল যে খেলোয়াড়রা শুধু অবিশ্বাসভরে আঘাতকারীর দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কয়েক সেকেন্ড চোখ সরাতে পারল না।

যাত্রীর মেম্বারদের মধ্যে কথা নেই। শুধু একটি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল মাত্র, "অত মাংস খাবে কে এবার!"

বিপুল ঘোষ হতভম্ব হয়ে অমিতাভকে বলল, "য়্যা যুগের যাত্রী গোল খেয়ে গেল! কে গোলটা দিল?"

অমিতাভ গলার কাছে জমে ওঠা বাষ্প ভেদ করে অস্ফুটে শব্দগুলো বার করে আনল, "কমল গুহ।" তারপর লাজুক স্বরে যোগ করল, "আমার বাবা।"

ঝাঁপিয়ে পড়ল যাত্রী শোভাবাজারের গোলে। চার মিনিট বাকি। পরপর তিনটি কর্ণার, দুটি ফ্রি কিক্ যাত্রী পেল। আব্রাহামের চোরা ঘুসিতে বলাইয়ের ঠোঁট ফাটল। কিন্তু সেই বৃহৎ প্রাচীন অশ্বত্থ গাছটি সব ঝড়ঝাপটা থেকে আড়াল করে রাখল তার পিছনের গোলটিকে।

শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে পাগলের মত চীৎকার করতে করতে মাঠের মধ্যে দৌড়ে এল শম্ভু। "আমি সেরে গেছি, আমি সেরে গেছি কমলদা। আমার আর ব্যথা নেই।"

প্রথম কমলের দুই হাঁটু জড়িয়ে তাকে উপরে তুলল সত্য। তারপর কি ভাবে যেন চারটে কাঁধ চেয়ার হয়ে কমলকে বসিয়ে নিল। ইস্টবেঙ্গল মেম্বার গ্যালারি উত্তেজনায় বিস্ময়ে টগবগ করছে। যাত্রীর থেকে তিন পয়েন্ট এগিয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল।

কাঁধের উপর কমলকে তুলে ওরা মাঠের বাইরে এল। কৃষ্ণ মাইতির গলা ধরে গেছে চীৎকার করে। "কমল বল্ বল্. আমি প্লেয়ার চিনি কিনা বল্। নিজের রিস্‌কে সব অপোজিসন অগ্রাহ্য করে তোকে খেলিয়েছিলুম আগের ম্যাচে, বল্ ঠিক বলছি কি না।"

কমলের মস্তিষ্ক ঘিরে এখন যেন একটা কালো পর্দা টাঙানো। কি ঘটছে. কে কি বলছে তার মাথার মধ্যে ঢুকছে না, কোন আবেগ বেরোতেও পারছে না। ক্লান্তিতে দু চোখ ঝাপসা। তার শুধু মনে হচ্ছে কিছু অর্থহীন শব্দ আর কিছু মানুষ তার চারপাশে কিলবিল করছে। কমল ভারবাহী একটা ক্রেনের মত নিজের শরীরটা নামিয়ে দিল ভূমিতে। দুহাতে মুখ ঢেকে সে উপুড় হয়ে শুয়ে রইল। অনেকক্ষণ পর টপটপ করে তার চোখ থেকে জল ঝরে পড়ল ঘাসের উপর। কেন পড়ছে তা সে জানে না।

অতি যত্নে তার পা থেকে বুট খুলে দিচ্ছে কে! কমল মাথা ফিরিয়ে দেখল সলিল। গ্যালারির দিকে কমল তাকাল। একটা পটকাও ফাটেনি। পতাকা ওড়েনি। উৎসব করতে আসা মানুষগুলো নিঃশব্দে বিবর্ণ অপমানিত মুখগুলোয় শ্মশানের বিষণ্ণতা নিয়ে মাঠ থেকে চলে যাচ্ছে। গ্যালারিগুলো ক্রমশ শূন্য হয়ে এল। বেদনায় মুচড়ে উঠল কমলের বুক। আর কখনো সে মাঠের মধ্য থেকে ভরা-গ্যালারি দেখতে পাবে না। কমল গুহ আজ জীবনের শেষ খেলা খেলেছে।

কমল উঠে দাঁড়াল। কোন দিকে না তাকিয় মুখ নিচু করে সে মাঠের মাঝে সেণ্টার সার্কেলের মধ্যে এসে দাঁড়াল। আকাশের দিকে মুখ তুলল। অস্ফুটে বলল, "আমি যেন কখনো ব্যালানস না হারাই। আমার ফুটবল যেন সারাজীবন আমাকে নিয়ে খেলা করে।"

কমল নিচু হয়ে মাটি তুলল। কপালে সেই মাটি লাগিয়ে মন্ত্রোচ্চারণের মত বলল, "অনেক দিয়েছ, অনেক নিয়েছও। আজ আমি বরাবরের জন্য তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। জ্ঞানত তোমায় অসম্মান করিনি। নতুন নতুন ছেলেরা আসবে তোমাকে গৌরব দিতে। দয়া করে আমাকে একটু মনে রেখো।"

"কমলদা, চলুন এবার।" মাঠের বাইরে থেকে ভরত চেঁচিয়ে ডাকল। ওরা অপেক্ষা করছে তার জন্য।

মাঠ থেকে বেরিয়ে আসার সময় কমল দেখল সেই সাংবাদিকটিকে খুব উত্তেজিত স্বরে কৃষ্ণ মাইতি বলছে, "আমিই তো কমলকে, বলতে গেলে, আবিষ্কার করি; ফুটবলের অ আ ক খ প্রথম শেখে আমার কাছেই।"

শুনে কমল হাসল। তারপরই চোখে পড়ল অমিতাভ দূরে দাঁড়িয়ে। কমল অবাক হল, বুকটা উৎকণ্ঠা আর প্রত্যাশায় দুলে উঠল।

এগিয়ে এসে প্রায় চুপিচুপিই বলল, "আজ জীবনের শেষ খেলা খেললাম, কেমন লাগল তোমার?"

অমিতাভ উত্তেজনায় থরথর স্বরে বলল, "তোমার জন্য আমার গর্ব হচ্ছিল বাবা।"

"সত্যি!" কমলের বিস্ময় হাউইয়ের মত ফেটে পড়ল চোখে মুখে। তার মনে হল গ্যালারিগুলো আবার ভরে গেল।

"সত্যিই।"

"যদি আমার দশ বছর আগের খেলা তুই দেখতিস।" কমল হাসতে শুরু করল।

দুর্ঘটনার মূল

আশাপূর্ণা দেবী

ছবি এঁকেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী

আবার সেই ছায়া মূর্তি!

সেই রান্নাঘরের বন্ধ জানলার ওপারে শূন্যে ঝুলে আছে দু-হাত দু-দিকে ছড়িয়ে জানলার গ্রীল চেপে ধরে, আর ঘাড়টা গুঁজে।

কাঁচের জানলা, দেখার অসুবিধে নেই।

পর পর এই পাঁচ দিন!

প্রথম দিনের আবিষ্কারের গৌরব ছিল বুড়ো ঝি সদুর মা-র। রাতে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যাবার পর, বোধহয় বামুন ঠাকুর বাসায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ারও পর, সদুর মা-র হঠাৎ খেয়াল হয়, তার দোক্তার কৌটোটা রান্নাঘরের কোণে দেয়ালের কাছে পড়ে আছে। ঠাকুর যখন রুটি তৈরী করছিল সদুর মা তখন একটু তেল চেয়ে নিয়ে গরম করে পায়ে মালিশ করতে করতে বাতের যন্ত্রণা যে কী যন্ত্রণা তাই শোনাচ্ছিল তাকে। সেই সময় ওই দোক্তার কৌটো-বিভ্রাট।

সদুর মা সিঁড়ির তলায় শোয়, এতো রাত্তিরে দরজা টরজা খোলার শব্দে পাছে কারুর ঘুম ভেঙে যায় তাই পা টিপে টিপে নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে, খাবার দালান পার হয়ে অন্ধকারেই রান্নাঘরের দরজার ছিটকিনি খুলে দেয়ালের নীচে হাতড়ে কৌটো নিচ্ছিল, হঠাৎ "আঁ আঁ আঁ" করে চীৎকার করে উঠলো।

করবেই তো।

যদি কেউ দেখতে পায় কাঁচের জানলার ওপারে একটা ছায়ামূর্তি দুটো হাত দু দিকে ছড়িয়ে গ্রীল চেপে ধরে শূন্যে ঝুলছে, তা হলে সে করবে না চীৎকার?

তায় আবার ওই বেতো বুড়ি!

হার্টফেল যে করেনি এই ঢের।

বাড়িতে তখন কেউ ঘুমিয়েছে, কেউ ঘুমোয়নি। যাদের রাত জেগে বই পড়া অভ্যেস তারা পড়ছিল, বাকিরা স্বপ্ন দেখছিল। জাগন্ত ঘুমন্ত সবাই ওই বিটকেল আর্তনাদের শব্দে দুদ্দাড়িয়ে উঠে এলো—কী? কী? কী হয়েছে? কে কোথায় চেঁচালো? বলে।

তার সঙ্গে বান্টি আর পুটুসও।

যদিও ওদের মা নিজে ছুটে বেরোবার সময় ওদের বলে গিয়েছিলেন, 'তোরা আবার কী করতে উঠছিস? উঠিসনে খবরদার! আমি দেখছি—'

তবু ওরা উঠতে ছাড়েনি।

বাবা তো আগেই বেরিয়ে গেছেন দুমদাম করে দরজা খুলে।

তবে? বান্টি পুটুস কি একলা ঘরে মশারির মধ্যে শুয়ে শুয়ে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবে? তার থেকে বেরিয়ে পড়ে মূল ভয়ের জায়গায় উপস্থিত হওয়া ঢের ভালো। সেখানে তো তবু 'সকল ভয় নিবারক' বড়রা আছেন।

বান্টি পুটুস বেরিয়ে পড়ে দেখলো দালানের দুটো আলোই দপ দপ করে জ্বলছে, আর বাবা মা থেকে শুরু করে ঠাকুমা, জ্যেঠু, ছোটকাকু সবাই একত্র জড়ো হয়ে সদুর মা-র মুখে চোখে জল দিচ্ছেন, মাথায় বাতাস করছেন।

হাত পাখা তো নেই বাড়িতে, নিজেরা হাওয়া খাওয়া হয় 'ফ্যান'এ, আর রান্না হয় তো গ্যাসের উনুনে যাতে পাখা লাগেনা, তাই খবরের কাগজ নেড়ে নেড়ে বাতাস দিচ্ছেন।

সকলের মুখে চোখেই ভয়ের ছাপ।

পুটুস ভয়ে ভয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বললো, দিদি, সদুর মা কি মরে গেছে?

বান্টি রেগে বললো, 'বোকার মতো কথা বলিস না মরে গেলে তো মানুষ একদম ঠান্ডা হয়ে যায়, তাহলে আর বাতাস দেবে কেন?'

একটু পরে সদুর মা-র জ্ঞান ফিরলো. তখন সবাই একযোগে প্রশ্ন করতে লাগলো, কী হয়েছে? হঠাৎ অমন চেঁচালি যে? সাপে কামড়েছে? কাঁকড়া বিছে? না কি আরশোলা গায়ে পড়েছে? এতো রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে এখানেই বা এলি কেন?

সদুর মা কষ্টে বললো, 'দোক্তার কৌটো'।

'ওঃ দোক্তার কৌটো ফেলে গিয়েছিলি? তাতে চেঁচাবার কী হলো?'

সদুর মা বললো 'ভূঁ ভূঁ ভূঁৎ! রান্নাঘরের জাঁলিলায়।'

আবার দাঁতে দাঁতে লেগে গেল সদুর মার।...লোকে তখন তাকেই দেখবে, না ভূত দেখবে?

পুটুসের জ্যেঠু খুব ভাবনা-ভাবনা গলায় বললেন, ভূতের কথা বাদ দাও।। জানলা ভেঙে চোর টোর ওঠবার চেষ্টা করছিল না তো? বোঁচা, তুই একটা কাজ কর, রান্নাঘরের এদিকের দরজাটায় তালা লাগিয়ে রাখ। ঢুকলে রান্নাঘরের মধ্যেই আটকে থাকবে, এদিকে আসতে পারবে না।'

'বোঁচা মানে বান্টি পুটুসের বাবা। দিব্যি লম্বা একখানা নাক থাকা সত্ত্বেও কেনই যে তাঁকে ওই বোঁচা নামের খোঁচা খেয়ে জীবন কাটাতে হচ্ছে কে জানে!

বোঁচা বললেন, 'আর রান্নাঘরের বাসন-পত্র?'

ঠাকুমা বলে উঠলেন, 'তাইতো! গোছা গোছা মাজা বাসন? নিয়ে গেলেই তো গেল!'

'আহা নিয়ে যাবে কোথা দিয়ে? ওদিকে তো কার্নিশও নেই তেমন। শূন্যে নামাবে কী করে?'

'দাঁড়িয়েছে যখন, তখন—'

'ওমা দাঁড়ায়নি গো মা!' সদুর মা আবার ডুকরে ওঠে, 'ফাঁকায় ঝুলতেছে! ঘাড় গুঁজে ঝুলতেছে! চোর নয়, ভূত!'

জ্যেঠু বললেন, 'তুই তো চিরকালই ভূত দেখিস!'

'কাকু বললেন, সদুর মা, তুই তো একটা ভূত!'

পুটুস চুপি চুপি বললো, 'মেয়ে-মানুষ ভূতকে কি ভূত বলে দিদি? পেত্নী বলে না? কাকু ভুল বলেছে—'

বান্টি তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, 'কবেই বা কাকু ভুল না বলে? আমায় বলে না 'গাধা'?, মেয়েরা কখনো গাধা হতে পারে?'

'তোর কি মনে হচ্ছে রে, দিদি? চোর না ভূত?'

বান্টি সতেজে বলে, 'স্রেফ্ চোর।

ভূত বলে কিছু আছে নাকি?

ভূত বলে কিছু আছে না কি?'

সদুর মাকেও সেই কথা বলা হলো, 'ভূত বলে কিছু নেই, চোরই দেখেছিস তুই।'

তবু সদুর মা সে রাতে একা সিঁড়ির তলায় শুতে গেল না, ঠাকুমার ঘরের মেজেয় শুয়ে থাকলো।

তবে কেউ অবিশ্যি রান্নাঘরে উঁকি মেরে দেখতে গেল না। তাড়াতাড়ি এদিকের দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া হলো। দেখার কী দরকার বাবা! যদি এতোক্ষণে জানলা ভেঙে ঘরে ঢুকে থাকে, যদি তার হাতে ছোরা থাকে?

জানলা ভাঙা তো শক্ত নয়। এ বাড়ির সমস্ত জানলাই তো কাঁচের। কাঠের কপাট বলে কিছু নেই এ বাড়িতে। রান্নাঘর থেকে বাথরুম পর্যন্ত সমস্ত জানলাতেই কাঁচ আর সুন্দর ডিজাইনের গ্রীল।

যাকে বলে ছবির মতো বাড়ি।

বহু খোঁজাখুঁজি করে সেই শ্যামপুকুর থেকে এই ডোভার রোডে উঠে এসেছেন এঁরা বাড়িটি সুন্দর বলে। কিন্তু চোরের উপদ্রব হলেই তো মুস্কিল।

তা প্রথম দিনে সবাই চোরই ভেবেছিল।

ভূতকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল।

শ্যামপুকুরে থাকতে বামুন ঠাকুর রাতে বাড়িতেই থাকতো। এ পাড়ায় ওর দাদার বাসা আছে বলে কাজ-টাজ সেরে দাদার বাসায় শুতে চলে যায়। আসে খুব ভোরে।

সেদিনের পরের সকালে এলো, আর এসেই চেঁচাতে শুরু করলো, 'রান্নাঘরে তালা-চাবি কেন? আমাকে কি অফিসের ভাত দিতে হবে না?'

বোঁচা অর্থাৎ পুটুসদের বাবা কোনো কথা না বলে চাবিটা ফেলে দিলেন। ভেবেছিলেন, ঠাকুর ঢুকেই হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠবে জানলা ভাঙ দেখে। কৈ, কিছুই তো না।

কাকু বললেন, 'ঠাকুর! সব ঠিক আছে?'

ঠাকুর অবাক হয়ে বললো, 'থাকবে না কেন ছোড়দাদাবাবু?'

ঠাকুমা বললেন, 'বাসনগুলো সব আছে?'

ঠাকুর আবার অবাক হলো।

'থাকবেনা তো কোথায় যাবে?'

তখন একে একে সবাই রান্নাঘরে ঢুকলো, বাপ্টি পুটুসও। কই কোথায় চোর? কোথায় চুরি? কোথায় জানলা ভাঙা?

তা হলেও গলির দিকটা একবার দেখা দরকার। বললেন জ্যেঠু, মইটইতে উঠে উঁকি দিচ্ছিল কি না—'

নাঃ গলিতেও চোরের চিহ্ন টিহ্ন নেই।

তখন সকলে হাসতে লাগলো, সদুর মা ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছে বলে।

কিন্তু পরদিন?

হ্যাঁ, পরদিনই তো—

স্বয়ং জি জি গাঙ্গুলী, অর্থাৎ গণেশ গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, অর্থাৎ পুটুস-দের জ্যেঠুই সদুর মার মতো 'আঁ আঁ' করে ছিটকে বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে।

এসে হাঁপাতে লাগলেন।

এতো রাত্তিরে উনি রান্নাঘরে কেন?

আর কিছু নয়, বামুন ঠাকুর জানলা টানলা ভালো করে বন্ধ করেছে কি না তাই দেখতে। ঘরে ঢুকেই চমকে ছিটকে চলে এসেছেন আঁ আঁ করতে করতে।

সেই, গলির দিকের জানলার বাইরে ছায়ামূর্তি।

দুহাত ছড়িয়ে গ্রীল চেপে ধরে ঘাড়টা গুঁজে শূন্যে ঝুলছে।

রান্নাঘরের জানলার কাঁচ ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঝাপসা, আর পাশের সরু গলি-পথের ওধারে কাদের যেন একটা ঝাঁকড়া-মাথা শিউলী গাছ আছে, তার ফাঁক দিয়ে দূরের রাস্তার আলো এসে পড়ে ছায়ামূর্তির ভয়াবহতা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে।

ওর ভঙ্গীতে যেন একটা ক্ষুধার্ত আর করুণ ভাব, যেন ঘরে ঢুকতে পাচ্ছেনা তাই বেচারীর মত ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখছে।

জ্যেঠুকে ঠিক করতেও সময় কম লাগলো না। সদুর মা তারস্বরে বলতে লাগলো, 'আমি বলিনি, চোর নয় ভূত? এখন বিশ্বেস হলো তো?'

জ্যেঠু ফ্রীজ থেকে এক বোতল জল একসঙ্গে গলায় ঢেলে একটু সুস্থ হয়ে এ ঘরে এসে গলা নামিয়ে বললেন, 'বোঁচার ছেলে মেয়ে দুটো জেগে নেই তো?'

বোঁচা বা বাবা বললেন, 'না! ঘুমিয়ে পড়েছে।'

বাপ্টি অলক্ষ্যে পুটুসকে একটা চিমটি কাটলো, পুটুসও বাপ্টিকে।

জ্যেঠু গলা নামিয়ে বললেন, 'দ্যাখ্ বামুন ঠাকুরের কানে যেন কথাটা না ওঠে, তা হলে রান্নাঘরে ঢুকতে ভয় পাবে, কাজ ছেড়ে পালাবে।'

বাবা বললেন, 'ও তো কিছু দেখতে পায়নি, দিনের বেলা থাকে না।'

'সেই তো অন্য উপদ্রব যদি না হয়. এখন বলাবলিতে কাজ নেই।'

'সদুর মা কি আর না বলে ছেড়েছে?'

'ও বললে কেউ গ্রাহ্য করেনা। হাসে।'

অতএব ঘটনাটা চাপা চাপাই থাকলো।

কিন্তু জ্যেঠুকেই বা ঠিক বিশ্বাস কী. উনিও তো চিরকেলে ভীতু। ঠাকুমা বলেন, বুড়ো বয়েসে পর্যন্ত নাকি রাত্রে বাইরে যেতে উনি ঠাকুমাকে ডেকে তুলতেন। পাছে বউ এসে ওই ভীতুমি দেখে হাসে, তাই ইহজন্মে বিয়েই করলেন না। তা' ওনার সামনে তো আর বলা যায় না এ-কথা!

বাবা চুপিচুপি কাকুকে বললেন, 'ফ্যাচা আজ তুই আর আমি দেখবো। সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে, টর্চটা নিয়ে আমায় ডেকে নিয়ে যাবি।'

পরামর্শটা অবিশ্যি ছোটদের কান এড়াল না। ওরা ঠিক করলো, বাবা যখন উঠে যাবেন, ওরাও চুপিচুপি বাবার পিছু পিছু যাবে। মার ঘুম গভীর, সেদিকে ভয় নেই।

'জন্মে কখনো তো ভূত দেখিনি, একবার যখন সুযোগ হচ্ছে—' বাপ্টি বললো, 'কিন্তু তোর আর যেতে হবে না, তুই যা রামভীতু। হয়তো সদুর মা-র মতন 'আঁ আঁ' করে অজ্ঞান হয়ে যাবি, তখন লুকিয়ে চলে আসার জন্যে পিটুনী খাবি।'

পুটুস বললো, 'ইস! আমি ভীতুর রাজা, না তুই ভীতুর সম্রাট। মনে নেই সেদিন?'

হ্যাঁ সেদিন, মানে সেই সদুর মা-র দিন, দিদি সারারাত ওকে আঁকড়ে শুয়েছিল। মনে নেই বলা চলেনা।

সেদিন অনেক রাত্রে বাপ্টি আর পুটুসের পরিত্রাহি চীৎকারে শুধু বাড়ির কেন, পাড়ার লোকেরাও জেগে গেল। এ-বাড়ি ও-বাড়ির বারান্দা জানলা থেকে প্রশ্ন শোনা গেল, 'কী হয়েছে মশাই? কে অমন চেঁচিয়ে উঠলো আপনাদের বাড়িতে?'

ছোটকাকু বললেন, 'কেউ না। বাচ্চারা স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছে। আপনারা নির্ভয়ে ঘুমুতে যান।'

এদিকে নিজেদের ভয়ে হাত পা কাঁপছে।

সেই দৃশ্য!

সেই দু-হাত ছড়িয়ে গ্রীল চেপে ধরা ঘাড়-গোঁজা মূর্তি। ছায়া ছায়া শীর্ণ!

আরো দু' দিন দেখলো সবাই।

মানে বাড়ির সব্বাই।

সকলেরই ধারণা, ওরা কী দেখতে কী দেখেছে। আমি নিজের চোখে দেখি। কিন্তু উঁকি মারতে যা দেরী, সবাই পিছিয়ে আসছে সেই দৃশ্য দেখে।

এদিকে বাড়িতে নানা দুর্ঘটনাও শুরু হয়ে গেছে।

একদিন বাপ্টির মার কুটনো কুটতে গিয়ে আঙুল কেটে গিয়ে রক্তপাত হলো,

একদিন ঠাকুমার পায়ে পান ছেঁচে খাবার হামানদিস্তেটা পড়ে গেল।... একদিন কইমাছ ভাজতে গিয়ে বামুন ঠাকুরের সর্বাঙ্গে গরম তেলের ছিটে লেগে ফোস্‌কা পড়লো, একদিন ছোট কাকুর নতুন টেরিকটের প্যান্টটায় কিসের যেন খোঁচা লাগলো, আর সেদিন সদুর মার হাত থেকে একসঙ্গে একগাদা কাঁচের বাসন পড়ে ভেঙে গেল!

এইভাবে চলতে লাগলে কী করে এ-বাড়িতে টেঁকা যায়? ঠাকুমা অবিশ্যি সদুর মাকে বকলেন, 'তোকে কতদিন বলেছি, একসঙ্গে অতগুলো বাসন নিয়ে সিঁড়ি নামিসনি—'

তা সদুর মাও সতেজে বললো, 'খুবই সাবধানে নে যাচ্ছিনু মা, কে যেন হাতে ধাক্কা দে ফেলে দিলো।'

ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো সকলের।

আর কে দেবে ধাক্কা?

সেই ছায়ামূর্তিটি ছাড়া?

যে নাকি সারাক্ষণই অনিষ্ট ঘটিয়ে বেড়াচ্ছে?

কেন ঘটিয়ে বেড়াচ্ছে, তা-ও জানা হয়ে গেল। বামুন ঠাকুরের কানে কথাটা বাড়ির কেউ না তুললেও বাসনমাজা ঝি তবু তুলেছে। সে এ-পাড়ার বাসিন্দা। এ-বাড়ির অনেক রহস্যও সে জানে। তার কাছেই জানতে পেরে গেছে ঠাকুর এই বাড়ির ওই রান্নাঘরের সিলিঙের আলোর দড়িতে দড়ি বেঁধে একজন না কি গলায় ফাঁস দিয়ে মরেছিল। সে না কি বাড়ির একটা চাকর ছিল, কেন মরেছিল কেউ জানেনা।

সেই ভাড়াটেবাবুরা তারপরই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

ও-কথা শোনার পর থেকে ঠাকুর রোজই বলছে, 'ও ঘরে আমি রাঁধবো না।'

কিন্তু তা ছাড়া রাঁধবেই বা কোথায়?

জ্যেঠু অবশ্য আশ্বাস দিয়েছিল, 'আচ্ছা ছাদে একটা ঘর করে দেব।'

কিন্তু 'ছাদে' শুনে ঠাকুর দুই হাত কপালে ঠেকিয়েছে। ছাদ তো শ্রেষ্ঠ ভয়ের জায়গা।

এরপরই একদিন এক কান্ড হলো।

ঠাকুমার ঠাকুর ঘরের তাক থেকে কুলের আচারের বোতলটা হাওয়া হয়ে গেল। অথচ দরজায় যেমন চাবি তেমনি চাবি।

ঘরে আরো কত জিনিস রয়েছে— রুপোর পঞ্চ প্রদীপ, গোপালের গলার সোনার হার, সে-সব গেল না, গেল কি না আচারের বোতল! অতএব চোরের কাজ নয়। বাপ্টি আর পুটুস ওই বোতলটা যাওয়ায় 'হায় হায়' করলো।

ঠাকুমা বললেন, 'তাই তো যাবে। ভূত মুখপোড়া যে খাবারের জন্যেই মরছে। নইলে রান্নাঘরের জানলায় ঝুলে মরে? ...ঠাকুর দেবতার জিনিসে হাত দেবে, এমন সাহস তো নেই।

ঠাকুমা সেইদিনই পুরুত ঠাকুরকে ডেকে নারায়ণের তুলসী দেওয়ালেন চন্ডীপাঠ করালেন, সারা বাড়িতে শান্তিজল ছিটোলেন, বড়দের হাতে হাতে তারকেশ্বরের তাগা পরিয়ে দিলেন, আর ছোট দুটোর গলায় রাম নামের কবচ ঝুলিয়ে দিলেন।

পুরুতমশাই সব শুনে টুনে পুঁটুলীপত্র নিয়ে যাবার সময় বলে গেলেন, 'এটি মা আপনাদের আরো আগেই করা উচিত ছিল। দেখবেন আর কোনো অনিষ্ট হবে না। আমি বাড়ির চৌদিকে 'ভূত বন্ধন মন্ত্র' পড়ে দিয়ে গেলাম।'

সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো।

যাক, দেরীতে হলেও, কাজটা হলো যখন, আর ভয় নেই!

হায় ভগবান! হায় ভূত!

পরদিনই বাপ্টি আর পুটুস, যাদের গলায় না কি রাম নামের কবচ দেওয়া হয়েছে, তারা হঠাৎ বিনা কারণে এমন পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করতে শুরু করলো যে ডাক্তার ডাকতে হলো।

ডাক্তার অবশ্য নিজেরই লোক, বাপ্টি-দের একজন তুতো মামা!

তিনি অবস্থা দেখেই ধমক দিলেন, 'কী করেছিস? এন্তার ফুচকা খেয়েছিস?'

ওরা কেঁদে ফেলে বললো, 'না ডাক্তারমামা, মোটেই না।'

'তবে? ঝালমুড়ি?'

'না মামা!'

'তা হলে কাঠি পকৌড়ি? ডালিম হজমি? জিরে যোয়ান? চিনেবাদাম? ডালমুট? তেলে ভাজা? ফুলুরি?'

'ওসব কিছু না ডাক্তারমামা, কিছু না।'

'কিছু না, অথচ একসঙ্গে দুজনের এক রোগ! এ কী মামদোবাজি না কি?'

এবার আর বাপ্টিদের মা চুপ করে থাকতে পারলেন না, কেঁদে ফেলে বললেন, 'তাই টাবুদা, তাই। মামদো না হোক ভৌতিক ব্যাপারই।'

তারপর একে একে সবই খুলে বলেন।

আর বলবো কি, বলতে বলতেই বাড়িতে আবার এক দুর্ঘটনা ঘটে। স্বয়ং জ্যেঠু, মানে জি জি গাঙ্গুলী, ওরফে গণেশগোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, মানে বাড়ির হর্তা-কর্তা-বিধাতা সিঁড়িতে পা পিছলে আছাড় খেলেন। জল ছিল সিঁড়িতে।

জল কে ফেলেছে?

সদুর মা।

কিন্তু কবে না সদুর মা সিঁড়িতে জল ছড়ায়? রোজ পড়ছে লোকে?

বাপ্টিদের মা ছুটতে ছুটতে চলে গেলেন, ওদের ডাক্তারমামাও গেলেন, ধরে তোলা হলো জ্যেঠুকে, আর শুধুই পায়ে লেগেছে, মাথাটা ফাটেনি, এই বলে ভগবানকে (অথবা ভূতকে) ধন্যবাদ দিয়ে পায়ে চুণে হলুদ লাগিয়ে বসিয়ে রাখা হলো ওঁকে। অফিস যেতে দেওয়া হল না, আর ঠাকুমা কপালে হাত চাপড়ে বললেন, 'তবু তোরা এ বাড়ি ছাড়বি না বোঁচা-ফ্যাচা?' ভালো বাড়ি বলে বসে থাকবি? এর পর প্রাণ কটা যাবে, এই চাস তোরা?'

ডাক্তারমামা প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে বললেন, 'সত্যি জামাইবাবু, এ বাড়িটা আপনাদের ছাড়াই উচিত। এতোই যখন ইয়ে হচ্ছে!...আচ্ছা রোজই দেখা যায়?'

'দেখলেই দেখা যায়। আর কেউ দেখতে যাই না।'

'সত্যিই আগে এ-বাড়িতে গলায় দড়ির কেস্‌ হয়েছিল?'

'তাই তো শুনেছি।'

'আমি অবশ্য বিজ্ঞানের ছাত্র, এসব মানা উচিত নয়, তবু সত্যি বলবো, মানি। জগতে সবই আছে। ভগবানও আছে, ভূতও আছে।

চলে গেলেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে বোঁচা আর ফ্যাচা বাড়িওয়ালার কাছে গিয়ে নোটিশ দিয়ে এলেন!

বাড়িওয়ালা তো শুনে হাঁ।

'কী মশাই, এই কদিন এলেন, এরই মধ্যে কী হলো?'

'কিছু না। পাড়াটা আমাদের স্যুট করছে না।'

তারপর আর কী?

বাড়ি বললেই তো আর বাড়ি পাওয়া যায় না?

শ্যামপুকুরের সেই পুরনো বাড়ি-ওয়ালাকে গিয়েই ধরা হলো। সে বাড়িতে এখনো ভাড়াটে আসেনি, মিস্ত্রী লেগেছে, মেরামত হচ্ছে। গলির মধ্যে জরাজীর্ণ বাড়ি, না সারালে তো আর ভাড়া হবে না?

সেও মওকা পেয়ে দাঁও মারলো।

বললো, 'অনেক খরচা হচ্ছে, ডবল ভাড়া দিতে হবে।'

হবে তো হবে।

প্রাণে বাঁচতে তো হবে!

এ-বাড়িটা ছাড়ার সময় এসে গেলে সকলেরই শোক উথলে ওঠে।

আহা কী চমৎকারই ছিল বাড়িটা!

কেমন খোলামেলা!

কেমন বড় দালান! কেমন ঝোলানো

বারান্দা, কেমন চওড়া চওড়া দরজা জানলা!

শুধু ঠাকুমা রাগ করে বললেন, 'হ্যাঁ কেমন জানলায় ভূত!'

চলে যাওয়া হবে ভালো দিনক্ষণ দেখে, সক্কালবেলা। যাতে ছায়ামূর্তিটি না সঙ্গ নেয়। বামুন ঠাকুরকে বলে রাখা হলো, 'আজ আর তুমি তোমার দাদার বাসায় না শুয়ে, রাতের রান্না খাওয়া সেরে দিয়ে সোজা পুরনো পাড়ায় গিয়ে শুয়ে থাকোগে। আর ভোরে উঠে উনুন ধরিয়ে কাজে লেগে যাওগে। অফিস ইস্কুল তো আছে? জ্যেঠুতো আর চিরদিন পায়ে চুণে হলুদ লাগিয়ে বসে নেই?'

ঠাকুর সেই মতো চলে গেল।

আর কী বলবো, যাবার সময় দরজায় ঠাঁই করে মাথা ঠুকলো।...

তার মানে ভূত শেষ কামড় কামড়াচ্ছে।

এরপর সমস্তটা রাত শুধু দুর্গানাম জপ করে কাটিয়ে দিয়ে সকাল হতেই কেটে পড়া।

ভোরবেলা উঠে পুটুস দুঃখের গলায় বলে, 'আবার সেই বিচ্ছিরী বাড়িটা! জীবনে কীই-বা মজা আছে বল দিদি? এ-বাড়িতে তবু একটা মজার জিনিস ছিল!'

'যা বলেছিস! ভূতটার জন্যে আমার মন কেমন করছে। কেবল জানলায় ঝুলে তাকিয়েই থাকলো। কোনোদিন কিছু খেতেও পেল না।'

'আচ্ছা, আমরা কিছু দিয়ে চলে যাবো? এখন তো আর নেই সে?... রাত্তিরে এসে খাবে।'

'আমরা আবার কী দেব?'

'কেন, বিস্কুট, টফি!'

'তা বরং দেওয়া যায়। এইবেলা চল, বড়রা উঠলে তো হবে না কিছু! আমাদের সব ইচ্ছে ঘোচানোই তো কাজ ওঁদের।'

অতএব দুই ভাই-বোন পা টিপে টিপে উঠে পড়ে কিছু বিস্কুট টফি নিয়ে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়ালো।

'পুটুস, তুই আগে দরজা ঠ্যাল্।'

'আহা রে! তুই বড় না? তুই ঠ্যাল্ না!'

'আমি তো একটু ভীতু আছিই, জানিস তো'—।

'আর আমি যেন কম ভীতু?'

'তবে আয় দুজনে একসঙ্গে ঠেলি।'

দিল ধাক্কা দুজনে, আর খুলেই 'আঁ' করে উঠলো।

আজ ভোরবেলাতেও সেই ছায়া-মূর্তি!

কিন্তু ওই একবারই আঁ!'

তারপরই বাপ্টি বলে উঠলো, 'পুটুস! ওটা কী?'

'ওটা তো, ওটা তো—ইয়ে একটা শ্যার্ট! 'মা, মা—বাপী! জ্যেঠু!'

হ্যাঁ, আসলে ওটা একটা শার্টই।

পুরনো। ছিটের শার্ট।

ওদের কলকোলাহলে সকলেই এসে দেখতে পেলো।

ছোটকাকী বললেন, 'ওটাতো আমি বামুন ঠাকুরকে দিয়েছিলাম গ্যাসের স্টোভটা মুছতে টুছতে।'

তা, তাই করেছে ঠাকুর। করেই এসেছে এতোদিন ধরে। কালও করে গেছে।

রাত্রে মোছার পর কেচেকুচে জানলার বাইরে ঝুলিয়ে রেখেছে শুকোবার জন্যে। সহজে শুকোবে বলে, শার্টের হাতা দুটোকে ছড়িয়ে গ্রীলে গুঁজে দিয়েছে, আর কলারটাকে উঁচু করে তুলে, গ্রীলের ডিজাইনের আর একটা খোঁচায় ঠেকিয়ে রেখেছে। রোজ করে, রোজ সকালে এসেই নামিয়ে নেয়, পাছে 'বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে' বলে মা কাকীমা বকেন।

আজ আর ঠাকুর সকালে আসেনি তাই সেই শার্ট দুহাত ছড়িয়ে ঝুলছে।

কিন্তু তখন আর কী?

তখন তো মালপত্র বাঁধাছাঁদা। পুরনো বাড়িতে উনুনে আগুন পড়ে গেছে। আর এ-বাড়ির বাড়িওয়ালা অন্য ভাড়াটে ঠিক করে ফেলেছে।

গণেশগোবিন্দ টাকের চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললেন, 'আমিই না হয় গণেশ-গোবিন্দ! তোরা কী? বোঁচা, ফ্যাচা? তোরাও একটু ভাববি তো জগতে সত্যি ভূত বলে কিছু থাকতে পারে না। ভূত মানেই, যা নেই।'

বোঁচা-ফ্যাচা বললেন, 'আমরা গোড়া থেকেই ভেবেছি, ভূতটুত সব বোগাস। হতেই পারে না। শুধু মার ভয়েই—'

ঠাকুমা রেগে বললেন, 'মার ভয়ে? বললেই হলো? কেন বাপ্টিদের মামা, বোঁচার শালা বললো না এ-বাড়ি ছেড়ে দিতে?'

কাকু একটু হেসে বললেন, 'তবে আর মার দোষ কী? তিনি তো আবার বিজ্ঞানের ছাত্র!'

'মানে ওই শালার জন্যেই এমন বাড়িটি ছাড়তে হলো আমাদের।'

বললেন বোঁচা!

আর বাপ্টি পুটুস চুপিচুপি বললো, 'কুলের আচারটার জন্যেই এই কাণ্ড হলো রে—না হলে তো মামা আসতো না।'

কী বলছো?

তারপর?

আবারও তারপর? নাঃ তোমরা জ্বালালে।

তারপর সবাই নিজেদের বুদ্ধির গলায় দড়ি পরাতে পরাতে, গালে মুখে চড়াতে চড়াতে, টাকের চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে, আর চোখ মুছতে মুছতে গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

আর ময়লা ছেঁড়া ছিটের শার্টটা রান্নাঘরের জানলার বাইরে দুহাত ছড়িয়ে গ্রীল ধরে শূন্যে ঝুলতে লাগলো ঘাড় গুঁজে।

শুধু সদু-র মাই দৃঢ় বিশ্বাসে বললো, 'দিনের বেলায় ওনারা অমন নিরীহ চ্যাহারা নিয়ে ঝুলে থাকেন, আত্তিরে নিজ মুত্তি ধরেন। নচেৎ বাড়িতে এতো সব দুঘ্‌ঘটনা ঘটছ্যালো কেন?'

কিন্তু সদু-র মা-র কথায় কে কান দেয়? তাছাড়া ওর দোক্তার কৌটো থেকেই তো এই বিপত্তি? ওর ওপরে সবাই বেজার। □

আপনি যা করুন না কেন ফিলিপ্‌স স্ট্রিপলাইট আপনাকে তা আরও ভাল করে করতে সাহায্য করে।

ফিলিপ্‌স স্ট্রিপলাইট একটি ১০০ ওয়াট বাল্বের দ্বিগুণ আলো দিলেও এর বিজলী খরচ ৪০ ওয়াট বাল্বের সমান। ফিলিপ্‌স স্ট্রিপলাইট জ্বালুন—বিজলী খরচ কমান। গুণ এবং কার্য্যকরীতার প্রশ্নে ফিলিপ্‌স স্ট্রিপলাইট নিঃসন্দেহে আপনার শ্রেষ্ঠ সওদা। সুসংবদ্ধ ফিলিপ্‌স স্ট্রিপলাইটে রয়েছে তারে জড়ানো প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ, বসানো সহজ—ব্যবহারে কম খরচ। দোকানে বা বাড়ীতে যেখানেই হোক, এই স্ট্রিপলাইটে আপনার কাজ হবে আরও নিখুঁত।

যখুনি ভালো আলোর দরকার হয়, ফিলিপ্‌সই সবচেয়ে আগে তা নিয়ে আসে

ফিলিপ্‌স

ফিলিপ্‌স ইণ্ডিয়া লিমিটেড

আপনার বাচ্চারা কি খাবারে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ পাচ্ছে না ?

প্রত্যেক দিন মাত্র একটি 'ভিটামিনেটস্' ফর্টে তাদের দৈনিক অত্যাবশ্যক প্রয়োজন সুনিশ্চিতভাবে মেটাবে।

বাচ্চারা দেখতে বেশ স্বাস্থ্যবান হলেও তাদের আহারে ভিটামিনের অভাব থাকতে পারে। আর আপনিও সে বিষয়ে জানতে পারবেন অনেক দেরীতে। কারণ, আপনি তাদের যেসব খুব ভালো ভালো খাবার খেতে দেন তাতে প্রায়ই ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অভাব থাকে। মনে রাখবেন, বাচ্চারা সবসময়ে উদ্দাম ও প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর। যদি তাদের ভিটামিন না দেন, তবে আপনি তাদের প্রর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ও শক্তি থেকে বঞ্চিত করছেন। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ও শক্তির জন্য শরীরের দরকার সুষম আহার। প্রত্যেক দিন মাত্র একটি 'ভিটামিনেটস্' ফর্টে বাচ্চাদের ও আপনাকে যোগাতে পারে পুষ্টির জন্য অত্যাবশ্যক

জীবনীশক্তিতে ভরপুর চক্‌চকে লাল ট্যাবলেট।

উপাদান—১১ টি ভিটামিন ও ৫ টি খনিজ পদার্থ। দিনে ১৫ পয়সার খরচেই আপনি পাচ্ছেন শরীরকে সুস্থ ও সবল ক'রে গড়ে তোলার দৈনন্দিন প্রয়োজনের অপরিহার্য পদার্থ। আজই আপনার কাছাকাছি ওষুধের দোকানে গিয়ে কিছু 'ভিটামিনেটস' ফর্টে কিনে আনুন। দিনের প্রারম্ভেই বাচ্চাদের খেতে দিন —'ভিটামিনেটস' ফর্টে।

'ভিটামিনেটস্' ফর্টে

ট্রেডমার্ক

'রোশ'

'রোশ'-এর উৎপাদন

ধাঁধা

উপরের ছবিটি এবারের কলকাতার ফুটবল মরশুমের আকর্ষণীয় একটি খেলার। বলতে পারো, খেলাটা কাদের সঙ্গে কাদের? পারলে হয়তো কারা গোল করেছে বলতে পারবে। ছবির মধ্যে কোনজন গোলটা দিয়েছে আর তার নামও বলতে পারবে।

এবার উপরের সঙ্গে নিচের ছবিটা মেলাও। হুবহু একই ছবি কিন্তু তবু কিছু তফাৎ রয়েছে। কী বা কী-কী বলতো?

উত্তর ১৭৬ পৃষ্ঠায়।

খেলার ধাঁধা

এবারের লীগে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে গোল দিচ্ছে সুভাষ ভৌমিক।
নিচের ছবিতে ১৬ নম্বরী খেলোয়াড়ের পিঠে কোন নম্বর নেই।
পিছনে লোহার দণ্ডটি নেই গোল পোস্টের। একদম ডানদিকের খেলোয়াড়ের সাদা প্যান্ট কালো হয়ে গিয়েছে। মাটিতে পড়ে থাকা খেলোয়াড় একজন উধাও।
গোলপোস্টের পিছনে বসে থাকা একজনের মাথায় টুপি নেই।

বাড়ন্ত বয়েসের ছেলেমেয়েদের সাথী-ইন্‌ক্রিমিন*!

ইন্‌ক্রিমিন টনিক – বাড়ন্ত বয়েসের ছেলেমেয়েদের জন্যে অতুলনীয়!

ডাক্তারদের কাছে নির্ভরযোগ্য নাম Lederle সায়নামিড ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি বিভাগ।

*আমেরিকার সায়নামিড কোম্পানীর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

হিসাব

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

এবার পতিতপাবন রুদ্র উঠলেন।

বিধানসভা একেবারে চুপ। পিছনের দিকে জন চারেক সদস্য নিদ্রা যাচ্ছিলেন। তাঁদের নাকের আওয়াজও বন্ধ হয়ে গেল।

এক একটি প্রশ্ন যেন এক একটি তীর। যাঁর উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হয়, তাঁকে একেবারে কাহিল করে ফেলে। উত্তর দেবার মতন আর শক্তি থাকে না। কেবল তোতলাতে থাকেন। ধরাশায়ী হতে বিলম্ব হয় না।

যে কোন ব্যাপার পতিতপাবন বাবুর একেবারে নখদর্পণে। কি অগাধ পাণ্ডিত্য ভাবলে অবাক হতে হয়। কোচবিহারের স্বল্পখ্যাত এক জেলায় কজন লোকের একটা চোখ নেই, মেদিনীপুর শহরে কটা নলকূপের হাতল উল্টো লাগানো হয়েছে, রায়গঞ্জ সাবডিভিসনে কটা গরুর অপুষ্টির জন্য শিং ওঠে নি, সব তাঁর মুখস্থ। কোন কাগজপত্র উল্টে দেখবার প্রয়োজন হয় না, মুখে মুখে ফিরিস্তি দিয়ে যান।

তাই সরকার পক্ষের সবাই পতিতপাবনবাবুকে রীতিমত সমীহ করেন। ভাষণ দেবার সময় আড়চোখে পতিতপাবনবাবুকে লক্ষ্য করেন। বেফাঁস
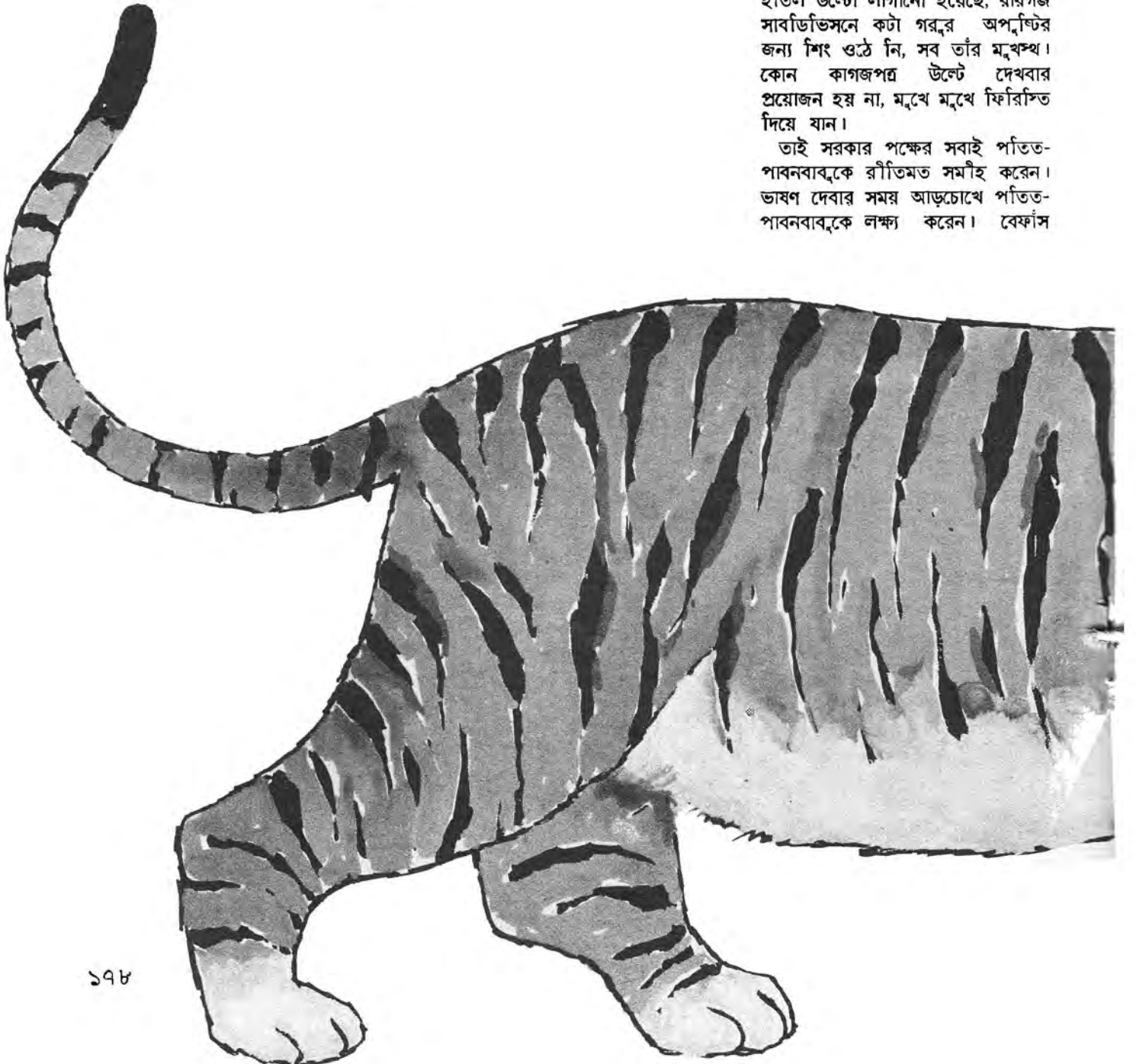
কিছু বললেই সর্বনাশ। তাঁর হাতে নিস্তার নেই।

কাজেই পতিতপাবনবাবু উঠে দাঁড়াতেই মুখ্যমন্ত্রীও একটু বিচলিত হলেন।

পতিতপাবনবাবু দাঁড়িয়ে একবার মুখ্যমন্ত্রীর দিকে দেখলেন, জরিপ করার ভঙ্গীতে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আপনার সরকার কি অবহিত আছেন, এ বছর সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা মাত্র দু হাজার তিন শো ছাপ্পান্ন, অথচ গত বছর এই সময়ে বাঘের সংখ্যা ছিল তিন হাজার একশো তেইশ। অবশ্য বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর দুশো তেরটি বাঘ সে দেশে চলে গেছে। বাকি বাঘ মারা গেছে অনেক কারণে। শিকারীরা মেরেছে ত্রিশটা, বিষাক্ত কাঁটায় কেটে গিয়ে গ্যাংগ্রিন হয়ে মারা গেছে তিনশো বাইশ, পানীয় জলের অভাবে মারা গেছে কুড়ি। আত্মহত্যা করেছে গোটা ষোল। বাঘের জন্য আপনাদের দরদের অন্ত নেই। সিংহের কাছ থেকে পশুরাজ খেতাব কেড়ে নিয়ে আপনারা বাঘকে দিয়েছেন। অবশ্য এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আমাদের অজানা নয়। ইংরাজদের মত আপনারাও ভেদনীতি চালাচ্ছেন। সিংহ আর বাঘের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি করাই আপনাদের আসল মতলব। বাঘ বাঁচাবার জন্য আপনারা কী করছেন জানাবেন কি?

মুখ্যমন্ত্রী চশমা খুলে নিয়ে চাদরে মুছলেন। এ ধরনের প্রশ্নের জন্য সময় দরকার। আগে থেকে নোটিশ দিয়ে রাখতে হয়। তবু কিছু একটা বলতে না পারলে ইজ্জত থাকে না।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল। এ প্রশ্ন আপনি পশুমন্ত্রীকে করবেন।

ভ্রূ কুঁচকে পতিতপাবনবাবু বললেন, কিন্তু আপনি তো মুখ্যমন্ত্রী। সব মন্ত্রীই আপনার তাঁবে।

তা হলেও, সুষ্ঠু কাজের জন্য বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব বিভিন্ন মন্ত্রীদের ওপর দেওয়া হয়।

সরকারের চিফ হুইফ উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন, আমি প্রবলভাবে, উঃ—

চিপ হুইপ বসে পড়লেন। দু পায়েই বাত। আজ আবার পূর্ণিমা। আগে চিনির কারবার ছিল। বহুকষ্টে খদ্দেরের জীপে এসে পোঁছেছেন। এখন মনে হচ্ছে না আসাই উচিত ছিল।

পাশের ভদ্রলোকটি ঝুঁকে পড়ে বললেন, দাদা, রশুন খাচ্ছেন না?

বিমর্ষকণ্ঠে চিফ হুইপ উত্তর দিলেন, চেষ্টা খুব করেছি ভাই, কিন্তু পেটে রাখতে পারি না। তোমার কথামত ভোরবেলা গায়ত্রী জপ করেই একটা রশুন মুখে পুরেছিলাম, বিকালে চাঁপদানীর মাঠে যখন বক্তৃতা দেবার জন্য মুখ খুলেছি, সেই রশুন ছিটকে সামনের এক ভদ্রলোকের মাথায় গিয়ে পড়ল। আমারও বরাত, ভদ্রলোকের মাথায় আব ছিল, তাতেই লাগল। আমার বক্তৃতার জোর জানো তো, রশুনও একটু জোরেই বেরিয়ে গিয়েছিল। অন্যসময় কিছুই হ'ত না, কিন্তু ভদ্রলোক আমার বিপক্ষদলের লোক। সেই আঘাতেই চেঁচামেচি করে মূর্ছা গিয়ে বিশ্রী কাণ্ড। তাঁর দলের লোকেরা আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। কোন রকমে উদ্ধার পেয়েছি। সেই থেকে রশুন আর খাই না।

বেশ তাহলে পশুমন্ত্রীই আমার কথার উত্তর দিন।

পশুমন্ত্রী জর্দা দিয়ে পান চিবোচ্ছিলেন। তিনি পাকা লোক। বহুবার মন্ত্রিত্ব করেছেন। সব দপ্তর ঘুরে এখানে এসে ঠেকেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

পশুমন্ত্রীর ধারে কাছে কেউ বসতে
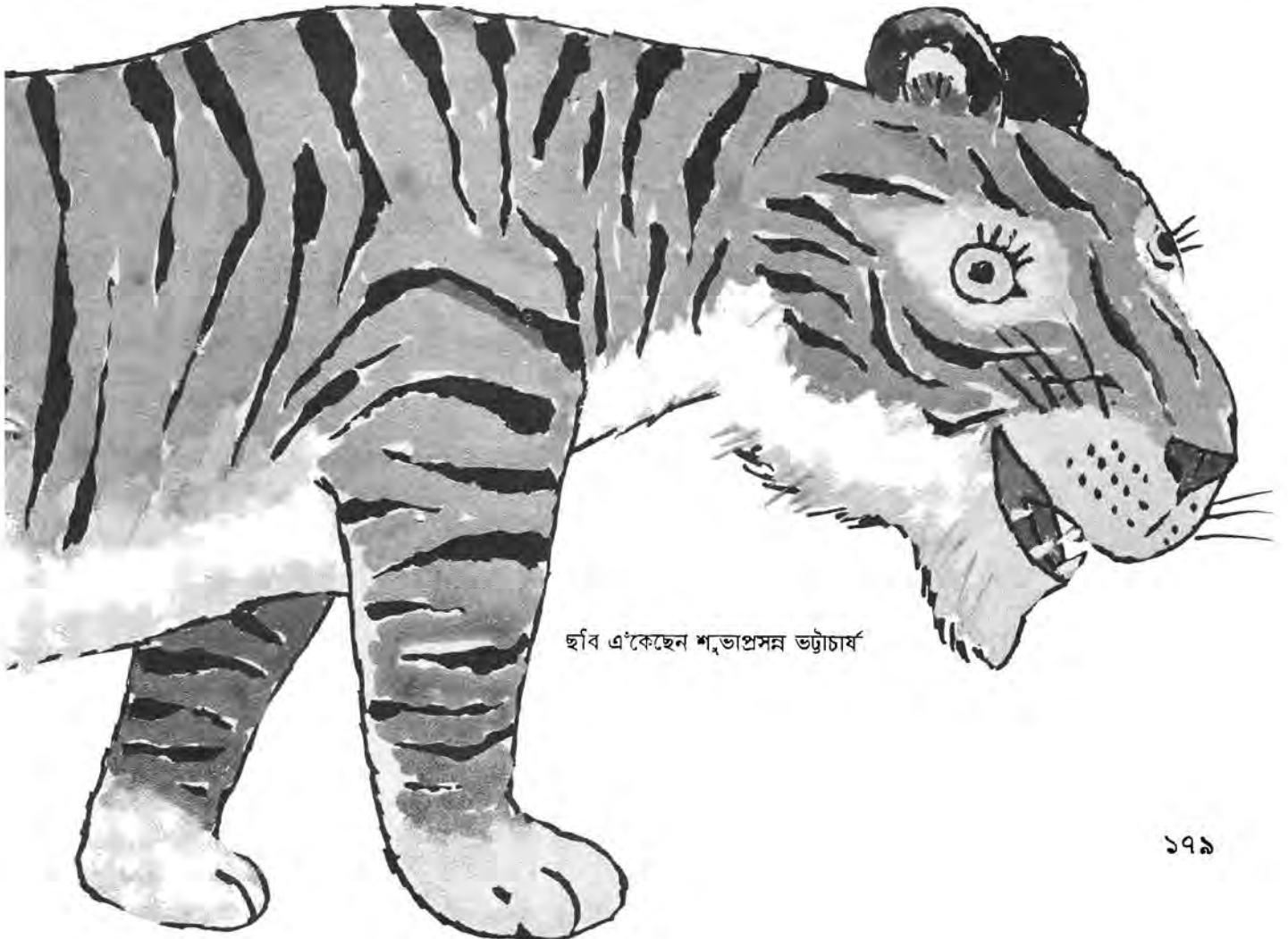
ছবি এঁকেছেন শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

চান না। সর্বদাই তাঁর মুখে পান ভর্তি। বক্তৃতা দেবার সময়ে পানের রস ফোয়ারার মতন ছোটে। ফলে, আশপাশের সবাই যখন বেরিয়ে আসেন, মনে হয় হোলি খেলে ফিরলেন।

মাননীয় সদস্য খুব বুদ্ধিমানের মতনই প্রশ্ন করেছেন, তবে তিনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন এ ধরনের প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য দপ্তর আছে, তাঁরা অনুসন্ধান করে এক সপ্তাহের মধ্যে সব কিছু জানিয়ে দেবেন। মাননীয় সদস্য অনুগ্রহ করে যেন প্রশ্নের একটি কপি অধ্যক্ষের কাছে পেশৈছে দেন।

বিধান সভা সেদিনের মতন শেষ।

পশুমন্ত্রী বিভাগীয় সচিবকে ফোন করলেনঃ মিস্টার সেনগুপ্ত, আপনি বাঘের এই হিসাবটা পাঁচদিনের মধ্যে আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। অত্যন্ত জরুরি।

ঠিক আছে স্যর। প্রশ্নটা লিখে নিই। মিস্টার সেনগুপ্ত প্রশ্নটা লিখেই বেল টিপলেন। বেয়ারা আসতে বললেন, লাহিড়ি সাব।

সহকারী সচিব লাহিড়ি ওঠবার ব্যবস্থা করছিলেন। তিন দিন পরে জামাইষষ্ঠী। তাঁর সব সুদ্ধ সাত মেয়ে। সাত জামাই ভারতবর্ষের নানা দেশে ছড়ানো। আজ বিকাল থেকে সব আসতে আরম্ভ করবে। ছেলে নেই, কাজেই সব কিছুর ভার তাঁর ওপর। বিরক্ত মুখে বললেন, জ্বালালে। এই অসময়ে আবার ডাক কেন? তারপর উঠে সচিবের ঘরে ঢুকলেন।

বাঘের প্রশ্ন পেয়ে তাঁর চোখ কপালে উঠল। বললেন, কি ব্যাপার বলুন তো? বাঘের এত হিসাব নিকাশ কেন? এরপর কি তাদেরও ভোট দেবার অধিকার হবে? সে রকম কোন আইন আসছে?

জানি না মশাই। জানেন তো, আমরা একেবারে সৈনিকদের মতন। হুকুম তামিল করাই আমাদের কাজ। দেখুন, কি করতে পারেন। আর সময়ও নেই।

লাহিড়ি প্রশ্ন নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

এরপর লাহিড়ির কামরায় সুপারিন্টেন্ডেন্ট রামতনু ধাড়ার ডাক পড়ল। রামতনুবাবু নৈহাটি থেকে যাওয়া আসা করেন। একটু দেরীতে অফিসে আসেন, কিন্তু থাকেন রাত সাড়ে সাতটা পর্যন্ত। ভিড়ের জন্য তার আগে আর ট্রেনে উঠতে পারেন না। বসে বসে একলা একলা বাঘবন্দী খেলেন।

লাহিড়ির কথা শুনে চমকে উঠলেন, আবার বাঘ?

আবার বাঘ মানে? এর আগে আবার কবে তোমায় বাঘ দেখালাম?

রামতনুবাবু সামলে নিলেনঃ না স্যর, বলছি, চারদিনের মধ্যে এত বড় হিসাব কি করা যাবে? এতো আর আন্দাজে দেওয়া যায় না।

আন্দাজে দেওয়া যায় না?

সেটা কি ঠিক হবে? আপনার মনে আছে, বছর দুয়েক আগে এই ধরনের একটা প্রশ্ন এসেছিল। পতিতপাবন রুদ্রেরই প্রশ্ন। পার্ক স্ট্রীটের মোড় থেকে টালিগঞ্জ ব্রিজ পর্যন্ত জলের পাইপ আর টেলিফোনের লাইনের জন্য ক জায়গায় গর্ত খোঁড়া হয়েছে। আপনি বললেন, সময় নেই, আন্দাজে একটা লিখে দাও। দিলাম লিখে, দুশো পঁয়ত্রিশ। তাই নিয়ে বিধান সভায় হুলুস্থুল কান্ড। রাতারাতি লোক নিয়ে আমি নিজে বের হয়েছিলাম। গুনে দেখলাম দুশো বত্রিশটা গর্ত। বাকি তিনটে গর্ত লোক দিয়ে খুঁড়ে তবে শান্তি।

লাহিড়ি বিরক্তকণ্ঠে বললেন, যা হোক একটা কিছু কর রামতনু। আমি আর ভাবতে পারছি না। আমার বাড়ীতেই সাতটা বাঘের আমদানি হচ্ছে।

বাড়ীতে বাঘ? রামতনুবাবু বিস্মিত হলেন।

আরে জামাইষষ্ঠী না? সাত জামাই আসছে।

পরের দিন অফিসে এসেই রামতনুবাবু সেকশন-ইন-চার্জ অবিনাশ রায়কে তলব করলেন। খুব করিতকর্মা লোক অবিনাশ। নিজে কাজ করে না, কিন্তু পরের কাছ থেকে ঠিক কাজ আদায় করে নেয়। রামতনুবাবুর বিশেষ প্রিয়পাত্র।

শোন অবিনাশ, বস। বাঘের হাত থেকে আমাকে বাঁচাও।

অবিনাশ অবাক হ'ল। বলেন কি, নৈহাটিতে বাঘ? হবে না, মিউনিসিপ্যালিটিগুলো অকর্মণ্য হয়ে উঠেছে। কিছু পরিষ্কার করবে না। চারদিকে আগাছা আর জঙ্গল বাড়ছে। জঙ্গল থাকলেই বাঘ থাকবে, এ তো জানা কথা। একটা কাজ করুন না, রেশনের আটা সিন্নির মতন মেখে বাড়ীর দরজায় রেখে দিন না।

রেশনের আটা?

হ্যাঁ, যা আটা দিচ্ছে, বাঘের বাপও হজম করতে পারবে না। লিভারের দফা শেষ হয়ে যাবে।

আরে না, না, নৈহাটিতে বাঘ নয়, বিধানসভায় বাঘ।

বিধানসভায়? সে কি? চিড়িয়াখানা থেকে এতদূর এসেছে নিজেদের অবস্থা জানাতে?

দূর, সে সব কিছু নয়। কথাটা ভাল করে শোনই না।

রামতনুবাবু প্রশ্নটা অবিনাশের দিকে এগিয়ে দিলেন, এর একটা ব্যবস্থা কর।

অবিনাশ কাগজটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, ঠিক আছে। সরেজমিনে তদারক করার জন্য কারো যাওয়া দরকার।

যা ভাল বোঝ কর। মোট কথা তিনদিনের মধ্যে আমার উত্তর চাই।

অবিনাশ সেকশনে ফিরে এল।

সেকশনের সব চেয়ে নিরীহ কেরানী অখিল সমাজদার। কোনদিকে দেখে না। ঘাড় হেঁট করে নিজের কাজ করে যায়। তবে একদিনের কাজ তিন দিনে করে। বুদ্ধি তেমন শাণিত নয়।

অবিনাশ তাকে ডেকে পাঠালঃ তোমার শ্বশুর বাড়ী তো সন্দেশখালি, তাই না?

অখিল মাথা নিচু করে টেবিলে আঁচড় কাটতে লাগল।

সামনে জামাইষষ্ঠী। দুদিনের জন্য শ্বশুরবাড়ী ঘুরে এস।

অখিল আশ্চর্য হ'ল। এর আগে দরখাস্ত করেছিল, কিন্তু অবিনাশ ধমকে উঠেছে, সবাই শ্বশুরবাড়ী গেলে, আমি সেকশন চালাব কি করে?

তুমি আজ বিকালেই চলে যাও। বরং একটু সকাল সকাল অফিস থেকে উঠে পড়। সন্দেশখালি যাওয়াও তো খুব ঝামেলা। ট্রেন, লঞ্চ, তারপর কিছুটা হাঁটতেও হবে।

এবারও অখিল ঘাড় নাড়ল।

আর নাও, এই হিসাবটা করে আনবে।

অবিনাশ প্রশ্নটা অখিলের দিকে এগিয়ে দিল।

এতক্ষণ পরে অখিল বলল, হিসাব?

হ্যাঁ, বাঘের একটা ছোট হিসাব আছে। তোমাদের সঙ্গে বাঘের তো খুব দহরম-মহরম। প্রায়ই মোলাকাত হয়। অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না।

ওপরে পাখা ঘুরছে, তবুও অখিলের সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল। এই বাঘের ভয়ে অখিল শ্বশুরবাড়ী যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে।

বছর খানেক আগে এক কান্ড হয়েছিল। বিকালে অখিল বেড়াতে বেরিয়েছিল। কিছু দূরে গিয়ে পথ হারিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে যখন পথের সন্ধান পেয়েছিল, তখন সন্ধ্যা নেমেছে।

চারদিকে চাপ চাপ কুয়াশা। বাড়ীর কাছে এক অর্জুন গাছের তলায় অখিলের খুড়শ্বশুর। বাসন্তী রংয়ের র‍্যাপার গায়ে জড়িয়ে।

আশ্চর্য কান্ড। ভদ্রলোক হাঁপানির রোগী। আর এভাবে ঠান্ডায় বসে আছেন!

কাছে গিয়ে অখিল জিজ্ঞাসা করেছিল, খুড়োমশাই, এই কুয়াশায় আপনি বাইরে কেন? আমার জন্য নাকি?

খুড়শ্বশুর উত্তর দিয়েছিলেন, হুঁম। হাঁপানির জন্য ভাল করে কথাও বলতে পারছেন না।

অখিল আরো এগিয়ে গিয়ে বলেছিল, এই তো আমি এসে গেছি, এবার বাড়ী চলুন।

অখিলের বোধ হয় ইচ্ছা ছিল, খুড়োমশায়ের হাত ধরে বাড়ীতে নিয়ে আসবে, কিন্তু পারে নি। ওরে বাবারে, খেলে রে, বলে বিদ্যুৎবেগে ছুটতে আরম্ভ করেছিল।

পায়ের একটা পাম্পশু পরের দিন পাওয়া গিয়েছিল, আর কাঁটা গাছে লেগে দামী শাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন।

অফিসে এসে অখিল গল্পটা করেছিল। সেই থেকে অবিনাশ অখিলকে ডাকে, বাঘেরও অখাদ্য।

অখিল যাবার মুখে অবিনাশ আবার ডাকল, শোন, বাঘের হিসাবটা শুধু তুমি নিয়ে আসবে। তাদের বাঁচাবার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে তোমার কোন খোঁজ করবার

নৌকার মাঝখানে অখিল। দুপাশে দুজন বন্দুক হাতে।

দরকার নেই। সে সম্বন্ধে মন্ত্রীমশাই যা ভাল বুঝবেন, করবেন। বুঝেছ?

কি বুঝল অখিলই জানে, কিন্তু সে ঘাড় নাড়ল।

অখিল যখন সন্দেশখালি পৌঁছল, তখন রাত আটটা।

তার শ্বশুর বেশ বড়লোক। মাছের ভেড়ি আছে, ধান জমি, মধুর ব্যবসা। গোটা ছয়েক নৌকা। নৌকা নিয়ে সুন্দরবনের গভীরে চলে যান। মধু সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। চুপি চুপি অর্জুন আর কেওড়া কাঠ কেটে নৌকা বোঝাই করেন।

অখিল শ্বশুরকে ধরল। আমি কিন্তু সরকারি কাজে এসেছি।

শ্বশুরমশাই বারান্দায় মাদুর পেতে বসেছিলেন। পুরুতমশাই দক্ষিণরায়ের পাঁচালী শোনাচ্ছিলেন। পুরুতমশাইকে থামিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সরকারি কাজ মানে?

পাঞ্জাবির পকেট থেকে কাগজটা বের করে অখিল বলল, এই বাঘের হিসাবটা নিয়ে যেতে হবে। মন্ত্রী-মশাই চেয়েছেন।

তাক থেকে চশমা পেড়ে নিয়ে চোখে দিয়ে শ্বশুরমশাই কাগজটা পড়লেন, তারপর বললেন, কঠিন হিসাব। তুমি কাগজটা রমজান আলিকে দিয়ে দাও। কাল ভোরে ওর দল সুন্দরবনের মধ্যে যাচ্ছে, একটা হিসাব নিয়ে আসবে। তবে সুন্দরবন তো আর একটুখানি এলাকা নয়, বিরাট জায়গা। বাঘ সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে। গড়পড়তা একটা হিসাব নিয়ে আসতে পারবে।

অখিল মাথা নাড়লঃ না, আমাকেও রমজান আলির সঙ্গে যেতে হবে। অন্য কারো ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলে চলবে না। সেকশন-ইন-চার্জের হুকুম, নিজে সব কিছু দেখে আসতে হবে।

শ্বশুরমশাই অবাক। সে কি? বাঘে-দের মধ্যে জামাইষষ্ঠীর রেওয়াজ আছে বলে জানা নেই। তোমাকে জামাই বলে খাতির করবে তাও মনে হয় না। তার ওপর সুন্দরবনে তুলো আর সূর্যমুখীর চাষের জন্য অনেকটা জঙ্গল সাফ করাতে বাঘগুলো তেতে আছে। মানুষ দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অখিল নাছোড়বান্দা। কাজ ধীরে সুস্থে করে বটে, কিন্তু কাজে ফাঁকি দেয় না।

শ্বশুরমশাই অগত্যা সব ব্যবস্থা করে দিলেন।

নৌকার মাঝখানে অখিল। দুপাশে দুজন বন্দুক হাতে। চারপাশ ঘিরে অন্য লোক। তাদের হাতে লাঠি, শড়কি, বল্লম।

নৌকায় অন্য লোকেরা বলল, আপনার মন্ত্রীমশাইকে জিজ্ঞাসা করবেন, মানুষ-কে ছেড়ে বাঘের এত খোঁজ কেন? আমাদের সুখদুঃখের খোঁজও একটু দেবেন কত্তা। খাদ্য পাই না, পরনের কাপড় নেই—

হাত নেড়ে অখিল তাদের থামিয়ে দিলঃ আরে এসব খোঁজ মন্ত্রীরা নেবেন কেন? বিরোধী দলের সদস্যরা জানতে চান। আমরা আর কি করব!

নৌকা যখন ঘাটে বাঁধা হ'ল, তখন দুপুর।

দুজন মাঝিমাল্লা ছাড়া সবাই নেমে গেল।

রমজান আলি বলল, বসুন জামাই-বাবু, আমরা মধু নিয়ে বিকালের আগেই ফিরব। মধু আনব, সেই সঙ্গে বাঘের হিসাব।

সবাই জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বেশ কড়া রোদ। অখিল ছইয়ের তলায় আশ্রয় নিল।

পাটাতনের ওপর মাঝিরা রান্না শুরু করল।

তারপর রোদের তেজ কমতে, অখিল বাইরে এসে বসল। হরিণ, শেয়াল, নানা রঙের পাখি জল খেয়ে যাচ্ছে। নৌকা থেকে একটু দূরে। একটু আগে মাঝি আর মাল্লারাও নেমে গেছে। যাবার সময় বলে গেছে, শুকনো গাছের ডাল ভেঙে এখনই আসছি জামাইবাবু।

নৌকায় অখিল একেবারে একলা। হঠাৎ দেখল হরিণ আর অন্য জন্তুরা তীরবেগে বনের মধ্যে পালিয়ে গেল।

কি হল? এমন ভয় পেল কেন?

এদিকে মুখ ঘুরিয়েই অখিল কাঠ হয়ে গেল। ওপাশের চড়া থেকে লাফিয়ে জলে পড়ে একটা বাঘ সাঁতরে এপারে আসছে। শুধু তার মুখটা দেখা যাচ্ছে। বিরাট হাঁড়ির মতন মুখ। জ্বল জ্বল করে দুটো চোখ জ্বলছে। নৌকা লক্ষ্য করেই এগিয়ে আসছে। হয়তো সাঁতরে এপারে আসাই তার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু নৌকার ওপর এমন তৈরি 'ডিনার' দেখে গতি পরিবর্তন করেছে।

নৌকা ভীষণ বেগে দুলতে লাগল। নৌকার অবশ্য দোষ নেই। অখিলের অবস্থা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতন। ঠক ঠক করে তার দেহ কাঁপছে। কাজেই নৌকাও কাঁপছে।

সর্বনাশ, কি হবে! বেশ কাছে এসে পড়েছে!

আর কালবিলম্ব না করে অখিল ডাঙগার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এক হাঁটু কাদা। বহুকষ্টে কাদা ভেঙে জমির ওপর উঠল।

অখিল দ্রুতপায়ে সামনের গাছের গোড়ায় এসে দাঁড়াল। ঝাঁকড়া আস-শ্যাওড়া গাছ। অখিল জীবনে কোন দিন গাছে ওঠে নি। গাছে ওঠার চেষ্টাও করে নি, কিন্তু তার যখন জ্ঞান হ'ল, দেখল সে গাছের প্রায় মগডালে বসে আছে।

এদিকে ফিরে দেখল, বাঘ নৌকার ওপর। ঠিক যেখানে অখিল বসেছিল। সূর্যের আলো এসে বাঘের মুখে পড়েছে। সে আলোয় দেখা গেল, বাঘের মুখ খুব বিষণ্ণ। মনে যেন দারুণ অশান্তি। অখিলের দিকে কোন নজর নেই।

নিরুপায় অখিল চুপচাপ বসে রইল।

মাঝিমাল্লাদেরও দেখা নেই। অবশ্য নৌকার আরোহী বদল হয়েছে দেখলে তারাও আর ধারে কাছে আসবে না।

কিন্তু অন্য লোকগুলোই বা ফিরছে না কেন? বাঘের হিসাব নিতে গিয়ে তারাও কি সব হিসাবের বাইরে চলে গেল!

বাঘটা উঠে দাঁড়াল। করুণদৃষ্টিতে একবার জঙ্গলের দিকে দেখল তারপর জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর উঠল না।

কম্পিত বুকে অখিল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। না, বাঘ উঠল না।

বোঝা গেল আত্মহত্যা করেছে। অন্যলোকে বললে অখিল হয়তো বিশ্বাস করত না, কিন্তু নিজের চোখকে অবিশ্বাস করবে কি করে!

বেশ অন্ধকার চারদিকে। ঝোপে ঝোপে জোনাকি জ্বলছে। সবগুলো হয়তো জোনাকি নয়, কিছু কিছু বন্য জন্তুর চোখও রয়েছে।

মাটির ওপর দ্রুত ধাবমান কতক-গুলো ছায়া।

এই সময় গাছ থেকে নামা নিরাপদ নয়। একা নৌকায় থাকাও রীতিমত বিপজ্জনক। তাছাড়া, অখিল কিভাবে উঠেছে নিজেই জানে না, নামতে পারবে এমন ভরসা কম।

সে ডাল আঁকড়ে বসে রইল।

কিন্তু বেশীক্ষণ চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব হ'ল না। দলে দলে মশা এসে আক্রমণ শুরু করল। মশা নয়, ডাঁশ। যেখানে বসে, প্রায় সিকি লিটার রক্ত তুলে নেয়।

মারবার উপায় নেই। শব্দ হলেই নিচের বন্য জন্তুরা আকৃষ্ট হবে। গাছে চড়তে পারে সুন্দরবনে এমন জন্তু কমতি নেই। উঠে পড়লেই

হ'ল।

সুতরাং অখিল নিঃশব্দে, বিনা প্রতিবাদে নির্যাতন সহ্য করে গেল। মনে মনে ভাবল ব্লাড ব্যাংকে রক্ত দিচ্ছে'।

এক সময়ে ভোর হ'ল। গাছে গাছে পাখির ডাক।

একটু পরেই ঝোপের পাশ থেকে মাঝিমাল্লারা বেরিয়ে গাছতলায় এসে দাঁড়াল।

একজন বলল, ও জামাইবাবু, আপনি! আমরা ভেবেছি চিতাবাঘ গাছের ওপর ওত পেতে বসে আছে। তলা দিয়ে গেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই আমরা সারা রাত আর এক গাছে বসে কাটালাম।

অখিল চটে লাল। জলজ্যান্ত মানুষ আমাকে চিতাবাঘ ভাবলে কি করে?

অন্ধকারে শুধু কাঠামোটা দেখা যাচ্ছে। তার ওপর ওই ল্যাজ।

ল্যাজ? আমার ল্যাজ? মানে?

ওই দেখুন না।

অখিল চোখ ঘুরিয়ে দেখল।

তার কাছাটা খুলে ল্যাজের মতন দুলছে। গাছে ওঠবার সময় কখন খুলে গেছে।

এবার নেমে আসুন জামাইবাবু।

একটু নেমেই অখিল থেমে গেল। কিছুতেই নামতে পারছে না। পা দুটো ঠক ঠক করে কাঁপছে।

মাঝিদের মধ্যে যে ছোকরা সে চটপট করে গাছে উঠে জাপটে ধরে অখিলকে নামাল।

ভাল করে তাকে দেখেই সবাই অবাক। একজন বলল, একি গো জামাইবাবু, মনে হচ্ছে কোথা থেকে হাওয়া বদল করে এসেছ। এক রাতে শরীর এত ভাল হ'ল কি ক'রে?

অখিল বুঝতে পারল এ সব ডাঁশের কারসাজি। শরীর ফুলিয়ে ডবল করে দিয়েছে।

সবাই নৌকায় গিয়ে উঠল।

মাঝিদের একজন আয়না নিয়ে অখিলের সামনে ধরল।

দুটো চোখ দেখার উপায় নেই। গাল ফুলে চোখ ঢেকে দিয়েছে। গায়ের রংও একটু লালচে। পাঞ্জাবিটাও রীতিমত টাইট।

অখিল জিজ্ঞাসা করল, আর সকলে আসছে না কেন? কাল বিকালে আসবার কথা!

কেউ বিশেষ উদ্বিগ্ন হ'ল না। বলল, দক্ষিণরায়ের হিসাব নিয়ে ফিরবে তো। একটু দেরি হবেই। আজ এসে পড়বে।

অখিল এদিক ওদিক দেখে আবার প্রশ্ন করল, আচ্ছা, বাঘ আত্মহত্যা করে?

অখিলের কথা কানে যেতেই সবাই চোখ বন্ধ করে কানে আঙুল দিল। এক সঙ্গে বলল, জয় বাবা দক্ষিণরায় অপরাধ নেবেন না। জামাইবাবু এ এলাকায় ওসব নাম করবেন না। দক্ষিণরায় বলবেন। হ্যাঁ, ওঁরা আত্মহত্যা করেন বৈকি। একবার মনে আছে কাঠ কাটতে জঙ্গলে গেছি, হঠাৎ দক্ষিণরায় একটা হরিণ লক্ষ্য করে লাফ দিল, কিন্তু ধরতে পারল না। হরিণ পালাল। দক্ষিণরায়ের বাপ খেপে লাল। গরর গরর করে সে কি তর্জন। আমি গাছের ওপর বসে কাঁপছি আর সব দেখছি। ব্যস, ছেলের অভিমান। বাপ সরে যেতেই মাথা নীচু করে জলের ধারে এসে দাঁড়াল, তারপরই ঝপাং। এ জন্তুর তুলনা হয় না জামাইবাবু। বড় অভিমানী।

অখিল ভাবতে লাগল, তাহলে ওই বাঘটারও এ রকম কিছু একটা হয়ে থাকবে। অভিমানে আত্মহত্যা।

দুপুরবেলা সবাই নৌকার ওপর বসে, হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে হৈ হৈ শব্দ।

সন্দেহ নেই, বাঘ বেরিয়েছে। লোকেরা তাড়িয়ে এদিকে নিয়ে আসছে।

অখিল আর তিলমাত্র বিলম্ব না করে ছইয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ডাঁশের কল্যাণে তার চেহারাটাও বেশ পুষ্ট হয়েছে। বাঘের নজর একবার তার ওপর পড়লে আর অন্য কাউকে পছন্দ হবে না।

অখিল দুর্গানাম জপ করতে লাগল।

পাটাতনের ওপর থেকে কে একজন বলল, জামাইবাবু, বেরিয়ে আসুন, ওরা সবাই ফিরছে।

আস্তে আস্তে অখিল বেরিয়ে এল।

রমজান আলির দল আসছে। মাচায় কাকে ঝুলিয়ে।

বাঘ মেরে আনছে নাকি! তাই এত দেরি।

কাছে আসতে দেখা গেল, একটা কাঠের পিঁড়েতে একজন অতি বৃদ্ধ বসে। চৌদোলার মতন তাকে ঝুলিয়ে আনছে।

অখিল জিজ্ঞাসা করল, লোকটি কে?

দক্ষিণরায়ের মন্দিরের পুরুতমশাই ত্রিলোচন ঠাকুর। দক্ষিণরায়ের দল ওঁর কথায় ওঠে বসে। এ এলাকা ওঁরই রাজত্ব। রমজান আলি ওঁকে নিয়ে এসেছে হিসাব দেবার জন্য। সব কিছু ওঁর নখদর্পণে।

ত্রিলোচন ঠাকুর নৌকায় উঠতেই প্রণামের হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

রমজান আলি বলল, নিন জামাই-বাবু, হিসাব নিন।

ত্রিলোচন ঠাকুর হাসলেন। তোমার হিসাব তো বাবা ঠিক নয়। তিন বছরের পুরনো হিসাব। ঠিক হিসাব লিখে নাও। মোট বাঘের সংখ্যা তিন হাজার একশো দশ। গত বছরে বরং কমই ছিল। এবার বাঘ বাড়ার আসল কারণ অনেকগুলো ডবল যমজ বাচ্ছা হয়েছে। তা ছাড়া নিজেদের মধ্যে মারামারির ফলে অনেক কমে গেছে। এ অঞ্চলেও সভা হচ্ছে। গরম গরম বক্তৃতা। দেশে ভাই ভাইয়ে খুনোখুনির কথা সব বক্তাই বলে। সবই বাঘেদের কানে আসে। তারা বুঝতে পেরেছে, নিজেদের ভিতর মারপিট নিছক 'মানবিক' ব্যাপার, পশুর জগতে চলে না। চলা উচিত নয়। তাই নিজেদের মধ্যে আর কামড়াকামড়ি করে না। যে দুশো তেরটি বাঘ বাংলাদেশে ফিরে গেছে, তারা সে দেশেরই বাঘ। গোলমালের সময় এদেশে চলে এসেছিল, গোলমাল থামতে নিজের দেশে চলে গেছে। গ্যাংগ্রিনে কেউ মারা যায় নি। বাঘের গ্যাংগ্রিন ঠিক হয় না। লিভারের অসুখে কিছু মারা গেছে, কিছু গেছে যক্ষ্মায়। কলকারখানার দূষিত ধোঁয়ায়।

কৌতূহলী অখিল জিজ্ঞাসা করে ফেলল, এরা কি আত্মহত্যা করে নিজেদের পারিবারিক কারণে?

ত্রিলোচন ঠাকুর উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। আত্মহত্যা করে বৈকি। আলবত করে। কিন্তু নিজেদের ব্যাপারে নয়। আমাদের জন্য।

অখিল চমকে উঠলঃ আমাদের জন্য? তার মানে?

মানে অতি সরল। বিদেশী শাসক এ দেশ থেকে সরে গেল, তবু আমাদের শ্বেতপ্রীতি কমল না। সাদা রং দেখলে এখনও আমরা ভক্তিতে ডগমগ হয়ে যাই। তাই চিড়িয়াখানায় পর্যন্ত সাদা বাঘকে আলাদা সম্মান দেখানো হয়। বেশী মূল্যের দর্শনী। রাজকীয় থাকার ব্যবস্থা। এসব কি ভেবেছ বাঘেদের কানে যায় না? ছি, ছি, লজ্জায় তারা প্রাণ রাখবে কি করে!

অখিল চুপ করে রইল। এর চেয়ে নিখুঁত হিসাব সে কল্পনাও করে নি। এবার অফিসে তার উন্নতি অবধারিত।

কাগজে সব হিসাব লিখে নিয়ে কাগজটা অখিল পাঞ্জাবির পকেটে রেখে দিল।

ত্রিলোচন ঠাকুর যাবার সময় বললেন, দাও পাঁচটা টাকা। মন্দিরে পূজো দিতে হবে।

অখিল বুঝতে পারল এ সবই ডাঁসের কারসাজি...

বিনা বাক্যব্যয়ে অখিল পাঁচ টাকা দিয়ে দিল।

ত্রিলোচন ঠাকুর চৌদোলায় চড়ে চলে গেলেন। তাঁর সাগরেদরা নিয়ে গেল।

নৌকা সন্দেশখালির দিকে ফিরল।

অখিলের মন খুশীতে ভরপুর। এত কঠিন একটা কাজ এত সহজে সমাধা হবে ভাবতেও পারে নি। গুন গুন করে অখিল গান গাইতে শুরু করল।

ফুরফুর বাতাস বইছে। এখনও পুরো অন্ধকার নামে নি। লোকেরা পাটাতনের ওপর বসে গল্পগুজব করছে।

হঠাৎ অখিলের মনে হ'ল কে যেন তার পাঞ্জাবি ধরে টানছে। প্রথমে মনে করল বোধ হয় নৌকার পেরেকে আটকে গেছে। কিন্তু না, টানটা বেশ জোর।

মুখ ফিরিয়ে দেখেই অখিল চিৎকার করে উঠল, বাঘ! বাঘ!

সবাই ছুটে এল। এখানে মাঝগাঙে আবার বাঘ কোথায়। তা ছাড়া জামাইবাবু দক্ষিণ রায় না বলে বাঘ বলছেন কেন? বিপদ একটা নির্ঘাৎ বাধাবেন। এখনও ওঁদের এলাকা পার হই নি। কই কোথায় দক্ষিণ রায়?

জলের মধ্যে।

সে কি? সবাই অবাক।

অখিল মোটেই ভুল দেখে নি। বিরাট মুখ। আগের দিন যেমন দেখেছিল। জ্বলজ্বলে দুটো চোখ।

আশ্চর্য, বাঘটা কি এতক্ষণ ডুবসাঁতার দিয়েছিল? কিংবা ডুব দিয়ে পাড়ে উঠে ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে বসেছিল। তারপর নৌকার সঙ্গে সাঁতরাতে শুরু করেছে।

বাঘটা আবার ডুব দিয়েছে। তাকে কোথাও দেখা গেল না।

রমজান আলি হেসে বলল, জামাইবাবু খোয়াব দেখেছেন।

নিজের পাঞ্জাবির পকেটের দিকে চোখ পড়তেই অখিল হাঁউমাঁউ করে চেঁচিয়ে উঠল। সর্বনাশ, আমার পকেট!

পকেট নেই। বাঘ দাঁত দিয়ে চিবিয়ে কেটে নিয়েছে। সেই সঙ্গে হিসাবও উধাও।

অখিল মাথা চাপড়াতে শুরু করল। এত মেহনত সব মাটি।

নৌকা সন্দেশখালি পৌঁছাল। অখিল শ্বশুরের কাছে সব বলল।

শ্বশুর বললেন, ওই হিসাবটা নেবার জন্য তোমার সঙ্গ নিয়েছিল বোঝা গেল। যাক, হিসাবের ওপর দিয়ে গেছে। হিসাব একটা তৈরি করা যাবে। জামাই গেলে, জামাই তৈরি করা সম্ভব হ'ত না।

অখিল আন্দাজে একটা হিসাব তৈরি করে নিল।

কলকাতায় আসবার জন্য যখন সে নৌকায় উঠছে, তখন খবরটা কানে এল। শ্বশুরই বললেন। ত্রিলোচন ঠাকুরকে দক্ষিণ রায়ের দল পথেই শেষ করে দিয়েছে। গোপন হিসাব ফাঁস করে দেবার জন্য। □

আমার ছোট্ট ভাই-বোনেরা
পুজো এসে গেল। সামনেই এই
আনন্দের দিনগুলিতে নিশ্চয়ই তোমরা কেউ
বইখাতা নিয়ে বসছ না। ঢাকের শব্দে,
প্যান্ডেলের আলোয় আর মাইকের চিৎকারে
তোমাদের নিশ্চয়ই মন নেচে উঠবে, কাজেই তখন
কি আর পড়াশুনা হয়। পুজো শেষ হয়ে গেলেই
কিন্তু বইখাতা নিয়ে বোসো। সামনেই বার্ষিক
পরীক্ষা। তখন আর ফাঁকি দিলে চলবে না।
যেমন আমি দিতুম। কাকা আমার যখনই বই
এনে দিত, আমি লুকিয়ে ফেলতুম আর কাকাকে
বলতুম হারিয়ে গেছে। কাকাকে ফাঁকি দিতে
গিয়ে আমি নিজে ফাঁকে পড়ে গেছি। যাহোক
তোমাদের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলেই আমি
তোমাদের সঙ্গে দেখা করব। কোথায় এবং
কবে পরে জানিয়ে দেব। তোমরা এসো কিন্তু।
ভালবাসা রইল —
ইতি
তোমাদের
রানু

VISUAL

রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিজয়িনী
শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী নীরা মালিয়া অভিনীত
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
রানুর প্রথম ভাগ

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপি সব ঘরে ঘরে।
রাখিবে তণ্ডুল তাহে এক মুষ্টি করে॥
সঞ্চয়ের পন্থা ইহা জানিবে সকলে।
অসময়ে উপকার পাবে এর ফলে॥

॥ ব্রতকথা ॥

টাকা জমানোর পথও একটাই—একমুঠো চালের মত, নিয়মিত যত টাকা সম্ভব ইউবিআইতে রাখা। ইউবিআইতে আপনার সঞ্চয়, সংসারে চিরকাল লক্ষ্মীশ্রী বজায় রাখবে। ইউবিআইতে টাকাটা নিরাপদ থাকবে, সুদে বাড়বে আর তোলাও বেশ সুবিধেজনক।

ইউবিআই আপনার শুভার্থী প্রতিবেশী।

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

নেণ্টুকাকা কুমড়োর চাটনী ও রবীন্দ্রনাথ

পূর্ণেন্দু পত্রী

ছবি এ'কেছেন শ্ভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

সেবারে সত্যি সত্যি আমি বিন্ধ্য-পর্বতের মত অটল ছিলাম প্রতিজ্ঞায়। কিন্তু ডোবালো ঐ হাঁদারাম হাবল্টা। ও এমন করে বোঝালে যে জল হয়ে গেলাম। হাবল্টা হাঁদা হোক আর যাই হোক, কথা বলে বেশ গ্ছিয়ে। বেশ য্ক্তিট্ক্তি জ্ড়ে দিতে পারে কথার মধ্যে। ঐ আমাকে বোঝালে—

শোন্, তুই যা ভাবছিস এবারে তা হবে না। এবার আমরা যেটা করছি সেটা অন্য জিনিস। একটা কথা তো সত্যি, নেণ্ট্কাকা গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত মান্ষ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নাম শ্নলে, অন্যবারের মত করবে না। তা ছাড়া ধর্, ফাংশানে বক্তৃতা দেবার জন্যেও তো নেণ্ট্কাকাকে দরকার। এমন কি, ভগবান না কর্ন, আমরা যাঁকে সভাপতি করার কথা ভাবছি, তিনি কোন কারণে পেণছতে না পারলে নেণ্ট্কাকাকেই তো সভাপতির চেয়ারে বসাতে হবে।

তখনও আমার প্রো রাগটা জল হয়নি। আমি বললাম—

কিন্তু গত বছরের সরস্বতী প্জোর ব্যাপারটা মনে করে দ্যাখ্। আমাদের আকাশে উঠিয়ে দিয়ে কী রকম মইটা কেড়ে নিলেন। বার বার ভাল লাগে এসব? ম্খেই শ্ধ্ বড় বড় বাৎ। আসল জিনিসের বেলায় লবডঙ্কা।

আবার হাবল্ আমাকে বোঝালে—

তুই যা বলছিস সব সত্যি। সব মেনে নিলাম। কিন্তু সব যদি মানি তাহলে তো এই গ্রামে বাস করে কোন-দিন কিছ্ করা যাবে না। নেণ্ট্কাকার ম্খে বড় বড় ব্লি, চাঁদার বেলায় পাঁচ সিকে পয়সা, তার কাছে যাব না। হরি জ্যাঠার সেবারে একটা তক্তাপোষ আর রান্নার বাসন-কোষণ দেবার কথা ছিল, দিলেন না। তাহলে তাঁর কাছেও চাঁদা চাওয়া বারণ। ম্খ্জ্যে বাড়ির বিমল-বাব্, আমরা তাঁর গাছের ডাব চুরি করেছি বলে ইস্কুলে গিয়ে হেডস্যারের কাছে নালিশ করেছিলেন, তাঁর কাছেও

তাহলে যাওয়া চলে না। এইভাবে যদি আমরা কেবল ভাল লোক বাছতে শুরু করি তাহলে দেখবি কিস্যু হবে না। দুচারটে ভাল মানুষ যদি বা মেলে, তখন বলবি ও'র কানে বড় পুঁজের গন্ধ, তাঁর পায়ে দাদ, অমুকবাবু তাঁর বৌকে ঠেঙায়, তমুকবাবু ঘুষখোর, তখন চাঁদার খাতায় জমার ঘরে জিরো ছাড়া আর কি জমবে বল্ ?

হাবলুটার যুক্তি ঠিক যেন ছাকুনি জালের মত, ঘন ঘন গিঁট দিয়ে বোনা। পালাবার ফাঁক নেই। পরে ভেবেচিন্তে দেখলাম, হাবলু মন্দ বলে নি কথাগুলো। আমাদের এবারের চাঁদা চাইবার উদ্দেশ্যটা সত্যিই ভিন্ন। শুধু ভিন্ন বললে কম বলা হয়। আমরা প্রায় একটা রেভলিউ-শনারী কান্ড করতে চলেছি খড়গাছির মত একটা অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামে। রবীন্দ্রজন্মোৎসব। তাক্ লাগিয়ে দেবো এবার সবাইকে। হৈ চৈ পড়ে যাবে আশপাশের সাত গাঁয়ে। এখানকার লোক উৎসব বলতে তো বোঝে শুধু দুর্গাপুজো, সরস্বতী পুজো আর কার্তিক পুজো। আর ঐ চত্তির মাসের কটা দিন শিবঠাকুরের গাজনকে নিয়ে চ্যাটাং চ্যাটাং ঢাকের বাদ্যি। কিন্তু ওসবের মধ্যে তো কালচারাল ব্যাপার স্যাপার নেই। এবারে সেটাতেই হাত দিয়েছি আমরা। পরীক্ষায় ফেল করি বলে সবাই আমাদের ভাবে ফ্যালনা। এবার আমরা ঐ ফ্যালনা কজন ছেলেই দেখিয়ে দেবো, বিশ্বের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি, মানে চেতনার যে অভ্যুদয় চলেছে আজ পৃথিবী জুড়ে অর্থাৎ বিশ্বকবিকে হৃদয়ে বরণ করার মধ্যে দিয়ে। ক্লাবের কালচারাল সেক্রেটারী হিসেবে আমি যে স্পীচটা দেবো সেটা এখনো লেখা হয়ে ওঠে নি। তবে মেজ-দার ঘরের তাকে একটা ধুমসো রচনার বই আছে। তার মধ্যে 'বিশ্বকবি রবীন্দ্র-নাথ' নামে পাঁচ পাতার একটা প্রবন্ধ, পেজ নাম্বার ১৪২, মনে করে রেখেছি।

নেণ্টুকাকা অন্যদের মত ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেন না। বাড়ি আসেন শনিবার শনিবার। ঠিক হল সামনের রবিবারই যাওয়া হবে নেণ্টুকাকার কাছে।

রবিবার। তখনও মাটির রোদ গাছ-পালার মাথায় ওঠেনি। আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমি, হাবলু, সুঁটে, ঝণ্টু আর বাঁটুল। অধিক সন্নেসীতে গাজন নষ্ট হতে পারে এই ভয়ে আমাদের জাগরণী সংঘের অন্যান্য সদস্যদের ডাকা হল না। তাদের অন্য কাজে অন্য জায়-গায় যেতে বলা হ'ল।

মল্লিকদের বাঁশঝাড়ের কাছটা দিনের বেলাতেও অন্ধকার। আমরা খানিকটা এগিয়েছি। সকলের আগে আগে যাচ্ছিল ঝণ্টু। হঠাৎ হেঁই হেঁই করে চেঁচিয়ে উঠল সে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমরা। ঝণ্টু আমাদের আঙুল দিয়ে দেখাল, একটা ইয়া বড় সাপ আমাদের ডানদিকে শুকনো বাঁশপাতার ওপর মৃদু খিস খিস শব্দ তুলে যেন সাঁতার কাটতে কাটতে চলে যাচ্ছে। সাপটা দূরের ঝোপের আড়ালে চলে যাবার পর হাবলু হালুম করে চেঁচিয়ে উঠল আনন্দে।

দেখলি? দেখলি?

কি? সাপ তো?

না হে বন্ধু, সাপের কথা বলছি না। বলছি সাথ-এর কথা। ডান দিক দিয়ে সাপ গেল। দক্ষিণেতে ভুজঙ্গম। খুব শুভ লক্ষণ। নেণ্টুকাকা আজ বধ হবেই হবে।

হাবলুর উৎসাহে আমাদের গালও গোল হয়ে উঠল টেনিস বলের মত।

নেণ্টুকাকা তাঁর পুকুরপাড়ে ছাই-গাদার কাছে কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা বাগানের মধ্যে বসে খুরপী দিয়ে ঘাস তুলছিলেন। নেণ্টুকাকার খুব বাগানের সখ। ফুলের নয়, শাকসব্জীর। লাউ, কুমড়ো, বেগুন, ঢেঁড়শ, এসবের। বাড়িতে এলে সকাল সন্ধ্যে ঐ বাগানেই। নেণ্টু-কাকা ঘাস তুলছিলেন আর দূরে তাঁর প্রিয় চাকর সন্নেসী মাটি কোপাচ্ছিল কোদালে। আমাদের দলবলকে দেখে এক পলকের জন্যে একটু অবাক হবার মত ভঙ্গী ফুটেছিল নেণ্টুকাকার মুখে। পরক্ষণেই সেটা ঢাকা পড়ে গেল দরাজ হাসিতে।

এস, এস। এত সকাল সকাল তোমা-দের আবার কি ব্যাপার?

আমরা সবাই হাবলুর দিকে তাকা-লাম। আগে থেকে কথা হয়ে আছে, হাবলুই যা বলার বলবে। কেননা নেণ্টু-কাকার বাইরেটা যেমনই আটপৌরে হোক, ভেতরটা বেশ মাজাঘষা। তাঁর বিদ্যে-বুদ্ধির ঝুলি থেকে কখন কী বেরিয়ে পড়বে কে জানে! বিদ্বান লোকেরা সাপুড়ের চুপড়ির সাপের মত। এমনিতে ঠাণ্ডা। ফণা তুললেই সর্বনাশ। ভেবে-চিন্তে তাই হাবলুকেই সামনে রাখা। হাবলু অঙ্কে আর ভূগোলে আর সংস্কৃতে ফেল করে বটে, কিন্তু বাংলা আর ইতিহাসে চৌকস। ৬০—৬২ তো বাঁধা।

হাবলু নিজের থতমত ভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্যে খচ্‌খচ্ করে নিজের মাথা খানিকটা চুলকে নিয়ে খুব বিনীত ভংগীতে শুরু করলে—

নেণ্টুকাকা-আ-আ...

বল, বল।

আমরা এবারে আপনার কাছে অনেক বড় দাবী নিয়ে এসেছি।

পায়ের কাছে এক গোছা তোলা ঘাস জমেছিল, সেগুলোকে ছুঁড়ে দূরে সরিয়ে দিতে দিতে নেণ্টুকাকা বললেন—

সে তো আসবেই। তোমাদের মত যারা সবুজ, তারাই তো চিরকাল বড় বড় দাবী নিয়ে এগিয়ে আসে সকলের আগে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছো? আয়রে সবুজ, আয়রে আমার কাঁচা। পড়েছো?

হাবলু এবং তার দেখাদেখি আমরা সকলেই এমনভাবে হাসলাম, যেন পড়েছি। নেণ্টুকাকার মুখে রবীন্দ্রনাথের নামটা শোনামাত্রই আমাদের মনে যেন জগঝম্পের বাজনা বেজে উঠল। হাবলুর কথাই ঠিক। রবীন্দ্রনাথ-টাথের ব্যাপারে নেণ্টুকাকা আমাদের আগের মত বিট্রে করবেন না। হাবলু আমাদের দিকে এমন একটা মিষ্টি হাসি ছুঁড়ে দিলে, যেন তার আধখানা যুদ্ধ জেতা হয়ে গেছে অলরেডি।

হাবলুর গলায় আবার সেই আগের মত বিনীত স্বর—

নেণ্টুকাকা, আপনি যা বললেন মানে যাঁর নাম বললেন, আমরা এবার আমাদের গ্রামে সেই জগৎ-বরেণ্য কবিরই জন্মোৎ-সব পালন করতে উদ্যোগী হয়েছি। আপনাকে মানে আমরা আপনার কাছে এসেছি অনেকগুলো দাবী নিয়ে।

তোমরা রবীন্দ্রজন্মোৎসব করছো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাঃ, বাঃ। তোমাদের বেশ উন্নতি হয়েছে তো। রাত জেগে ইয়ার্কি মেরে, ধেই ধেই করে নেচে, আর কতকগুলো ভাঙা রেকর্ড বাজিয়ে আজকালকার ছেলেরা ঐ যে কেবল দুর্গাপুজো আর সরস্বতী পুজো নিয়ে মাতামাতি করে, ওটা দেখলেই আমার রাগ হয়। এই যে রবীন্দ্রজন্মোৎসব করছো, খুব ভাল জিনিস। এতে নিজেদেরও অনেক কিছু শেখা হয়, লোককেও শেখানো যায়। খুব ভাল। তা আমাকে, আমার কাছে তোমা-দের কি দাবী আছে, বলে ফেল।

হাবলুর হাত আবার মাথায় উঠে এসে চুল ঘাঁটতে লাগল। আমাদের হাতের মুঠোও শক্ত হয়ে উঠল উত্তেজনায়।

হাবলু বললে—আমাদের একটা হাতের লেখা কাগজ আছে। আমরা তার রবীন্দ্রসংখ্যা বার করবো। তার জন্যে আপনাকে একটা লেখা দিতে হবে। আর জন্মোৎসবের দিন আমরা ঠিক করেছি, আপনিই হবেন আমাদের প্রধান অতিথি। আর...

এইবার চাঁদার কথা। আসল ব্যাপার। বলে ফ্যাল্ হাবল্, সাহস করে বলে ফ্যাল্। দশ টাকা। দেরী করিস নে। হাবলুর ঠোঁটের ডগার কাছে আটকে আছে আমাদের জোড়া জোড়া চোখ।

আর, কাঁকনকে যদি উদ্বোধন সঙ্গীতটা গাইবার পারমিশন দেন... তাহলে খুব ভাল হয়—কেননা আমাদের এখানে তো আর কোন গান জানা মেয়ে নেই...

কাঁকন নেন্টুকাকার বড় মেয়ে। বছর এগার বারো বয়েস। বাড়িতে মাষ্টার এসে গান শিখিয়ে যায়। হাবলুর বুদ্ধি আছে বটে। এটা আমাদের কারো মাথায় আগে আসেনি। বুঝেছি, নেন্টুকাকার মনটাকে ও ভিজিয়ে ফেলতে চাইছে। তা বেশ, কিন্তু চাঁদার কথাটা বল্ এবার!

হাবলু থামতেই নেন্টুকাকা সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সন্নেসীর দিকে তাকিয়ে হাঁক দিলেন—

সন্নেসী, একটু তামাক সেজে নিয়ে আয় তো, বাবা।

সন্নেসী মাটি কোপানো থামিয়ে চলে গেল। নেন্টুকাকা পিঠটাকে সোজা করে নিয়ে আবার অন্য একটা জায়গায় গিয়ে বসলেন, ঘাস তুলতে। বসতে বসতেই প্রশ্ন করলেন—তোমাদের প্রোগ্রামটা কি সেদিন?

প্রোগ্রাম? প্রোগ্রাম একটা মোটামুটি ভেবেছি। এই, প্রথমে উদ্বোধন সঙ্গীত। তারপর সভাপতি আর প্রধান অতিথি বরণ, তারপর দুটো একটা গান আর বক্তৃতা। ঝন্টু আর বাটুল ওরা দুজনে মিলে একটা কমিক করবে। এর পর ক্লাবের সেক্রেটারী কিছু বলবে। তারপর নাটক।

কি নাটক?

কবিগুরুর মুকুট।

সন্নেসী তামাক সেজে নিয়ে এল হুঁকোয়। নেন্টুকাকা হুঁকোয় পর পর কয়েকটা টান দিয়ে গলগল করে কিছু ধোঁয়া উড়িয়ে আমাদের দিকে তাকালেন—

তোমাদের বেশ উৎসাহ আছে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এ্যামবিশন নেই। যাঁর জন্মদিন পালন করছো, তাঁর লেখা-টেখা একেবারেই পড়ে দেখনি মনে হচ্ছে- 'দুর্ভাগা দেশ' কবিতাটা পড়েছো রবীন্দ্রনাথের? পড়েছো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কি আছে লেখা কবিতায়? 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, ভাগ করে খেতে হবে তাহাদের সাথে অন্নপান।' এই যে এত বড় একটা কথা, এটাকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রজয়ন্তী করার কোন মানেই হয় না। শুধু খানিকটা নাচ গান আর বক্তৃতা করলেই

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমরা.........

কি শ্রদ্ধা জানানো হয়ে যাবে অতবড় একটা ওয়াল্ডর্ফ ফেমাস পোয়েটকে? তোমরা যদি আমার সাজেশান শুনতে চাও তাহলে বলি।

আমরা প্রায় সকলেই একসঙ্গে বলে উঠলুম—কেন শুনবো না কাকু? নিশ্চয়ই শুনবো।

নেণ্টুকাকা কি যেন বলতে যাওয়ার মুখেই থেমে গেলেন। 'মেজবাবু' বলে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল ও পাড়ার জগদীশ। নেণ্টুকাকার চাষবাস সব ঐ জগদীশই দেখাশোনা করে।

কে? জগদীশ এসে গেছো? একটু দাঁড়াও।

নেণ্টুকাকা এবার হাবলুর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন—উৎসবটা শুরু হবে সকাল থেকে। সকাল বেলায় শুধু প্রভাত ফেরী। রবীন্দ্রনাথেরই একটা গান গেয়ে তোমরা গ্রামটা ঘুরলে। তারপর দুপুর বেলায় কাঙালী ভোজন। খুব বেশী আইটেম করার দরকার নেই। খিচুড়ী হবে। তার সঙ্গে আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, কুমড়োর চাটনী আর যদি পারো একটু করে পাঁপর ভাজা। কত আর লোক হবে! পাঁচ-ছ'শোর বেশী তো হবে না। এমন কিছু নয়। আসলে খাওয়াটা এখানে বড় কথা নয়। ঐ যে কাঙালী ভোজন, তাতে কোন জাত-বেজাতের বিচার থাকবে না। বামুন-কায়েত, শূদ্র ভদ্র, হিন্দু মুসলমান সবাইকে একসঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়ে খাওয়ানোটাই হল আসল কথা। এইটেই রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের সাধনা ছিল, জানতো?

হাবলু আমতা আমতা করে বললে, —ওতো অনেক টাকার ব্যাপার। আমরা অত টাকা...

টাকা? শোনো টাকার জন্যে কখনো কোন বড় উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নি।

হুঁকোর আগুনটা নিভে এসেছিল। নেণ্টুকাকা জোরে কয়েকটা টান দিয়ে সেটাকে বাগানের বেড়ার গায়ে ঠেকিয়ে রেখে আবার সন্নেসীকে ডাক দিলেন। সন্নেসী মাটি কাটা থামিয়ে নেণ্টুকাকার সামনে এসে দাঁড়াল।

সন্নেসী! তোমার মাকে গিয়ে বল, ২০টা টাকা দিতে।

২০ টাকা! হাবলু চকিতে ঘুরে তাকাল আমাদের দিকে। তার মুখে দিগ্বিজয়ের হাসি। ঝণ্টুর গাল লাল হয়ে উঠেছে আনন্দে। সুঁটে পটপট করে হাতের আঙুলগুলোকে মটকে নিলে। বাঁটুল এক চক্কর ঘুরিয়ে নিলে নিজেকে। আমারও গালের হাসি গাল ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

হ্যাট্স অফ, হাবলু। তুই যাদু জানিস। নেণ্টুকাকার কাছ থেকে ২০ টাকা চাঁদা আদায়! যা কিনা শিবের বাপেরও অসাধ্যি আজ তুই তাই করলি। ১ টাকা আদায় করতে আমাদের পেটের অন্নপ্রাশনের ভাত হজম হয়ে গেছে। হাবলু, এখান থেকে বেরিয়ে তোর পায়ের ধুলো নেব, মাইরী!

তোমরা, আজকালকার ছেলেরা—সামান্য কাঙালী ভোজন করাতে ভয় পাচ্ছো? টাকার ভয়ে, তাইতো? আচ্ছা, এবার ঐ রবীন্দ্রনাথের কথাই ভেবে দ্যাখ তো। পকেট ফাঁকা, সিকি পয়সাও ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স নেই। তা সত্ত্বেও ফাঁকা মাঠের মধ্যে অতবড় একটা বিশ্বভারতী গড়ে তুললেন শান্তিনিকেতনে। টাকার জন্যে কাজটা আটকালো কি? আটকায় না। উদ্দেশ্য যদি বড়ো হয়, আটকায় না। পাঁচশো লোকের কি ধর ছশো লোকের জন্যে খিচুড়ী করতে কত খরচ? হিসেব করে বলতে পারবে এক্ষুনি?

আমরা সকলেই খানিকটা থতো-মতো। পাঁচশো ছশো লোকের খিচুড়ী রাঁধতে কত চাল, কত ডাল ওসব কি আমাদের জানার কথা!

হাবলু বললে—এখুনি তো বলতে পারব না। আমরা তো আগে কোনদিন কাঙালী ভোজন করাই নি। তবে মুখুজ্যে পাড়ার বঙ্কু মেশোমশাইকে জিজ্ঞেস করলেই জেনে যাবো। ওঁর বাবার শ্রাদ্ধে কাঙালী ভোজন হয়েছিল, চার পাঁচ মাস আগে।

অঙ্কে বোধ হয় তোমরা কেউই ভাল নও। এ বছর কত পেয়েছ অঙ্কে?

নেণ্টুকাকা একদম সোজাসুজি আমার দিকেই তাকিয়ে। আমার বুক ধক্‌ধক্ করে উঠল।

আমি! আমাকে বলছেন? আমি সত্যি সত্যি অঙ্কে খুব কাঁচা।

কত পেয়েছো, কত, নম্বরটা বল না।

আমি, আমি ১৭ পেয়েছিলাম।

তা এত ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাওয়ার কি আছে? অঙ্কে কম নম্বর পাওয়াটা এমন কিছু অপরাধ নয়। মন দিয়ে অঙ্ক কষলেই শেখা হয়ে যাবে। এই যে রবীন্দ্র-নাথের কথাই ধর না। লেখাপড়ায় কি ভাল ছেলে ছিলেন? ছিলেন না। কতটুকুই বা পড়েছিলেন? বেশী পড়েন নি। তাহলে এত বড় হলেন কি করে? জানো? কারণটা কি? রবীন্দ্রনাথ তোমা-দের মত ভেতো বাঙালী ছিলেন না। বাঙালীদের উপর হাড়ে চটা ছিলেন। 'সাতকোটী সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করো নি' এই কথা কবি অনেক দুঃখ করেই লিখে গেছেন। কেন বলতো? কারণ বাঙালীরা বড্ড বাক্যবাগীশ জাত। কাজে কুড়ে। তোমরা রবীন্দ্রজন্মোৎসব করতে চাইছো, অথচ তোমাদের কতকগুলো সাধারণ জ্ঞান নেই। তোমরা যদি ভেবে থাকো, চাল ডাল তেল নুন এসব জিনিষের কি দরদাম, এসব রবীন্দ্রনাথ জানতেন না, তাহলে ভুল করবে। রবীন্দ্রনাথ কবিতাও লিখতেন। আবার জমিদারিও চালাতেন। তোমার নাম কি?

নেণ্টুকাকা প্রশ্নটা করলেন ঝণ্টুর দিকে তাকিয়ে।

আমার নাম? ঝণ্টু।

ঝণ্টুতো ডাক নাম। ভাল নাম কি?

সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

কার ছেলে বলতো তুমি?

আমার বাবা হলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওঃ, তুমি ক্ষীরোদকাকার ছেলে? বাঃ। বাড়িতে অম্বল খাও?

অম্বল? অম্বল তো খাই।

কিসের অম্বল? পেঁপের, না কুমড়োর, না ঢেঁড়শের। না কুঁচো চিংড়ীর?

সব রকমই হয়।

বেশী হয় কোনটা?

বেশী হয় কুমড়োর।

কুমড়োর কত করে সের, জানো?

আজ্ঞে না।

তাহলেই দ্যাখ। কুমড়োর অম্বল রোজ খাচ্ছ, অথচ জিনিসটা বাজারে কত দামে বিক্রি হচ্ছে, খবর রাখো না। রবীন্দ্রনাথের মত অত বড় একটা বিশ্ব-প্রতিভার কতটুকু খবর রাখো তোমরা বুঝতেই পারছি। তোমরা তো এখনো যোগ্যই হয়ে ওঠোনি...

আমাদের যে গালগুলো হাসি-খুশীতে পাকা আমের মত লাল টুস-টুসে হয়ে উঠেছিলো একটু আগে, চুপসে আমসত্ত্বের মত কালো হয়ে যেতে লাগলো। কুমড়োর দামটা জানিনা বলেই বোধ হয় চাঁদার করকরে কুড়িটা টাকা আর পাওয়া গেল না। কুমড়ো জিনিসটা গোল জানতাম। তার ভিতরে যে এত গণ্ডগোল জানতাম কি ছাই! তীরে এসে সব কিছু ভরাডুবি হয়ে যেতে বসেছে দেখে মনের মধ্যেটা হায় হায় করে উঠলো।

আর ঠিক সেই সময়েই হাবলু যেন থিয়েটারে পার্ট বলছে, এমনি নাটকীয় ভঙ্গীতে সজোরে বলে উঠল—নেণ্টু-কাকা, ৩০৫ টাকা লাগবে।

৩০৫ টাকা? কি করে হিসেবটা কষলে?

আজ্ঞে, আমাদের পাড়ার দাশু হালদারের হোটেল আছে বাগনান স্টেশনে। সেখানে শুধু ডাল ভাত আর

তরকারি খেতে ১২ আনা পড়ে। দাশু-কাকা বলেছিলেন এই ১২ আনায় তাঁর ৪ আনা লাভ থাকে। তাহলে পার হেড ৮ আনা করেই পড়ে এক একজনের। আমরা যদি ৬০০ জন লোককে খাওয়াই খরচ পড়বে, ৩০০ টাকা। আর যে হালুইকর রাঁধবে, তাকে ৫ টাকা মজুরী দিতে হবে।

বাঃ। এই তো। দেখ, তোমরা সবাই ভয় পেয়ে গেলে। হাবলু ভয় না পেয়ে চেষ্টা করল বলেই উত্তরটা পেয়ে গেল। কোন কিছুতে চট্ করে ভয় পেতে নেই। রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন, 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়'। সব সময় মনে রাখবে কথাটা। এই তো হয়ে গেল। মোটামুটি কত খরচ হবে তার একটা হিসেব তোমরা পেয়ে গেলে। এবার কাজে নেমে পড়, কথা না বলে।

আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু...

কিন্তু কি বল?

কাঙালী ভোজনের তো অনেক খরচা। সবাই যদি একটু বেশী বেশী করে চাঁদা না দেন...

তা তো বটেই। এ তো আর ১টাকা ২টাকার ব্যাপার নয়। গ্রামে তোমরা একটা ভাল জিনিস করছো। সবাইকে সাহায্য করতে হবে বৈকি। তোমরা ছেলেমানুষ, কি করে করবে নইলে!

এই সময় সন্নেসীকে দেখা গেল আসতে। দুটো দশ টাকার নোট হাতে। হাবলুকে আমি ইসারা করলাম হাতের তিনটে আঙুল দেখিয়ে। অর্থাৎ এ সময় আরেকবার কথাটা তুলে ২০ কে ৩০ করে নে।

হাবলু পকেট থেকে চাঁদার বই আর ফাউন্টেন পেনটা বের করে ফেললে।

তাহলে নেন্টুকাকা, আপনার নামে আমরা...

দাঁড়াও বলছি।

সন্নেসী এসে ১০ টাকার নোট দুটো নেন্টুকাকার হাতে দিতেই, তিনি জগদীশকে ডাকলেন। জগদীশ কঞ্চির বেড়ার উপর দিয়ে তার লম্বা হাতটা বাড়িয়ে দিলে।

আজ ২০ টাকা দিচ্ছি। বাকী টাকাটা সামনের সপ্তাহে এসে নিয়ে যেও, কেমন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বলে জগদীশ ১০ টাকার নোট দুটো নিয়ে চলে গেল। নেন্টুকাকা আমাদের দিকে ঘুরে তাকালেন।

হ্যাঁ, কি বলছিলে?

আজ্ঞে, চাঁদা...

চাঁদা? চাঁদা আমি দেবো না। বুঝলে? ১ টাকা ২ টাকা চাঁদা দিলে অত বড় ব্যাপার তোমরা সামলাতে পারবে

উদ্দেশ্য যদি বড়ো হয়.........

না। তোমরা বরং একটা কাজ কর।

হাবলুর গলার স্বর তখন ১৮ দিনের জ্বরের রুগীর মত চিনচিনে। মুখখানাও লম্বা হয়ে ঝুলে এসেছে নীচের দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে নিজের অপমান নিজে সামলাবার চেষ্টা করছে সে প্রাণপণে। তবুও গলায় আগের মতই বিনীত ভঙ্গী ফুটিয়ে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, বলুন।

কাঙালী ভোজনের জন্যে কুমড়োর চাটনীটা তো হচ্ছে । তোমাদের আর বাজার থেকে কুমড়ো কেনার দরকার নেই। যে কটা কুমড়ো লাগবে, আমার বাড়ি থেকে নিয়ে যেও। আর ম্যাগাজীনের জন্যে যে লেখাটা চেয়েছ, সেটা সামনের রবিবারে এসে নিয়ে যেও। কবি রবীন্দ্রনাথকে সবাই চেনে। কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথকে অনেকেই চেনে না। ঐ বিষয়েই তোমাদের একটা বড় প্রবন্ধ লিখে দেবো।

বাইরে বেরিয়ে এসে আমার ইচ্ছে করছিল, বশিষ্ঠ কিংবা বিশ্বামিত্র মুনির মত অভিশাপ দিয়ে হাবলুকে শেষ করে দি। ওর জন্যেই সকালটা নষ্ট। আর গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া।

ঝন্টু বললে—আমি জানতাম।

কি?

হাবলু তখন বললে না যে, ডান দিকে সাপ পড়া খুব ভাল। আসলে তো সাপটা ছিল বাঁদিকে। বাঁদিক থেকে ডানদিকে চলে গিছল।

তখনই বললি না কেন রে রাসকেল? দিনটা মাটি হোত না।

আহা, তখন বললে তো তোরা আর যেতিস না। আর না গেলে নেন্টুকাকার রবীন্দ্র-প্রতিভা কি জানা হোত কোনদিন?

সে বছর আর রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করিনি আমরা কুমড়োর চাটনীর ভয়ে।

শ্যামল ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরির খেলা
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা।
শান্তিনিকেতন ... শরতের নির্মল আকাশ
আর ধানক্ষেতে দোলা লাগানো মৃদুমন্দ বাতাসের স্পর্শ। এখানে
ওখানে হাজারো গাছের আড়ালে নাম-না-জানা অজস্র পাখির
ভীড়। সুরকি-ঢালা লাল রাস্তার পাশে পাশে গাছের ছায়ায়
প্রাচীন তপোবনের ঐতিহ্য। একাধিক বিস্ময়কর মূর্তি...
ভাস্কর্যের বিমুগ্ধ প্রতীক। উপরন্তু বিচিত্রা আর
উদয়ন... কবিগুরুর পূণ্য স্মৃতিধন্য। আম্রকুঞ্জ আর
শালবীথিতে পথিকের ভীড়। আশ্রমের বাইরে
মেঠো পথে রাখালিয়া বাঁশির সুর।
এ সব নিয়েই আজকের শান্তিনিকেতন...
আপনার আমার 'প্রাণের আরাম,
মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি'।
আজই চলে আসুন। আরামদায়ক
আর মনোমত জায়গার জন্যে
ট্যুরিস্ট লজ আর কটেজে খোঁজ
নিন। রিজার্ভেশনের জন্যে
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
ট্যুরিস্ট ব্যুরো
৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ডালহৌসি স্কোয়ার) ঈষ্ট
কলিকাতা-১ ফোন : ২৩-৮২৭১ গ্রাম : TRAVELTIPS
স্বরাষ্ট্র (পর্যটন) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
TCP/TB 262A1

সেতুবন্ধ লক্ষ্মণেশ্বর

অমিতাভ চৌধুরী

ছবি এঁকেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী

সীতা উদ্ধারের সময় রামচন্দ্র জম্বুদ্বীপ ও লংকাদ্বীপের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছিলেন। তাঁকে সাহায্য করেন কিষ্কিন্ধ্যার কপিকুল। চিফ ইনজিনিয়ার ছিলেন নল নামক বানর। নল রামচন্দ্রকে বলেছিলেন, "এক মাসে বান্ধি দিব শতেক যোজন, গাছ পাথর আনি দিক যত কপিগণ।" এই সেতুস্থলই বর্তমানে 'সেতুবন্ধ রামেশ্বর' নামে পরিচিত।

কিন্তু বাল্মীকি, বেদব্যাস বা মাইকেল যা লেখেন নি, তা সেতুবন্ধ লক্ষ্মণেশ্বরে প্রস্তাবিত দ্বিতীয় সেতুবন্ধনের কাহিনী। রামলক্ষ্মণ দু'ভাই একসঙ্গে সীতা উদ্ধারে রওনা হন। সঙ্গে সুগ্রীব অঙ্গদ হনুমান জাম্বুমান প্রমুখ বানর নেতারা। দ্রুতনির্মিত প্রথম সেতু দিয়ে সব বানর সৈন্যের লংকা প্রবেশে অসুবিধা ঘটে। যুদ্ধাস্ত্র, রসদ ইত্যাদি একসঙ্গে সেতুর উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। উপরন্তু মিলিটারি স্ট্র্যাটেজির দিক থেকে একটিমাত্র সেতুর উপর নির্ভর করা অসমীচীন বলে বানর-জেনারেলরা মনে করেন। সেই কারণেই সেতুবন্ধ রামেশ্বরের পাশে দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের কথা ওঠে।

তাছাড়া শোনা যায়, নির্মিত প্রথম সেতুটি কনিষ্ঠ লক্ষ্মণের মর্মবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রামচন্দ্র অনুমানে বুঝতে পারেন, ছোটভাইয়ের ইচ্ছা তাঁর নামেও একটা সেতু হোক, ইতিহাসে দু'জনের নাম এখানেও পাশাপাশি থাক। সেই মত দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের প্রস্তাব হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সম্পূর্ণ হওয়া দূরে থাক, কাজে হাত পর্যন্ত নাকি দেওয়া হয় নি। কেন হয়নি, এ যাবৎ অজ্ঞাত সেই কাহিনী আমি বীরভূমের ময়ূরেশ্বর থানার একটি অখ্যাত গ্রামের গোয়ালঘরে পাওয়া ভূর্জপত্রের এক পাণ্ডুলিপি থেকে জানতে পেরেছি। পাঠোদ্ধারে বিশ্বভারতী ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—দুই প্রতিষ্ঠানের সাহায্য আমি নিয়েছি।

কনসার্ট ॥ জুড়ির গীত

অজ্ঞাত অখ্যাত এই নব রামায়ণ।
দ্বিতীয় সেতুর কথা করিব বর্ণন ॥
নায়কের ভূমিকাতে শ্রীরামচন্দ্রন।
ADMKদলে তিনি প্রতিষ্ঠাতা নন ॥
কুলবধূ কেড়ে নিল পাষণ্ড রাবণ।
উদ্ধার করিতে যান সীতা প্রাণধন ॥
কিউ আর ইউ যেন, পিছনে লক্ষ্মণ।
'যুগ যুগ জীয়ো' বলো যত বন্ধুগণ ॥

রামচন্দ্র বসে আছেন বর্তমান তামিলনাড়ুর প্রত্যন্ত অংশে। সম্মুখে বিস্তীর্ণ জলরাশি। সমুদ্রতীরের এই অপরূপ শোভা সত্ত্বেও রামচন্দ্র বিমর্ষ। সমুদ্রের ওপারে তাঁর 'হাইজ্যাক'-করা প্রাণাধিকা পত্নী সীতা রাবণের অন্দরমহলে

'হোস্টেজ'-রূপে পড়ে আছেন, এই একটি মাত্র ভাবনা তাঁর মনে অনবরত খোঁচা দিচ্ছে। তীর-ধনুক-তূণীর পাশে বালুকাশয্যায় শায়িত। এমন সময় লক্ষ্মণ এলেন, পাশে বসলেন। বসেই ভীমপলশ্রী রাগে একটা গান ধরলেন—

খোঁজাখুজি করিলাম
হেথা হোথা চৌদিকে,
কোথাও না হেরিলাম
প্রাণাধিকা বৌদিকে।

রাম: ভাইরে, এখন গানের সময় নয়, একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয় সেতুবন্ধনের প্রস্তাব পাকা বহ্নীক দেশ থেকে কয়েকজন ইনজিনিয়ার এসে পরামর্শও দিয়ে গেছেন। ঠিকাদারও ঠিক হয়েছে। গবাক্ষ বীরবাহু ও তাম্রধ্বজ – এই তিন কিষ্কিন্ধ্যাখ্যাত ইনজিনিয়ার মিলে একটি সংস্থা গড়েছেন। দ্রাবিড়-স্থানের কয়েকজন মান্য ব্যক্তি অবশ্য ওই ঠিকার ব্যাপারে আপত্তি জানান। আমার কাছে চুয়াত্তর জনের এক ডেপুটেশন পাঠিয়ে বলেন, স্থানীয় কোন সংস্থাকে ঠিকা দেওয়া হোক। আমি রাজী হইনি; এই সব সর্বজম্বুদ্বীপীয় ব্যাপারে প্রাদেশিকতা ভাল নয়। কিষ্কিন্ধ্যার লোকদের দ্বারা আমি উপকৃত। মহামতি সুগ্রীবের পরামর্শক্রমে কিষ্কিন্ধ্যাবাসী ওই তিন বানরকে কৃপা করেছি।

লক্ষ্মণ: উত্তম কাজ করেছেন। কিন্তু দাদা, আপনি তো এখনও আপনার সমস্যাটি উপস্থিত করলেন না?

রাম: বলছি, বলছি। আমার প্রিয় শিষ্য জাম্বুমান জানিয়েছেন, প্রস্তাবিত সেতুটি পঞ্চলক্ষ হস্ত উচ্চ হোক। কিন্তু আমার পরমভক্ত হনুমানের অভিমত, এত উচ্চতার প্রয়োজন নেই, দ্বিসহস্র হস্ত হলেই যথেষ্ট। তাছাড়া সেতু এত উচ্চ হলে তার লম্ফদানের পক্ষেও নাকি বিঘ্নকর। এখন কী করি বুঝতে পারছি না। সীতা নিয়ে ভাবনার মাঝখানে সেতু এসে ঢুকলো।

লক্ষ্মণ: সমস্যা জটিল। আমার প্রস্তাব, উচ্চ নীচ সমস্যার সমাধানকল্পে তিন জনের একটি কমিটি হোক। তাতে জাম্বুমান হনুমান দুজনেই থাকুন, আর যেহেতু সেতুটি আমার নামেই প্রস্তাবিত, তাই তৃতীয় সদস্য থাকি আমি।

রাম: তথাস্তু। কিন্তু সহোদরপ্রতিম সুগ্রীবকে না নিলে তিনি যদি সীতাউদ্ধারে অসহযোগিতা করেন?

লক্ষ্মণ: সে আপনি ভাববেন না। আমি তাঁকে দ্বিতীয় সেতু সংস্থার চেয়ারম্যান করে দেব। মাসে ত্রিসহস্র মুদ্রা ও একখানি অশ্বচালিত আধুনিক রথের ব্যবস্থা করে তাঁর মুখ বন্ধ করে দেব।

রাম: চমৎকার আইডিয়া। যাও ভ্রাতঃ, কমিটির কাজ অবিলম্বে আরম্ভ করো।

কমিটি গঠিত হল। মাস যায় বছর যায়, বৈঠকের পর বৈঠক বসে, (ইতিমধ্যে কমিটির সদস্যরা চার বার মিশর ও পারস্য ঘুরে এসেছেন) কিন্তু কোন রিপোর্ট দাখিল হয় না, নকশা তৈরি হয় না। এদিকে রামচন্দ্র অধৈর্য হয়ে পড়ছেন। ভক্ত হনুমান আনীত কদলী ও বনফল খেয়ে ক্ষুধা দূর করেন এবং নিয়মিত আহার নিদ্রার ফাঁকে 'হা সীতা, হা সীতা' বলে দূর লংকাদ্বীপের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়েন।

অধীর রামচন্দ্র কনিষ্ঠ লক্ষ্মণকে ডেকে পাঠান। লক্ষ্মণ আসতেই তাকে তাড়া দিয়ে বলেন—

রামঃ কোন্ হেতু, হে কোন্ হেতু
হচ্ছে না ওই সেকেন সেতু?
লক্ষ্মণঃ সেতুর পিছন আছেন কেতু
তাই হয় না সেকেন সেতু?
রামঃ কী কারণ হে, কী কারণ
কাজের এমন ধরন ধারণ?
লক্ষ্মণঃ অনেক কিছুই আছে দাদা
কিন্তু সেটা বলতে বারণ।

রামঃ শীঘ্র কাজ শুরু কর, নতুবা প্রথম সেতু দিয়েই আমি লংকা আক্রমণ করব।

লক্ষ্মণঃ অপেক্ষা করুন আর একটু, আমাদের কমিটির একসপ্ততিতম সংখ্যক বৈঠক আজই বসছে। তাতে প্রস্তাবিত সেতুর গঠনশৈলী, বিস্তার, ব্যয় ইত্যাদি পাকা হবে। আপনি কিছুই ভাববেন না।

সেইদিনই দ্বিতীয় সেতুর ৭১তম বৈঠক বসল। দীর্ঘকাল বৈঠক চলবে, এই বিবেচনায় প্রচুর কদলী এনে রাখা হল টেবিলে, খিদে পেলে যাতে ঘন ঘন অন্যত্র যেতে না হয়। প্রথমেই লক্ষ্মণ সেতু সংস্থার স্থায়ী চেয়ারম্যান সুগ্রীবের পত্র পাঠ করলেন। তাতে লেখা, ঠিকা যেই পাক, সেতু নির্মাণের সময় তাঁর নিজস্ব দলের সাতশত বানরকে চাকরি দিতে হবে। তাছাড়া প্রথম সেতু নির্মাণের পর যারা বেকার, তাদেরও চাকরিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে। নতুবা ক্ষতিপূরণ।

লক্ষ্মণঃ এ অন্যায়। বৌদিকে বাঁচানোর ব্যাপারে আমরা বিপন্ন, তাই সুগ্রীব চাপ দিয়ে দাবি আদায় করে নিতে চাইছেন। জানেনই তো আমরা দু'ভাই কপর্দকশূন্য, রাজ্যচ্যুত বনবাসী। এত লোককে চাকরি বা ক্ষতিপূরণ দিলে ফতুর হয়ে যাব। তাছাড়া আমার নিজেরও দুইশত চাকুরিপ্রার্থী আছে।

হনুমানঃ আমার প্রার্থী তিনশত।

জাম্বুমান: আমার পাঁচশত।

লক্ষ্মণ: মহা বিপদ! ঠিক আছে। সুগ্রীব ও আমাদের তিনজনের দাবির গড় কষে প্রার্থীর সংখ্যা হোক আড়াইশ। তাহলে মোট চারজনের সহস্র শ্রমিকে কাজ চালানো সম্ভব হবে।

জাম্বুবান: কিন্তু স্থানীয় দ্রাবিড়রা যদি দাবি তোলে?

হনুমান: কোন অসুবিধা নেই। পঞ্চাশ ষাটজন কেরানীর দরকার হবে। ওগুলো তাদের জন্য বরাদ্দ রইল।

লক্ষ্মণ: উত্তম। এখন কাজের কথায় আসুন। সেতু উঁচু হবে না নিচু হবে?

জাম্বুবান: কিচ কিচ কিচ কুচু
সেতুটা হোক উঁচু।

হনুমান: কিচ কিচ কিচ কিচু
সেতুটা হোক নিচু।

জাম্বুবান: উঁচু।

হনুমান: নিচু।

লক্ষ্মণ: সর্বনাশ! সামান্য বিষয় নিয়ে এত কলহ করলে কি চলবে? দ্বিতীয় সেতু যে শীঘ্র নির্মাণ করা দরকার, সে বিষয়ে মাননীয় সদস্যেরা নিশ্চয়ই অবহিত। সুতরাং.........

হনুমান: আমি প্রস্তাব করছি, এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য প্লক্ষ দ্বীপ থেকে একজন বিদেশী উপদেষ্টা আনা হোক।

জাম্বুবান: আমি কম কিসে? আমার মত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রযুক্তিবিদ আর আছে এই জম্বুদ্বীপে? তাছাড়া বিদেশী বাবদ অর্থব্যয় একেবারে অযৌক্তিক। বিদেশী মুদ্রার টানাটানি রয়েছে, একথা ভুললে চলবে কেন?

হনুমান: বন্ধু জাম্বুমান, আপনি উত্তেজিত হবেন না। এই দ্বিতীয় সেতুর উপর জননী সীতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সুতরাং এমনভাবে আটঘাট বেঁধে করা চাই, যাতে পরে কোথাও কোন বিপত্তি না ঘটে।

জাম্বুমান: প্রথম সেতু নির্মাণে আমি সাহায্য করেছি। তাহলে এক্ষেত্রে আমার নকশা গ্রাহ্য হবে না কেন?

লক্ষ্মণ: এই তুচ্ছ বিসংবাদ থেকে আপনারা বিরত থাকুন। আমার প্রস্তাব, জাম্বুমান ও হনুমানের প্রস্তাবের মাঝামাঝি উঁচুও নয়, নিচুও নয়, এমন একটি সেতু নির্মাণ করা হোক।

হনুমান: দেখুন স্যার, আমি বলে দিচ্ছি, আমার প্রস্তাব নাকচ হলে কমিটির সঙ্গে কোন সংস্রব রাখবো না। আমার কী, সেতু ছাড়াই আমি লাফ দিয়ে এপার ওপার করতে পারি। আপনারা যা ইচ্ছে তাই করুন।

লক্ষ্মণ: বৎস হনুমান, এখন ক্রোধের সময় নয়।

হনুমান: রাগ করবো না তো কী! সব হ্যাপা তো আমাকেই সামলাতে হয়। জাম্বুবান তো নকশা দাখিল করেই খালাস।

জাম্বুমান: ঠিক আছে, আমি যখন অপদার্থ, আমি আমার পদত্যাগপত্র দাখিল করলাম।

হনুমান: ঠিক আছে। আমিও পদত্যাগ করলাম। ধুৎতেরি, লড়াই করব, না তর্ক করব!

লক্ষ্মণ বেগতিক দেখে বৈঠক মুলতুবি ঘোষণা করলেন। বিরস-বদনে তিনজন তিনদিকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। দ্বিতীয় সেতু কমিটির ৭১তম অধিবেশন বিনা সিদ্ধান্তে সমাপ্ত।

রামচন্দ্র এই গণ্ডগোলের সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত বিচলিত। লক্ষ্মণকে ডেকে বললেন, 'তোরা যা খুশি কর, আমি প্রথম সেতু দিয়েই সাগর পাড়ি দিচ্ছি। নিরুপায় লক্ষ্মণ তখন জানালেন, এই কমিটি ভেঙে দিয়ে তিনি ও সুগ্রীব যৌথ সিদ্ধান্ত নেবেন ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে।

লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লেন সুগ্রীবের খোঁজে। সুগ্রীব সে সময় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন নিজ গুহায়, আর গুন গুন স্বরে গান গাইছিলেন, 'ঠমকি চলত রামচন্দ্র। এমন সময় লক্ষ্মণ এসে উপস্থিত।

লক্ষ্মণ: সুহৃদ সুগ্রীব, একটা ব্যবস্থা না করলে মান সম্মান যায়। দাদাও রেগে আগুন।

সুগ্রীব: (এক টিপ নস্যি নাকে নিয়ে) আমার মনে হচ্ছে, এই ব্যাপারে তৃতীয় কোন শক্তির হাত আছে। সে-ই গণ্ডগোল পাকাচ্ছে।

লক্ষ্মণঃ তৃতীয় শক্তি? সে আবার কী?

সুগ্রীবঃ (নাক রুমালে ঝেড়ে) সি-আই-এ।

লক্ষ্মণঃ সি আই এ? সে আবার কী বস্তু?

সুগ্রীবঃ (আবার নস্যির ডিবা খুলে) বস্তু নয়, ব্যক্তি। এই দ্বিতীয় সেতু বানচাল করার জন্যে বিদেশী একটি গুপ্তচর সংস্থা তৎপর হয়েছে। ওরা রাবণ রাজার পক্ষে। সীতা সহজে উদ্ধার পান, চায় না।

লক্ষ্মণঃ তাই নাকি? দাদাকে তাহলে তো বলতে হয়।

রামচন্দ্রের কাছে ছুটে গেলেন লক্ষ্মণ। রামচন্দ্র তখন সমুদ্রতীরে বালির উপরে তীরের ফলা দিয়ে সীতার ছবি আঁকছিলেন।

লক্ষ্মণঃ দাদা, দাদা, সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

রামঃ হয়ে গেছে? বাঃ! দ্বিতীয় সেতুর কাজে হাত তাহলে কবে পড়ছে?

লক্ষ্মণঃ কাজ চুলোয় যাক, কাজ কেন শুরু হচ্ছে না, সেই প্রশ্নের মীমাংসা হয়েছে। আমাদের মধ্যে একজন সি আই এর চর আছে।

রামঃ সি আই এ? তুই কি পাগল হয়ে গেলি? আমরা অযোধ্যাবাসী দু'জন ছাড়া সবাই কিষ্কিন্ধ্যার লোক। সি আই এ কোত্থেকে এল?

লক্ষণঃ সুগ্রীব বলেছেন, সে বড় ভয়ানক জিনিস। নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়।

রামঃ তার মানে?

লক্ষ্মণঃ তার মানে কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করতে ওরা অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলিয়ে সব ভণ্ডুল করে দেয়।

রামঃ তাতে লাভ?

লক্ষ্মণঃ লাভ ক্ষতি জানি না, সুগ্রীব আমাকে যা বুঝিয়েছেন, তাই বলছি। তাছাড়া সুগ্রীব-সরকারের সংগে আমাদের পঁচিশ বছরের মৈত্রীচুক্তি হয়েছে, তাঁরা যা বলবেন, তা-ই বিনা তর্কে মানতে হবে।

রামঃ তা বটে। তবে চলো ভাই, ধনুকে টংকার দাও, আমরা দু'জনে সি আই এ বধ করে আসি।

লক্ষ্মণঃ তা সম্ভব নয় দাদা। সুগ্রীব বলেছেন, সি আই এ সর্বশক্তিমান, সি আই এ সর্বভূতে বিরাজমান, তাকে বধ করার সাধ্যি কারও নেই। ওকে শুধু গালাগালি দিয়েই আমাদের কর্তব্য শেষ করতে হবে।

রামঃ সি-আই-এ না কী যেন, তাকে বন্দী করে আনা যায় না? আমি হনুমানকে নিয়োগ করতে পারি।

লক্ষ্মণঃ না, না, তাতে বিপত্তি হতে পারে। কে জানে, হনুমান নিজেই হয়ত সি আই এ'র চর।

রামঃ কী সর্বনাশ! কিন্তু প্রমাণ?

লক্ষ্মণঃ প্রমাণের প্রয়োজন নেই, বদনাম দিলেই হলো।

রামঃ তাহলে জাম্বুবানও তো চর হতে পারে।

লক্ষ্মণঃ তা'ও সম্ভব। সুগ্রীব বলছিলেন—

লক্ষ্মণের কথা শেষ হল না। ততক্ষণে অদূরে প্রচণ্ড হট্টগোল শোনা গেল। হনুমান ও জাম্বুমানে প্রচণ্ড মারামারি শুরু হয়ে গেছে। খামচা-খামচি, চুল ছেঁড়াছেড়ি, দাঁত ভেঙচি ইত্যাদি। মারামারির ফাঁকে প্রচণ্ড বিক্রমে একজন আর একজনকে সি আই এ'র চর বলে গালাগালি দিচ্ছেন। অঙ্গদ মারামারি থামানোর চেষ্টায় গলদঘর্ম। দূরে হাসি হাসি মুখে দাঁড়ানো সুগ্রীব মজা দেখছেন। হনুমান-জাম্বুমানে ছড়া কাটাকাটিও চলছে—

জাম্বুমানঃ কিষ্কিন্ধ্যার তুই মুখ পোড়ালি
সি আই এ'র চর হনুমান
তোর মনে সব বদ মতলব
হৈছে আমার অনুমান।

হনুমানঃ চড় মারিম্বু, ধড় ঘুরাম্বু;
জাম্বো জেটের মত পেটমোটারে তুই জাম্বু।

অবস্থা যখন চরমে রাম লক্ষ্মণ মাঝখানে পড়ে ঝগড়া থামালেন। দু'জনে শান্ত হলেন। কিন্তু সুগ্রীবের নির্লিপ্ত আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে রামচন্দ্র তার 'ভিটো পাওয়ার' প্রয়োগ করে স্থায়ী চেয়ারম্যানের পদ থেকে তাকে বরখাস্ত করলেন। তার অপরাধ গণ্ডগোলের মূলে তিনি। সি আই এ নামক পোকা সকলের মাথায় ঢুকিয়ে মজা দেখছেন। রামচন্দ্র দ্বিতীয় সেতুর কাজ শুরু
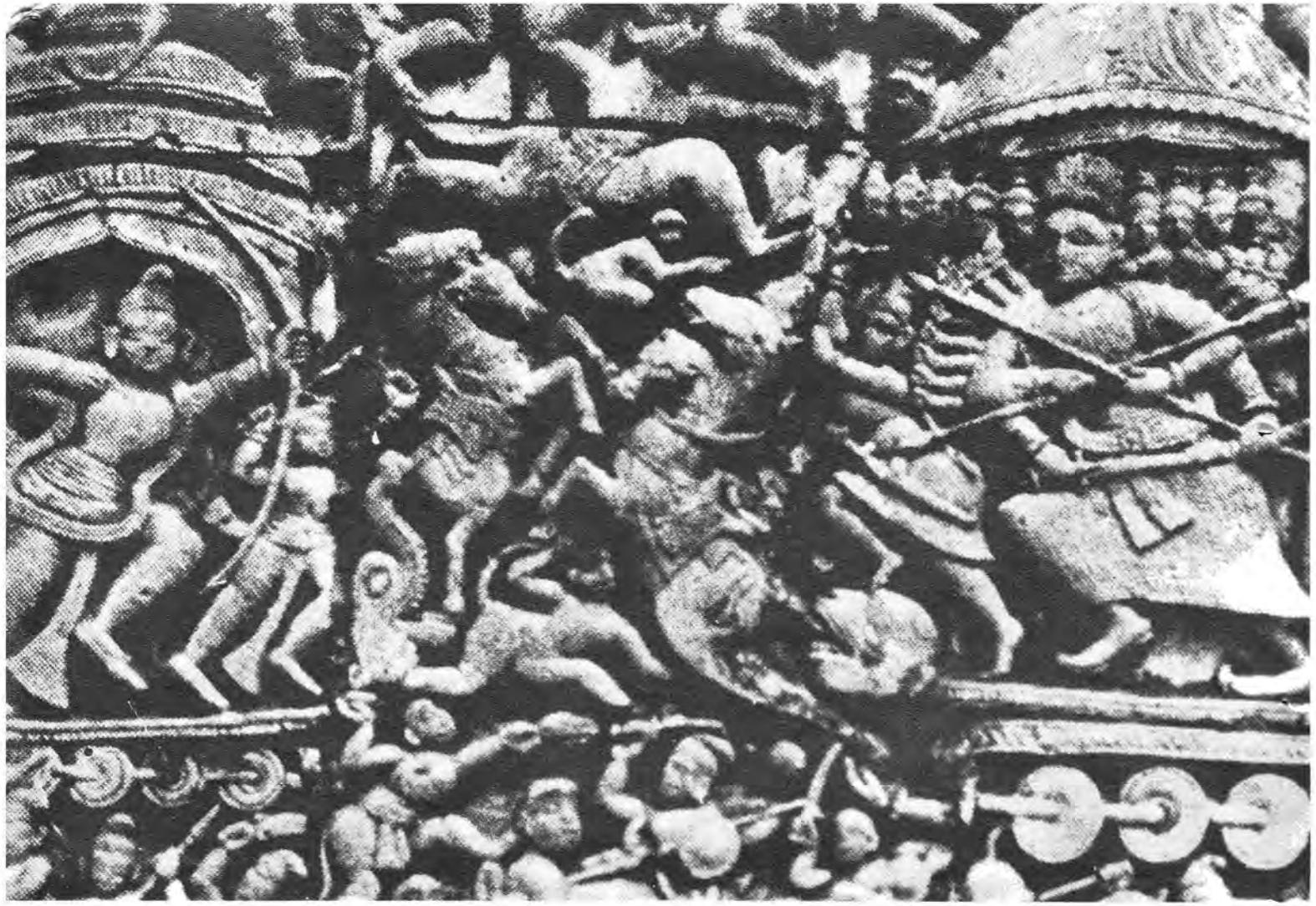
করার জন্য আর একটি কমিটি করে দিলেন।

সুগ্রীব রেগেমেগে চলে গেলেন। ক্ষতবিক্ষত জাম্বুবান ও হনুমানকে শুশ্রূষা করতে এলেন কবিরাজ সুষেণ। রামচন্দ্র ডেকে পাঠালেন ইনজিনিয়ার নলকে।

রাম: বৎস নল, পরামর্শ আছে।

নল: বলুন পিতঃ।

রাম: লক্ষ্মণের নামে দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের প্রস্তাব আছে। তোমার সাহায্য চাই।

নল: আমি প্রস্তুত।

রাম: দ্বিতীয় সেতু তৈরী অবিলম্বে দরকার। কিন্তু উঁচুনিচু নিয়ে হনুমানে জাম্বুমানে ঝগড়া করছে। সুগ্রীব সি আই এ'র মন্ত্র কানে ঢুকিয়েছে। লক্ষ্মণ টাল সামলাতে পারছে না। এখন ভরসা তুমি।

নল: আমার প্রস্তাব হল, জলের উপর দিয়ে দ্বিতীয় সেতুর নকশা তৈরি হতে থাকুক, ততক্ষণে জলের তলা দিয়ে চটপট আমি একটি পাতাল পথ তৈরি করে ফেলি।

রাম: পাতাল পথ? সে কি সম্ভব? আমাদের জম্বুদ্বীপে এমন জিনিস তো আগে হয়নি!

নল: হয়নি বলেই করা দরকার। পাতাল পথ নেই বলে আমাদের প্রেসটিজ থাকছে না। পাতালপতি বাসুকি আমার বন্ধু, তাঁর সাহায্যে আমি কাজ শেষ করে দেব।

রাম: কিন্তু ওই সি আই এ না কী যেন, বাগড়া দেবে না তো?

নল: আসুক না দিতে, আমার হাতে যুব বানরবাহিনী আছে, পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবো।

রাম: শুনে প্রীত হলাম। কিন্তু বৎস, কতদিনে পাতাল পথের কাজ শেষ হবে? আমার যে আর বিলম্ব সয় না।

নল: সমীক্ষা আছে, উপদেষ্টার পরামর্শ আছে, নকশা আছে, কমিটি

সাব-কমিটি অনেক কিছু আছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ শিলান্যাস। সেটা আজই আপনি করতে পারেন। শুভস্য শীঘ্রং।

রাম ঃ বেশ, তাই হোক।

নলের প্রস্তাব মত দ্বিতীয় সেতুর সঙ্গে সঙ্গে পাতাল পথের কাজও শুরু হল। পঞ্জিকার বিধানমত মাহেন্দ্রক্ষণে শিলান্যাসও হয়ে গেল সমুদ্রতীরে, সেতুবন্ধ রামেশ্বরের গায়ে গায়ে। রামচন্দ্র নিজেই শুভকাজ সমাধা করলেন। স্থানীয় জনগণকে তুষ্ট করতে একটি দ্রাবিড় বালিকা উপস্থিত বানরগণের তুমুল 'হুপ-হুপ' ধ্বনির মধ্যে নবদূর্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্রের গলায় মালা পরিয়ে দিল। তারপরেই রাবণের পাইপগানে শহীদ জটায়ুর স্মৃতিতে এক মিনিট নীরবতা পালন।

নল তার প্রতিবেদনে জানালেন, আসল কাজ শেষ হল, এখন পরবর্তী কাজে হাত দিতে আর মাত্র পাঁচ বছর এবং আশা করা যায় আগামী পনেরো বছরের মধ্যে পাতালপথ বানর সেনাদের জন্য উন্মুক্ত হবে। দরকার হলে এই পথ ভায়া কিষ্কিন্ধ্যা অযোধ্যা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। সে পরেকার কথা, পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী শিলান্যাস অনুষ্ঠান যে নির্দিষ্ট দিনে করা সম্ভব হয়েছে, তার জন্যে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত।

অনুষ্ঠান শেষ হল। রামচন্দ্র নিজ গুহায় ফিরে গেছেন। এত সুন্দর ও সার্থক শিলান্যাস সত্ত্বেও তাঁর মনের খেদ দূর হল না। তিনি আগেকার মতই বিমর্ষ। সীতা উদ্ধারে আরও পনেরো বৎসর! অসম্ভব। পাশের গুহা থেকে লক্ষ্মণকে ডেকে আনলেন।

রাম ঃ ভাইরে, কালই তৈরি হও। কালই আমি লংকা আক্রমণ করব। এই প্রথম সেতু দিয়েই আমি সমুদ্র লংঘন করবো। আমার দ্বিতীয় সেতুতে কাজ নেই, আমার পাতালপথে কাজ নেই। এ সবের অপেক্ষায় থাকলে জীবনেও সীতা উদ্ধার হবে না।

লক্ষ্মণ ঃ কিন্তু সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কারা কারা সি আই এ'র চর যাচাই বাছাই না করে কি অভিযানে অগ্রসর হওয়া উচিত?

রাম ঃ (উত্তেজিত হয়ে) যাবি তো চল্ আমার সংগে, নয়তো আমি একাই যাচ্ছি। নিকুচি' করেছে তোর সি আই এ—

ক্রোধে অশালীন গ্রাম্য ভাষা বেরিয়ে পড়ে অযোধ্যার যুবরাজ আর্যপুত্র রামচন্দ্রের মুখে। তারপর 'হা সীত হা সীতা' বলে তীর ধনুকের খোঁজে তিনি বেরিয়ে পড়েন। পিছনে পিছনে লক্ষ্মণ। ওরা চলে যেতেই আবার জুড়ির প্রবেশ ও গান॥

জুড়ির গীত

'হা সীতা হা সীতা' বলে
রাম লক্ষ্মণ রণে চলে
সংগে চলে বানর হাজার হাজার।
বীচিকলা কাঁদি কাঁদি
রসদরূপে লৈল বাঁধি
নিল পুটলি লুচি-বেগুন ভাজার॥
'হুপ হুপ হুররে হীপে হীপে'
হুলুস্থুলু লংকাদ্বীপে
যুদ্ধে গর্দান গেল রাবণ রাজার॥

ভূর্জপত্রের পাণ্ডুলিপিটি তারপরেই কীটদষ্ট। অনেক চেষ্টা করেও বাকি অংশ উদ্ধার করতে পারিনি। তবে প্রথম সেতু দিয়ে রামচন্দ্রের লংকা যাত্রা, রাবণ বধ, সীতা উদ্ধার ইত্যাদি সকলেরই জানা। কিন্তু দ্বিতীয় সেতু বা পাতাল পথ কোনদিন শেষ হয়েছিল কিনা, কিংবা আদৌ কাজে হাত পড়েছিল কিনা জানতে পারিনি।

যে খেলা

চিরঞ্জীব

জার্নেল সিং

মোহনবাগান ও ইসটবেঙ্গলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিতা কেন? মোহনবাগান মানেই কি পশ্চিমবঙ্গের বা 'ঘটি'দের ক্লাব? না—ইসটবেঙ্গল 'বাঙাল'দের নিজস্ব সম্পত্তি?

মোহনবাগান বলেঃ আমরা সাম্প্রদায়িকতা বা প্রাদেশিকতায় বিশ্বাস করি না। আমরা শুধু 'ঘটি'দের ক্লাব নই। বিভিন্ন সময়ে আমাদের নানা জয়ের মুকুট এনেছেন 'বাঙাল' খেলোয়াড়রা, ক্লাব পরিচালনায়ও 'বাঙাল'রা গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছেন। ইসটবেঙ্গলও বলেঃ আমরা শুধু 'বাঙাল'দের ক্লাব নই। আমাদের নথিপত্রই সে প্রমাণ দেবে।

আজ ভারতের এই সেরা দুই ফুটবল ক্লাবের হাজার হাজার সদস্য ও লক্ষ লক্ষ সমর্থকের অবচেতন মনে কিন্তু 'ঘটি' ও বাঙাল' ব্যাপারটিই প্রাধান্য পায়। অন্তত যে দিনগুলিতে উভয়ে মুখোমুখি হয়।

কিন্তু চুরাশি বছর আগে ১৮৮৯ সালের ১৫ আগস্ট বা তার পরেও ব্যাপারটি ছিল একেবারে অন্য রকম। উত্তর কলকাতার ফড়িয়াপুকুরে মোহন-বাগান লেন-এর 'মোহনবাগান ভিলা'র মাঠে খেলার সূত্রে ক্লাবের নাম হল মোহনবাগান স্পোরটিং ক্লাব। উভয় বঙ্গেরই কেষ্ট-বিষ্টু ব্যক্তিরাই ছিলেন এর কর্ণধার। ১৯০৩ ও ১৯০৫ সালে যখন মোহনবাগান কোচবিহার কাপ জিতল বা ১৯০৬, ১৯০৭ ও ১৯০৮ সালে ট্রেডস কাপ বিজয়ী হল, তখন কেউ 'বাঙাল'-'ঘটি'র ফারাক লক্ষ্য করেন নি। বরং তারপর যখন আই এফ এ শীল্ডে খেলার কথা ভাবল, তখন কলকাতার মানুষরাই ব্যঙ্গ করে বলেনঃ মোহনবাগান বামন হয়ে চাঁদ ধরতে যাচ্ছে। ১৯১০-এ শীল্ডে ওরা প্রথম রাউন্ডেই বি এন আর-এর কাছে হেরে যায়। ১৯১১-য় দ্বিগুণ উৎসাহে খেলা শুরু করল আর শীল্ডের খেলায় সেণ্ট জেভিয়ারসকে ৩-০, রেঞ্জার্সকে ২-১ ও রাইফেল ব্রিগেডকে ১-০ হারিয়ে দিল। সেমি-ফাইনালে মিডলসেকস্ প্রচন্ড প্রতিরোধ করায় ০-০ হল। কিন্তু দ্বিতীয় দিন মোহনবাগান প্রবল পরাক্রমে আক্রমণ হেনে ৩-০-য় জিতল।

এর পর এল সেই স্মরণীয় দিন ২৯ জুলাই। শুধু কলকাতা নয়। সারা বাংলার মানুষ 'বাঙাল-ঘটি' নির্বিশেষে ভেঙে পড়ল বাঙালী তথা ভারতীয় আর সাহেব দলের প্রথম এই শীল্ডের ফাইনাল দেখতে। কোম্পানী বিশেষ ট্রেন আর বিশেষ স্টিমার সার্ভিস চালু করল। ও-দিকে ফাইনালে উঠেছে ইস্ট ইয়রকশায়ার রেজিমেণ্ট। সাহেবপাড়ায় প্রবল উত্তেজনা। বাঙালীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ। বজ্র-কঠিন সংকল্প তাঁদের—গোরাদের হারাতেই হবে।

খেলা দেখতে টিকিট থাকলেও এখনকার মত গ্যালারি তো ছিল না। পিছনের দর্শকদের অসুবিধা না হয় তাই কাঠের বাক্স বানিয়ে তার উপর দাঁড়াবার ব্যবস্থা হত। কিন্তু সে তো কয়েক শ' মাত্র। এদিকে দর্শক সংখ্যা ১৯৭৩-এর লীগের ইডেনে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচকেও ছাড়িয়ে গেল। বাঙালী আর সাহেব মিলিয়ে সেই যুগেও আশি হাজার ফুটবল-পাগল মানুষের ভিড়। খেলা দেখতে পেলেন শুধু সামনে যাঁরা ছিলেন। রিলের ব্যবস্থাও ছিল না এখনকার মত। তাই ঘুড়িতে ফল লিখে দর্শকদের জানানো হল।

সকলেই গভীর উৎকণ্ঠায় কাটাতে লাগলেন। বিরতির সময় পর্যন্ত ০-০। তার পরেও কিছুক্ষণ কাটল। কোনো পক্ষই গোল দিতে পারছে না। অধিকাংশই

শেষ হবে না

ভাবতে লাগলেন খেলা বোধ হয় অমীমাংসিতই থেকে যাবে। আর মাত্র দশ মিনিট বাকি। গোরারা একটি ফ্রি কিক পেল। আর তার থেকেই গোল। সাহেবদের সে কী লাফালাফি! হৈ-চৈ! কিন্তু এক মিনিটের মধ্যেই অধিনায়ক শিবদাস ভাদুড়ী একলাই সকলকে কাটিয়ে নিয়ে ১-১ করলেন। মাঠের ও আশ-পাশের চেহারা গেল পাল্টে। মোহনবাগান এবার একের পর এক আক্রমণ রচনা করে চলেছে। খেলা শেষ হতে তিন মিনিট বাকি। আবার শিবদাস ভাদুড়ীর পায়ে বল, প্রতিপক্ষকে কাটিয়ে হাফ-লাইনের কাছে গিয়ে পাস দিলেন সেন্টার ফরওয়ার্ড অভিলাষ ঘোষকে। অভিলাষ ঘোষ ভুল করলেন না অভীষ্ট সিদ্ধিতে। ২-১ হয়ে গেল। হাজার হাজার মানুষের উল্লাসে কলকাতা তখন কল্লোলিত। সেই জাতীয় উৎসবে বাঙাল-ঘটি সকলেই অংশ নিলেন একপ্রাণ হয়ে। প্রত্যেকেই মোহনবাগানের জয়গানে মুখর। হুল্লোড় হবে না কেন—মোহনবাগানের আগে তো আর কোনো ভারতীয় দল শীল্ড জেতে নি!

১৯১১-এ মোহনবাগানের সেই চিরস্মরণীয় একাদশে ছিলেনঃ হীরালাল মুখার্জি; এ (ভূতি) সুকুল ও সুধীরকুমার চ্যাটার্জি; মনোমোহন মুখার্জি রাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নীলমাধব ভট্টাচার্য; কানু রায়, হাবুল সরকার, অভিলাষ ঘোষ, বিজয়দাস ভাদুড়ী ও শিবদাস ভাদুড়ী (অধিনায়ক)।

দেখতে দেখতে কেটে গেল নটি বছর। মোহনবাগান আই এফ এ শীল্ড না পেলেও লীগে ভাল ফল দেখাল, জিতল অন্যান্য ট্রফি। তাহলেও খালপারের এরিয়ান ক্লাবের প্রতিপত্তি কম ছিল না। হাঁক-ডাক আরম্ভ হয়েছে জোড়াবাগান ক্লাব ঘিরেও। ১৯১৫ সালে এই ক্লাবে খেলতে এলেন বিক্রমপুরের (ঢাকা) শৈলেশ বসু। কয়েক বছরের মধ্যে ফুটবল-ক্রিকেটে তাঁর খুব খ্যাতি হল। কিন্তু ১৯১৯-২০ মরশুমে ক্যালকাটার বিরুদ্ধে ক্রিকেট খেলায় শৈলেশবাবুকে বাদ দেওয়া হয়। দুঃখে ও ক্ষোভে তিনি দেখা করলেন ক্লাবের সহ-সভাপতি ময়মনসিংয়ের জমিদার সুরেশচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে। সুরেশবাবু অনুসন্ধানের পর জানলেন ষড়যন্ত্র করেই শৈলেশবাবুকে ক্যালকাটার বিরুদ্ধে খেলতে দেওয়া হয়নি। এর পরই স্থির হল পূর্ববঙ্গের খেলোয়াড়দের নিয়ে নতুন ক্লাব গড়া হবে। কিন্তু নতুন ক্লাবের নাম কি হবে! বৈঠক বসল নসা সেন (ডাঃ রমেশচন্দ্র সেন), শৈলেশ বসু ও সুরেশচন্দ্র চৌধুরীর মধ্যে।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব নাম রাখলে কেমন হয়? সুরেশবাবু শুরুতে রাজি হননি। পরে ভেবেচিন্তে বললেন, তাই হোক; এর চাইতে ভাল নাম আর হতে পারে না (অবশ্য এর অনেক আগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন)।

'নতুন' ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তো প্রতিষ্ঠা হল। আই এফ এ-র লীগে খেলবে কেমন করে! তখন নির্দিষ্ট কয়েকটি দল ছাড়া ডিভিশনে খেলার সুযোগ পেত না। শোনা যায়, দ্বিতীয় ডিভিশন থেকে তাজহাট ক্লাবের নাম প্রত্যাহার করিয়ে ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তারা শূন্যস্থানটি পূরণ করেন নবগঠিত ক্লাব দ্বারা। সেবার (১৯২১) লীগে তারা তৃতীয় হল। আই এফ এ শীল্ডে হারল দ্বিতীয় রাউন্ডে ডালহৌসীর কাছে।

বলরাম

এই বছরই ইস্টবেঙ্গল প্রথম মুখোমুখি হয় মোহনবাগানের। কোচবিহার কাপের খেলায় তারা হেরে গেল মোহনবাগানের কাছে। কিন্তু খগেন শীল্ডে ইস্টবেঙ্গলের কাছে হারে মোহনবাগান। 'ঘটি'-'বাঙাল' লড়াই তখনও শুরু.

১৯১১-য় আই এফ এ শীলড বিজয়ী প্রথম ভারতীয় দল মোহনবাগান: বাঁদিক থেকে দাঁড়িয়ে—রাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (সেনটার হাফ), নীলমাধব ভট্টাচার্য (লেফট হাফ), হীরালাল মুখারজি (গোলকিপার), মনোমোহন মুখারজি (রাইট হাফ), সুধীরকুমার চ্যাটারজি (লেফট ব্যাক), এ সুকুল—'ভূতি' (রাইট ব্যাক)। বসে—যতীন্দ্রনাথ রায়—'কানু' (রাইট আউট), শ্রীশচন্দ্র সরকার—'হাবুল' (রাইট ইন), অভিলাষ ঘোষ (সেনটার ফরওয়ারড), বিজয়দাস ভাদুড়ী (লেফট ইন) ও অধিনায়ক শিবদাস ভাদুড়ী (লেফট আউট)।

হয়নি। তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে আরও দুটি বছর কাটল। ১৯২৪ সাল। দ্বিতীয় ডিভিশন লীগে ক্যামেরনস হাইল্যান্ডারস 'বি' রেজিমেণ্টালের সমান (৩৭) পয়েন্ট ইস্ট-বেঙ্গলের। তখন যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হলেও কোনো ভারতীয় দল প্রমোশন পেত না। এককভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েও সিনিয়র ডিভিশনে যেতে পারত না। এখন যেমন বিশেষ বিশেষ কারণে আই এফ এ বিশেষ বিশেষ নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করে, তেমনি ছিল সেকালেও। ওঠা-নামা সেই বছরই হত—যেবার কোনো ভারতীয় দল প্রথম ডিভিশন লীগের সর্বনিম্নে থাকত ও একই বছরে যদি কোনো ভারতীয় দল দ্বিতীয় ডিভিশনের শীর্ষে স্থান পেত।

ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তারা 'তদ্বির' ও সলাপরামর্শ আরম্ভ করলেন। যুক্তি দেখান হল, ওই নিয়ম পক্ষপাতদুষ্ট, উপরন্তু ক্যামেরনস হাইল্যান্ডারস 'এ' টিম তো প্রথম ডিভিশনে খেলছে! ১৯২৪-এর অক্টোবরে আই এফ এ-এর বিশেষ সভা বসল সন্তোষের রাজার বাসভবনে। নিয়ম বদলে স্থির হল, প্রথম ডিভি-শনের সর্বনিম্ন স্থানাধিকারী পরের বছর নেমে যাবে, আর দ্বিতীয় ডিভিশনের শীর্ষ স্থানাধিকারী পরবর্তী মরশুমে প্রথম ডিভিশনে খেলবে। মোহনবাগান ও এরিয়ান ছাড়া আই এফ এর-এর কোনো সদস্যই ইস্টবেঙ্গলের যুক্তির বিরোধিতা করেন নি। আই এফ এর-এর তৎকালীন সম্পাদক কাস্টমসের (মতান্তরে ক্যালকাটা ক্লাবের) মেডলিকটই এই কাজে ইস্টবেঙ্গলকে সবচেয়ে সাহায্য করেন। কথিত আছে, এই ঋণ শোধ করতে ইস্টবেঙ্গলের এক কর্মকর্তা নাকি আই এফ এ সম্পাদককে একখানি গাড়ি ভেট দিয়েছিলেন।

১৯২৫ সালে ইস্টবেঙ্গল প্রথম ডিভিশন লীগে প্রথম খেলার সুযোগ পেল। শুধু সুযোগ নয়, প্রায় অর্ধ-শতাব্দী যাবৎ লীগে ইস্টবেঙ্গল-মোহন-বাগানের যে লড়াই, তার শুরুও এই বছর। এর আগের মরশুমে কোচবিহার কাপের ফাইনালে আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগানকে ১-০-য় হারিয়েছে দ্বিতীয় ডিভিশনের ইস্টবেঙ্গল।

ইস্টবেঙ্গলের মনোমালিন্য ছিল জোড়াবাগানের সঙ্গে। তবুও খাস কলকাতার ক্লাব বলে মোহনবাগানের সঙ্গেও রেষারেষি শুরু হল তাদের। অথচ গোষ্ঠ পাল, তারক শুর, সুধাংশু বসুর মত কট্টর 'বাঙাল'রাও মোহন-বাগানে খেলছেন। ওদের অধিনায়ক গোষ্ঠবাবু দুর্ভেদ্য ডিফেন্স, তাই নাম হয়েছিল তাঁর 'চাইনীজ ওয়াল'। এদিকে ইস্টবেঙ্গলের গোলরক্ষক পূর্ণ দাশ খাঁটি 'ঘটি'। তবুও কেন ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে এই দুই ফুটবল

১৯৪২-এ প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ন ইস্ট-বেঙ্গলঃ মাটিতে বসেঃ নীহার মিত্র, আপ্পারাও, অমিতাভ মুখার্জি। চেয়ারে—প্রমোদ দাশগুপ্ত, এস সেন (ফুটবল সম্পাদক), এ সোমানা (অধিনায়ক), জ্যোতিষ গুহ (সহকারী সাধারণ সম্পাদক)' শিশির ঘোষ, জে কে শীল (ট্রেনার) ও গিয়াসুদ্দীন। সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে—পরিতোষ চক্রবর্তী, রাখাল মজুমদার, ফটিক সিংহ, খগেন সেন, এ বসু, রবি দে, অনিল নাগ। পিছনে—সুশীল চ্যাটারজি, জে বসু, সুহাস চ্যাটারজি, নগেন রায় ও এস দত্ত।

দলের খেলাকে 'ঘটি'-'বাঙালে'র লড়াই বলা হত, আজও তা রহস্যই রয়ে গেছে।

এখন আমরা লীগের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বলি যাদের খেলাকে, লীগে তাদের প্রথম সাক্ষাৎ ১৯২৫-এর ২৮ মে। সিনিয়র বা প্রথম ডিভিশন লীগের প্রথম লড়াইয়ে ইস্টবেঙ্গল ১-০ জেতে। লীগে মোহনবাগানের গোলে প্রথম গোলটি প্রবেশ করাবার কৃতিত্ব নেপাল চক্রবর্তীর। ফিরতি লীগে মোহনবাগান ১-০ জিতলেও আগের হারই তাকে লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বঞ্চিত করে। সেবার ক্যালকাটা ২২ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, ২১ পয়েন্ট পেয়ে মোহনবাগান রানার্স আপ এবং ইস্টবেঙ্গল-ক্যামেরনস যুগ্মভাবে তৃতীয় হয় ১৯ পয়েন্ট অর্জন করে।

লীগের এই প্রথম সাক্ষাতে ইস্টবেঙ্গলে ছিলেন : পূর্ণ দাশ; প্রফুল্ল চ্যাটার্জি ও সন্তোষ গাঙ্গুলি; হারাণ সাহা, ননী গোঁসাই ও বিজয়হরি সেন; সূর্য চক্রবর্তী, হেমাঙ্গ বসু, মোনা দত্ত, মনা মল্লিক ও নেপাল চক্রবর্তী। আর মোহনবাগানে ছিলেন : নৃপেন ভাদুড়ী; গোষ্ঠ পাল ও ডাঃ আর দাশ; তারক শূর, বলাইদাস চ্যাটার্জি ও সুধাংশু বসু; এম ঘোষ, রবি গাঙ্গুলি, পল্টু দাশগুপ্ত, উমাপতি কুমার ও ক্ষেত্র বসু। রেফারি সি আর ক্রেটন।

পরের বছর লীগেও ইস্টবেঙ্গল হারাল মোহনবাগানকে ২-১-এ। তবে ফিরতি খেলায় মোহনবাগান ০-০ রাখল। ১৯২৭-এ দুটি খেলাতে কেউই গোল দিতে পারেনি। ১৯২৮-এ মোহনবাগান প্রথম খেলাতেই ২-০ জিতল, পরেরটি ১-১। চার বছর সিনিয়র ডিভিশনের জীবনে প্রথম তিন বছর বিক্রম দেখালেও চতুর্থ মরশুমে ইস্টবেঙ্গল মুষড়ে পড়ল। লীগ শুরুর আগেই চাকরি পেয়ে পূর্ণ দাশ, হারাণ সাহা ও সূর্য চক্রবর্তী চলে যান রেল দলে। ইস্টবেঙ্গল সবচেয়ে কম পয়েন্ট অর্জন করায় নেমে গেল দ্বিতীয় ডিভিশনে।

সূর্যবাবু আবার ফিরে এলেন পুরোন ক্লাব ইস্টবেঙ্গলে। নবোদ্যমে খেলা শুরু করলেন। সেকালের খ্যাতদের কয়েকজনকে নিয়ে এলেন তিনি। হীরা দাশ, সুধাংশু মিত্র, পরেশ মজুমদার প্রমুখের প্রচেষ্টায় ইস্টবেঙ্গল দ্বিতীয় ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ১৯৩২-এ লীগের প্রথম খেলাতেই দুর্ধর্ষ ডালহৌসীকে ৫-০-য় হারিয়ে দিল। হেরে গেল তাদের কাছে একে একে বাঘা বাঘা দল—ক্যালকাটা, মোহনবাগান ও এরিয়ান। ফিরতি খেলাতে প্রচণ্ড লড়াই হল মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলে। ইস্টবেঙ্গলের সূর্যবাবু, রমিজ ও মজিদের ৩ গোলের বদলা নিলেন সামাদ ও করুণা ভট্টাচার্য (৩-২)। ইস্টবেঙ্গল আগের মত শক্তিমান না হলেও দৃঢ় সংকল্প আর একতাই এগিয়ে নিয়ে গেল। পরের

১৯২১ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত মোহন-বাগানের অধিনায়ক ও 'চাইনিজ ওয়াল' গোষ্ঠ পাল।

বছর (১৯৩৩) সূর্য চক্রবর্তীর প্রচেষ্টায় তারা রীতিমত তৈরী হয়েই মাঠে নামল। তবে মোহনবাগানের সঙ্গে দুটি খেলাই হল ড্র। ২-২ ও ১-১। ইস্ট-বেঙ্গল এবার লীগ বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে এনেছিল। ডারহামস ২০টি খেলায় ২৬ পয়েন্ট পেল, ইস্টবেঙ্গলের ১৯টিতে ২৫। কিন্তু লীগের সবচেয়ে কম পয়েন্ট সংগ্রহকারী স্পোর্টিং ইউনিয়নের কাছে অপ্রত্যাশিত পরাজয় ঘটল তাদের। ইস্টবেঙ্গল দলের তৎকালীন খেলোয়াড়রা আজও ওই পরাজয়ের কথা ভুলতে পারেন নি। ১৯৩৪-এ মোহনবাগান গতবারের পরাজয়ের গ্লানি মোচন করল ২-০ ও ১-১ করে। গতবারের রানার্স আপ ইস্টবেঙ্গল এবার অষ্টমে চলে গেল। অথচ দলে তখন নূর মহম্মদ রয়েছেন। নতুন মুখও এসেছে কিছু। এই বছরই স্পোর্টিং ইউনিয়ন থেকে জ্যোতিষ গুহ (পরবর্তীকালে ক্লাবের সম্পাদক) দ্বিতীয় গোলরক্ষক হয়ে আসেন প্রথম গোলরক্ষক মণি তালুকদারকে সহায়তা করতে।

ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগান কেউই তেমন কৃতিত্ব দেখাতে না পারলেও কলকাতায় সেবার বাঙালী তথা ভারতীয়দের মধ্যে ফুটবল ঘিরে কম উল্লাস হয় নি। কেননা, সিনিয়র ডিভিশনে উঠেই মহমেডান স্পোর্টিং লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে তাদের এই সাফল্য কলকাতা চিরকাল স্মরণ করবে।

১৯৩৫-এ 'ঘটি'-'বাঙালে'র দুটি খেলাই ড্র। কিন্তু ১৯৩৬-এ প্রথম ইস্ট-বেঙ্গলের ফরওয়ার্ড লাইন যেভাবে আক্রমণ রচনা করেন তা মোহনবাগানের গোলরক্ষক কে দত্তর পক্ষে ঠেকানো সম্ভব ছিল না। লক্ষ্মীনারায়ণ, মজিদ, কে প্রসাদ ও মুরগেশ চারটি গোলে মোহনবাগানকে পর্যুদস্ত করলেন। ফিরতি খেলা অবশ্য ০-০ হয়েছিল। পরের বছর (১৯৩৭) ইস্টবেঙ্গলকে নিস্তেজ মনে হল। প্রথম খেলায় তারা ১-১ করলেও দ্বিতীয় খেলায় ০-১-এ হেরে গেল। ১৯৩৮-এ তো দুটি খেলাই ১-১।

১৯৩৯ মোহনবাগানের কাছে গৌরবের হলেও কলকাতার ফুটবল সংকটের মুখে এসে দাঁড়াল। মহমেডান স্পোর্টিং, ইস্টবেঙ্গল, কালিঘাট আর এরিয়ান অভিযোগ তুলল আই এফ এ-র বিরুদ্ধে। তাদের বক্তব্য আই এফ এ খেয়াল-খুশি মত ফিকশ্চার তৈরী করেছে, রেফারিং-ও পক্ষপাতদুষ্ট। ওরা হুমকি দিল—"লীগ তালিকার রদ-বদল না হলে আমরা খেলব না।" এরিয়ান পরে মত বদল করলেও বাকি তিনটি ক্লাব একটুও নড়েনি। আই এফ এ কিন্তু ক্লাবগুলির শাসানিতে কারুর কাছে নতি স্বীকার করেনি, নরমও হয়নি। মহমেডান, ইস্টবেঙ্গল ও কালিঘাটের মত তিন পরাক্রমশালীকে সাসপেন্ড করে দিল দুই সিজনের মত। এই তিন দল বেঙ্গল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন নামে নতুন সংগঠন গড়ল। এই ঘটনার আগেই অনেক খেলা শেষ হয়েছিল। মোহন-বাগান-ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে ফিরতি খেলাটি হতে পারেনি। প্রথম খেলায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ইস্টবেঙ্গল ১-২ গোলে হেরে যায়। মোহনবাগানের পক্ষে ৩ জুন গোল দুটি দেন সতু চৌধুরী ও অধিনায়ক বিমল মুখার্জি এবং ইস্ট-বেঙ্গলের পক্ষে নায়ার। তবে মোহনবাগান ভবানীপুরের কাছে ১-২ পরাজিত হয়। মোহনবাগানের চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ওই পরাজয় বাধা ছিল না। সাসপেনশনের জন্য ইস্টবেঙ্গল ও কালিঘাট ফিরতি লীগ খেলেনি মোহন-বাগানের সঙ্গে। তাই ২২টি খেলায় ৩৫ পয়েন্ট পেয়ে মোহনবাগান প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ন হল। সেবার লীগ বিজয়ের কৃতিত্ব যাঁদের : কে (হারাধন) দত্ত; পরিতোষ চক্রবর্তী, অনিল দে, ডাঃ এস দত্ত, এ রায়চৌধুরী, মোহিনী ব্যানার্জি, বেণীপ্রসাদ, বিমল মুখার্জি, প্রেমলাল, এস দেব রায়, জে ঘোষ, বি দে, কে ব্যানার্জি, এস শেঠ, আর সেন, এস দত্ত (ছোট) ও সতু চৌধুরী।

১৯৩৯-এ লীগে মোহনবাগান :-

খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
২২	১৪	৭	১	৩১	৭	৩৫

১৯৪০-এ লীগে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে প্রথম খেলায় মোহনবাগানের ০-১ হার হল ৩০ গজ দূর থেকে লক্ষ্মীনারায়ণের ফ্রি কিক কে দত্ত ধরতে না পারায়। মোহনবাগানের বড় হার হল আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে। কলকাতারই আর একটি দল—এরিয়ানের সঙ্গে তার খেলা। দুর্ধর্ষ মোহনবাগান শুরুতেই ০-১ পিছিয়ে রইল ধীরেন ব্যানার্জির সটে। সেটি ১-১ করলেন মানা গুঁই। ধীরেন ব্যানার্জি আবার বল নিয়ে এগিয়ে ২-১ করলেন। মোহনবাগানের গোলরক্ষক কে দত্ত 'নার্ভাস' হয়ে পড়েছেন। আবার একটি গোল দিলেন ধীরেন ব্যানার্জি। ৩-১ হল। এবার 'ঘটি'-'বাঙাল' নয়, কলকাতার লোকই নিজেদের দুই ক্লাবকে সমর্থন করতে ভাগ হয়ে গেলেন। সারা মাঠে হৈ-হৈ রৈ-রৈ। এরিয়ানের এ

ভৌমিক শেষ গোলটি দিলেন। মোহনবাগানকে ১-৪-এ হারিয়ে এরিয়ান শীল্ড জয় করল। সেদিন মোহনবাগান আশানুরূপ খেলতে পারেনি। গোলরক্ষক কে দত্ত-র খেলাও খুব খারাপ হয়। তবে গুজব রটে, কে দত্ত ঘুষ খেয়েছিলেন। আজও এই গুজবের শেষ হয় নি। বছর তিনেক আগে তাঁকে ওই কথা জিজ্ঞাসা করা হলে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেন। সতীর্থ খেলোয়াড়রাও ঘুষ খাওয়ার ব্যাপারটি নিছক রটনা বলেই মনে করেন।

১৯৪১-এ ইস্টবেঙ্গল আরও শক্তি অর্জন করে মোহনবাগানকে লীগের দুটি খেলাতে ২-০ হারিয়ে দেয়। গত বছর শীল্ড ফাইনালে পরাহত মোহনবাগান স্নায়ুতে ভুগছিল কিনা কে জানে! তবে ইস্টবেঙ্গলকে সাহস জুগিয়েছিলেন মোহনবাগানের কে দত্ত এবং কালিঘাট থেকে আপ্পারাও ও রামালু এসে।

১৯৪২-এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আতঙ্কে বর্মার বিখ্যাত ফরওয়ার্ড ফ্রেড্ পাগসলী হেঁটে চলে আসেন কলকাতায়। ইতিপূর্বে বর্মা সফরকারী ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও ছিল। তাঁকে পেয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে উল্লাস শুরু হল। কয়েকটি খেলার পর প্রমাণ হল : ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণভাগে তাঁর মত আর কেউ নেই। ইস্টবেঙ্গল এবার একটি খেলায় হারল ১-২-এ মহমেডান স্পোর্টিং-এর কাছে। মোহনবাগান হারল 'বাঙাল'দের কাছে ১-২ ও ০-১-এ। অধিনায়ক সোমানা ২৬টি গোল দিয়ে টপ স্কোরার হলেন। ২৪টি খেলায় ৪৩ পয়েন্ট অর্জন করে সিনিয়র ডিভিশনে তারা প্রথম চ্যাম্পিয়ন হল। মহমেডান ৪০ ও মোহনবাগান ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হল। সোমানার নেতৃত্বে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম লীগ বিজয়ী দলে ছিলেন নীহার মিত্র; অমিতাভ মুখার্জি, প্রমোদ দাশগুপ্ত, পরিতোষ চক্রবর্তী, রাখাল মজুমদার অনিল নাগ, নগেন রায়, আমীন, গিয়াসুদ্দীন, খগেন সেন, প্রশান্ত দাশ, শিশির ঘোষ, কৃষ্ণা রাও, আপ্পারাও, সুনীল ঘোষ, সুশীল চ্যাটার্জি, অসীম ব্যানার্জি রবি দে, সন্তোষ দত্ত, ফটিক সিংহ, টবি বসু, পাগসলী ও নজর মহম্মদ।

১৯৪২-এ ইস্টবেঙ্গলের লীগে জয়-পরাজয়

খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
২৪	২০	৩	১	৬৪	৯	৪৩

১৯৪৩-এ চ্যাম্পিয়নশিপ ছিনিয়ে নিল মোহনবাগান। যদিও ইস্টবেঙ্গল লীগের প্রথম খেলায় ১-০ গোলে মোহনবাগানকে হারিয়েছিল, তথাপি ফিরতি খেলায় ইস্টবেঙ্গল হার স্বীকার করে ০-২-এ। তবুও ইস্টবেঙ্গল বিজয়ী হবে ক্রীড়ামোদীদের এই ধারণার যথেষ্ট যুক্তি ছিল। কিন্তু শেষ খেলায় তারা কাস্টমসের কাছে হেরে গেল। ২৪টি খেলায় মোহনবাগানের হল ৩৯ এবং ইস্টবেঙ্গলের ৩৭ পয়েন্ট।

ইস্টবেঙ্গল তবুও দমল না। সামান্যর জন্য লীগ বিজয়ী না হয়ে শীল্ড দখলে মনোনিবেশ করল দ্বিগুণ উৎসাহে। মহাবিক্রমে তারা মহমেডান, বি এ্যান্ড এ রেল-কে হারিয়ে ফাইনালে উঠল। অন্যদিকে মোহনবাগান সেমি-ফাইনালে হারে পুলিশের কাছে। ফাইনালে ওই পুলিশ ০-৩ গোলে শোচনীয় ভাবে ইস্টবেঙ্গলের কাছে পরাজিত হল।

১৯৪২-এ লীগ এবং পরের বছর প্রথম শীল্ড ঘরে তুলে ইস্টবেঙ্গল কলকাতাবাসী পূর্ববঙ্গীয়দের কাছে আরও জনপ্রিয় হল। রাখাল মজুমদারের নেতৃত্বে গোল তিনটি দেন আপ্পারাও, ফটিক সিংহ ও সোমানা। ফাইনালে খেলেন ডি সেন; রাখাল মজুমদার ও পরিতোষ চক্রবর্তী; অজিত নন্দী, আরোকিরাজ ও নগেন রায়; ফটিক সিংহ, আপ্পারাও, সোমানা, সুনীল ঘোষ ও সুশীল চ্যাটার্জি। রেফারি—কালু মিশ্র।

১৯৪৪-এ মোহনবাগান লীগের দুটি খেলাতেই (১-০, ২-১) ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে দেয়। কিন্তু পরাজিত হল এরিয়ানের কাছে। সমান খেলে তখন মহমেডান এগিয়ে এক পয়েন্টে। বাকি শুধু মোহনবাগান-মহমেডান স্পোর্টিং-এর খেলা। ফ্রি কিক থেকে জয়সূচক গোলটি দেওয়ার পর শৈলেন মান্নাকে ঘিরে সেদিন যে হুল্লোড় হয়েছিল, আজও তা যেন গল্প কথা। বলা বাহুল্য, "ফ্রি কিক মানেই শৈলেন মান্না"—এই পরিচিতি হল তাঁর।

কয়েক সপ্তাহ পরে সেই সর্বপ্রথম আই এফ এ শীল্ডে প্রথম দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মুখোমুখি হল। সেমি-ফাইনালের দিন ইস্টবেঙ্গল দলে দেখা গেল না সোমানা ও পাগসলীকে। অনুপস্থিত অধিনায়ক সুশীল ঘোষও। কিন্তু সেদিন ইস্টবেঙ্গলই শুরু থেকে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে এবং ১-০ বিজয়ী হয়। অবশ্য ফাইনালে বি এ্যান্ড এ রেল জিতল।

১৯৪৫-এ কলকাতায় লীগ-শীল্ড ঘিরে আরও উত্তেজনা, আরও উৎসাহ।

১৯১১-য় আই-এফ-এ শীলডবিজয়ী মোহনবাগান অধিনায়ক শিবদাস ভাদুড়ী।

চুয়াল্লিশের শোধ তো বটেই, আরও নতুন কিছু করা যায় কিনা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্মকর্তা ও খেলোয়াড়দের একমাত্র ভাবনা যেন তাই-ই।

লীগে সূচনাও শুভ হল ইস্টবেঙ্গলের। ইস্টার্ন কম্যান্ড সিগন্যালসকে হারাল ৬-০-য়। তারপর রেঞ্জার্সকে ৬-১, ডালহৌসীকে ৫-০-য় এবং গতবারের শীল্ড বিজয়ী বি এ্যান্ড এ আর-কে ১-০-য়। ক্যালকাটাও হারল ০-২-এ। কলকাতার ফুটবল সম্ভবত সে যুগেও এখনকার মত অনিশ্চিত ছিল। এখন যেমন 'ছোট' দলগুলি মাঝে-মধ্যে চমক দেখায় মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে, তেমনি দেখা যেত পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেও। অবশ্য ভবানীপুর তো তখন রীতিমত ভাল দল। তবুও ১৯৪৫-এ ইস্টবেঙ্গলের কুসুমাস্তীর্ণ পথে কাঁটা হয়ে দেখা দিল ভবানীপুর, ১-০ গোলে তারা হারাল ইস্টবেঙ্গলকে। বলা বাহুল্য, এই মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের এটিই একমাত্র পরাজয়।

ইস্টবেঙ্গলের পরের খেলা ছিল মোহনবাগানের সঙ্গে। আই এফ এ কর্তৃপক্ষ চ্যারিটি ম্যাচ ঘোষণা করায় খেলার গুরুত্ব আরও বেড়ে গেল। মোহনবাগান ৯ জুন ইস্টবেঙ্গলের কাছে কোণঠাসা হয়ে পড়ে, ০-২ গোলে মোহনবাগানের পরাজয় ঘটল। ফিরতি লীগে ইস্টবেঙ্গল মাত্র দুটি ড্র করে, বাকিগুলিতে পুরো পয়েন্ট। ওদিকে মোহনবাগানও বসে নেই। ২২টি খেলা শেষে উভয়ের ঝুলিতে সমান পয়েন্ট ৩৬। এর পর মোহনবাগান ড্র করল মহমেডানের সঙ্গে, আর ইস্টবেঙ্গল জিতল ভবানীপুরের বিরুদ্ধে (২-০)। অর্থাৎ ইস্টবেঙ্গল এক পয়েন্টে এগিয়ে গেল। এই অবস্থায় ফিরতি লীগে দুই দলে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল। কিন্তু কেউই গোল দিতে পারেনি। এক পয়েন্টের ব্যবধানে ইস্টবেঙ্গল লীগ চ্যাম্পিয়ন হল। ২৪টি খেলা শেষে লীগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ৩৯ ও রানার্স আপ মোহনবাগান ৩৮ পয়েন্ট অর্জন করে।

লীগ ও শীল্ডের খেলা। তখনও এখনকার মত পর পরই হত। তাই দেড় মাসের মধ্যে আবার মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সাক্ষাৎ। এবার আর শীল্ডের সেমি-ফাইনালে নয়, একেবারে ফাইনালে। লীগে দুই দলের মধ্যেকার খেলার ফল চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণয় করেছিল। তাই শীল্ড ঘিরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়ল।

৯ আগস্ট ক্যালকাটা মাঠে তিলধারণের জায়গা নেই। টিকিট বিক্রির আগের সব রেকর্ড ম্লান হল। আই এফ এ কর্তৃপক্ষ হিসাব করে বললেন, মোট সাড়ে চুয়াল্লিশ হাজার টাকা পাওয়া গেছে।

জাতীয় সপ্তাহ উপলক্ষে সকলে দুই মিনিট মৌন হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর রেফারির হুইশ্‌ল বাজল। মোহনবাগান সমর্থকরা উল্লাসে ফেটে পড়েছেন—

১৯৪৩-এ ইস্টবেঙ্গলের যারা প্রথম শীলড জিতেছিলেন: বসে—ফটিক সিংহ, সুনীল ঘোষ, পরিতোষ চক্রবর্তী ও নগেন রায়; দাঁড়িয়ে—প্রথম সারি—আরোকিরাজ, সোমানা, রাখাল মজুমদার, জি দাস (ফুটবল সম্পাদক), আপ্পারাও, প্রমোদ দাশগুপ্ত ও সুশীল চ্যাটার্জি। পিছনে—এ মুখার্জি, অজিত নন্দী, এস তালুকদার ও ডি সেন।

প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গল দলের গোলরক্ষক কে দত্ত, ব্যাকে প্রমোদ দাশগুপ্ত নামেন নি দেখে। দেখা গেল না রাখাল মজুমদারকেও। ইস্টবেঙ্গল শিবিরে যেন জাতীয় সপ্তাহের মৌনতা। কিন্তু কিক্ অফের পর থেকেই ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়রা বারংবার হানা দিতে থাকল মোহনবাগানের দিকে। মোহনবাগানও আক্রমণ রচনা করতে থাকে। প্রতিপক্ষের ব্যাক পরিতোষ চক্রবর্তী সেদিন ছিলেন দুর্ভেদ্য। সেদিন তিনি যেন আর একজন গোষ্ঠ পাল। সবচেয়ে আনন্দ দেয় কাইজারের খেলা। আর আপ্পারাও সারা মাঠ ঘুরে আক্রমণ ও রক্ষণ-ভাগকে সমানে সাহায্য করেন।

মোহনবাগানের গোলে ডি সেন সেদিন অপূর্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর ক্ষিপ্রতা মোহনবাগানকে একাধিক গোলে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

মোহনবাগান টসে জিতেছিল বটে, তবে ভাগ্যলক্ষ্মী ছিল ইস্টবেঙ্গলের দিকেই। তা না হলে বিরতির পরে ১৬ মিনিটের সময় ইস্টবেঙ্গলের সুশীল ঘোষের দুর্বল সট মোহনবাগানের এস দাশের গায়ে লেগে পাগসলীর পায়ে গিয়ে পড়বে কেন? পাগসলী সজোরে নিচু সট করলে পোস্ট ঘেঁষে বল গোলে ঢোকে ও ১-০ হয়।

ইস্টবেঙ্গলের জয়ের পর ক্যালকাটা মাঠে অভূতপূর্ব দৃশ্য শুধু নয়, সারা কলকাতা 'বন্দেমাতরম্'-এ মুখর হয়ে উঠল। মাঠে এখন দেখা যায় ইস্ট-বেঙ্গল বা মোহনবাগানের পতাকা, তখন কিন্তু পতাকা ছিল একটি। সেটি তিন-রঙা ঝাণ্ডা জাতীয় পতাকা। ইস্টবেঙ্গল এই প্রথম 'ডাবলস' পেল।

ফাইনালে দুটি দলে যাঁরা খেলেছিলেন

ইস্টবেঙ্গল—অমিতাভ মুখার্জি; পরিতোষ চক্রবর্তী (অধিনায়ক) ও এন গুহ; ডি চন্দ, কাইজার ও মহাবীর; টিটুকর, আপ্পারাও, পাগসলী, সুনীল ঘোষ ও নায়ার।

মোহনবাগান—ডি সেন; শরৎ দাশ ও শৈলেন মান্না; অনিল দে (অধিনায়ক), টি আও ও দীপেন সেন; নির্মল চ্যাটার্জি, বুচি বিজয় বসু, নিমু বসু ও নির্মল মুখার্জি। রেফারি—সারজেন্ট ম্যাকব্রাইড।

১৯৪৬-এর লীগ খেলা আরও আকর্ষণীয় হল। গতবারের লীগ ও শীল্ডে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে নি মোহনবাগান, তাই এবার ক্লাব কর্তৃপক্ষ আরও নজর দিলেন শ্রেষ্ঠত্ব ছিনিয়ে আনার দিকে। কর্তৃপক্ষের ওই চেষ্টা কিছুটা সফল হয়েছিল। লীগে মোহনবাগান একটি খেলায়ও হারে নি। বরং প্রথম লীগে ইস্টবেঙ্গল ০-১ হারে মহমেডান স্পোর্টিং-এর

১৯৭০-এ লীগ (অপরাজিত), শীলড ও ডুরানড বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল। বসে—অজয় শ্রীমানি, নরেশ রায়, জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত, এ এন সেন, এস কে বিশ্বাস, ডাঃ নৃপেন দাশ, শান্ত মিত্র (অধিনায়ক), নিশীথ ঘোষ, সুনীল ভট্টাচার্য (সহঃ অধিনায়ক), মহম্মদ হোসেন (কোচ) ও অমল ভট্টাচার্য। মাঝের সারি—নব, সন্তোষ, প্রশান্ত সিংহ, পরিমল দে, কাজল মুখারজি, কানাই সরকার, পিটার থঙ্গরাজ, বি হালদার, অশোক চ্যাটারজি, শ্যাম থাপা ও নায়িম। পিছনে—হাবিব, আর দত্ত, কালন গুহ, স্বপন সেনগুপ্ত, শংকর ব্যানারজি, কে বি শরমা, সুধীর কর্মকার, এস দাশ, অসীম বসু ও সমরেশ চৌধুরী।

কাছে। কিন্তু মোহনবাগানের ড্র-এর সংখ্যা বেশি হওয়ায় পয়েণ্ট হারাতে হয়। ড্র হয়েছিল মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা দুটিও (১-১ ও ০-০)। প্রথম খেলায় মোহনবাগানের মেওয়ালাল গোল দিলে তা শোধ করেন সালে।

এবার লীগ শেষে দুই দল

ইস্টবেঙ্গল—

খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
২৪	২০	৩	১	৬৫	১১	৪৩

মোহনবাগান—

খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
২৪	১৮	৬	০	৫৬	৭	৪২

নায়ার এই মরশুমে লীগে মাত্র ১৭টি খেলায় নেমে সর্বোচ্চ গোলদাতা হন তিনটি হ্যাটট্রিকসহ ৩৫টি গোল দিয়ে।

স্বাধীনতার আগে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানে সাক্ষাৎ আর হয়নি। শীল্ড খেলা মাঝ-পথে বন্ধ হয়ে গেল দাঙ্গার জন্য। হল না ১৯৪৭-এ লীগের খেলাও। মনে রাখার মত কথা—কলকাতায় তখন ভুল রেফারিং-এর জন্য গণ্ডগোল হত না। কোনো দল (বড়-ছোট যারাই হোক) হারলে খেলোয়াড়রা অসন্তোষ প্রকাশ করতেন না, দর্শকরাও ইট-পাটকেল ছুঁড়তেন না। অশান্তি ঘটাতেন না এখনকার মত। অবশ্য আজকালকার মত গড়াপেটা যে হত না, তা নয়। জনৈক রেফারি তো একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলায় একটি 'বড়' দল সম্পর্কে বলেন খেলা শুরুর আগে—"আমার হাতে বাঁশি, টিম তো জিতবেই।" সেদিন ০-০ ফল ছিল সমাপ্তির কয়েক মিনিট আগেও। কিন্তু তাঁর প্রিয় দল ১-০ জিতেছিল প্রায় শেষ মুহূর্তে পেনাল্টিতে। রেফারির ইচ্ছায় ওই পেনাল্টি কিক্-ও হয়েছিল একাধিকবার। খেলোয়াড়, দর্শক সকলেই জানতেন রেফারি ইচ্ছাকৃত পেনালটির নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তা নিয়ে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা প্রতিবাদ করেন নি, দর্শকরা অশান্ত হন নি।

১৫ আগস্ট স্বাধীনতার পরে সব কিছুর সঙ্গে খেলার মাঠেও শান্তি ফিরে এল। আই এফ এ কর্তৃপক্ষ তাই শীল্ডের খেলা শুরু করলেন। এবারও ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান।। কিন্তু দর্শকদের প্রবল চাপে ক্যালকাটা মাঠের বেড়া ভেঙে যাওয়ায় অক্টোবরে ফাইনাল খেলা হল না। আই এফ এ দেড় মাস পরে খেলার দিন ফেললেন—১৫ নবেম্বরে। ইতিমধ্যে ইস্টবেঙ্গলের পাগসলী বর্মায় চলে গিয়েছেন, আপ্পারাও স্বরাজ্যে। ১৫ নবেম্বর তাদের মাঠে দেখা গেল না। ইস্টবেঙ্গল স্বভাবতই দুর্বল দল নিয়ে নামল। বিরক্তিকর খেলায় সেণ্টার ফরওয়ার্ড সেলিম একটি মাত্র সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন এবং ৩৬ বছর পর মোহনবাগান আবার শীল্ড ঘরে তুলল। শুধু তাই নয়, ১৯৪৫-এ ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের কাছে ০-১ হেরেছিল, এবার তার শোধও নিল।

দুই দলে খেললেন

মোহনবাগান—ডি সেন; শরৎ দাশ (অধিনায়ক) ও শৈলেন মান্না; অনিল দে, টি আও ও মহাবীর প্রসাদ; ডি রায়, বিজন বসু, সেলিম, নায়ার ও এ দাশগুপ্ত।

ইস্টবেঙ্গল—পি মুস্তাফী; রাখাল মজুমদার ও পরিতোষ চক্রবর্তী; ডি চন্দ, কাইজার ও নগেন রায় (অধিনায়ক); সুশান্ত মুখার্জি, এস ভট্টাচার্য, বি দাশগুপ্ত, এস ঘোষ ও পি বি এ সালে। রেফারি—সুশীল ঘোষ।

১৯৪৮-এ খেলোয়াড়দের দল-বদলে ইস্টবেঙ্গল কাবু হয়ে গেল। মহমেডান স্পোর্টিং-এর দাপটে মোহনবাগানের লীগ জয়ের আশা বিলীন হয়। কিন্তু মোহনবাগান প্রথম লীগে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ১-১ করলেও ফিরতি লীগে ৩-০ গোলে পর্যুদস্ত করল ইস্টবেঙ্গলকে। ভারত বিভাগের পর কলকাতায় 'ঘটি'-'বাঙাল'-এর পার্থক্য ও দ্বন্দ্ব তখন চরমে। মোহনবাগানের এই জয় কলকাতার পুরোন বাসিন্দাদের ভীষণভাবে উৎসাহিত করল। মোহনবাগান শীল্ড ফাইনালে উঠল। সেমি-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল বিদায় নেয় ১-০ গোলে ভবানীপুরের কাছে হেরে। ভবানীপুর ফাইনালে মোহনবাগানকেও ২-১ গোলে হারিয়ে দেয়।

১৯৪৯-এ ইস্টবেঙ্গল শক্তিশালী দল গড়ার দিকে মনোনিবেশ করে। লণ্ডন ওলিম্পিকস থেকে ফিরে তাজ মহম্মদ, আমেদ খাঁ ও ধনরাজ ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে সই করলেন। মহমেডান স্পোর্টিং থেকে দল বদলে এলেন আবিদ, জলপাইগুড়ি থেকে পাওয়া গেল গোলরক্ষক মণিলাল ঘটককে। লীগে পর পর জিতল ইস্ট-বেঙ্গল। নবম খেলায় মোহনবাগানের সঙ্গে নায়ারের পেনাল্টিতে তারা ১-০ হারল। ফিরতি লীগে ২-১ গোলে আবার হারল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু লীগ

১৯৭২-এ ইস্টবেঙ্গলের লীগ, আই এফ এ শীল্ড, রোভারস ও ডুরানড বিজয়ের নেপথ্য নায়ক কোচ—প্রদীপ ব্যানারজি।

বিজয়ী হল ইস্টবেঙ্গল। ২৬টি খেলায় তাদের ৪৫, মহমেডান স্পোর্টিং-এর ৩৮ ও মোহনবাগানের ৩৬ পয়েন্ট হয়।

শীল্ড ফাইনালে আবার সম্মুখ সমর। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—"আমরা লীগের দুটি খেলাতেই হেরেছি, শীল্ডও হাতছাড়া হবে।"

কিন্তু খেলার শুরু থেকে আঘাতের পর আঘাত হেনে ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়রা মোহনবাগানের ধারালো অস্ত্রগুলি যেন ভোঁতা করে দিল। আর বিরতির আগেই ভেঙ্কটেশ ও আমেদের গোলে ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে রইল। শেষও হল ওই ২-০-তে। শীল্ডের পর তারা গেল বোম্বাইয়ে রোভার্সে খেলতে। ফাইনালে কলকাতার ইস্টার্ন রেলকে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল সর্বপ্রথম বড় তিনটি টুরনামেন্ট জিতল। আর এজন্য সর্বাধিক কৃতিত্ব ব্যাক তাজ মহম্মদের।

শীল্ড ও রোভার্সে ইস্টবেঙ্গল দলে ছিলেন গোল—মণিলাল ঘটক ও ফ্যানসি মুখার্জি। ব্যাকে—ব্যোমকেশ বসু ও তাজ মহম্মদ। হাফে—ডি চন্দ, কাইজার, খগেন সেন ও লতিফ; ফরওয়ারডে—ভেঙ্কটেশ, আপ্পারাও, আবিদ, ধনরাজ, আমেদ ও সালে।

পরের বছর (১৯৫০) ইস্টবেঙ্গল হল লীগে অপরাজেয় চ্যাম্পিয়ন। শীল্ডও ঘরে তোলে। এবার লীগের প্রথম পর্যায়ের শেষ খেলায় ভেঙ্কটেশের একমাত্র গোলে ইস্টবেঙ্গল জিতল। ফিরতি লীগে হল ২-২। ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক সালে দেন দুটি গোল, মোহনবাগানের রুনু গুহঠাকুরতা ও সত্তার তা শোধ করেন। শীল্ডের সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান ১-২ গোলে হারে সারভিসেসের কাছে। কিন্তু সারভিসেস ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের কাছে পরাজিত হয় ৩-০।

১৯৫১-র লীগে শুরু থেকেই মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল যথারীতি শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখে। কিন্তু দুই প্রধানের প্রথম সাক্ষাতে মোহনবাগানের সংঘবদ্ধ আক্রমণে ইস্টবেঙ্গল বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, আর তার পুরোভাগে ছিলেন সাত্তার। কিন্তু গোল তিনটি দিলেন রুনু গুহঠাকুরতা, এ দাশগুপ্ত ও বশির। ফিরতি লীগে মোহনবাগান কোণঠাসা হয়ে ইস্টবেঙ্গলের কাছে ২-০ হারে প্যাট্রিক ও ভেঙ্কটেশের গোলে। কিন্তু পাঁচ বছর পরে আবার মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হল ইস্টবেঙ্গলকে ৪ পয়েন্টে পিছনে রেখে। শীল্ড ফাইনালে ইস্ট-বেঙ্গল ২-০ জিতল। অবশ্য প্রথম দিন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ০-০ ছিল। ইস্টবেঙ্গল এই নিয়ে উপর্যুপরি তিন বার শীল্ড পেল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় দল হিসাবে রেকর্ড করে মোট পাঁচবার শীল্ড জিতে।

১৯৫২-য় ইস্টবেঙ্গল লীগ ছিনিয়ে নিল মোহনবাগানের কাছ থেকে। দুটি খেলাতেই তারা জিতল ১-০ ও ১-০। মোহনবাগান রানার্স আপও হতে পারেনি। তারা চলে গেল অষ্টমে। আবার আই এফ এ শীল্ডে ইস্টবেঙ্গল কোয়ার্টার ফাইনালেই বিদায় নেয়। মোহনবাগান ফাইনালে উঠলেও শীল্ডের ভাগ্য নির্ধারণের খেলা এবার হয় নি। লীগের খেলা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল ১৯৫৩-য়। দুই প্রধানের যে খেলাটি হল, তাতে ইস্টবেঙ্গল ১-০ হারায় মোহন-বাগানকে। ইস্টবেঙ্গল শীল্ডের ফাইনালে উঠলেও মোহনবাগানের দেখা পায়নি তারা, মোহনবাগান আগেই বিদায় নেওয়ায়। তবে এবার প্রথম মোহনবাগান ডুরান্ড জেতে।

১৯৫৪-য় মোহনবাগানের জয়-জয়কার; চুনী গোস্বামীকেও দেখা গেল মোহনবাগানে। এই প্রথম লীগ ও শীল্ড বিজয়ী হয়ে 'ডাবলস' পেল তারা। লীগের প্রথম খেলায় অনায়াসে ৩-১-এ হারাল ইস্টবেঙ্গলকে। কিন্তু আমেদ খাঁর নেতৃত্বে ফিরতি লীগে তারা মাঠেই এল না। দেখা গেল না আই এফ এ শীল্ডেও। ইস্টবেঙ্গলের দীর্ঘকালীন ফুটবল ইতিহাসে এমন ঘটনা এই প্রথম। পরের বছর (১৯৫৫) মোহনবাগান লীগে ঐতিহ্য বজায় রাখে চ্যাম্পিয়ন হয়ে এবং ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ১-১ ও ২-০ জিতে। কিন্তু শীল্ড ফাইনাল নিয়ে এবার আর 'ঘটি'-'বাঙাল' দ্বন্দ্ব হল না, উভয়ে সেমি-ফাইনালে বিদায় নেওয়ায়। মোহনবাগান অবশ্য সমর্থকদের নৈরাশ্যের অবসান ঘটায় সর্বপ্রথম রোভার্স জিতে। রোভার্সের জয়ের রেশ ১৯৫৬-য় লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের মালা পরিয়ে দিল তাদের। এই মরশুমে লীগ ছাড়া আর কোনো টুর্নামেন্টে ইস্ট-বেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলার সুযোগ হয়নি। লীগের প্রথম খেলায় ইস্ট-বেঙ্গলকে অনায়াসে ২-০ হারিয়ে দেয়। ফিরতি খেলাটি ড্র। পরবর্তী লীগ (১৯৫৭) মরশুমের আগে আন্তঃরাজ্য ছাড়পত্র নিয়ে হায়দরাবাদের রাইট-ইন নারায়ণ ও লেফট-ইন তুলসীদাস বলরাম ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করলেন এবং মোহনবাগানের সঙ্গে দুটি খেলাতেই নারায়ণের গোলে ইস্ট-বেঙ্গল ১-০ ও ১-০ বিজয়ী হল। এর পর এই মরশুমেই উভয়ের সাক্ষাৎ হল দিল্লিতে ডুরান্ড সেমি-ফাইনালে। ডুরান্ডে কলকাতার এই দুই দল এর আগে—

মোহনবাগানের অধিনায়ক চুনী গোস্বামীর নেতৃত্বে ভারত আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে শেষ সোনা জেতে ১৯৬২-তে জাকারতা এশিয়ান গেমস ।

কখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়নি। ২৮ ডিসেম্বর মোহনবাগান দর্শনীয় ফুটবল খেলল। তাদের গোল দেওয়ার সব চেষ্টা ব্যর্থ করলেন ইস্টবেঙ্গলের গোলরক্ষক সনৎ শেঠ। ০-০ থাকায় খেলা পড়ল একদিন পরে ৩০ ডিসেম্বর। উভয় দল আবার সমানে লড়ে চলেছে। ইস্টবেঙ্গলের মুসা প্রথমে গোল দিলেন। বিরতির আগে ১-১ করলেন চুনী গোস্বামী। বিরতির পরে মোহনবাগান ২-১ এগিয়ে গেল এন মুখার্জির গোলে। কিছুক্ষণ পরে ইস্টবেঙ্গলের বাল-সুব্রহ্মনিয়ম ২-২ করলেন। সমাপ্তি-বাঁশির একটু আগে মুসা ৩-২ এগিয়ে নিলেন।

কিন্তু ১৯৫৮-র লীগে দুটি খেলার একটিতেও মোহনবাগানের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল যুঝতে পারল না। প্রথমটিতে হারল ১-০, দ্বিতীয়টিতে ২-১। তবে লীগ নেয় ইস্টার্ন রেল। শীল্ড মোহনবাগানের হাতের মুঠোয় এসেও দূরে সরে যায় কামপাইয়ার ভুলে। সমর ব্যানার্জি ১-০ এগিয়ে নিলেও কামপাইয়া আত্মঘাতী গোল করলেন। ফল ১-১। খেলা পড়ল তিন মাস পরে ২৯ জানুয়ারী (১৯৫৯)। নারায়ণের একমাত্র গোলে শীল্ডের নিষ্পত্তি হল এবং ট্রফি চলে গেল ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে। পরের মরশুমে লীগের প্রথম খেলায় মোহনবাগান ২-০ জিতলেও, ফিরতি খেলায় ০-১ হেরে যায়। কিন্তু তারা লীগ বিজয়ী হল ইস্টবেঙ্গলকে ২ পয়েন্ট পিছনে ফেলে। উভয়ে শীল্ড ফাইনালেও উঠেছিল, তবে সে খেলা হয়নি। ১৯৬০-এর লীগে আবার পিছনে পড়ল ইস্টবেঙ্গল। তারা চলে গেল তৃতীয় স্থানে। মোহনবাগানের সঙ্গে ০-০ ও ২-০ করেই খোয়ায় তিনটি পয়েন্ট। মোহনবাগান ৪৯ ও মহমেডান স্পোর্টিং ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে যথাক্রমে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ হয়। শীল্ড পেয়ে মোহনবাগান আবার 'দ্বিমুকুট' বিজয়ী আখ্যা পেল। শীল্ডে দুই প্রধানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি, কিন্তু নবেম্বরে বোম্বাইয়ের কুপারেজ ময়দানে রোভার্স সেমি-ফাইনালে দুই দলের দেখা হল। ইস্টবেঙ্গল ২-১-এ বিজয়ী-ই হয়নি শুধু, দেখাল কলকাতা, দিল্লি ও বোম্বাইয়ে উভয়ের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎকারে জয়ের কৃতিত্ব তাদেরই। ডুরান্ড ফাইনালে কলকাতার এই দুই দলের খেলা প্রথম দিন ১-১ ও দ্বিতীয় দিন ০-০ হওয়ায় যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

১৯৭০-এর শীলড ফাইনালে ইরানের পাস ক্লাবের বিরুদ্ধে জয়সূচক গোলটি দেন ইস্টবেঙ্গলের পরিমল দে।

আট বছর পর ১৯৬১-তে লীগে ইস্টবেঙ্গলের আবার প্রাধান্য দেখা গেল। পুলিশের বিরুদ্ধে গোল দিয়ে জয়ের সূচনা করেন অধিনায়ক বলরাম। মোহন-বাগানও দুটি খেলাতেই ওই বলরামের গোলেই ১-০ ও ১-০ হারল। বলরাম হলেন এবার লীগে সর্বোচ্চ (২৪) গোলদাতা। ইস্টবেঙ্গল ২৮টি খেলায় ৪৭, বি এন আর ৪১ ও মোহনবাগান ৩৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হল। শীল্ডের ফাইনালে আবার মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু দুদিন-ই খেলা ড্র হল। তারপর যুগ্ম-বিজয়ী হল ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। আই এফ এ শীল্ডে এ ধরনের ঘোষণা এই প্রথম। এতদিন শীল্ড জিতে এসেছিল সকলে এককভাবে।

১৯৬২-তে কে লীগ জয় করবে, তা নিয়ে কৌতূহলের শেষ ছিল না। প্রথম খেলায় ইস্টবেঙ্গলের এস নন্দীর গোলে মোহনবাগান শুধু হারেনি, পরাজিত হয় উয়াড়ি ও জর্জ-টেলিগ্রাফের কাছেও। ফিরতি লীগে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ০-০, মোহনবাগান এবারও জর্জ-এর কাছে হারল (১-২)। ইস্ট-বেঙ্গল গোটা লীগে দুটি হারলেও ১২টি ড্র করায় ২৮টি খেলায় উভয়ের পয়েন্ট ২৮ হল। আই এফ এ ঘোষণা করল মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল আবার খেলা হবে। মোহনবাগান সেদিন ইস্টবেঙ্গলের অস্তিত্ব বুঝতে দেয়নি। ২-০ জিতে দশম বার লীগ জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করল। খেলা শেষে ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকদের মুখে শোনা গেল "এবার বদলা নিমু শীল্ডে।" ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে কর্মকর্তারা বললেন খেলোয়াড়দের সান্ত্বনা দিয়ে—"দুঃখ করবার কিছু নাই। শীল্ড চাই।" কিন্তু শীল্ড চলে গেল মোহনবাগানের তাঁবুতে, ইস্টবেঙ্গল সেমি-ফাইনালে হায়দরাবাদের কাছে ০-১-এ হেরে যায়। তবে রোভার্স জিতে-ছিল অন্ধ্র পুলিশের সঙ্গে যুগ্মভাবে।

পরের মরশুমেও (১৯৬৩) লীগে মোহনবাগানের শুরু ভাল হল। দশম খেলায় চুনী, জারনেল আর সুনীল নন্দীর গোলে হারল ইস্টবেঙ্গল, তবে ফিরতি খেলায় ইস্টবেঙ্গলকে দমিয়ে রাখতে পারল না। এবার মোহনবাগান আক্রান্ত এবং নূর ও অসীম মৌলিকের গোলে মোহনবাগান পরাজিত হল। ২৮টি খেলায় মোহনবাগানের জয় ২১, ড্র ৫ ও পরাজয় ২; ইস্টবেঙ্গলের ২১-৪-৩। অর্থাৎ এক পয়েন্ট ব্যবধানে (৪৭-৪৬) মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হল। শীল্ডে এরা মুখোমুখি হল না, উভয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায় নেওয়ায়। মোহন-বাগান ডুরান্ড কলকাতায় এনে কিছুটা সুনাম ফিরিয়ে আনে।

চৌষট্টিতে মোহনবাগান সাড়ম্বরে ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী তথা প্ল্যাটিনাম জুবিলীর আয়োজন করে ক্ষান্ত রইল না। বিভিন্ন খেলায় সাফল্যের দিকেও গুরুত্ব দিল। লীগের কোনো খেলাতেই তারা হারেনি। ইস্টবেঙ্গল অবশ্য প্রথম খেলায় আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল গোল দিতে। মোহনবাগানের দুর্ভেদ্য রক্ষণব্যূহ ভেদ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বরং ফিরতি লীগে অশোক চ্যাটার্জি, চুনী গোস্বামী ও অরুময়ের গোলে ওরা হেরে গেল। ইস্টবেঙ্গল একটি গোল শোধ করে শম্ভুদাস চৌধুরীকে দিয়ে (৩-১)। এবারও লীগ টেবলে ইস্টবেঙ্গল এক পয়েন্টে (৪৭-৪৬) পিছিয়ে রইল। কিন্তু গতবারের শীল্ড বিজয়ী বি এন আর-কে সেমি-ফাইনালে হারিয়ে ওরা শীল্ড ফাইনালে উঠল, বিপরীত দিকে সেমি-ফাইনালে মোহনবাগানের কাছে হারে আর এক রেল (ইস্টার্ন)। ২৩ সেপ্টেম্বর ফাইনালে দুই পরাক্রমশালীর খেলা ১-১ হল। প্রথম গোলের কৃতিত্ব ইস্টবেঙ্গলের অসীম মৌলিকের। খেলা শেষের তিন মিনিট আগে পেনালটি থেকে জারনেল সিং ১-১ করেন। এই পেনালটিতে ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকরা শুধু নয়, খেলোয়াড় ও কর্মকর্তারাও প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। আই এফ এ-এর কাছে প্রতিবাদ চিঠিও দেওয়া হয়। সমর্থকদের পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠে—"প্ল্যাটিনাম জয়ন্তীতে মোহনবাগানের রেকর্ড করাবার জন্য আই এফ এ গড়াপেটা করছে, আর তাতে রেফারিও অংশ নিয়েছেন।" আই এফ এ রি-প্লের চেষ্টা করল, কিন্তু খেলা আর হল না।

বিপরীত শিবিরের সমর্থকরাও পাল্টা জবাব দিলেন, "মোহনবাগান খেলে জেতে, অন্য কারুর সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।" মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা রাজধানীতে ডুরান্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে ২-০-য় হারিয়ে সমর্থকদের মর্যাদা রক্ষা করলেন। ১৯৬৫-তে মোহনবাগান আবার ইস্টবেঙ্গলকে পিছনে ফেলল। আবার তারা অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ন। উপর্যুপরি দুবার অপরাজিত থেকে লীগ জিতে তারা রেকর্ড করল। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের দুটি খেলাই ০-০, ০-০ হল। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল এবার রানার্স আপ হলেও চার পয়েন্ট পিছনে রইল (৪২-৪৬)। এরা আবার লড়াইয়ে নামল শীল্ড ফাইনালে। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল খেলা প্রতিবারই দেখা যায়, কিন্তু পঁয়ষট্টির ২২ সেপ্টেম্বরের মত এমন উঁচুমানের খেলা কলকাতা সম্ভবত বহুদিন দেখে নি। সত্যিই এরা এদিন দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মতই খেলেছিল। এমন খেলা হচ্ছিল যে গ্যালারিতে ও রেডিও-র সামনে উভয় দলের সমর্থকরা প্রতিটি মুহূর্ত কাটালেন গভীর উৎকণ্ঠায়। আরও উৎকণ্ঠায় ভাবিয়ে তোলার জন্য খেলা শেষ হল ০-০। তিন সপ্তাহ পর রি-প্লেতে অসীম মৌলিকের একমাত্র গোলে ইস্ট-বেঙ্গল অষ্টম বার শীল্ড জিতল। ডুরাণ্ডে দুই দলের সাক্ষাৎ হয়নি কোয়ার্টার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল হেরে যাওয়ায়। কিন্তু মোহনবাগানের ডুরান্ড জয়ের সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ড স্থাপিত হল। তাদের আগে আর কোনো ভারতীয় দল উপর্যুপরি তিনবার ডুরান্ড পায়নি। মোহনবাগানের আগে পর পর তিনবার ডুরান্ড নিয়ে-ছিল হাইল্যান্ড লাইট ইনফ্যানট্রি বা এইচ এল আই। (১৮৯৩, ১৮৯৪ ও ১৮৯৫) ও ব্ল্যাকওয়াচ (১৮৯৭, ১৮৯৮ ও ১৮৯৯)।

ভারতের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার অরুণ ঘোষ—এখন মোহনবাগানের কোচ।

ছেষট্টিতে আবহাওয়া ঘুরে গেল। ভাগ্যলক্ষ্মী এবার ইস্টবেঙ্গলের দিকে। লীগের প্রথম খেলায় মোহনবাগানের সঙ্গে ১-১ হলেও, ফিরতি খেলায় সুকুমার সমাজপতির একমাত্র গোলে মোহনবাগান হারল। তবে তারা অপরাজেয় লীগ চ্যাম্পিয়ন হতে পারল না; ইস্টার্ন রেলের সঙ্গে প্রদীপ ব্যানার্জির দেওয়া গোলে হারল। মোহনবাগান চার পয়েন্ট পিছনে থেকে হল রানার্স আপ। মোহনবাগান শীল্ড ফাইনালেও পৌঁছতে পারল না। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলকে ফাইনালে বেগ দিল বি এন আর। প্রথম খেলা ০-০ হওয়ার পর দ্বিতীয় খেলায় পরিমল দে ১-০ করে শীল্ড জিতল। রোভার্স ও ডুরাণ্ডে তৃতীয় রাউণ্ডেই ইস্টবেঙ্গল বিদায় নেয়। কিন্তু রোভার্স কলকাতায় আনল মোহনবাগান।

১৯৬৭-র লীগ চলে গেল নয় বছর পরে মহমেডান স্পোর্টিং-এর দখলে। ইস্টবেঙ্গল রানার্স আপ, মোহনবাগান তৃতীয় স্থানে চলে আসে। আই এফ এ ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে লীগের বড় খেলাগুলি ইডেনে হল। তাই মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলার টিকিট নিয়ে তেমন কাড়াকাড়ি মনে হয়নি। প্রথম খেলায় প্রথম গোলটি দিলেন মোহনবাগানের বিক্রমাদিত্য দেবনাথ। ইস্ট-বেঙ্গল পালটা আক্রমণে শুধু গোল শোধ নয়, এগিয়েও গেল (২-১)। বিজয়ী দলের পক্ষে গোল দেন প্রশান্ত সিংহ ও অসীম মৌলিক। ফিরতি লীগে চুনী গোস্বামীর গোলে ইস্টবেঙ্গল পরাজিত হল। শীল্ড ফাইনালে আবার ওরা মুখোমুখি হয় ৯ অক্টোবর। বিরক্তিকর ফাইনাল ০-০ রইল। আই এফ এ

শৈলেন মান্না

সাত্তার
পি ভেঙ্কটেশ

এস মেওয়ালাল

আর ফাইনালের আয়োজন করতে পারেনি। অথচ উভয়েই যেন ওই অসমাপ্ত লড়াইয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল অধীর আগ্রহে। সুযোগও মিলল প্রায় দু-মাস বাদে। কিন্তু সে দেখা কলকাতায় নয়—বোম্বাইয়ে রোভার্স ফাইনালে কুপারেজ-এ। রোভার্স ফাইনালে ইতিপূর্বে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি। তাই সারা বোম্বাই ভেঙে পড়ল এদের খেলা দেখার জন্য; প্রবাসী 'ঘটি'-'বাঙাল'রাও ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ১৪ ডিসেম্বর ০-০ রইল। দর্শকরা আবার সুযোগ পেলেন। ১৬ ডিসেম্বর তারা পরিতৃপ্ত হলেন। ইস্ট-বেঙ্গল ২-০ জিতল শর্মা ও নাঈমের গোলে।

১৯৬৮-র কলকাতার ফুটবল 'কলঙ্কজনক'। বিভিন্ন ক্লাবের অখেলোয়াড়ী মনোভাবে নীল আকাশের নিচের খোলা মাঠের ফুটবল চলে গেল আদালতের কাঠগড়ায়। হাইকোর্টের ইনজাংশনে লীগ ও শীল্ড পণ্ড হয়ে গেল।

পরের বছর বা ১৯৬৯-এর ফুটবল মরশুমের বহু আগে মোহনবাগান গোল দেওয়ার অস্ত্রগুলিতে শান দিতে কোচ অমল দত্তকে নিযুক্ত করল। মোহনবাগান লীগ পেল, কিন্তু একক লীগে হারে ইস্টবেঙ্গলের কাছে, মোহন-বাগান থেকে চলে যাওয়া অশোক চ্যাটার্জির গোলে। সুপার লীগে কেউ গোল দিতে পারেনি। ইস্টবেঙ্গল রানার্স আপ হয় অপরাজেয় থেকে। মোহনবাগান লীগের পরাজয়ের শোধ তুলল সুদে-আসলে শীল্ড ফাইনালে ৩-১ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে। গোল দেন প্রণব গাঙ্গুলি ২ ও সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদার। একটি গোল শোধ করেন কান্নন। বোম্বাইয়ে রোভার্স ফাইনালে আবার মিলিত হল এরা। এবার ইস্টবেঙ্গল অনায়াসে ৩-০-য় বিজয়ী হল। গোল দিলেন কাজল মুখার্জি ও সুভাষ ভৌমিক ২।

১৯৭০-এ ইস্টবেঙ্গলের সুবর্ণ জয়ন্তী প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শীল্ড জিতে, লীগ নিয়ে খেলোয়াড়রা ক্লাবের সুনাম বাড়ালেন। একক লীগে এরা মোহন-বাগানকে পরাস্ত করল হাবিবের গোলে, আর সুপার লীগে জিতল স্বপন সেনগুপ্তর লক্ষ্যভেদে। মোহনবাগান শীল্ডের ফাইনালে পৌঁছতে পারেনি, সেমি-ফাইনালে ইরাণের পাস ক্লাবের কাছে পরাস্ত হওয়ায়। ফাইনালে পাস ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের বদলী (?) খেলোয়াড় পরিমল দে-র একমাত্র গোলে হেরে যায়।

শীল্ডে পরাজিত মোহনবাগানের রোভার্স জিততে তেমন বাধা পেতে হয়নি। কেননা, ইস্টবেঙ্গল সেমি-ফাইনালেই বিদায় নিয়েছিল। বাধা পেল তারা দিল্লিতে ডুরাণ্ডের ফাইনালে। ইস্টবেঙ্গলের প্রচণ্ড আক্রমণে মোহনবাগান ছত্রভঙ্গ হল। হাবিবের দুটি গোল ইস্টবেঙ্গলের গলায় জয়ের মালা পরিয়ে দিল। একাত্তরের লীগ মরশুমে ইস্টবেঙ্গল আরও কৃতিত্ব দেখায় অপরাজেয় চ্যাম্পিয়নশিপের মাধ্যমে। দুই প্রধানের খেলা ১-১ করলেন যথাক্রমে ইস্ট-বেঙ্গলের শান্ত মিত্র ও মোহনবাগানের কান্নন। এবার মোহনবাগান শীল্ডের আসরে নামেনি। ইস্টবেঙ্গল তো সেমি-ফাইনালে টালিগঞ্জ অগ্রগামীর কাছে এক গোলে হারল। শীল্ড পেল মহমেডান স্পোর্টিং। মোহনবাগানকে এবার কেবলমাত্র রোভার্স কাপ নিয়ে খুশি থাকতে হল।

১৯৭২-এ ইস্টবেঙ্গল দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে মরশুম শুরু করল। কোচ প্রদীপ ব্যানার্জি দলকে আরও সুসংহত করলেন। লীগ জয়ের নতুন নজীর সৃষ্টি হল। এবার নিয়ে তারা রেকর্ড করল উপর্যুপরি তিনবার অপরাজিত লীগ জয়ের। ৭৫ বছরের শীল্ড ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটেনি। দ্বিতীয়ত ইস্টবেঙ্গলের গোলকে এবার কেউ কোনো ম্যাচে বিধ্বস্ত করতে পারেনি। ৭১ বছর আগে আইরিশ গোরা দল একটি গোলও না খেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এবার ইস্টবেঙ্গলও সেইভাবে শীল্ড পেল।

লীগে এবার দুই প্রধানের খেলা মোটেই উন্নত মানের হয়নি। মোহন-বাগানের ফরওয়ার্ডরা ব্যর্থ না হলে ফল কী হত কে জানে! তবে ইস্টবেঙ্গল নিঃসন্দেহে সেরা দল ছিল এবং ২-০ (স্বপন সেনগুপ্ত ও হাবিব) গোলে জয়-লাভে মোহনবাগানের গোঁড়া সমর্থকদেরও কিছু বলার ছিল না। শীল্ডও চলে যাবে ইস্টবেঙ্গলের তাঁবুতে এ রকম ধারণাও তাদের ছিল। ইস্টবেঙ্গল মাঠে দুই দলের মধ্যে ফাইনাল ঘিরে একই রকম উত্তেজনা ছিল। এবং তা স্বাভাবিক কারণেই দর্শকদের মধ্যে বেশি। ইস্টবেঙ্গল মাঠে তাদের সমর্থক বেশি থাকবেন —এও নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু মোহনবাগানের সমর্থকরা বোধহয় 'আশা নেই' বলেই মাঠে আসেন নি। তবুও মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা শক্তিহীন ছিলেন না। তাঁরা সমানে লড়াই করে ০-০ রাখলেন। কিন্তু এদিন মাঠের মধ্যে যে সব ঘটনা—বিশেষ করে উভয়ের খেলোয়াড়দের মধ্যে যে লাথালাথি ও ফাউলের আধিক্য দেখা গেল তা সচরাচর হয় না। রেফারিকেও দুর্বল মনে হয়েছে বাঁশি

বাজাতে। দ্বিতীয় খেলা পড়ল মোহনবাগান মাঠে। আসলে ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকরা সংখ্যায় যে বেশি, তা এদিন বোঝা গেল প্রিয় দলের মাঠে প্রবেশের সময়। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে সেদিন খেলা পণ্ড হয়ে যায়। তবুও মোহনবাগানের সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদারের যে গোলে তারা ১-০ রেখেছিল, তারপরেও মোহনবাগানের দর্শক-গ্যালারিতে করতালি ও উল্লাস গগনভেদী হয়নি।

আই এফ এ আবার শীল্ড খেলার দিন ধার্য করে। কিন্তু মোহনবাগানের পক্ষে টিম করা সম্ভব হল না। ইস্টবেঙ্গলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হল।

এরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হল রোভার্সের ফাইনালে। প্রথম দিন ০-০, দ্বিতীয় দিনেও কোনো পক্ষ গোল দিতে পারল না। অতিরিক্ত সময়েও ০-০। তারপর ঘোষণা করা হল কলকাতার এই দুই দল 'যুগ্মবিজয়ী'। ডুরান্ড ফাইনালে দেখা হল উভয়ের। দিল্লিতে জিতল ইস্টবেঙ্গল। ১৯৭২-এ ওরা শুধু 'ট্রিপল' ক্রাউনই পায়নি, সিনিয়র ডিভিশন লীগেও চ্যাম্পিয়ন। কলকাতার কোনো ক্লাব একই সঙ্গে এতগুলি বড় টুরনামেণ্ট জেতেনি। ইস্টবেঙ্গলের এই সাফল্যের জন্য তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জানায়। একেই বলে স্পোর্টসম্যানশিপ!

টি আও

ফুটবল নিয়ে কলকাতা চিরকালই কল্লোলিনী। কিন্তু মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলকে বাদ দিলে ওই বিশেষণ প্রয়োগ করা যায় কি? ক্রিকেটের টেস্ট ম্যাচ ঘিরে ইডেনের উৎসব সাজ দেখা যায়। আর ফুটবল নিয়ে ইডেন অদ্ভুত উত্তেজনায় সময় কাটায়।

এবার (১৯৭৩) প্রাথমিক লীগে এই দু দলের খেলার ফল ইস্টবেঙ্গল ২-১ জেতে; সুভাষ ভৌমিক ও হাবিবের দেওয়া গোলের একটি শোধ করে মোহনবাগানের বদলী খেলোয়াড় মোহন সিং। যাই হোক, খেলা শুরুর আগে যখন দুটি দল পৃথকভাবে মাঠে প্রবেশ করল, তখন পটকা, পতাকা, কাঁসর-ঘণ্টা, করতালি ও উল্লাসে আবার স্পষ্ট জানা গেল কাদের সমর্থক বেশি। সুপার লীগের প্রথম খেলায় সুভাষ ভৌমিকের একমাত্র গোলে ইস্টবেঙ্গল হারায় মোহনবাগানকে। ইস্টবেঙ্গলের এ জয় গৌরবের। কিন্তু রেফারিকে ঘিরে ১৪ আগস্ট ওই খেলার পর যে ঘটনা ঘটেছে তা ফুটবলের পক্ষে যে হিতকর নয় সে সম্পর্কে সকলে নিশ্চয়ই একমত হবেন। মোহনবাগানের শঙ্কর ব্যানার্জি এই খেলায় গুরুতর আহত হন।

কালীপদ (হারাধন) দত্ত
আমেদ

উপর্যুপরি যারা খেলায় সফল হতে থাকে, সমর্থক তাদের বাড়েই। পরাজিত দলের গোঁড়া সমর্থকরাও নৈরাশ্যে সময় কাটান। কিন্তু মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকদের কেউ কি প্রিয় দলের পরাজয়ে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়ে সফল বিরোধী দলে যোগ দেবেন?

না, প্রত্যেকেই আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলবেন: সিনিয়র ডিভিশন লীগে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল এ পর্যন্ত ৮৫ বার সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হয়েছে, তার মধ্যে ইস্টবেঙ্গল জিতেছে ৩৩টিতে, মোহনবাগান ২৬টিতে আর বাকি ২৬টি অমীমাংসিত। মোহনবাগান লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ১৪ বার ও ইস্টবেঙ্গল ১২ বার। কিন্তু আই এফ এ শীল্ড জিতেছে ইস্টবেঙ্গল এগার বার ও মোহনবাগান নয় বার। মোহনবাগান রোভার্স কাপ পেয়েছে ৬ বার ও ইস্টবেঙ্গল ৫ বার। কিন্তু ডুরান্ড কাপ বিজয়ে ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে—সাত বার, আর মোহনবাগান চার বার।

লতিফ

১৯২১ সালে মোহনবাগান কোচবিহার কাপে ইস্টবেঙ্গলকে হারায় প্রথম সাক্ষাতে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ইস্টবেঙ্গল তার শোধ নেয় খগেন্দ্র শীল্ডে। তারপর ১৯২৫-এর ২৮ মে সিনিয়র ডিভিশন লীগে এই দুই দলের প্রথম খেলায় ইস্টবেঙ্গলের জয়লাভ—ইত্যাদির মাধ্যমে দুই দলের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল কলকাতার মাঠে, আজ সে লড়াই ভারতময়। প্রতিটি বড় টুরনামেণ্টে ফুটবলের প্রতি মরশুমে শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, প্রবাসী বাঙালীরাও এদের জয়ে ও পরাজয়ে নিজেরই সাফল্য ও অসাফল্য মনে করেন। ক্ষণিকের তরে কেউ ভাবেন, 'আমি ঘটি, মোহনবাগান আমার টিম'; কেউ বা মনে করেন, 'আমি বাঙাল—ইস্টবেঙ্গল আমাগো ক্লাব'।

একশ' বছর পরেও যাঁরা ফুটবল দেখতে ভিড় করবেন, ভারতের বা পশ্চিমবঙ্গের ক'জন নাগরিক নিজেকে তখন খাঁটি পূর্ববঙ্গীয় বলে দাবি করতে পারবেন? খাঁটি পশ্চিমবঙ্গীয়ই বা কেউ থাকবেন কি অন্ততঃ ১৯৩৪, ১৯৪৭ বা ১৯৭৩-এর অর্থে? কিন্তু মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের অস্তিত্ব থাকলে নিশ্চয়ই প্রত্যেকের অতীতের 'ব্যক্তিসত্তা' অন্ততঃ খেলার দিনে প্রকাশ পাবে। নিজ নিজ দলের জয়-পরাজয় মেনে নিয়ে আনন্দ অথবা বেদনা সম্বল করে ও'রা অনন্তকাল হয়তো বাড়ি ফিরবেন। □

মা,
ওদের বাথরুমে
এত দুর্গন্ধ,
আর আমাদের
বাথরুমে
এত সুন্দর গন্ধ
কেন?

বেবী, আমরা যে
অডোনিল
ব্যবহার করি!

অডোনিল নিমেষে সব দুর্গন্ধ দূর ক'রে আপনার বাথরুম তকতকে পরিষ্কার ক'রে তোলে আর মিষ্টি গন্ধে ভরে দেয়।
অনেক রকম সুন্দর সুন্দর গন্ধে অডোনিল পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরণের সাইজ, মডেল ও প্যাকে পাবেন।

CHAITRA-BLS-6 BEN

গোগো দি গ্রেট

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু
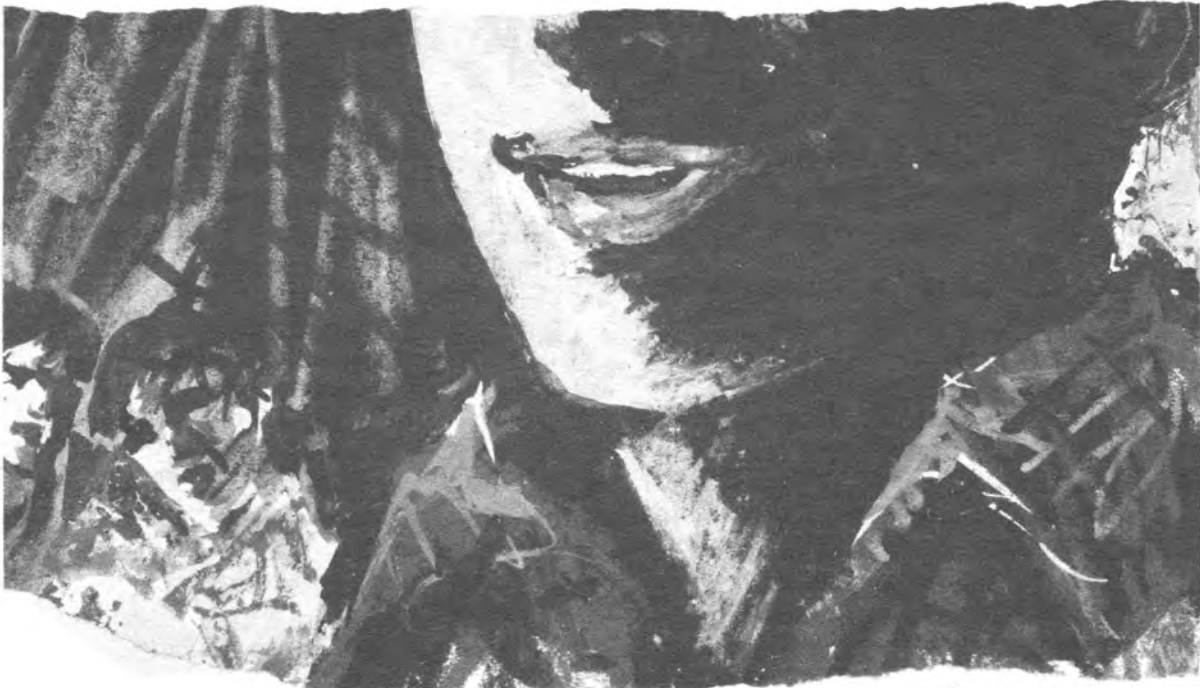
ছবি এঁকেছেন সুধীর মৈত্র

দেখে চমকে উঠল গোগো। তালাবন্ধ বাড়িটার দোতলায় একটা জানলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে এক চিলতে আলো বেরিয়ে আসছে।

আলো এমনিতে জ্বলে না, জ্বালাবার জন্য মানুষ দরকার হয়। আর যে-মানুষ বা মানুষেরা বাড়ির বাইরে তালা ঝুলিয়ে, সব দরজা-জানলা বন্ধ করে ভিতরে চুপি চুপি আলো জ্বালে—

সঙ্গে সঙ্গে মন স্থির করে ফেলল গোগো। সদর দরজার তালা ভেঙে ঢুকতে গেলে আওয়াজ হবে, সাবধান হয়ে যাবে শয়তানরা। তার চেয়ে পাইপ বেয়ে তিনতলার ছাদে উঠে গেলে হয়তো ছাদের দরজাটা খোলাই পেয়ে যাবে গোগো। বড় জোর খিল বা ছিটকিনি দেওয়া থাকবে। সঙ্গের লোহার স্কেল আর পকেট হাতুড়ি দিয়ে অনায়াসেই সেটা খুলতে পারবে। তা ছাড়া, পাহারায় যদি কেউ থাকে তো সে একতলাতেই কোথাও ঘাপটি মেরে থাকবে। ছাদে নয়। যাকে বলে, পশ্চাৎভাগ থেকে আক্রমণ, তাই করতে পারবে গোগো। আর, সেই আচমকা আক্রমণে আরো সহজ হবে শয়তানদের কাবু করা।

ভাবতে ভাবতেই কখন পাইপ বেয়ে উঠতে শুরু করেছে গোগো। ছাদের কাছাকাছি পেঁৗছে পাইপের গায়ে জমা শ্যাওলায় হাত ফসকে আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে দু-ঠ্যাঙের মধ্যে পাইপটাকে কোলবালিশের মতন চেপে জোর সামলে নিল নিজেকে। তারপর সাবধানে বাকী পাইপটুকু বেয়ে ছাদে উঠে যা ভেবেছিল ঠিক তাই। একটু চাড় দিতেই ছাদের দরজাটা খুট করে খুলে গেল।

ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেটা চোখে একটু সয়ে নিয়ে সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়ালো গোগো। কান পেতে কিছুক্ষণ শোনবার চেষ্টা করল। তলা থেকে ভেসে আসা কোনো কথা বা গলা শুনে যদি আগে থেকে বোঝা যায় শয়তানরা সংখ্যায় কত? একা ক-জনের সঙ্গে তাকে মোকাবেলা করতে হবে?

না, কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। সাবধানে, পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল গোগো। মাঝ সিঁড়িতে এসেই চোখে পড়ল একটা ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতরের এক ফালি আলো এসে পড়েছে বারান্দায়।

ঐ একটা ঘরেই আলো আর তার যেটুকু এসে পড়েছে টানা বারান্দাটায়। আর সব—ঘর, দালান, বারান্দা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে কেউ কোথাও ঘাপটি মেরে রয়েছে কি না, কোথাও কারুর চাপা নিঃশ্বাস পড়ছে কি না—ভালো করে আগে বুঝে নিল গোগো। তারপর পা টিপে টিপে নেমে গিয়ে ভেজানো দরজাটার কাছে দাঁড়াল। আচমকা যদি ঘর থেকে কেউ বেরিয়ে আসে তাই কোমরে গোঁজা পকেট-হাতুড়িতে একটা 'হাত রাখলো।

ঘরের ভিতর থেকে চাপা, কর্কশ একটা স্বর ভেসে এল—তোমার বাবা গোপনে পুলিশে খবর দিয়েছেন!

উত্তরে একটি মেয়ের মিষ্টি গলা শোনা গেল। খুশির সুরে সে বলল—বেশ করেছেন! আমাকে চুরি করে আনার ফল এবার তোমরা হাতে হাতে পাবে!

কর্কশ গলা বলল—গোপনে পুলিশে খবর দিয়ে এদিকে আবার তোমার বাবা ঘোষণা করেছেন, তোমার সন্ধান যে দিতে পারবে তাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবেন।...ভাবছি—

মিষ্টিগলার মেয়েটি বলল—ভাবছো, আমাকে ফেরত দিয়েই ঐ লাখ টাকাটা নিয়ে নেবে?...কক্ষনো না! বাবাকে আমি বারণ করব। বলব, চোরদের শুধু প্রশ্রয় নয়, উৎসাহ দেওয়া হবে তাতে!

কর্কশ গলা খ্যাক খ্যাক করে হেসে বলল—যদি বলতে পারো তবে সেটা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার হবে!

মেয়েটি অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল—কেন?

তাহলে সেই প্রথম মরা মানুষ কথা বলবে!

তার মানে?

তোমার বাবা মেয়ের সন্ধান চেয়েছেন। জীবিত কি মৃত বলেন নি। ফলে, গঙ্গার ধারে পড়ে থাকা তোমার লাশের খবর যে গিয়ে তাঁকে দেবে, তাকেই তিনি ঐ লাখ টাকার পুরস্কার দিতে বাধ্য!

শুনে মেয়েটির গলা করুণ হয়ে এল। বলল—আমাকে মেরে ফেলবে? না—না! আমার বাবার যে আমি ছাড়া কেউ নেই। আমি মরে গেলে বাবার ভীষণ কষ্ট হবে। কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে যাবেন বাবা আর দুঃখে বুক ফেটে মরে যাবেন!

কর্কশ গলা গম্ভীর হয়ে বলল—কিন্তু তা ছাড়া তো উপায় দেখছি না। পুলিশ যেভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাতে বেশীদিন আর তোমায় লুকিয়ে রাখা যাবে না। মেরে ফেলতেই হবে। তবে একটা উপায় বোধহয় হতে পারে—

মেয়েটি ব্যগ্র হয়ে বলল—কী উপায়?

গলাটা একবার ঝেড়ে নিয়ে কর্কশ গলা বলল—যদি তুমি আমায় বিয়ে করো! তাহলে তোমাকে জ্যান্তই নিয়ে যেতে পারব তোমার বাবার কাছে। জামাইকে তো আর তিনি জেলে দিতে পারবেন না!

শুনে খুব রেগে গেল মেয়েটি। বলল—কী বললে? তোমাকে বিয়ে করব? তোমার মতন একটা বাড়ির চাকরকে?

কর্কশ গলা বোঝাবার চেষ্টা করল—আহা, তোমাকে বিয়ে করার পর বাড়ির চাকর তো আমি আর থাকবো না। জামাই হবো। তাছাড়া, আসলে চাকরও তো আমি নই। তোমাকে চুরি করার জন্যে তোমাদের বাড়িতে চাকর সেজে ঢুকেছিলাম।

হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটি—চাকর আবার তুমি সাজবে কী? চাকর আবার তোমায় সাজতে হয় নাকি? চাকরের মতনই তো তোমার চেহারা!

ধমকে উঠল কর্কশ গলা—খবরদার!

মাথার চুল নয়তো শুয়োরের কুচি!

খবরদার বলছি।

আর বোয়ালমাছের মতন বোঁচা নাক। দেখলে বমি আসে।

আবার? ফের যদি—

আর ছুঁচোর মতন গায়ে গন্ধ। ঘরে ঢুকলে নাকে রুমাল দিতে—

মেয়েটির কথা শেষ হওয়ার আগেই চটাস করে একটা শব্দ হলো আর সেই সঙ্গে উ—হু আর্তনাদ শোনা গেল মেয়েটির গলায়। রাগে গরগর করতে করতে কর্কশ গলা বলল—আর বলবি কখনো?

কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি বলল—বলবো! একশো বার বলবো!

ক্ষেপে গেল কর্কশ গলা—তবে রে!

নারীর উপর নির্যাতন? সব সাবধানতা ভুলে হাঁক দিয়ে উঠল গোগো—খবরদার! তারপর এক ধাক্কায় দরজা খুলে লাফ দিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ঘরের মধ্যে। দেখল, থামের গায়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা বারো-তেরো বছরের একটি মেয়ের চুলের মুঠি ধরে রয়েছে একটা লোক। কী সুন্দর দেখতে মেয়েটিকে! দুধের মতন গায়ের রঙ আর কী সুন্দর কালো টানা-টানা চোখ আর ভুরু। আর লোকটা, যেন মা দুর্গার অসুর। প্যান্ট-শার্ট পরে থাকার জন্য একটু যা অন্য রকম দেখাচ্ছে।

গোগোর হাঁক শুনে চমকে ফিরে তাকিয়েছিল প্যান্ট-শার্ট পরা অসুরটা। ততক্ষণে গোগোও তার হাওয়াই শার্টের তলায় কোমরের পকেট হাতুড়িটা এমনভাবে উল্টো করে ধরেছে যে হাতলের জায়গায় উঁচু হয়ে উঠেছে শার্টটা। আর সেইখানে চোখ পড়তেই মেয়েটির চুল ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালো অসুরটা। খসখসে গলায় বলল—শার্টের তলায় ওটা কী?

গোগো জবাব দিল—তোমার মাথার খুলি ফুটো করার অস্ত্র!

জোর করে একটা অবিশ্বাসের হাসি মুখে আনবার চেষ্টা করল অসুরটা—খেলনার পিস্তল বুঝি?

খেলনার কি না, একটু চালাকির চেষ্টা করলেই সেটা বুঝতে পারবে!

কিন্তু নলটা যেন একটু বেশী লম্বা মনে হচ্ছে!

সেটা সাইলেনসার লাগানো রয়েছে বলে। তোমার মাথার খুলি ঝাঁঝরা করে দিলেও একটা আওয়াজ কেউ পাবে না।

শুনে গোগোর প্রতি খুব একটা শ্রদ্ধার ভাব দেখিয়ে অসুরটা বলল—দেখি, দেখি—কেমন? সাইলেনসার লাগানো পিস্তল আগে কখনো দেখিনি।

তার চালাকি ধরার জন্য যে এটা অসুরটার একটা চালাকি, বুঝতে অসুবিধা হল না গোগোর। হেসে বলল—দেখবে, দেখবে! এত তাড়া কিসের? তবে শুধু চোখে-দেখে আর কী বুঝবে? বুঝবে যখন চেখে দেখবে! যখন গুলি খেলবো তোমার সঙ্গে!

বুঝতে না পেরে অসুরটা বলল—গুলি খেলবে?

হ্যাঁ, গুলি। পিস্তলের সাত-সাতটা গুলি যখন সাইলেন্টলি গাব্বু করব তোমার মগজে তখন সাইলেনসার কী রকম জিনিস সেটা একসঙ্গে চোখেও দেখবে, চেখেও দেখবে।

শুনে থামের কাছ থেকে হাততালি দিয়ে উঠল মেয়েটি। মিষ্টি গলায় বলে উঠল—ফাইন বলেছেন। আপনিও শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা পড়েন বুঝি?

গোগো জবাব দেবার আগেই অসুরটা কেমন অস্থির হয়ে ধমকে উঠল মেয়েটিকে—চুপ! গোগো বুঝতে পারল অসুরটা খুবই মুস্কিলে পড়ে গিয়েছে। গোগোর শার্টের তলায় সত্যিকার পিস্তল রয়েছে বলে তার বিশ্বাস হচ্ছে না। আবার ভাবছে—আজকালকার ছেলে তো! যদি সত্যিই থাকে! আর, সেই দোমনায় বিরক্ত হয়ে শেষটায় এবার গোগোকেই ধমকে উঠল।

কিন্তু তুই কে?

গোগো গম্ভীর হয়ে বলল—'তুই' নয়, 'আপনি!' শয়তানি করো বলে কি ভদ্রতাও শেখোনি?

আচ্ছা, আচ্ছা। বলো, তুমি কে?

উহুঁ, 'তুমি'-ও নয়,—'আপনি'।

বাঃ, তুমি তো আমায় 'তুমি' বলছো!

শয়তানদের 'তুই' বললেও অন্যায় হয় না। কিন্তু আমাকে 'আপনি' না বললে কোনো কথার জবাব পাবে না।

উপায় না দেখে অসুরটা বলল—বেশ, বাবা, তাই। বলুন, আপনি কে?

গোগো।

গোগো?

হ্যাঁ, গোগো। শিষ্টের সহায় আর তোমার মতন দুষ্ট, শয়তানের যম!

থামের কাছ থেকে মিষ্টি মেয়েটি আবার হাততালি দিয়ে উঠল—ঠিক যেন মোহন! আপনি মোহন সিরিজও পড়েন বুঝি? তাহলে আর আমার কোনো ভয় নেই।

গোগো শুধু একটু হাসল। কী কষ্ট করে যে সেগুলি পড়তে হয়, তা যদি মেয়েটি জানতো!

এদিকে কান না দিয়ে অসুরটা একমনে কী যেন মনে করবার চেষ্টা করছিল। আর, মনে পড়তেই বলে উঠল—এইবার চিনতে পেরেছি। তুমি টিকটিকি গোবিন্দরাম চাটুজ্যের ভাইপো গোবিন্দগোপাল। সংক্ষেপ করে ডাক নাম গোগো!

টিকটিকি গোবিন্দরাম মানে গোগোর ন-কাকা যিনি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন। এখন বিলেতের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে রয়েছেন। সেখানকার কাজকর্ম দেখে আসার জন্য সরকার থেকে তাঁকে পাঠানো হয়েছে।

গোগোর নামের ব্যাপারটাও সত্যি। কিন্তু দুটোর কোনোটাই এখন গোগোর পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব নয়। সে নিজে

হ্যাঁ, গোগো। শিষ্টের সহায় আর তোমার মতন দুষ্ট শয়তানের যম।

ডিটেকটিভ নয়, একজন ডিটেকটিভের ভাইপো মাত্র, এ কথা বললে কি আর তার উপর কোনো ভরসা রাখতে পারবে মেয়েটি? তার নাম যদি আবার তার উপর গোবিন্দগোপাল হয়?

গোগো গম্ভীর হয়ে বলল—কোনো গোবিন্দরাম চাটুজ্যেকে আমি চিনি না। আমার নামও গোবিন্দগোপাল নয়। আমার নাম গোগো।

বয়েস কত?

প্রশ্ন শুনে চটে উঠল গোগো—বয়েস? কেন, বয়েস দিয়ে কী হবে?

অসুরটা মুচকি হেসে বলল—অসুবিধে থাকলে বলতে হবে না।

ঢোক গিলে গোগো বলল—অসুবিধে আবার কী থাকবে? আমার বয়েস...সতেরো!

বাধ্য হয়েই চার বছর বাড়িয়ে বলতে হল গোগোকে। তা, দেখতে তো গোগো বেশ ধড়োসড়োই, বেমানান হবে না খুব। হলেও গোগো নাচার। সত্যিকার বয়েস বললে সাহস বেড়ে যেত অসুরটার! আর, সমবয়সী জানার পর ততটা ভরসাও কি আর গোগোর উপর থাকতো মেয়েটির?

অসুরটা অবিশ্বাসের সুরে বলল—বলো কী, সতেরো?

হ্যাঁ।

কোন স্কুলে পড়ো?

আরেকটু হলেই স্কুলের নামটা বলে ফেলেছিল গোগো। চট করে সামলে নিয়ে বলল—স্কুল নয়, বলো কলেজ!

কলেজ?

হ্যাঁ, কলেজ। সতেরো বছরেও যদি স্কুলে পড়বো তো কলেজে পড়বো কবে? তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া রয়েছে, বিলেত যাওয়া রয়েছে, কবে করবো সব? তোমার মতন বুড়ো বয়েসে?

শুনে মিষ্টি মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল। লজ্জা পেয়ে গেল অসুরটা, আমতা আমতা করে বলল—না, তা বলিনি। জিজ্ঞেস করছিলাম—

যা জিজ্ঞেস করবে, একটু ভেবেচিন্তে করবে। তাছাড়া, তুমি জিজ্ঞেস করবেই বা কেন? আমার হাতে যখন পিস্তল তখন ও-সব জিজ্ঞেস পত্তর যা করবার তা তো আমি করবো আর তুমি জবাব দেবে। এতদিন ধরে শয়তানি করে বেড়াচ্ছো, এ-সব নিয়ম জানো না?

মিষ্টি মেয়েটি বলল—জানে না, আবার? খুব জানে! আপনাকে ভালোমানুষ পেয়ে চালাকি করছে, বুঝতে পারছেন না?

অসুরটা বলল—আমি কি বলেছি, জবাব দেবো না? কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস না করলে জবাব দেবো কী করে?

গোগো বলল—তোমার নাম কী?

নাম?

হ্যাঁ।

অসুরটা কী যেন ভাবতে লাগল। গোগো ধমক দিয়ে বলল—কী হলো? নিজের নামটাই ভুলে গেলে নাকি?

ভুলবো কেন? ভাবছি কোন্ নামটা বলবো?

কোন্ নাম মানে?

সুকুমার চক্রবর্তী, শিবরাম রায়, চুনী ব্যানার্জি, প্রদীপ গোস্বামী, সুনীল সোবার্স, গ্যারি গাভাসকর—

ও-সব তো ওরফে-র নাম। আসল নামটা বলো—

আসল নামও তো একটা নয়।

আসল নাম আবার কারু দুটো হয় নাকি?

কেন হবে না? তোমার আসল নাম একটা যেমন গোগো, আরেকটা গোবি—

তাড়াতাড়ি ধমকে উঠল গোগো—আমার নাম নয়, তোমার নাম বলো—

ডাক নাম, না, ভালো নাম?

আগে ভালো নামটা শুনি—

অসুরটা আগে বুক ফুলিয়ে দম নিল। তারপর গলা ফাটিয়ে বলল— কা—লা—চাঁ—দ!

কানে প্রায় তালা লাগবার জোগাড়! গোগো বিরক্ত হয়ে ধমক দিল—আস্তে! ওটা এমন কিছু একটা ভালো নাম নয় গলা ফাটাবার মতন। রীতিমতন একটা খারাপ নাম।

মিষ্টি মেয়েটি বলে উঠল—যেমন লোক, তেমনি চেহারা আবার তেমনি নাম!

গোগো বলল—এবার ডাকনামটা বলো!

ই—য়া—হি—য়া!

আবার কানে তালা লাগবার অবস্থা! এমন রাগ হল গোগোর যে হাতে সত্যিকার পিস্তল থাকলে কী যে করে ফেলতো, বলা যায় না। এমনিতেই ইচ্ছে করছিল ঐ হাতুড়িরই একটা ঘা গিয়ে বসিয়ে দেয় অসুরটার মাথায়।

কানের মধ্যে ঝিমঝিম করছিল গোগোর। চোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারই মধ্যে শুনতে পেল মিষ্টি মেয়েটির গলা। সাবধান করে দিচ্ছে যেন অসুরটাকে। গোগোও চোখ খুলে ভীষণ ধমকে উঠল অসুরটাকে—ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সঙ্গে?

বোকার মতন মুখ করে অসুরটা বলল—ইয়ার্কি? ওমা সেটা আবার কখন করলাম? হ্যাঁরে, ইয়াহিয়া?

গোগোর পেছনে বাঁ-দিক থেকে ষাঁড়ের মতন গলায় কে যেন জবাব দিল—না, ওস্তাদ! ঘাড়ে কটা মাথা আপনার যে এই খোকাবাবুর সঙ্গে ইয়ার্কি করবেন?

শুনে অসুরটা গোগোর ডানদিকে তাকালো—কালাচাঁদ, তুই কি আমায় ইয়ার্কি করতে শুনলি?

গোগো-র পেছনে ডানদিক থেকে শুয়োরের মতন কে যেন ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল—রামোচন্দর! আপনার কি নরকেরও একটু ভয় নেই কর্তা, যে এই নাড়ুগোপালের সঙ্গে ইয়ার্কি করবেন?

ঈস, কী চালাক অসুরটা! কী ভীষণ বোকা বানিয়েছে গোগোকে নাম বলার ভান করে! আর, এই সুযোগে যা খুশি বলে নিচ্ছে গোগোকে। শুধু...শুধু গোগোকে এখনো ঠিক মতন চেনেনি!

নিজের বেকায়দা অবস্থাটা বুঝে নিতে ঐ যা এক মুহূর্ত সময় লাগল গোগোর। তারপর ঝুপ করে বসে পড়ল মেঝেতে আর বাঁদিক ফিরেই ইয়াহিয়ার হাঁটুতে বসিয়ে দিল হাতুড়িটা—খটাস্। সেইসঙ্গে ফটাস্ করে হাড়ভাঙার একটা আওয়াজ কানে আসতেই তাক করে লাফিয়ে উঠল গোগো—হেড দিয়ে। গোগোকে ধরবার জন্যে তাড়াতাড়ি নিচু হচ্ছিল কালাচাঁদ, ফলে আরো জোর, আরো মোক্ষম হল হেডটা কালাচাঁদের পেটে—দুম্‌ম্। তারপর গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গোগো দেখলো ইয়াহিয়া আর কালাচাঁদ দু-জনেই মেঝেতে বসে পড়ে ছটফট করছে। একজন হাঁটু ধরে. অন্যজন পেটে হাত দিয়ে।

মিষ্টি মেয়েটি হাততালি দিয়ে উঠল—সাবাস গোগো! যুগ যুগ জিও!

ততক্ষণে ইয়াহিয়া আর কালাচাঁদের মাথায় একবার করে হাতুড়িটা ছুঁইয়ে রূপকথার রাজকন্যার মতন তাদের দুজনকে ঘুমও পাড়িয়ে ফেলেছে গোগো।

মিষ্টি মেয়েটি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—সাবধান!

চকিতে ফিরে তাকালো গোগো। দশ কি পনেরো সেকেন্ড চোখ রাখতে পারেনি অসুরটার উপর আর তাতেই খেলার মোড় ঘুরে গিয়েছে। একটা পিস্তল উঁচিয়ে হিংস্রদৃষ্টিতে গোগোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে অসুরটা। আর রাগে যেন ফুঁসছে।

এখন কী করবে গোগো? কী করতে পারে? ফ্যালফ্যাল করে ঐ পিস্তলের নলের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া?

কী দেখছো তাকিয়ে? এটা তোমার মেজদির গানের সঙ্গে

আরো মোক্ষম হল হেডটা কালাচাঁদের পেটে।

তবলা বাঁধবার হাতুড়ি নয়। সত্যিকার পিস্তল!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গোগো বলল—তার মানে আমাকে এবার মরতে হবে, এই তো?

আমার গোপন আড্ডার ঠিকানা তুমি জেনেছো আর আমার দু-জন বেস্ট সাগরেদ কালাচাঁদ আর ইয়াহিয়ার যে অবস্থা তুমি করেছো, তারপরও কি তুমি আশা করো তোমায় আমি বাঁচিয়ে রাখবো?

না।

মৃত্যুর জন্যে তবে প্রস্তুত হও।

আমি প্রস্তুত। তবে তোমার হাত যা কাঁপছে তাতে তোমার গুলি বুকে না লেগে আমার হাতে বা হাঁটুতে লাগবে বলে মনে হচ্ছে। মরতে আমি প্রস্তুত কিন্তু নুলো বা খোঁড়া হয়ে বাকী জীবন কাটাতে আমি রাজী নই। আমি বরং আরেকটু কাছে এগিয়ে যাই—

খবরদার! আমার কাছে আসার বা কোনো চালাকির চেষ্টা করেছো কি—

দু-পা এগিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়তে হল গোগোকে। হেসে বলল—তাহলে দয়া করে পিস্তলের নিশানাটা তোমার ঠিক করো। এই যে আমার বাঁ-বুকে...হার্টটা যেখানে থাকে মানুষের। একটা গুলিতেই—

মিষ্টি মেয়েটি কেঁদে বলল—ও কী, আপনি ওকে সব বলে দিচ্ছেন কেন? আপনি মরে গেলে আমার বাবার আদরের রাধারানীকে কে বাঁচাবে এই অসুরটার হাত থেকে?

রাধারানী! গোগো তাকালো মেয়েটির দিকে। যেমন মিষ্টি দেখতে তেমনি মিষ্টি নাম! বলল—ভয় নেই, রাধারানী। তোমাকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করেই আমি এখানে এসেছি।

রাধারানী চোখ মুছে বলল—কী ব্যবস্থা?

পুলিশ!

শুনে চমকে উঠল অসুরটা—পুলিশ? পুলিশে খবর দিয়েছিস বুঝি তুই?

গোগো বাঁ-হাতে ঘড়ি দেখতে দেখতে বলল—হ্যাঁ, অনেকক্ষণ। এতক্ষণে এসে যাওয়া উচিত ছিল। বোধহয় এসেও গেছে। যাতে কেউ পালাতে না-পারে বোধহয় সেইজন্যে এই বাড়ির চারদিকটা আগে ঘিরছে।

তবে রে ছুঁচো! তাহলে আর তোর রক্ষা নেই!

গোগো ব্যস্ত হয়ে বলল—হাত কিন্তু ভীষণ কাঁপছে তোমার। আগে যা কাঁপছিল, পুলিশের কথা শোনার পর আরো বেশী। না বাপু, আমি বরং কাছে যাচ্ছি, পিস্তলটা বরং আমার বুকে লাগিয়ে ফায়ার করো!

বলে তাড়াতাড়ি দু-পা গোগো এগিয়ে যেতেই অসুরটা চেঁচিয়ে উঠল—হল্ট! আর এক-পা এগিয়েছো কি?

মাপ করো, নুলো বা খোঁড়া হওয়ার রিস্ক্ আমি নিতে পারবো না।

বলে গোগো এক-পা আরো এগোতেই ক্র্যাক্ করে একটা আওয়াজ হল আর প্রথম গুলিটা এসে লাগল গোগোর বুকে। মনে হল, কে যেন বুকে আলতো একটা ঘুসি মারল!

আরো এক-পা এগিয়ে গেল গোগো।

ক্র্যাক্!

দ্বিতীয় গুলিতে ঘুসিটা একটু শুধু জোরে মনে হল. এই যা। আরো এক-পা এগিয়ে গেল গোগো।

-ক্যাক্!

ঘুসিটা যেন বুকে আরেকটু জোরে লাগল কিন্তু এখনও ঠাট্টার মতন। আরো এক-পা এগিয়ে গেল গোগো।

ক্যাক্! ক্যাক!

চতুর্থ আর পঞ্চম গুলির দুটো জোর ধাক্কা পিছিয়ে দিল গোগোকে। ভ্রূক্ষেপ না করে একসঙ্গে এবার দু-পা এগিয়ে গেল গোগো।

ক্যাক্!

মাত্র দু-হাত দূর থেকে ছোঁড়া গুলি। প্রচণ্ড একটা ধাক্কায় আরেকটু হলেই উল্টে পড়ে যাচ্ছিল গোগো। সামলে নিল কোনরকমে কিন্তু আর এগোলো না। আর এগোলে তার শার্টের তলায় ইস্পাতের পাতের ফতুয়াটা হয়তো ফুটো হয়ে যাবে। আর মাত্র একটা গুলি বাকী পিস্তলে, সেটা শেষ হলেই হাতুড়িটা নিয়ে বাঘের মতন গোগো ঝাঁপিয়ে পড়বে অসুরটার উপর—

ক্যাক্—

প্রচণ্ড ব্যথা করে উঠল গোগোর বুকের মধ্যে। ফুটো হয়ে গেল নাকি ইস্পাতের ফতুয়াটা। নিশ্চয়ই তাই। নইলে চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে কেন গোগোর? অসুর, মিষ্টি মেয়ে রাধারানী সব তালগোল প্যাকিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছেই বা কেন?

এরই নাম বোধহয় মৃত্যু! অর্থাৎ, এ জীবনের লীলাখেলা শেষ হয়ে গেছে গোগোর! কে যেন ডাকছে গোগোকে! তাকে নিয়ে যাবার জন্যে দূত এসেছে বোধহয় পরলোক থেকে। চেহারাটা চেনা-চেনা। অনেকটা গোগোর ছোটকাকার মতন দেখতে। গলাটাও তাই। বলছে—কী রে, বোকার মতন তাকিয়ে আছিস কেন? এখনও ঘুম কাটেনি?

ধড়মড় করে উঠে বসল গোগো চোখ কচলাতে কচলাতে। ছোটকা বলল—কী ঘুম রে তোর! যত ধাক্কা মারছি তত আরামের নিঃশ্বাস ফেলছিস কুম্ভকর্ণের মতন।

বুকের কাছটা হাত বোলাতে লাগল গোগো। কেমন ব্যথা-ব্যথা করছে।

কী রে, লেগে গেল নাকি?

ভীষণ রাগ হল গোগোর, জবাব দিল না। এমন সুন্দর একটা স্বপ্ন ভেস্তে দিল ছোটকা। একেবারে লাস্ট রাউণ্ডে গিয়ে। আর একটু সবুর সইল না ছোটকার। আরেকটু সময় পেলেই তো অসুরটাকে কীচকবধ করে মিষ্টি মেয়ে রাধারানীকে নিয়ে একেবারে তার বাবার কাছে পেঁ'ছে দিয়ে আসতে পারতো গোগো!

গোগোকে গোঁজ হয়ে বসে থাকতে দেখে ছোটকা বলল—বুঝেছি, লেগে গেছে তোর! ভেরি সরি! কিন্তু কিছুতেই উঠছিলি না যে তুই!

রাগ সামলাতে না-পেরে গোগো বলল—কে বলেছিল আমায় তুলতে?

যা কাণ্ড করছিলি তুই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, তাই তো জাগিয়ে দিলাম। ঘরে ঢুকে দেখি হাত-পা ছুঁড়ছিস আর বিড়বিড় করে বকছিস।

মোটেই হাত-পা ছুঁড়ছিলাম না। আমি তখন কায়দা করছিলাম ইয়াহিয়া আর কালাচাঁদকে।

ইয়াহিয়া? কালাচাঁদ? তারা আবার কে?

অসুরটার দুই সাকরেদ।

হেসে ফেলল ছোটকা—ও স্বপ্ন দেখছিলি! তাই- বল্!

রাগটা কমে আসছিল গোগোর, আবার চড়ে গেল। এমনভাবে স্বপ্নের কথাটা বলল ছোটকা যেন একটা এলেবেলে স্বপ্ন যার মাথামুণ্ডু নেই।

গোগো গম্ভীরভাবে বলল—নিজে দেখতে পাওনি বলে ও-রকমভাবে স্বপ্ন বলছো। দেখতে পেলে বর্তে যেতে।

কেন. কী স্বপ্ন?

স্বপ্নেও তুমি ভাবতে পারবে না। শুধু তোমার জন্যে নইলে অসুরটাকে ঘায়েল করে রাধারানীকে আমি একেবারে তার বাবার কাছে পেঁ'ছে দিয়ে আসতাম।

রাধারানী?

যেমন মিষ্টি নাম, তেমনি মিষ্টি দেখতে। অসুরটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে।

শুনে আবার হাসতে লাগল ছোটকা। বলল—কাল কী খেয়েছিলি?

রাগে গোগো জবাব দিল না।

বল্ না, কী খেয়েছিলি?

কী আবার? তুমি যা খেয়েছিলে তাই।

মনে পড়েছে—ডিম খেয়েছিলি ঘুগনিওয়ালার কাছ থেকে। হজম করতে পারিসনি। পেট গরম হয়ে তাই ঐ সব আজগুবি স্বপ্ন দেখেছিস।

গোগো প্রতিবাদ করে উঠল—ডিম তো তুমিও খেয়েছিলে। আমি একটা, তুমি দুটো।

আমি কলেজে পড়ি, সাঁতার কাটি, ব্যায়াম করি। চারটে খেলেও আমার কিছু হবে না। আমাদের বড়দের কথা আলাদা। কিন্তু তুই স্কুলে পড়িস, ছেলেমানুষ—তোর হবে!

ছোটকার সব ভালো শুধু এই একটা ব্যাপার ছাড়া। সুযোগ পেলেই স্কুল আর কলেজে পড়ার মধ্যে কী ভীষণ যে একটা তফাৎ, সেটা বুঝিয়ে দেবে গোগোকে। মাত্র দু-বছর আগে যে নিজেও ঐ স্কুলেই পড়তো, সে কথা বেমালুম ভুলে গেছে ছোটকা। তিন বছর...আর মাত্র তিনটে বছর পরে গোগোও যে কলেজে পড়বে সেটাও একবার ভাবে না।

দোষটা অবশ্য সবটা ছোটকার নয়। গোগোদের বাড়িতে সেই আদ্যিকাল থেকে যে নিয়ম চলে আসছে, আসল গলদটা সেখানেই। কেউ কলেজে ভর্তি হলেই তার সাত খুন মাপ। সকালে সে সাঁতার শিখতে যেতে পারবে লেকে, সন্ধের পরও জুডো শিখতে পারবে, ব্যায়াম করতে পারবে ক্লাবে। একা একা যেখানে খুশি যেতে পারবে, যখন খুশি বেরুতে পারবে। শুধু তাই নয়, প্রতি মাসে দশটাকা করে হাতখরচা পাবে—সিনেমা দেখা, খেলা দেখা, রেস্টুরেন্টে খাওয়ার জন্যে। তার উপর খাতা, বই দরকার বললে তার টাকাটা হাতেই পাবে, কেউ কিনে এনে দেবে না। কিন্তু যতদিন স্কুলে থাকবে কিচ্ছু না। ততদিন পড়াশোনা ছাড়া আর কিছু চলবে না। রোজ বিকেলে কিছুক্ষণ খেলার ছুটি ছাড়া আর কিছু পাবে না। কোথাও একা-একা যেতে পারবে না। সিনেমা দেখা, খেলা দেখা তো দূরের কথা, একগাল চানাচুর কিনে খাওয়ার জন্যেও একটা পয়সা পাবে না কেউ হাতে। কী চাই, কেন চাই বলতে হবে বড়দের কারুকে, তেনারা শুনে বিবেচনা করে দেখবেন এবং নেহাৎ খুব দয়া হলে তবে দু-একদিনের মধ্যে কিনে এনে দেবেন।

সেদিক দিয়ে বরং ছোটকা অনেক ভালো। প্রাণে দয়ামায়া আছে বলতেই হবে। গোগোকে সঙ্গে করে মাঝে মাঝে খেলা দেখতে নিয়ে যায়। চাইলে দশ বিশ পয়সা হাতে দেয় গোগোর। তা ছাড়া প্রায়ই খাওয়ায়। বিকেলবেলা ক্লাবে গিয়ে ছোটকাকে ধরতে পারলে খাওয়া একরকম বাঁধা। ব্যায়াম করার পর ভীষণ খিদে পায় ছোটকার আর ক্লাবের এক বাঁধা ঘুগনিওয়ালা রয়েছে, তার কাছ থেকে তখন ডিম খায় ছোটকা। গোগোকেও খাওয়ায়। তবে নিজে দুটো খেলে গোগোকে একটা দেয়। নিজে একটা খেলে গোগোকে আলুর দম দেয়। বলে—আজ আলুর দম খা। ছেলেমানুষ, রোজ রোজ ডিম খেলে তোর পেট গরম হবে।

সোজা বললেই হয়, আজ পয়সা কম আছে, গোগো। তুই আজ আলুর দম খা। কিন্তু তাতে তো আর গোগোর উপর হামবড়াই করা হয় না!

গোগো অবশ্য কোনো দিন কিছু বলে না। আলুর দম হলেও তবু তো বাড়িতে লুকিয়ে ছোটকা খাওয়াচ্ছে!

এখনও গোগো কিছু বলল না, মেনে নিল পেট গরমের কথাটা। কিন্তু নিয়ে বুঝি ভুল করল। ছোটকা গম্ভীর চালে বলল—তুই ছেলেমানুষ, আমারই ভুল হয়েছে তোকে ডিম খাওয়ানো। আর খাওয়াবো না কোনো দিন।

এবার আর গোগো প্রতিবাদ না করে পারল না। বলল—মোটেই না। ডিম খাওয়ার জন্যে মোটেই হয়নি। ডিম তো আমি প্রায়ই খাই, রোজ কি অসুর আর রাধারানীকে স্বপ্ন দেখি ?

ছোটকা জবাব দিতে পারল না। পারছে না দেখে গোগোও চেপে ধরল আরো—বলো! তুমিই বলো, আজ তবে কেন অসুর আর রাধারানীকে স্বপ্ন দেখলাম?

ছোটকা চোখদুটো ছোটো-ছোটো করে বলল—কী নাম বললি?

কার, অসুরটার? নাম জানবার সময় কি আর তুমি দিলে?

না-না, মেয়েটার!

বললাম তো, রাধারানী।

শুনে হাসি ফুটে উঠল ছোটকার মুখে—বুঝেছি!

কী বুঝেছো?

কী করে স্বপ্নটা তুই দেখেছিস! কালকের কাগজে পতিতপাবন সাহার ঠাকুরবাড়ি থেকে রাধারানীর সোনার বিগ্রহ চুরি যাবার খবরটা বেরিয়েছে। সেইসঙ্গে যে উদ্ধার করে দিতে পারবে বা কোথায় বিগ্রহটা আছে খবর দিতে পারবে তাকে তিন হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে পতিতপাবনবাবুর ঘোষণাটাও। সেই সব পড়েই মাথা গরম হয়েছিল তোর। তার উপর ডিম খেয়েছিস বিকেলে। ব্যস, পেট মাথা গরম হয়ে সেই সবই রাতে তুই স্বপ্ন দেখেছিস!

একেবারে জলের মতন বুঝিয়ে দিল ছোটকা। গোগোও আপত্তি করতে পারল না। এতক্ষণ কালকের কাগজের ঐ খবরটার কথা মনে পড়েনি। ছোটকা বলতেই সব মনে পড়ে গেল।

বোধহয় তেমন জোরালো খবর আর কিছু ছিল না, তাই কাল কাগজের প্রথম পাতাতেই খবরটা ছাপা হয়েছে। ছবি দিয়ে বেশ ফলাও করে। ছবিতে কৃষ্ণ ঠাকুর একা দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে, পাশে রাধারানীর জায়গাটা খালি। ঐখানেই রাধারানীর সোনার বিগ্রহটি আজ এক বছরের উপর ছিল। সেই বাংলাদেশে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হবার পর, ইয়াহিয়া খানের সৈন্যরা হত্যা, লুট আর অত্যাচার শুরু করার পর সেইখান থেকে লুকিয়ে নিয়ে আসার পর থেকেই। সকাল-সন্ধে দু-বেলা পুজো হয়েছে, সবাই দেখেছে। দেখেছে পরশুর আগের দিন রাত্তির পর্যন্ত।

সকলের চোখের সামনেই তারপর মন্দিরের দু-প্রস্থ দরজায়—প্রথমটা লোহার পাতের, দ্বিতীয়টা কাঠের, এক-এক করে বন্ধ করে তালা দেওয়া হয়েছে। তারপর কোলাপসিবল গেট টেনে তালা দেওয়া হয়েছে সেই গেটে। সোনার বিগ্রহ রয়েছে বলেই এত তালার ব্যবস্থা, এত সাবধানতা। তারপর যে যার ঘরে গিয়েছে।

পরের দিন অর্থাৎ পরশু ভোরে দেখা গেল বাইরের কোলাপসিবল গেটের তালা যেমন ঝোলে রোজ, তেমনিই ঝুলছে। ভিতরে কাঠের দরজাতে, তার ভিতরে লোহার পাতের দরজাতেও তালাগুলি তেমনি ঝুলছে। শুধু বেদীর উপর সোনার রাধারানীর বিগ্রহ নেই!

দেখে মাথা ঘুরে গেল বৃদ্ধ পূজারী বৃন্দাবন ভট্টাচার্যের। খবর পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে নেমে এলেন পতিতপাবনবাবু, তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলে শ্যামচাঁদ ও কালাচাঁদ। তারপর পুলিশে খবর। পুলিশ এসে গেট, দরজা ও তালাগুলির ছবি নিয়েছে—আঙুলের ছাপের জন্য। পুলিশের কুকুরও আনতে চেয়েছিল কিন্তু মন্দিরে কুকুর ঢুকতে দিতে পতিতপাবনবাবু রাজী হননি। অগত্যা পুলিশ বাড়ির সবাইকে বেশ কিছুটা জিজ্ঞাসাবাদ করে চলে গিয়েছে। পতিতপাবনবাবু পাগলের মতন হয়ে গিয়েছেন। সোনার বিগ্রহটি তাঁরই সম্পত্তি ছিল কিন্তু পাগল হবার কারণ সবটা তাই নয়। মন্দির থেকে ইষ্ট দেবী চলে যাওয়ায় বিরাট একটা অমঙ্গলের আশঙ্কা মনে দেখা দিয়েছে তাঁর। তাই বিগ্রহটি ফিরে পাবার জন্যে তিন হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন তিনি।

গোগোর মতন ছোটকাও বোধহয় কালকের কাগজের ঐ খবরটা পুরোপুরি মনে করবার চেষ্টা করছিল। গম্ভীরভাবে বলল—তোর স্বপ্নের অসুরটার সাকরেদ-দুটোর কী নাম বললি যেন?

ইচ্ছে করছিল না গোগোর বলতে তবু বলতে হল—ইয়াহিয়া আর কালাচাঁদ।

জানিস, ও দুটোরও হদিশ পাওয়া গেছে?

খুব জানে গোগো, অনেক আগেই সে নাম দুটোর হদিশ পেয়ে গেছে। অমন একটা দুর্দান্ত স্বপ্ন একেবারে কুচিকাটা করে দিল ছোটকা। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল গোগোর বুক থেকে। বলল—হুঁ।

চোখ মিটমিট করে কী যেন ভাবল ছোটকা। তারপর লাফিয়ে উঠল—দাঁড়া, কালকের কাগজটা একবার নিয়ে আসি। ভালো করে পড়ে দেখি আরেকবার।

বেরিয়ে গেল ছোটকা ঘর থেকে আর গোগো যেন বাঁচল। তাড়াতাড়ি উঠে মুখ ধুয়ে এখনই সে পড়তে বসে যাবে। এই স্বপ্নের সঙ্গে জড়িত কোন ব্যাপারে আর কথা বলতে চায় না গোগো ছোটকার সঙ্গে। কাগজ নিয়ে এসে ছোটকা কিছু বলবার চেষ্টা করলে গম্ভীর হয়ে বলবে—অনেক পড়া রয়েছে আমার!

টেবিলে বসে ভূগোলের বইয়ের দুটো পাতা গোগো পড়েছে কি পড়েনি, কাগজটা হাতে নিয়ে লাফাতে লাফাতে ছোটকা এসে আবার ঢুকল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—পাঁচ হাজার! বুঝলি গোগো, পাঁচ হাজার!

বুঝতে না-পেরে গোগো বলল—পাঁচ হাজার কী?

টাকা! পুরস্কারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে পতিতপাবন সাহা। কালকের কাগজটা পেলাম না। আজকের কাগজে কিছু আছে কি না দেখতে গিয়ে দেখি—এই দ্যাখ!

বলে গোগোর সামনে কাগজটা ফেলে দিল ছোটকা। নিস্পৃহভাবে দেখল গোগো। তারপর কাগজটা ভাঁজ করে সরিয়ে রেখে বইয়ের পাতায় আবার মন দিল।

থুতনিতে হাত দিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছিল ছোটকা। মুখ তুলে বলল—ভাবছি, কেস্‌টা টেক আপ করবো।

শুনে বইয়ের পাতায় আর চোখ রাখতে পারল না গোগো। বলল—কী টেক আপ করবে?

পতিতপাবন সাহার কেস্‌টা।

তু—মি?

হ্যাঁ। যা বুঝতে পারছি, পুলিশ কিছুই করে উঠতে পারবে না। ঐ পাঁচ হাজার টাকা দেখছি আমাকেই নিতে হবে শেষ পর্যন্ত।

এমনভাবে কথাটা বলল ছোটকা যেন খুব অনিচ্ছাসত্ত্বেও টাকাটা নিতে হবে। না নিয়ে কোনো উপায় নেই। এই হামবড়াভাবটাই ভীষণ একটা দোষ ছোটকার। পুলিশের গোয়েন্দাবিভাগে এখন ন-কাকা না থাকলেও তার মতন বাঘা বাঘা আরো কত গোয়েন্দা রয়েছে। তারা যেখানে কিছু করতে পারবে না, সেখানে ছোটকা পারবে এ কথা ভাবছে কী করে ছোটকা?

ছোটকা বলল—যত দিন যাবে, দেখিস পুরস্কারটা ততো

বাড়িয়ে দেবে পতিতপাবন সাহা। পাঁচ হাজার থেকে সাত হাজার। সাত থেকে দশ। দশ থেকে—

বাধা দিয়ে গোগো বলল—কিন্তু সেটা পেতে হলে আগে সোনার বিগ্রহ উদ্ধার করতে হবে। সেটা করবে কী করে?

একটা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে ছোটকা বলল—সেটা খুব কঠিন হবে না। বাংলা-ইংরেজী মিলিয়ে প্রায় পাঁচশো মতন ডিটেকটিভ উপন্যাস আমার পড়া আছে। দেড় হাজারের মতন গল্প। তার মধ্যে কোনো না কোনোটার সঙ্গে পতিতপাবন সাহার বাড়ির সোনার রাধারানী চুরির কৌশল মিলে যাবেই। আর একবার কৌশলটা জানতে পারলে চোরধরা আর কী? কিছুই না। আর একবার চোর ধরা পড়লে তখন চুরির জিনিসও বেরিয়ে আসবে।

গোগো তবু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছিল, কিন্তু ছোটকা? জেগে জেগে যে স্বপ্ন দেখছে! ছোটকার কথা শুনে তাই হাসবে কি কাঁদবে, ভেবে পেল না গোগো। ন-কাকার মুখে গোগো শুনেছে গল্প-উপন্যাসের চুরি-ডাকাতি, খুন-জখমের সঙ্গে আসলে যা ঘটে তার মধ্যে মিল খুব কম। যে কারণে গল্প-উপন্যাসে সব অপরাধীই ধরা পড়ে—আসলে যা নাকি হয় না। তা যদি হতো তাহলে গোয়েন্দাকাহিনীর লেখকরাই সবচেয়ে বড় গোয়েন্দা হতো। কিন্তু তা নাকি কোনোদিনই হয়নি। অমন শার্লক হোমস কাহিনীর লেখক ডাক্তার কোনান-ডয়েলকে নাকি খুব আশা করে একবার ডাকা হয়েছিল একটা সত্যিকার চুরির কিনারা করতে। অনেক চেষ্টা করেও নাকি তিনি কিছু পারেননি।

কিন্তু ছোটকাকে এ-সব কথা বলে লাভ নেই। বললেই বলবে, তুই স্কুলে পড়িস, ছেলেমানুষ। ও-সব তুই বুঝবি না। তাই গোগো শুধু বলল —তাই বুঝি?

বলার মধ্যে ছোটকা বুঝি অবিশ্বাসের একটু গন্ধ পেল। বলল—তাছাড়া কয়েকটা সূত্র তো এর মধ্যেই পেয়ে গেছি।

এর মধ্যেই সূত্র পেয়ে গেছে ছোটকা! গল্প-উপন্যাসে যেমন পড়া যায়! হাঁ-হয়ে গেল গোগো। জিজ্ঞেস না করে পারল না—কী সূত্র?

প্রথমত, যেই রাধারানীকে চুরি করে থাকুক, ঠাকুর-দেবতা সে মানে না। মানলে বিগ্রহচুরির মতন পাপকাজ সে কখনো করতে পারতো না। হিন্দু দেব-দেবী না-মানা অন্য ধর্মের লোক হওয়াও তার পক্ষে আশ্চর্য নয়।

হুঁ। আর কী সূত্র?

গেটে, দরজাদুটোয় অতগুলি তালা কিন্তু তার একটাও ভাঙা হয়নি।

ভাঙতে গেলে আওয়াজ হতো।

এসিড দিয়ে গালানোও হয়নি। সবগুলি চাবি দিয়ে খোলা হয়েছে। বাইরের কারুর পক্ষে অতগুলি চাবি জোগাড় করা সম্ভব নয়। তার মানে, চুরিটা বাড়িরই কারু কাজ!

যুক্তিটা মনে ধরল না গোগোর। বলল—বাড়িরই যদি কেউ হবে তবে সে কি চেষ্টা করবে না চুরিটা বাইরের কেউ করেছে বলে বোঝাতে?

ছোটকার মাথায় ব্যাপারটা ঢুকল না। বলল—হ্যাঁ। কিন্তু তাতে আটকাচ্ছে কোথায়?

অতগুলি তালা শুধু খোলা হয়নি, বন্ধও করা হয়েছে আবার। বাইরের লোক হলে তো বিগ্রহ নিয়ে চটপট সরে পড়বে। ধরাপড়ার রিস্ক নিয়ে মিথ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অতগুলি তালা বন্ধ করবে কি?

আমিও তো তাই বলছি।

কিন্তু বাইরের লোক বোঝাতে হলে তালাগুলি খোলা রাখাটাই কি উচিত ছিল না?

একটা হামবড়া হাসি ফুটে উঠল ছোটকার মুখে। বলল—উচিত ছিল কিন্তু এ-রকম দুয়েকটা ভুল করে বলেই তো অপরাধীরা ধরা পড়ে গোয়েন্দাদের হাতে। তুই জানিস না, এ-রকম একটা না একটা ভুল অপরাধীদের করতেই হবে। নইলে ধরা পড়বে কী করে?

কী বলবে গোগো? চোর ভুল করেছে কি করেনি, জোর করে কোনোটাই কি বলা চলে? বিশেষ করে, নিজের চোখে কিছু না দেখে? শুধু কাগজের ঐ খবর পড়ে?

একটু চিন্তা করে নিয়ে ছোটকা বলল—এক যদি কোনো গুপ্তপথ থাকে মন্দিরে ঢোকার!

গুপ্তপথ?

হ্যাঁ।

কাগজে কি গুপ্তপথের কোনো কথা লিখেছে?

গুপ্তপথের ব্যাপারটা গোপন বলেই হয়তো জানতে পারেনি। লিখতেও পারেনি তাই।

কিন্তু তেমন কোনো গুপ্তপথ থাকলে সে কথা কি পতিতপাবনবাবু পুলিশকে জানাতেন না?

হয়তো জানানোর উপায় নেই। যদি তাঁর ছেলেদের কারুকে তিনি সন্দেহ করে থাকেন তাহলে জানাবেন কী করে? গুপ্তপথের কথা শুনলেই পুলিশ বুঝতে পারবে কাজটা বাড়িরই কারুর। তখন ছেলেদের নিয়ে টানাটানি করবে।

কিন্তু তেমন সন্দেহ হলে কি আর পুলিশে খবর দিতেন পতিতপাবনবাবু?

কেন দেবেন না? শুধু সন্দেহই হয়েছে তাঁর, নিশ্চিত তো নন।

কিন্তু তেমন গুপ্তপথ থাকলে পুলিশই কি খুঁজে পেতো না?

পুলিশের কুকুর আনতে পারলে ঠিকই বের করতো খুঁজে। এমনিতে হয়তো ততটা খোঁজেনি। তা ছাড়া, গুপ্তপথের নিয়মই হচ্ছে, এমনভাবে তার মুখে ছবি বা জিনিস রাখা থাকে যে সেদিকটা নজর করে না কেউ।

ছোটকা তার এতদিনের ডিটেকটিভ গল্প-উপন্যাস পড়া সব বিদ্যে জাহির করছে বুঝে গোগো আর কথা বলল না। মন্দিরে গোপনে যাবার জন্যে একটা গুপ্তপথ কেন খ্যামোখা বানাতে যাবে পতিতপাবনবাবু, এই আসল প্রশ্নটাই তাই আর করল না। ঘরে বসে পতিতপাবন সাহার বাড়িতে একটা গুপ্তপথের কথা ভাবতে ছোটকার যদি ভালো লাগে তো তাই ভাবুক। সত্যি কিছু তো আর করতে পারবে না, করতে যাচ্ছে না।

ভুলটা সঙ্গে সঙ্গেই ভাঙিয়ে দিল ছোটকা। বলল—চল্! আর দেরী করে লাভ নেই। অকুস্থলে গিয়ে একবার সরজমীনে সব দেখা দরকার!

যাবে তুমি? সত্যি যাবে?

হ্যাঁ। বেশী দূর নয়. এই পদ্মপুকুরে। এত হাতের কাছে এমন কেস, এমন পুরস্কার কোনোদিন আর পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ! পেয়ে ছেড়ে দেবো. ভেবেছিস? নে, ওঠ্—

আমি?

হ্যাঁ, তোকেও দরকার। একজন সহকারী দরকার হয় গোয়েন্দাগিরিতে। যদিও তুই স্কুলে পড়িস, ছেলেমানুষ, তবু তোকে দিয়েই যাহোক করে কাজটা চালিয়ে নিতে হবে।

রাগ হয়ে গেল গোগোর। বলল—আমি গিয়ে কী করবো? আমি স্কুলে পড়ি, ছেলেমানুষ. গোয়েন্দাগিরির কী জানি যে যাবো?

খুব জানিস। আমার আলমারির আদ্ধেক বই লুকিয়ে পড়ে ফেলেছিস, সেটা ভেবেছিস আমি জানি না?

আকাশ থেকে পড়বার চেষ্টা করল গোগো—কখন পড়লাম?

সে তুই জানিস। কিন্তু তুই না-পড়লে বইগুলি আগে পরে হয় কী করে শুনি? হত্যা. রহস্যময় অন্তর্ধান. ব্ল্যাকমেল. ডাকাতি. চুরি সব আলাদা-আলাদা ভাগ করে নাম অনুযায়ী অ—আ—ক—খ বর্ণানুক্রমে আমার সাজানো থাকে। প্রায়ই দেখি বইগুলি

এগিয়ে পিছিয়ে গেছে।

লুকিয়ে পড়তে হয় বলে এক-একটা বই পড়তে দু-তিন দিন লেগে যায় গোগোর। বইয়ের সারির মধ্যে ফাঁক দেখে যদি ছোটকা ধরে ফেলে তাই বইগুলিকে আলগা করে সাজিয়ে রাখে গোগো। ফলে, বই আবার রাখতে গিয়ে আগে পরে হয়ে গিয়েছে।

ধরা পড়ে চুপ করে রইল গোগো। এতদিন ছোটকা কিছু বলেনি ভেবে একটু অবাকও হল।

একটু কেশে নিয়ে ছোটকা বলল—ওর মধ্যে অনেক বই আছে যা তোর পড়া উচিত নয়। বড়দা, বড় বউদি জানতে পারলে—

ভয় দেখাচ্ছে ছোটকা! তবু গোগো বলল—কিন্তু এখন আমি বাড়ি থেকে বেরুবো কী করে?

কেন, অঙ্কের খাতাটা কি তোর হঠাৎ ফুরিয়ে যেতে পারে না? সেকথা শুনে আমি কি তোকে পয়সা দিয়ে বলতে পারি না—যা কিনে আন্‌গে? তাছাড়া, ভেবে দ্যাখ্ যদি কোনোরকমে বিগ্রহটা উদ্ধার করে দিতে পারি তাহলে—

তাহলে কী, সেটা বলতে হল না গোগোকে। মুখে হামবড়াই করলেও ছোটকার মনটা তো সত্যিই ভালো। আর, কত অঘটনই তো রোজ ঘটছে। পাঁচ হাজার টাকা যদি ছোটকা পেয়ে যায় তাহলে রোজ-রোজ খেলা দেখা আর ডিম খাওয়ার আর কোনো চিন্তা থাকে না।

৩

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে গোগোকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল ছোটকার জন্যে। ঐ কয়েক মিনিটেই অনেক কিছু ভেবে নিল গোগো।

ছোটকার সঙ্গে যখন যাচ্ছেই গোগো তখন রহস্য সমাধানে ছোটকাকে যথাসাধ্য সাহায্যই করবে গোগো। পতিতপাবন সাহার বাড়িতে গিয়ে চোখকান খোলা রাখতে হবে গোগোকে যাতে সামান্য কোনো সূত্রও চোখ না এড়িয়ে যায়, তুচ্ছ কোনো কথাও কান না-পেরিয়ে যায়। লক্ষ্য করতে হবে কেউ তার পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু করেছে কি না, করছে কি না? বলেছে কি না, বলছে কি না? ন-কাকার কাছে গোগো শুনেছে, বেশির ভাগ অপরাধীই ধরা পড়ে অস্বাভাবিক আচরণ করে।

নে, জিলিপি খা! হারানের দোকানের জিলিপি—

জিলিপি! ফিরে তাকিয়ে গোগো দেখল বাঁ-হাতে বড় একটা ঠোঙা তার দিকে বাড়িয়ে ধরে ডানহাতে একটা জিলিপি মুখে পুরছে ছোটকা। মুখের মধ্যে সেটা ভাঙতে ভাঙতে ছোটকা বলল—সকালে উঠে তো কিছু খাসনি!

এইজন্যেই এত ভালো লাগে ছোটকাকে গোগোর। কী বিবেচনা ছোটকার। সেই সঙ্গে যদি একটু বুদ্ধি থাকতো! একেবারে নেই যে তা নয়। যথেষ্টই আছে নইলে বইয়ের ব্যাপারটা ধরল কী করে? কিন্তু যদি তার উপর আরো দুশো তিনশো গ্রাম বেশী থাকতো! থাকলে সোনার বিগ্রহ উদ্ধারের আশা আর কখনই ছোটকা করত না। অপরাধীকে হয়তো ধরা সম্ভব কিন্তু সোনার রাধারানীকে যে আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়, সেটা বুঝতে পারত ছোটকা। যেই সরিয়ে থাকুক সোনার রাধারানীকে, নিয়ে পুজো করবার জন্যে নিশ্চয়ই সরায়নি। সরিয়েছে রাধারানী সোনার বলে, সেই সোনার জন্যে। আর, তাই যদি হয় আর অপরাধীর ঘটে এতটুকু বুদ্ধি থাকে তাহলে সোনার রাধারানী আর রাধারানী নেই, এতক্ষণে শুধু সোনা হয়ে গিয়েছে। ধরা পড়বার জন্য সোনার বিগ্রহ কাছে নিয়ে নিশ্চয়ই অপরাধী বসে থাকবে না।

কথাটা ছোটকাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। নইলে শুধু ভুল পথেই যে ছুটবে ছোটকা, তাই নয়, ভীষণ একটা হতাশও হবে পুরস্কারের ব্যাপারে। সোনার বিগ্রহ রাধারানীকে উদ্ধার করতে পারলে বা তার খোঁজ দিতে পারলে তবেই পুরস্কারের প্রশ্ন

নে জিলিপি খা—

উঠছে কাগজে পতিতপাবন সাহার ঘোষণা মতন!

জিলিপি খেতে খেতে আর হাঁটতে হাঁটতে গোগোর মতন ছোটকাও বুঝি কী ভাবছিল। গোগো কিছু বলার আগেই বলে উঠল—বুঝছি গোগো, এটা নিশ্চয়ই ঐ গ্যাঙেরই কাজ!

ঐ গ্যাঙ?

হ্যাঁ, ঐ এক দলেরই কাজ যারা মন্দির, মিউজিয়ম থেকে সব মূর্তি, বিগ্রহ চুরি করে বিদেশের মিউজিয়মে বা কোটিপতিদের সংগ্রহশালায় পাঠিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাচ্ছে।

কিন্তু সেই সব মূর্তি-বিগ্রহের নানারকম ইতিহাস আছে। পাথরের বা ব্রোঞ্জ-পেতলের সেই সব মূর্তির আসল দাম তো সেটাই।

ইতিহাস একটা বানিয়ে দিতে কতক্ষণ? তুই কি মনে করিস ঐ সব বিদেশী মিউজিয়ম আর কোটিপতিরা কখনও ঠকে না? তাদের ঠকায় না এইসব চোরের দল? তার উপর মূর্তিটা যদি সোনার হয়, বুঝতে পারছিস, আরো কত লক্ষ ডলার বা পাউন্ডে সেটা বিক্রি করবে? সোনার দাম তো পাবেই, তার উপর—

কথার মাঝখানে থমকে থেমে গেল ছোটকা। রাস্তার ওপারে একটা বাড়ির দিকে তাকিয়ে বলল—সামনে পুলিশ ভ্যান,

দরজায় পুলিশ, মনে হচ্ছে ওই বাড়িটাই। নে, তাড়াতাড়ি শেষ কর্ ঠোঙাটা—

হাঁটতে হাঁটতে কখন পদ্মপুকুরে এসে পড়েছে, খেয়াল করেনি গোগো। ঠোঙা থেকে নিয়ে জিলিপিগুলি গোগ্রাসে মুখে পুরতে পুরতে ভালো করে দেখতে লাগল রাস্তার ওপারের বাড়িটা।

রাস্তার অনেকখানি নিয়ে পুরনো দোতলা বাড়ি। বাইরের দিকের একতলাটা সবই দোকান করে ভাড়া দেওয়া। তার কোনোটা সেলুন, কোনোটা ডাক্তারখানা, কোনোটা মনোহারী, কোনোটা দর্জির, কোনোটা মিষ্টির, কোনোটা ফুলের, কোনোটা মুদীর, কোনোটা চায়ের, কোনোটা পান-সিগারেটের, কোনোটা ইলেক-ট্রিকের, কোনোটা বা ঘড়ি-লাঠাইয়ের।

ঠিক মাঝখানের ফুল আর মিষ্টির দোকানের মাঝখান দিয়ে ছোট একটা দরজা বাড়ির মধ্যে ঢোকার। কিছু লোক ভীড় করেছে সেখানে কিন্তু একটা পুলিশের সিপাই আগলে রেখেছে দরজাটা।

ঠোঙাটা ফেলে দিয়ে রুমালে হাত মুছতে মুছতে ছোটকা বলল—চল্।

গোগো সন্দেহ প্রকাশ করল—ঢুকতে দেবে কি? যেভাবে সিপাইটা দাঁড়িয়ে আছে আর সবাই ভীড় করে ভিতরে উঁকিমারার চেষ্টা করছে তাতে মনে হয় না ভিতরে যেতে দিচ্ছে।

দেবে না মানে? পুরস্কার ঘোষণা করবে অথচ কারুকে বাড়িতে ঢুকতে দেবে না, দেখতে দেবে না—চালাকি নাকি?

রাস্তার এপারে আসতেই দরজাটার মাথায় সাদা পাথরের একটা ফলক চোখে পড়ল। বড় বড় অক্ষরে 'স্বর্ণময়ী রাধারানীর মন্দির' লেখা রয়েছে ফলকে। আর, গোগোর কথাও ঠিক হল, ভীড় ঠেলে দুজনে দরজার কাছে যেতেই সিপাইটা পথ আটকে বলল—মত্ জানা!

ছোটকা বলল—আমরা বিশেষ কাজে পতিতপাবনবাবুর কাছে এসেছি। এখনই দেখা হওয়া দরকার।

আভি অন্দর জানেকি অর্ডার নহী। ইনভিগিশন চলতী হ্যায়।

ইনভিগিশন? ছোটকা ঠিক বুঝতে পারল না। গোগো ফিসফিস করে বলল—ইনভেস্টিগেশন বলতে চাইছে বোধহয়।

সঙ্গে সঙ্গে ছোটকা একগাল হেসে সিপাইটাকে বলল—আরে, আমরা তো ঐ ইনভিগিশনের ব্যাপারেই এসেছি।

তব্ অর্ডার দিখাইয়ে।

অর্ডার? কার অর্ডার?

হমারা ইনসপেক্টর সাবকী অর্ডার।

তিনি কোথায়?

অন্দরমে হ্যায়।

বেশ, যেতে দাও। এখনি নিয়ে আসছি—

নহী, অর্ডার নহী দিখানেসে নহী জা সাকতে।

কিন্তু যার অর্ডার চাইছো, তিনি তো ভিতরে। ভিতরে না গেলে তার অর্ডার আনবো কী করে?

উও হম নহী জানতা।

কথাগুলি যে সে কী রকম আহাম্মকের মতন বলছে, ছোটকা সেটা অনেক বোঝাবার চেষ্টা করল সিপাইটাকে। একটু বুঝি বুঝলও সিপাইটা আর তাতেই ক্ষেপে গিয়ে তেড়ে উঠল—হটো! জলদি হটো নহী তো—

বাধ্য হয়ে তখন সরে আসতে হল। ছোটকা চাপাগলায় গোগোকে বলল—জুডোর প্যাঁচে এখনই ওর গাঁয়ের ক্ষেতের সর্ষেফুল দেখিয়ে দিতে পারি ব্যাটাকে। কিন্তু কর্তব্যরত পুলিশের গায়ে হাত-দেয়া বে-আইনী কাজ, তাই কিছু করতে পারছি না। তুই দাঁড়া এখানে, আমি অন্য ব্যবস্থা করছি—

বলে গোগোকে ভীড়ের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখে ছোটকা পুলিশ ভ্যানটার কাছে গেল। ভ্যানের মধ্যে বসা ড্রাইভারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কী যেন কথাবার্তা বলল। তারপর সেই ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে বীরদর্পে ফিরে এল। দরজায় সিপাই-টাকে গিয়ে কী যেন বলল ড্রাইভার আর সিপাইটা জ্বলন্ত-দৃষ্টিতে একবার ছোটকার দিকে তাকিয়ে নিয়ে তারপর গলা নামিয়ে বলল—জাইয়ে!

গোগোর দিকে ফিরে তাকিয়ে ছোটকা হেসে বলল—ভিতরে তরুণদা আছে। ন-দার বন্ধু। তুই দাঁড়া, আমি এখনি আসছি।

বলে দেখতে দেখতে ছোটকা দরজার পর সরু পথটা পেরিয়ে ভিতরের উঠোনে চলে গেল। শুধু উঠোন নয়, উঠোনের পর ঠাকুরবাড়ির কিছুটাও দেখা যাচ্ছে দরজার মধ্যে দিয়ে। বাঁশ বাঁধা রয়েছে ঠাকুরবাড়ির গায়ে। চুনকামের কাজ চলছে।

মন্দির খোলাই রয়েছে কিন্তু সিঁড়িতে দুটো সিপাই আর উপরে কিছু লোক ভীড় করে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে কিছু দেখা যাচ্ছে না। মন্দিরের ভিতরটা একটু অন্ধকারও। কাঠের দরজা, লোহার দরজা—কাগজে যেগুলির খবর বেরিয়েছিল, সেগুলি কিছু নজরে আসছে না। শুধু বাইরে দু-ধারে টানা কোলাপ-সিবল গেটের দুটো অংশ দেখা যাচ্ছে।

ছোটকা গিয়ে প্রথমে সিঁড়িতে দাঁড়ানো সিপাই দুটোর সঙ্গে কথা বলল। তারপর উঠে গিয়ে আর সকলের মতন কী যেন দেখতে লাগল মন্দিরের মধ্যে। তারপর মন্দির থেকে নেমে এসে বাঁ-দিকে, গোগোর চোখের আড়ালে চলে গেল। গোগো বুঝতে পারল ছোটকা ন-কাকার বন্ধু তরুণ সরকারকে খুঁজছে গোগোকে ভিতরে নেবার জন্যে।

একা বাইরে ঐ ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে প্রথমটা রীতিমতন খারাপ লাগছিল গোগোর। কখন ছোটকা আসবে গোগোকে ভিতরে নিয়ে যাবার জন্যে, সেই অপেক্ষায় অধৈর্য হয়ে উঠছিল। তারপর চারপাশের ভীড়ের মধ্যে থেকে কিছু কথাবার্তা কানে আসতে কানদুটো তার খাড়া হয়ে উঠল।

এদিক দিয়ে যেতে গিয়ে ভীড় দেখেই বুঝি একজন উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করল—কী রে মন্টে, আজ আবার এত ভীড় কেন? আবার কী হলো?

মন্টে জবাব দিল—সেই রাজমিস্ত্রিগুলোকে পুলিশ একটু আগে অ্যারেস্ট করে নিয়ে এসেছে পচাদা!

পচাদা বোধহয় ঠিক বুঝতে পারল না। বলল—রাজমিস্ত্রি?

মন্টে বলল—হ্যাঁ, ঠাকুরবাড়ি যারা কদিন ধরে রঙ করছিল।

আর ঐ বেন্দাবনঠাকুর? এখনোও হত্যে দিয়ে রয়েছে নাকি মন্দিরে?

দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। ওই দ্যাখো না, মন্দিরে ভীড় রয়েছে।

মন্টের গলা নয়, পচাদার গলা নয়, অন্য একজন বলে উঠল—হত্যা দিয়ে থাকলেই যদি সোনার বিগ্রহ ফিরে আসতো তাহলে আর ভাবনা ছিল না। আসলে খুব একটা ভক্তি দেখাচ্ছে যাতে কেউ ওকে সন্দেহ না করে।

কাশতে কাশতে একজন বলল—পুলিশ তো শুনলাম পরশুই ওকে অ্যারেস্ট করতে চেয়েছিল, সাহামশাই অনেক বলে কয়ে আটকেছেন। তিনি নাকি বলেছেন, অসম্ভব! বৃন্দাবন ঠাকুর এ কাজ করতেই পারেন না। উনি যদি বিগ্রহ চুরি করে থাকেন তাহলে ঐ বিগ্রহ আর আমার চাই না।

চিবিয়ে চিবিয়ে অন্য একজন বলল—কেন, বেন্দাবনঠাকুর ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির নাকি? এখন সোনার দাম কত জানেন? জানেন কত দাম হবে ঐ বিগ্রহের? ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হলেও তাকে ছেড়ে দেবেন ভেবেছেন সাহাবাবু? আসলে সোনার বিগ্রহ না ছাই, ঐ বলে য্যাদ্দিন শুধু ধোঁকা দিয়ে এসেছে সকলকে। ব্যাপারটা বেন্দাঠাকুর জানে, রোজ তো চান করায়, পুজো করে! পুলিশের হাতে পড়ে যদি কিছু বলে ফ্যালে তাই পুলিশের হাত থেকে তাকে বাঁচিয়েছে!

সঙ্গে সঙ্গে চাঁছাছোলায় তাকে সায় দিয়ে উঠল আরেকজন—যা বলেছেন! আর আমরাও মশায় কম উজবুক নই। কোত্থেকে একটা কাঁসার না পেতলের পুতুল এনে বললে বাংলাদেশ থেকে সোনার বিগ্রহ এসেছে! ভীষণ নাকি জাগ্রত! ব্যস, সোনা শুনে আমরাও সব ভক্ত হনুমানের মতন হামলে পড়লুম এসে ওর মন্দিরে। এখন অবিশ্যি কমেছে কিন্তু গোড়ার সেই ভীড় মনে আছে? সেই ভোর থেকে পুজো দেবার কী লাইন পড়ে যেতো!

শুনে ফ্যাঁসফেসে গলায় আপশোষ করে উঠল আরেকজন—আহা, কী কেত্তন গাইতো তখন কেষ্ট ঘোষ রোজ সন্ধেবেলা! যেমন গলা, তেমনি ভাব। বেন্দাঠাকুরের সঙ্গে একদিন কী ঝগড়া হলো আর গাইতে আসে না। লোকও আসা ছেড়ে দিয়েছে।

এতক্ষণে মন্টের গলা শোনা গেল আবার। বলল—লোক আসবে কী? যা পয়সা-পয়সা করে বেন্দাঠাকুর। সেদিন মোহনবাগানের খেলা, দেখতে যাবার সময় পেন্নাম করতে গেলাম মন্দিরে। তা কী বলল জানেন বেন্দাঠাকুর? শুধু পেন্নাম কইরা কী হইবো? পেন্নামী দিয়া পেন্নাম করো, তবে না ফল পাইবা!

সঙ্গে সঙ্গে ছোকরা গলায় আরেকজন জিজ্ঞেস করল—কী রেজাল্ট হয়েছিল সেদিন?

মন্টে বলল—ড্র।

পেন্নামী দিয়েছিলেন?

না। পরে মনে হয়েছিল, দশটা পয়সা দিলেই হতো বেন্দাঠাকুরের কথামতন।

শুনে ভেংচে উঠল ছোকরা-গলা—পরে মনে হয়েছিল! এক-একটা পয়েন্টের এখন ভ্যালু জানেন? সাধে কি আর এই অবস্থা মোহনবাগানের? এই সব সাপোর্টার—দশটা পয়সা যারা খরচ করতে পারে না মোহনবাগানের জন্যে!

একসঙ্গে অনেকে ছি-ছি করে উঠল। মন্টের পচাদার গলাও শোনা গেল—নিজে না-দিবি, আমাকে তো অন্তত বলতে পারতিস!

মন্টে খুব লজ্জায় পড়ে গেল, আর দাঁড়ালো না। ঐ যাঃ, সাড়ে ন-টা বেজে গেছে বলে সরে পড়ল।

সাড়ে ন-টা। হ্যাঁ, মিষ্টির দোকানের ঘড়িতে সাড়ে ন-টাই। দেখে টনক নড়ল গোগোর। সাড়ে দশটায় স্কুল—এতক্ষণে স্নান করতে ঢোকার কথা গোগোর। একটু পরেই গিয়ে খেতে না বসলে খোঁজ পড়বে তার।

নাঃ। খোঁজ তার অনেক আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে। সকালের জলখাবার খেয়ে আসেনি গোগো।

কিন্তু ছোটকা? গোগোর কথা ভুলে গেল নাকি ছোটকা? কী করছে ছোটকা এতক্ষণ ভিতরে?

ভীষণ রাগ হয়ে গেল গোগোর ছোটকার উপর। গোগো আসতে চায়নি, ছোটকাই জোর করে নিয়ে এসেছে। এখন বাড়ি ফিরে যে বকুনিটা খাবে গোগো সেটা শুধু ছোটকার জন্যেই। আর ছোটকা কিনা গোগোকে বাইরে দাঁড় করিয়ে ভিতরে একা মজা দেখছে!

এর জন্যে হয়তো আজ বিকেলে গোগোকে ডিম খাওয়াবে ছোটকা। কিন্তু তাই বলে এতক্ষণ হাঁ-করে দাঁড়িয়ে থাকবে গোগো আর বকুনি খাবে বাড়ি ফিরে?

আর দাঁড়ালো না গোগো। ভীড় থেকে বেরিয়ে এসে প্রায় ছুটতে শুরু করল।

আর, যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়। বাড়ি ঢুকতেই সামনে একেবারে গোগোর মা।

কোথায় গিয়েছিলি সকাল থেকে?

অঙ্কের খাতা ফুরিয়ে গেছে, কিনতে গিয়েছিলাম।

পয়সা কোথায় পেলি? আমার কাছ থেকে তো নিসনি—

শুনে ছোটকা দিয়ে দিল যে।

হুঁ। কৈ, খাতাটা দেখি—

দোকানে গিয়ে দেখি ছোটকার দেওয়া আধুলিটা নেই পকেটে।

দোকান তো ঐ মোড়ে। যেতে আসতে এতক্ষণ লাগে?

রাস্তায় কোথাও পড়ে গেল কি না, খুঁজছিলাম যে।

স্কুলে ক্লাস আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। প্রথম পিরিয়ডে ছিল ইংরেজী। দেরী করে পৌঁছনোর জন্যে এক চোট বকুনি খেল গোগো ইংরেজীর স্যার গোকুলবাবুর কাছে। খেয়ে ছোটকার উপর আরো রেগে গেল।

দ্বিতীয় পিরিয়ডে অঙ্ক। মাকে মিথ্যেকথা বলার ফল হাতে হাতে পেল গোগো। দেখল, তাড়াহুড়ো করে আসতে গিয়ে কাল সন্ধ্যেবেলা অতগুলি অঙ্ক কষে রাখা হোমটাস্কের খাতাটাই ফেলে এসেছে।

পরের পিরিয়ডে ছিল সংস্কৃত। সংস্কৃতেও গোগো খুব ভালো। পণ্ডিতমশাইও খুব পছন্দ করেন গোগোকে, আর গোবিন্দগোপাল তাঁর ঠাকুর্দার নাম বলে গোগোকে দোলগোবিন্দ বলে ডাকেন। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য গোগোর, এমনই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল যে পণ্ডিতমশাই ধাতুরূপ বলার জন্যে তিন-তিনবার দোলগোবিন্দ নাম ধরে ডাকতেও গোগো শুনতে পেল না। পাশের ছেলে ধাক্কা দিতে তবে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

তাতে চটেননি পণ্ডিতমশাই। হেসে জিজ্ঞেস করলেন—এতক্ষণ কোথায় দোল খাচ্ছিলে বাবা দোলগোবিন্দ? মহাকাশ-চারীদের সঙ্গে মহাশূন্যে, না, শাখামৃগদের সঙ্গে আফ্রিকার জঙ্গলে?

গোগো তাড়াতাড়ি বলল—না, স্যার। একটা কথা ভাবছিলাম।

কী কথা?

গোগো অত ভাবেনি, তখনও বুঝি কিছুটা অন্যমনস্ক ছিল। বলল—আজ্ঞে, শ্যামচাঁদ আর কালাচাঁদের মধ্যে কেউ চোর কি না?

শুনে পণ্ডিতমশাই হঠাৎ ভীষণ রেগে গেলেন। কারণও ছিল রাগবার। কিন্তু তাঁর দুই ছেলের নাম যে শ্যামচাঁদ আর কালাচাঁদ সে-কথা গোগো কী করে জানবে?

বটে? যাও, বেরিয়ে যাও ক্লাস থেকে। এক্ষুনি—

ক্লাস থেকে বের করে দেবার মতন কী এমন করেছে, বুঝতেই পারল না গোগো। এমন রাগতেও কখনো দেখেনি পণ্ডিতমশাইকে। কিছু যে বলবে, সে সাহস আর হল না।

কী হল? এখনও দাঁড়িয়ে আছো?

দুঃখে, অপমানে চোখে জল এসে গেল গোগোর। মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল ক্লাস থেকে। এতদিন স্কুলে পড়ছে গোগো, কিন্তু ক্লাস থেকে বের করে দেওয়া দূরে থাক, দাঁড়াতেও কোনো দিন হয়নি। সে দুটোই আজ হল। কার মুখ দেখে গোগো আজ সকালে উঠেছিল, কে জানে!

মনে হতেই ছোটকার হামবড়া, হাসি-হাসি মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। হাসি দেখে রাগ আরো বেড়ে গেল গোগোর, গা যেন জ্বলতে লাগল। যে করে হোক, একটা শিক্ষা এবার ছোটকাকে দিতেই হবে গোগোকে। এই যে আজ স্কুলে অপমান আর নাকাল হচ্ছে গোগো, এ তো সব ছোটকার জন্যেই। আর ছোটকা? গোগো যে বাইরে একা দাঁড়িয়ে ছিল, এখনও বোধহয় গোগোর কথা মনে পড়েনি ছোটকার! মনের আনন্দে ভিতরে গোয়েন্দাগিরি করছেন তিনি!

ডিটেকটিভ বই পড়ে গোয়েন্দাগিরি! ভেবে এত দুঃখেও হাসি পেল গোগোর। গোয়েন্দাগিরির 'গো'-ও তাতে করা

যায় না। ইচ্ছে করলে গোগো তবু পারত। তার জন্যে কলেজে পড়বার দরকার হোত না গোগোর। স্কুলে পড়তে পড়তেই পারত। দেবে নাকি সেটা হামবড়া ছোটকাকে একবার দেখিয়ে?

আর দাঁড়াল না গোগো। বারান্দা ধরে এগিয়ে গিয়ে সোজা হেডমাস্টারমশাইয়ের ঘরে ঢুকল।

গোগো ক্লাসের ভালো ছেলে। ফার্স্ট-সেকেন্ড-থার্ডের মধ্যে হয়ে প্রাইজ পেয়ে আসছে প্রত্যেক বছর। গোগোকে দেখে হেডমাস্টারমশাই সস্নেহে বললেন—কী রে, কী হয়েছে?

গোগো বলল—শরীরটা ভালো লাগছে না, স্যার। গা জ্বালা করছে।

অপমানে, রাগে গোগোর মুখ থমথম করছিল। লক্ষ্য করে হেডমাস্টারমশাই বললেন—জ্বর আসছে মনে হচ্ছে। কত দূরে বাড়ি? একা যেতে পারবি তো?

গোগো ঘাড় কাত করে জানালো পারবে। একটা স্লিপ কাগজে গেট-পাস লিখে গোগোর হাতে দিয়ে হেডমাস্টারমশাই বললেন—যা তাড়াতাড়ি চলে যা!

বইখাতাগুলি নিতে একবার ক্লাসে যেতেই হল গোগোকে। হেডমাস্টারমশাইয়ের স্লিপ দেখে একবার গোগোর মুখের দিকে তাকালেন পণ্ডিতমশাই। তারপর বললেন—যাও।

ক্লাস থেকে বেরিয়ে এল গোগো। তারপর স্কুল থেকে বেরিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল বাড়িতে।

একটু ভয় ছিল—হয়তো মা আর কাকীমাদের খাওয়া হয়নি এখনও। দেখল, নাঃ, হয়ে গেছে। উপরে চলে গেছে তারা, লোকজনরা বসে খাচ্ছে। দেখে নিশ্চিন্তে মেজকাকার বৈঠকখানায় ঢুকে তাঁর আইনের বইয়ের আলমারির মধ্যে বইখাতাগুলি প্রথমে ঢুকিয়ে রাখল গোগো। তারপর টেবিলের উপর থেকে ফোনের বইটা নিয়ে একটু খুঁজতেই নম্বরটা পেয়ে গেল।

নম্বরটা ডায়াল করবার সময় হাতটা একবার কেঁপে উঠল গোগোর। ঐ একবারই। তারপর যখন রিং হতে লাগল ওদিকে তখন একবার মনে হয়েছিল ফোনটা নামিয়ে রাখে। সে-ও ঐ একবারই।

রিং হয়ে যাচ্ছে, ধরছে না কেউ। শেষে ধরল একজন—হ্যালো?

রুমালটা বের করা, রেডি করাই ছিল গোগোর। রিসিভারের উপরে দু-ভাঁজ করা রুমালটা রেখে গলাটা যথাসাধ্য ভারী করে গোগো জিজ্ঞেস করল—পতিতপাবনবাবুর বাড়ি?

সাড়া এল—হ্যাঁ। কাকে চাই?

মিঃ সাহা আছেন?

কে বলছেন?

আমি বিরূপাক্ষ করঞ্জায়ী। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। মিঃ সাহা বাড়িতে থাকলে তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

ওধার থেকে জবাব আসতে বেশ একটু দেরী হল। তারপর সেই একই গলা বলল—হ্যাঁ, আমিই পতিতপাবন সাহা। কিন্তু আপনাকে তো আমি—

চেনেন না, এই তো? দেখুন, সেইটাই আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকি। মানে, কলকাতা শহরে যত কম লোক আমায় চিনবে, ততই কাজের সুবিধে আমার। তত কম ছদ্মবেশ ধারণ করার প্রয়োজন হবে আমার।

গোগোর কথাটা পতিতপাবন সাহাকে খুশী করতে পারল না। বরং একটু বিরক্তিই ফুটে উঠল গলায়। বললেন—আপনার ফোনের জন্যে ধন্যবাদ। নাঃ, কোনো প্রাইভেট ডিটেকটিভের আমার দরকার নেই। পুলিশ তদন্ত করছে। যা করার, তারাই করবে।

কিন্তু পুলিশ যে কিছু করতে পারবে, সে-বিশ্বাস তো আপনার নেই।

কে বললো নেই?

আপনিই। পুলিশের উপর বিশ্বাস থাকলে কি আর বিগ্রহ উদ্ধারের জন্যে আপনি আলাদা করে পুরস্কার ঘোষণা করতেন? তারপর চব্বিশ ঘণ্টা যেতে না যেতে সে-পুরস্কারের পরিমাণ আবার বাড়িয়ে দিতেন?

সেটা অন্য কারণে। বিগ্রহের অভাবে মন্দিরে পুজো বন্ধ হয়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ি যদি বিগ্রহ ফেরত পাওয়া যায় তাই।

শুনছি, মন্দিরে যিনি পুজো করেন, তিনিও অনশন করে রয়েছেন।

হ্যাঁ, সেটাও একটা কারণ বটে।

তার মানে, পুলিশের উপর বিশ্বাস থাকলেও চটপট তারা কিছু করে উঠতে পারবে, সে-বিশ্বাস আপনার নেই।

জবাব দিতে এবার আবার একটু সময় লাগল পতিতপাবন সাহার। গলার সুরটাও একটু বদলে গেল। বললেন—পুলিশের যে একটু সময় লাগে তা তো জানেনই।

এই অবস্থায় যদি আপনার বিগ্রহটি চটপট আমি উদ্ধার করে দিতে পারি, আপত্তি আছে আপনার?

একটু দ্বিধাগ্রস্ত মনে হল পতিতপাবন সাহাকে। বললেন—আপত্তি...মানে—

আলাদা কোনো ফী-ও আপনাকে দিতে হচ্ছে না। পুরস্কারের টাকাটা তো রয়েইছে সেজন্যে।

স্বীকার করলেন পতিতপাবন সাহা—হ্যাঁ, তা আছে।

কোনো দিক দিয়েই লাভ ছাড়া লোকসান নেই আপনার। বলুন, আছে কি?

না।

আপনার কেসটা তাহলে আমি হাতে নিতে পারি?

বেশ তো, দেখুন না চেষ্টা করে—

তা তো করবোই। তবে আপনার একটু সহযোগিতাও তো দরকার হবে।

কী সহযোগিতা?

প্রথমত কী ভাবে চুরিটা হয়েছে সেটা বোঝার জন্যে সরজমীনে গিয়ে একবার সব দেখা দরকার আমার।

বেশ, বলুন কখন আসবেন?

গোড়াতেই আমি নিজে যাবো কি না, সেটা ভাবছি। মানে, যে-ভাবে চুরিটা হয়েছে, গেট-দরজার তালাগুলি যেমন ছিল, তেমনি রেখে—তাতে কাজটা ভিতরের কারুর সাহায্যে হওয়াটাও অসম্ভব নয়। তাই ভাবছি—

বলুন—

আমার চেহারাটা তাই গোড়াতেই দেখানো বোধহয় উচিত হবে না। প্রথমে আমার একজন সহকারীকে পাঠানোটাই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এমন একজন সহকারী যাকে দেখে সন্দেহ হবে না কারুর। দেখে স্কুলের ছেলে বলে ভাববে।

স্কুলের ছেলে?

আসলে যে তা নয়, সে তো বুঝতেই পারছেন। শুধু ছদ্মবেশটা তার তাই হবে।

ও!

আপনার অসুবিধে না থাকলে আজই, এখনই পাঠিয়ে দিতে পারি তাকে।

এখনই?

যত দেরী করবেন, বিগ্রহ ফিরে পেতে তত দেরী হবে আপনার।

বেশ, পাঠিয়ে দিন। হ্যাঁ, কী নাম বললেন আপনার?

বিরূপাক্ষ করঞ্জায়ী। আচ্ছা, নমস্কার।

নমস্কার। ফোনটা নামিয়ে রাখল গোগো। রাখার পর দেখল ঘামে সমস্ত জামা ভিজে গেছে তার। তা ভিজুক। কিন্তু গলা তো কাঁপেনি!
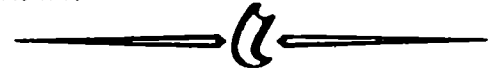
পতিতপাবন সাহার বাড়িতে যাবার জন্য রওনা হতে মিনিট দশেক সময় লেগে গেল গোগোর। প্রথমে কৌটো খুলে স্কুলের জন্য দেওয়া টিফিনটা খেয়ে নিল। টিফিনের সময় হয়ে গিয়েছিল কিন্তু গেলেও অন্যদিনের মতন খিদে মোটেই পাচ্ছিল না। তবু

খেয়ে নিল। গোগো দেখেছে, কিছু খেয়ে নিলে মনের মধ্যে ভয়-ভয় বা নার্ভাস ভাবটা বেশ কমে যায়।

গেলও কমে। ডিমের স্যান্‌ড্‌ইচ আর একটা সন্দেশ ছিল আজ টিফিনে। ভাগ্যিস, মেজকার টেবিলের গেলাসটায় জল ছিল! নইলে পতিতপাবন সাহার সঙ্গে ফোনে কথা বলে যা কাঠ হয়ে গিয়েছিল গলা আর তাতে যা বিষম লাগতো, তাতে খাবার ঘর থেকে ছুটে আসতো ঠাকুর-চাকররা। অসময়ে স্কুল থেকে ফেরাটা ধরা পড়ে যেত গোগোর।

তারপর টিফিন সেরে বৈঠকখানা থেকে পা টিপে টিপে বেরুতে যাবে গোগো, এমন সময় বাইরে সদর দরজাটা গোগোর মতনই সন্তর্পণে খুলে কে যেন ভিতরে ঢুকল। তারপর পা টিপে টিপে সিঁড়ির কাছে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে পরদার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে গোগো দেখল—ছোটকা! চটি হাতে নিয়ে পা টিপে টিপে নিঃশব্দে উপরে উঠে গেল ছোটকা। সেই সকালের চেহারা, সেই সকালের পোশাক। তার মানে, এতক্ষণ পতিতপাবন সাহার বাড়িতেই ছিল ছোটকা। আর, থাকার মানে—এতক্ষণ সেখানে অনেক কিছু দেখে এসেছে, জেনে এসেছে।

আসুক। ছোটকার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না গোগো। মাঝেসাঝে একটা ডিম, একটু আলুর দম বা ঘুগনি, একটা খেলা দেখা—এই তো। নাহলে গোগো কিছু মরে যাবে না। বেশী দিন তো আর নয়। চিরকাল তো আর গোগো স্কুলে পড়বে না।

এখনই খাওয়ার জন্যে আবার নিচে আসবে ছোটকা। ঢাকা আছে নিশ্চয়ই ছোটকার ভাত এবং সেইসঙ্গে তোলা আছে অনেক বকুনি আজ বিকেলে।

আর দেরী না করে গোগো বেরিয়ে পড়ল।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই পদ্মপুকুরে পতিতপাবন সাহার বাড়ির সামনে আবার পৌঁছে গেল গোগো। দেখল, পুলিশের ভ্যান চলে গেছে। দরজায় সিপাইটাও নেই, ভীড়ও সরে গেছে। দু-পাশের দোকানগুলির বেশির ভাগই বন্ধ। দুপুরে খেতে গিয়ে থাকবে লোকেরা।

দরজার উপর 'স্বর্ণময়ী রাধারানীর মন্দির' লেখা ফলকটা ছাড়া আরেকটি পাথরের ফলক এবার চোখে পড়ল গোগোর। দরজার পাশে ফুটপাথ থেকে ফুট চারেক উঁচুতে বাইরের দেওয়ালে বসানো বলে আগের বার চোখে পড়েনি। ভীড়ে তখন আড়াল হয়ে ছিল।

দরজার মাথার ফলকটার তুলনায় দেওয়ালের পাথরটা শুধু পুরনো নয়, আয়তনেও বেশ ছোট। ফলে, পাথরের উপরে 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির' লেখাটাও অনেক ছোট অক্ষরের।

দরজাটা হাট করে খোলা। ভিতরে মন্দির রয়েছে বলে তাই বোধহয় থাকে। ভীড় না থাকায় খোলা দরজা দিয়ে ভিতরের মন্দিরটা এখন আরো ভালো দেখা যাচ্ছে। খোলা রয়েছে মন্দির। খালিও। শুধু খাকী শার্টপরা একটা সিপাই বসে রয়েছে মন্দিরের সিঁড়িতে আর একজন কে যেন শুয়ে রয়েছে মন্দিরের মধ্যে বাঁশি হাতে দাঁড়ানো কৃষ্ণের সামনে। নিশ্চয়ই হত্যা দিয়ে থাকা বৃন্দাবন ঠাকুর। বোধহয় ওর জন্যেই মন্দির খোলা রয়েছে এই সময়ে। রাখতে হচ্ছে পতিতপাবনবাবুকে।

সিপাইটাকে দেখে একটু যেন নার্ভাস বোধ করল গোগো। ফিরে যাবে কিনা ভাবতে লাগল আর তার মধ্যেই চোখাচোখি হয়ে গেল সিপাইটার সঙ্গে। মনে সাহস এনে সঙ্গে সঙ্গে সিপাইটাকে গোগো জিজ্ঞেস করল—মিঃ সাহা আছেন?

অত দূর থেকে গোগোর গলাটা বুঝি ঠিক শুনতে পেল না সিপাইটা। বলল—ক্যা?

বাধ্য হয়ে দরজা ছেড়ে গোগোকে একটু ভিতরে ঢুকতে হল। সেই সঙ্গে কে একজন বাইরে থেকে দরজা দিয়ে ঢুকে এসে থমকে দাঁড়াল। পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল গোগোকে—কী চাই?

ফিরে তাকিয়ে গোগো দেখল ছোটকার বয়সী একটি যুবক। দু-এক বছরের বড়ও হতে পারে ছোটকার থেকে। বলল—আমি মিঃ সাহার কাছে এসেছি।

যুবকটি বলল—উনি তো এই সময়ে বাড়িতে থাকেন না।

গোগো বলল—আজ আছেন। একটু আগে ওঁর সঙ্গে কথা হয়েছে ফোনে।

যুবকটি অবাক হয়ে বলল—দাদার সঙ্গে?

গোগো হেসে বলল—না কালাচাঁদবাবু, আপনার বাবার সঙ্গে।

যদিও অঙ্কটা খুবই সোজা তবুও কালাচাঁদ বেশ অবাক হয়ে গেল গোগোর মুখে নিজের নাম শুনে।

তারপর বলল—ও, বাবার কথা বলছো?

হ্যাঁ। তাঁকে গিয়ে বলুন একটি স্কুলের ছেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

স্কুলের ছেলে?

হ্যাঁ, বললেই উনি বুঝতে পারবেন।

আবার বেশ কিছুটা অবাক হয়ে কালাচাঁদ ভিতরে ঢুকে গেল। গলিপথটা পেরিয়ে উঠোনে পড়ে বেঁকে গেল বাঁদিকে আর ফিরে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। সেই সঙ্গে আরো বুঝি বেশী অবাক হয়ে। এসে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গোগোকে লক্ষ্য করতে করতে বলল—বাবা বললেন, যা কিছু আপনি দেখতে চান, সেগুলি আগে দেখিয়ে তারপর আপনাকে বাবার কাছে নিয়ে যেতে।

'তুমি' থেকে 'আপনি'! তার মানে গোগোর পরিচয়টা পেয়ে গেছে কালাচাঁদ। দেখতে স্কুলের ছেলে হলেও আসলে যে সে তা নয়, সেটা শুনেছে। যথাসম্ভব ভারিক্কীভাব দেখিয়ে গোগো বলল—তাহলে আগে মন্দিরে চলুন।

কালাচাঁদের সঙ্গে ভিতরের উঠোনে এসে দাঁড়াতেই বাড়ির ভিতরটা এবার গোগো দেখতে পেল। দেখল, সামনের অতগুলি দোকান-ঘরের একটারও কোনো দরজা বা জানালা ভিতর দিকে নেই। বাড়িতে ঢোকবার ঐ জায়গাটুকু ছাড়া টানা দেওয়াল দিয়ে এদিকটা ভরাট। আর সেই দেওয়ালের শেষে বাড়ির দুই প্রান্তে দুটো সিঁড়ি উঠে গিয়েছে উপরে। দুটো সিঁড়ির মুখেই দরজা আর কোলাপসিবল গেট।

ডানদিকের সিঁড়ির মুখে দরজাটা বন্ধ। ভারী ভারী দুটো তালাও ঝুলছে কোলাপসিবল গেটে। আর বাঁদিকের সিঁড়ির দরজা আর কোলাপসিবল গেট শুধু খোলা নয়, সেখানে বাড়ির লাগোয়া একটা বড় ঘরও রয়েছে উঠোনের উপর। দুটো দরজাই ঘরটার খোলা আর তার মধ্যে দিয়ে ভিতরটা দেখা যাচ্ছে। অর্ধেক আপিস, অর্ধেক বৈঠকখানার মতন ঘরটা সাজানো। একদিকে যেমন চেয়ার, টেবিল, লোহার আলমারি রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি বড় বড় চৌকি লাগিয়ে তার উপর গদী আর চাদর পাতা। যাকে বলে ফরাস। সেই ফরাসে বসে ফর্সা, গোলগাল ফতুয়াপরা বছর ষাট বয়সের একজন কথা বলছে ফোনে।

মানুষটি যে পতিতপাবন সাহা, তাতে ভুল নেই। মানে, যে-রকম কর্তার মতন বসে রয়েছেন। তাছাড়া, এত কাছাকাছি যদি না থাকতেন তাহলে অত তাড়াতাড়ি কি কালাচাঁদ গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলে ফিরে আসতে পারত?

কানে ফোন ধরে পতিতপাবনবাবু এদিকেই তাকিয়ে ছিলেন। গোগো তাকাতেই মুখটা নামিয়ে কথা বলতে লাগলেন ফোনে।

উঠোন পেরিয়ে মন্দিরের সিঁড়িতে বসে পায়ের জুতো খুলতে খুলতে বাড়ির দোতলাটা এবার দেখে নিল গোগো। লোহার জাল দেওয়া টানা যে বারান্দাটা এদিক থেকে ওদিক চলে গিয়েছে সেটাকে মাঝখানে একটা দেওয়াল দুভাগে ভাগ করেছে। দেওয়ালের ডানদিকের ভাগের বারান্দাটা যেমন অপরিষ্কার, ঘরগুলিও তেমনি বন্ধ। আর বাঁদিকের ঘরগুলি যেমন খোলা, তেমনি বারান্দার দড়িতে তোয়ালে-গামছা ঝুলছে।

গোগোকে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে কালাচাঁদ বলল—এদিকটায় আমরা থাকি।

ওদিকটায়?

একটা ব্যাংকের গুদাম ছিল।

এখন?

একটা গেঞ্জিকলের সঙ্গে কথা হচ্ছে।

মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে গোগো আড়চোখে লক্ষ্য করল সিপাইটা প্যাট প্যাট করে গোগোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মনের মধ্যে বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করল গোগো; তারপর সেটা ঝেড়ে ফেলবার জন্যেই প্যাট প্যাট করে সে-ও তাকালো সিপাইটার দিকে। আর সেই সঙ্গে গট গট করে উঠে গেল মন্দিরে।

উঠে প্রথমেই দৃষ্টিটা পড়ল মন্দিরের মধ্যে চোখ বুঁজে শুয়ে থাকা বৃন্দাবন ঠাকুরের উপর। বেশ বয়েস হয়েছে, মাথার চুল সব পাকা। শীর্ণ শরীর, তবে তার কতটা এই ক-দিনের উপবাসে সেটা ধরা শক্ত।

পায়ের আওয়াজ পেয়ে ধীরে ধীরে চোখটা একবার খুললেন বৃন্দাবন ঠাকুর। তাকিয়ে একবার গোগোকে দেখলেন, তারপর কালাচাঁদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। কালাচাঁদ ব্যস্ত হয়ে বলল—কিছু বলবেন জ্যাঠামশাই?

বৃদ্ধ যেন অতিকষ্টে ঘাড় নাড়লেন। তারপর চোখ বন্ধ করে আবার পাশ ফিরলেন। গোগো ফিসফিস করে বলল—ক-দিন এ-ভাবে আছেন?

বুধবার থেকে।

আপনজন কেউ ও'র নেই এখানে?

না। কোথাওই নেই। স্ত্রী অনেক দিন মারা গিয়েছেন। একটি ছেলে ছিল, সে-ও বাংলাদেশের যুদ্ধে মারা গেছে।

বৃদ্ধের দিকে আবার ফিরে তাকালো গোগো কথাটা শুনে। তারপর মন্দিরের বিগ্রহের দিকে নজর দিল। পাথরের বেদীর উপর বাঁশি-হাতে কৃষ্ণের যে বিগ্রহটি এতক্ষণ পাথরের মনে হচ্ছিল, সেটা পাথরের নয়—ধাতুর তৈরী। এক হাতের উপর লম্বা। পাশে সোনার রাধারানীর বিগ্রহ যে আকারে কৃষ্ণেরই মানানসই ছিল, সেটা অনুমান করা যায়। আর সেই আকারের একটা সোনার বিগ্রহের দাম যে অনেক, অনেক টাকা হবে তাতে সন্দেহ নেই।

বিগ্রহের পর মন্দিরের আর সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল এবার গোগো। জোরে পা ফেলে হেঁটে-চলে প্রথমে মেঝেটা দেখল। না, কোন জায়গাটাই ফাঁপা মনে হচ্ছে না। তার মানে কোন গুপ্তপথ নেই মন্দিরে। থাকলে মেঝেতেই থাকত, দেওয়ালে নয়। মন্দিরের বাইরের চারদিকই তো ফাঁকা। দেওয়ালে আর গুপ্তপথ থাকবে কী করে?

গুপ্তপথের সন্দেহটা আসলে ছোটকার। উপন্যাস-পড়া সন্দেহ। গোগোর তখনই মনে হয়েছিল সন্দেহটা বাজে। তবু ন-কার কাছে গোগো শুনেছে কোন সম্ভাবনাই নাকি উড়িয়ে দিতে নেই।

মন্দিরের দুটো দরজার দিকে এবার নজর দিল গোগো। তালা না খুলে কীভাবে দরজা খোলা যায়, গোগো জানে। যে কবজা-গুলি দিয়ে দেওয়ালে লাগানো থাকে, সেগুলি খুললেই হয়।

লোহা আর কাঠের দরজার কবজাগুলি খুব ভালো করে লক্ষ্য করে দেখল গোগো। না, সেগুলিতে কারু কারচুপির কোন চিহ্ন নেই। তারপর কোলাপ্সিবল গেট। এত শক্ত, ভারী গেট গোগো খুব কম দেখেছে।

দরজা-গেট কোথাও কোন তালা ঝুলতে না দেখে প্রথমে একটু আশ্চর্য হল গোগো। তারপর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কালাচাঁদকে বলল—তালাগুলি পুলিশ পরীক্ষা করার জন্যে নিয়ে গেছে বুঝি?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, এই চুরির ব্যাপারে আপনাদের কী ধারণা?

আমাদের?

ধরুন, আপনারই। কীভাবে চুরিটা হয়ে থাকতে পারে? কে করে থাকতে পারে?

আমার ধারণা ঐ মিস্ত্রিদেরই কাজ। নইলে কাজ করতে করতে চুরির পরের দিন সকাল থেকে আর কাজে আসবে না কেন?

পুলিশ তো ওদের ধরেছে শুনলাম।

ধরে আজ এখানে নিয়ে এসেছিল পুলিশ—সনাক্ত করাবার জন্যে।

কী বলছে ওরা?

বাবার পা ধরে খুব কান্নাকাটি করল। বললো, চুরির ব্যাপারে ওরা বিন্দুবিসর্গ জানে না।

এ ক-দিন আসেনি কেন, কিছু বললো না?

মজুরী নিয়ে শেষের দিন একটা গণ্ডগোল করে গিয়েছিল ওরা বাবার সঙ্গে। বাবাকে বোঝালো, সেই জন্যেই নাকি আসেনি। বাবাও নরম হয়ে ইনসপেকটরকে বললেন, মনে হয় না এরা করেছে। এদের ছেড়ে দিতে পারেন।

ইনসপেকটর কী বললেন?

সবাইকেই যদি ছেড়ে দিতে হয় তাহলে আর আমাদের ডেকেছেন কেন?

গলা নামিয়ে গোগো বলল—সবাই মানে আর কাকে? যিনি এখানে শুয়ে আছেন?

গোগোর মুখের দিকে তাকাল একবার কালাচাঁদ। তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে জানালো হ্যাঁ।

মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহটি নেই এটা প্রথম কে আবিষ্কার করেন? উনিই তো?

গোগো শুনেছিল, যে কোন বড় অপরাধের ব্যাপারে যে-ব্যক্তি প্রথম সেই অপরাধ আবিষ্কার করে, তার উপরেই নাকি পুলিশের সন্দেহটা প্রথম পড়ে। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, সে-সন্দেহটা পুলিশের অমূলক নয়।

কালাচাঁদও গলা নামিয়ে জবাব দিল—হ্যাঁ, উনিই। ভোরবেলা মন্দিরের তালা খুলে দেখতে পান বেদী খালি।

তালার চাবিগুলি কি ও'র কাছেই থাকে।

সারাদিন ও'র কাছেই থাকে। রাতে আরতির পর মন্দির বন্ধ করে বাবার কাছে দিয়ে দেন।

চুরির আগের রাতে মন্দির বন্ধ করবার সময় উনি ছাড়া আর কে-কে মন্দিরে ছিল?

বাবা ছিলেন। আরতির সময়, মন্দির বন্ধ করার সময় বাবা-মা রোজই থাকেন। সেদিন রাতে আমিও ছিলাম। দাদাও এসে গিয়েছিলেন।

সেদিন আরতির সময়ে অস্বাভাবিক কিছু কি লক্ষ্য করেছিলেন এই মন্দিরে?

কালাচাঁদ মনে করবার চেষ্টা করল। তারপর বলল—না, সেদিন তেমন কিছু চোখে পড়েনি। তবে—

তবে?

কথাটা বলবে কি না বুঝি একটু ভেবে নিল কালাচাঁদ। তারপর বলল—শুধু সেদিন বলে নয়। আরতির সময় যেদিনই আমি থেকেছি, তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন জীবন্ত মনে হয়েছে আমার রাধাকৃষ্ণ দু-জনকেই।

সন্ধেবেলা ঐ আরতির সময়টাতেই শুধু?

হ্যাঁ।

অন্য কোনো সময়ে তো নয়?

না।

মনে মনে গোগো হাসল। ধুপধুনোর ধোঁয়া যখন এঁকেবেঁকে, পাক খেয়ে উপরে ওঠে তখন তার মধ্যে দিয়ে দেখলে ও-রকমই মনে হয়। ব্যাপারটা একসময়ে গোগোও জানতো না. অন্য রকম ভাবতো। বাবাকে বলতে ক্যালেনডারের একটা বাঘের ছবির সামনে ধুপধুনো দিয়ে ব্যাপারটা দেখিয়ে আর বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বাবা গোগোকে। কালাচাঁদের অবশ্য নিজে থেকেই সেটা বুঝবার মতন বয়েস হয়েছে। তবে বয়েস হলেই তো সবার সমান বুদ্ধি হয় না। ছোটকারই কি হয়েছে? মানে, যতটা এখন হবার কথা, ততটা?

মনে মনে হাসলেও বাইরে গম্ভীর হয়ে গোগো বলল—ভারী আশ্চর্য তো! কথাটা আপনি কাউকে বলেছেন এর আগে?

মাকে বলেছিলাম। জ্যাঠামশাইকেও বলেছি।

মা কী বললেন?

কিছু বলেননি। ঠাকুরদের উদ্দেশে কপালে হাতজোড় করে প্রণাম করলেন শুধু।

আর বৃন্দাবন ঠাকুর? মানে, আপনার জ্যাঠামশাই?

উনিও তাই।

আচ্ছা, এই যে মন্দিরের চাবিগুলি সারাদিন আপনার জ্যাঠামশায়ের কাছে থাকে, তা কী ভাবে রাখেন তিনি? মানে, কারু পক্ষে তাঁর অজান্তে সেগুলির ছাপ নেওয়া কি সম্ভব?

মনে হয় না সম্ভব। সকালে বাবার কাছ থেকে চাবির গোছাটা নিয়েই সেটা পৈতেতে বেঁধে নেন জ্যাঠামশাই। রাতে পৈতে থেকে খুলে আবার বাবাকে দিয়ে দেন। ঐ যে দেখুন না, কী রকম মোটা গোছার পৈতে পরেন জ্যাঠামশাই চাবির গোছা বাঁধার জন্যে।

তাকিয়ে দেখল গোগো। সত্যিই তাই, এত মোটা গোছার পৈতে মাদ্রাজীদের ছাড়া আর কারুকে পরতে দেখেনি সে। দেখে নিয়ে বলল—চাবিগুলি দেখছি না। তালার সঙ্গে পুলিশ থেকে নিয়ে গেছে বুঝি পরীক্ষার জন্যে।

হ্যাঁ।

রাত্তিরবেলা চাবিগুলি আপনার বাবার কাছে থাকতো বলছেন। কী ভাবে রাখতেন তিনি?

সিন্ধুকে তুলে রাখতেন।

সিন্ধুকের চাবি কোথায় থাকতো?

বাবার গলার চেনে ঝোলানো থাকে সব সময়ে।

তার মানে, তাঁর অজান্তেও কারু পক্ষে চাবির ছাপ নেওয়া সম্ভব নয়। আচ্ছা, এমন কি কখনো হয়েছে যে আপনার বাবা বা জ্যাঠামশাই ওঁদের মধ্যে কারুর কোনো অসুখ বা অসুবিধে বা অন্য কোনো কারণে ওঁদের মধ্যে কেউ মন্দির খোলার বা বন্ধ করার জন্যে চাবিগুলি অন্য কারু হাতে দিয়েছেন?

কালাচাঁদ বেশ মনোযোগ দিয়ে মনে করবার চেষ্টা করল। তারপর বলল—তেমন কখনো ঘটেছে বলে আমার মনে পড়ছে না। তবে ওঁরা ভালো বলতে পারবেন।

তোমার বাবার কথা জানি না, কালু। তবে আমি কখনো হাতছাড়া করিনি।

অতিকষ্টে বলা কথাগুলি বৃন্দাবন ঠাকুরের। চমকে ফিরে তাকিয়েছিল গোগো। চোখাচোখি হতেই ক্লান্ত চোখদুটো বুঁজে তিনি মাথাটা আবার মেঝেতে রাখলেন।

তার মানে, এতক্ষণ সব কথাই তিনি কান পেতে শুনছিলেন! তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে গিয়ে নিচু হয়ে গোগো জিজ্ঞেস করল—কীভাবে চুরিটা হয়েছে, আপনার কোনো ধারণা আছে? কোনো সন্দেহ?

গোগোর প্রশ্নটা তাঁর কানে গিয়েছে বলেই মনে হল না প্রথমে। অপেক্ষা করে গোগো যখন আবার জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছে, চোখ না খুলেই বললেন—তুমি বাবা কে, আমি জানি না। তবে পুলিশ নও, বয়েস দেখে বুঝতে পারছি। কিন্তু পুলিশও আমাকে ঐ কথাই জিজ্ঞেস করেছিল।

কী বলেছেন আপনি?

বলেছি, আমি কিছুই জানি না।

আমাকেও কি তাই বলবেন, বা, বলছেন?

চোখ মেলে তাকালেন আবার বৃন্দাবন ঠাকুর। তারপর ধীরে ধীরে বললেন—না। তোমাকে বলবো—

বলে হাঁপাতে লাগলেন বৃন্দাবন ঠাকুর। গোগো আরও নিচু হয়ে বলল—কী বলবেন, বলুন—

মা রাধারানীকে কেউ চুরি করেনি। করার কারুর ক্ষমতা নেই।

তবে বিগ্রহ গেল কোথায়?

কোথায় গেছেন, জানি না। তবে যেখানেই যান, ফিরে তাঁকে আসতেই হবে এই মন্দিরে।

সেই জন্যেই কি আপনি হত্যা দিয়ে রয়েছেন?

উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছিলেন বৃন্দাবন ঠাকুর। ক্লান্তিতে চোখও আর খুলে রাখতে পারলেন না। একটু বিশ্রাম করতে দিয়ে আরো কয়েকটা প্রশ্ন তাঁকে করবে বলে অপেক্ষা করছিল গোগো, হঠাৎ পিছন থেকে একটা কঠিন গলার ধমক কানে এল—কী হচ্ছে, কালু? জ্যাঠামশায়ের শরীরের অবস্থা জানো না?

ফিরে তাকিয়ে গোগো দেখল ফর্সা, সুদর্শন, সুটপরা এক ভদ্রলোক কালাচাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে। মন্দির বলে জুতো খুলে এসেছেন বলে পায়ের আওয়াজও তেমন হয়নি।

ন-কাকার বয়সী ভদ্রলোক। অর্থাৎ ত্রিশ-বত্রিশ। কালাচাঁদের সঙ্গে মুখের মিলও রয়েছে। নিশ্চয়ই শ্যামচাঁদ।

কালাচাঁদ বলল—না, জ্যাঠামশাই নিজেই কথা বললেন তাই—

বলুন। উনি বললেই শরীরের এই অবস্থায় ওঁকে বিরক্ত করতে হবে?

বাধ্য হয়ে গোগোকে উঠে আসতে হল বৃন্দাবন ঠাকুরের কাছ থেকে। এসে শ্যামচাঁদকে আগে একটা নমস্কার করল গোগো। ক'রে হেসে বলল—আপনার ভাইয়ের কোনো দোষ নেই, শ্যামচাঁদবাবু। দোষ আমার। আমি অতটা বুঝতে পারিনি।

কালাচাঁদ তাড়াতাড়ি গোগোর পরিচয় দিতে বলতে গেল—ইনি এসেছেন একজন প্রাইভেট ডিটেক—

কালাচাঁদকে থামিয়ে দিয়ে শ্যামচাঁদ বললেন—বাবার কাছে শুনেছি। শুনে কী ব্যাপার হচ্ছে এখানে, সেটাই দেখতে এসেছি।

কথাবার্তাগুলি কেমন যেন ট্যারা-ট্যারা শ্যামচাঁদের। বিরক্তিটাও সমানে ঝুলে রয়েছে মুখে। তাছাড়া বাড়িতে ঢুকেই কালাচাঁদের কথা শুনে গোগোর মনে হয়েছিল শ্যামচাঁদ এই সময়টা বাড়িতে থাকে না। সুটপরা চেহারাটাও শ্যামচাঁদের তাই বলছে। কোনো আপিসেরই তো এখন ছুটি হবার কথা নয়।

কালাচাঁদ বলল—উনি মন্দিরটা আগে দেখছেন।

ভুরু কুঁচকে শ্যামচাঁদ বললেন—সেটা দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু তাতে লাভ কি কিছু হয়েছে? না, ছেলেখেলাই হচ্ছে শুধু?

কথাটা কালাচাঁদকে বললেও 'ছেলেখেলা' শব্দটা উচ্চারণ করার সময় শ্যামচাঁদ আড়চোখে একবার তাকালেন গোগোর দিকে। তার মানে, গোগোর স্কুলের ছেলে সেজে আসার ব্যাপারটা যে মিথ্যে, সেটা জানিয়ে দিতে চাইছেন কালাচাঁদকে। গোগোকেও বোধহয় সেইসঙ্গে বুঝিয়ে দিতে চাইছেন যে আর যাকেই চোখে ধুলো দিতে পেরে থাকুক গোগো, তাঁকে পারেনি।

ধরা পড়ে গিয়ে খুবই নার্ভাস হবার কথা গোগোর। প্রথমে একটু বুঝি হয়েও ছিল কিন্তু সেইসঙ্গে এমন রাগও হয়ে গেল যে নার্ভাসভাবটা আর রইল না। শ্যামচাঁদের মতনই ভুরু কুঁচকে শ্যামচাঁদের দিকে তাকালো। গম্ভীর হয়ে বলল—কিছু লাভ না হলে এখানে আর সময় নষ্ট করছি কেন? আমাদের সময়ের দাম আছে।

শুনে শ্যামচাঁদ যেন থমকে গেলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—কী লাভ হয়েছে, সেটা জানতে পারি?

গোগো অম্লানবদনে বলল—দু-একটা ক্লু পাওয়া গেছে।

শুনে যেন অবাক হলেন শ্যামচাঁদ। বললেন—কীসের ক্লু?

কীভাবে বিগ্রহটি সরানো হয়েছে মন্দির থেকে।

কী ক্লু, শুনতে পারি?

নিশ্চয়ই পারেন। আমি গিয়ে মিঃ করঞ্জায়ীকে রিপোর্টটা দিলেই তাঁর কাছ থেকে সব শুনতে পাবেন।

তিনি জানাবেন?

হ্যাঁ।

ফোনে?

কেসটা হোপফুল মনে হচ্ছে। হয়তো নিজেই চলে আসবেন।

মুখে বিরক্তি আর তাচ্ছিল্যের যে ভাবটা ছিল, সেটা আর নেই শ্যামচাঁদের মুখে। জিজ্ঞেস করলেন—তা মন্দিরে দেখা শেষ হয়েছে, না, বাকী আছে এখনো?

এখনকার মতন মোটামুটি শেষ হয়েছে। আচ্ছা,

শ্যামচাঁদবাবু—

বলতেই মুখে আবার যেন বিরক্তি ফুটে উঠল শ্যামচাঁদের আর গোগোকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—মিঃ সাহা সম্বোধনটা আমি বেশী পছন্দ করি। বলতেও বোধহয় সেটা বেশী সুবিধের।

নিজের নামটা যে একেবারেই পছন্দ হয়নি শ্যামচাঁদের, বুঝতে পারল গোগো। ও নাম কারুরই আজকের দিনে পছন্দ হবার কথা নয়। বিশেষ করে, এ-রকম সুট-টাই-পরা সাহেব মানুষদের।

একটু হাসিও বুঝি পেয়ে গিয়েছিল গোগোর কথাটা ভাবতে গিয়ে। সেটা চেপে বলল—ঠিকই বলেছেন। আচ্ছা মিঃ সাহা, এই চুরির ব্যাপারে আপনার কী ধারণা? মানে, কে বা কারা করে থাকতে পারে? তাদের কৌশলটাই বা কী হতে পারে?

প্রশ্নটা শুনে শ্যামচাঁদ যেন খুশীই হলেন। বললেন—এ নিশ্চয়ই কোনো বড় গ্যাং-এর কাজ। সোনার বিগ্রহ এখানে আসার খবর পেয়ে অনেক দিন ধরে তারা প্ল্যান করেছে, একটা-একটা করে চাবি তৈরী করিয়েছে তালাগুলির। তারপর সুযোগ বুঝে মঙ্গলবার রাতে—

বাকিটা আর বলার দরকার বোধ করলেন না শ্যামচাঁদ। গোগোও খুব মন দিয়ে শোনার ভান করল কথাগুলি। তারপর বলল—বড় গ্যাং-এর কাজ যে নয়, তা বলছি না মিঃ সাহা। কিন্তু চাবির কথাটায় একটু খটকা লাগছে।

কেন?

বৃন্দাবন ঠাকুর আর আপনার বাবার জিম্মায় যেভাবে চাবিগুলি থাকে বলে শুনেছি কালাচাঁদবাবুর কাছে তাতে সেটা কি সম্ভব? নকল চাবি তৈরী করতে হলে আসল চাবিগুলি তো হাতে পেতে হবে তাদের? তা সে একটা-একটা করেই হোক বা একসঙ্গে!

শুনে শ্যামচাঁদ তীক্ষ্মদৃষ্টিতে তাকালেন গোগোর মুখের দিকে। বললেন—চাবি হারিয়ে গেলে আমরা চাবি তৈরী করাই কী করে?

চাবিওয়ালাকে ডেকে। তালা থেকে।

এ-ক্ষেত্রেই বা তাতে বাধা কোথায়?

চাবিওয়ালা আসবে কী করে? লুকিয়ে তালা থেকে চাবি বানাবেই বা কখন?

বড় গ্যাং যদি হয় আর তারা যদি অনেকদিন ধরে প্ল্যান করে থাকে তাহলে বাড়িতে চাকর সেজে তাদের কেউ আসতে পারে। আর চাকর সেজে এলে রোজ রাত্তিরেই তো তার সুযোগ হচ্ছে তালা থেকে চাবি বানানোর।

শুনে শ্যামচাঁদের উপর শ্রদ্ধা এসে গেল গোগোর। সত্যি, এটা তো সে ভাবেনি। বলল—হুঁ, সেটা হতে পারে। তবে খুব বেশীদিন তেমন লোক থাকবে না। অল্পদিনের জন্যে তেমন কোন লোক কি আপনাদের বাড়িতে কাজ করে গেছে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্যামচাঁদ বললেন—আমাদের বাড়িতে কোনো লোকেরই বেশীদিন কাজ করার উপায় নেই।

কেন? বাজার করতে গিয়ে অল্পবিস্তর চুরি চাকর মাত্রেই করে। কিন্তু আমাদের বাড়িতে তা করার উপায় নেই।

কেন?

বাবার জন্যে। বাজারে কীসের কী দর, বাবা খবর রাখেন। চোখে দেখে জিনিসের ওজনও বলে দিতে পারেন। ফলে কারুরই চুরি ধরা পড়তে বেশীদিন লাগে না। আর, একবার চোর জানার পর তাকে তো আর বাবা রাখবেন না।

সবাই কি তারা অজানা—অচেনা?

ঘন ঘন চাকর বদল হলে অত চেনা-জানা চাকরই বা পাওয়া যাবে কোত্থেকে?

যারা কিছু দিনের মধ্যে কাজ করে গেছে, তাদের মধ্যে বিশেষ কোনো একজনকে কি আপনার সন্দেহ হয়?

একজনের কথা পুলিশকে বলেছি। একদম চোর ছিল না লোকটা। যাকে বলে চরিত্র-বিরুদ্ধ চাকর।

তবে সে গেল কেন এখান থেকে?

অন্য এক জায়গায় অনেক বেশী মাইনে পেয়ে। আমাদের অন্তত তাই বলে গেছে।

কথাটা সত্যি কি না যাচাই করেছিলেন?

তখন যাচাই-এর প্রয়োজন হয়নি। এখন হয়েছে; তাকে খুঁজেও বের করেছে পুলিশ। নিয়ে এখনই এখানে আসবে।

সঙ্গে সঙ্গে টনক নড়ল গোগোর। বলল—যাক, মিঃ করঞ্জায়ী যা যা বলে দিয়েছিলেন, সেগুলি করা হয়ে গেছে আমার। যাই, তাড়াতাড়ি গিয়ে রিপোর্টটা তাঁকে দেই। আচ্ছা, আসি—

বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল গোগো। সিঁড়িতে বসা সিপাইটা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিল গোগোকে নামতে দেখে। মনে হয়েছিল বাধা দেবে বুঝি গোগোকে। কিন্তু না, বাইরে দরজার দিকে তাকিয়ে একটা আড়মোড়া ভেঙে আবার সিঁড়িতে বসে পড়ল সে।

শুধু কালাচাঁদ অবাক হয়ে বলল—বাবার কাছে যাবেন না একবার?

জুতো পরতে পরতে গোগো বলল—মিঃ করঞ্জায়ী নিজেই যখন আসছেন তখন আমার আর ওঁর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই।

একেবারে দরজার বাইরে এসে থামল গোগো। দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত দেখে নিল পুলিশের কোনো ভ্যান বা জীপ আসছে কি না কোনো দিক থেকে। আসছে না দেখে একটু যেন সাহস ফিরে এল বুকে। আর তাতেই মনে হল হঠাৎ ঐ রকম হুট করে চলে আসাটা ঠিক হয়নি মন্দির থেকে। অনেক কিছুই তাতে মনে করতে পারে শ্যামচাঁদ। মনে করতে পারে, পুলিশের নাম শুনে পালিয়ে যাচ্ছে গোগো।

তা যে নয় সেটা বোঝাবার জন্য একবার গোগো ফিরে তাকালো মন্দিরের দিকে। দেখল, কালাচাঁদ সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাঁ দিকে চলে যাচ্ছে। শ্যামচাঁদ কয়েকটা সিঁড়ি নেমে এসে দাঁড়িয়েছেন সিপাইটার কাছে। দাঁড়িয়ে গোগোর দিকে তাকিয়ে কী যেন বলছেন সিপাইটাকে।

আটকাতে বলছেন নাকি গোগোকে? গোয়েন্দা বই পড়া সব বিদ্যে দিয়ে, সব ভারিক্কী কথাবার্তা অত বুদ্ধি খাটিয়ে বলেও কি শ্যামচাঁদের মনের সন্দেহ দূর করতে পারেনি গোগো?

ঘুরে, কোনো দিকে আর না তাকিয়ে গোগো ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁটতে শুরু করল।

৬

হন হন করে অনেকটা পথ হেঁটে এসে, অনেকগুলি গলিতে ঢুকে আর বেরিয়ে পদ্মপুকুর পাড়া পুরো ছাড়িয়ে এসে তারপর একবার পিছন ফিরে দেখল গোগো। না, কোনো সিপাইকেই দেখা যাচ্ছে না। রাস্তাটায় লোক বেশী নেই, অনেক দূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

হয়তো অন্য কিছু বলছিলেন শ্যামচাঁদ সিপাইটাকে আর এমনিই তাকিয়ে ছিলেন গোগোর দিকে। কিম্বা হয়তো সত্যিই গোগোর পিছু নিয়েছিল সিপাইটা, ঐ গলিগুলি দিয়ে এসে গোগো পথ গুলিয়ে দিয়ে ফাঁকি দিয়েছে তাকে।

পুলিশ আসছে শুনে গোগো ভয় পেয়েছে ঠিকই। বুদ্ধিমান শ্যামচাঁদ সেটা ধরতেও পেরেছেন নিশ্চয়। শুধু পুলিশকে গোগোর ভয়টা কেন, সেটাই কখনো বুঝতে পারবেন না। ভাববেন, পুলিশকে ভয় করার মতন কোনো অপরাধ নিশ্চয়ই গোগো করেছে। তা যে গোগো করেনি, কখনও করতে পারে না, উল্টে বরং একটা অপরাধের কিনারা করতেই আজ এসেছিল, কোনো দিনই সেটা জানতে পারবেন না শ্যামচাঁদ। পুলিশের কাছে তিনি হয়তো গোগোর নামে অনেক কিছু বলবেন। তা বলুন গে। আসল ভয়টা তো গোগোর পুলিশকে নয়, ভয়টা বাবাকে। পুলিশ এসে পড়লে, পরিচয় জিজ্ঞেস করলে তখন তো আর মিথ্যে কথা বলতে পারতো না গোগো। ন-কার কাছে গোগো অনেকবার শুনেছে যে সবচেয়ে বড় বোকামি হল পুলিশের কাছে মিথ্যে কথা বলা। ফলে, গোগোর আসল পরিচয় তখন

বেরিয়ে পড়বে। স্কুল থেকে চলে এসে এত যে কাণ্ড করেছে গোগো, সব জানাজানি হয়ে যাবে বাড়িতে। জানবেন গোগোর বাবা আর তারপর বাবা যা করবেন গোগো জানে। বাবা কখনও গোগোকে বকেন বা মারেন না। ছোটখাটো অন্যায় করলে গোগোকে শুধু হেসে জিজ্ঞেস করেন—কী রে তুই এটা করেছিস? গোগো যদি স্বীকার করে তো আরো হাসতে থাকেন বাবা। হাসতে হাসতে বাড়ির সবাইকে ডেকে ডেকে বলতে থাকেন—শুনেছো, গোগোর কাণ্ড? শুনে তখন গোগোর মনে হয়, সত্যি! কী বোকার মতন কাজই না সে করেছে!

আর যদি অস্বীকার করে গোগো তাতেও বাবা হেসে বলবেন—জানতুম, এ-রকম হাঁদার মতন কাজ তুই কখনও করতে পারিস না।

আর যদি বড় কোনো অন্যায় কখনও করে ফেলে গোগো তো বাবা যা নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন, আশ্চর্য। হঠাৎ যেন ভুলেই যান গোগো তাঁর ছেলে। গোগো বলে পৃথিবীতে কেউ আছে, সেটাও যেন জানেন না। কথা তো বলেনই না, সামনে গিয়ে দাঁড়ালেও গোগোকে চোখে দেখতে পান না। গোগো যেন অদৃশ্য একটা মানুষ হয়ে যায় তখন তাঁর কাছে। আর, প্রত্যেক শনিবার যে একটা বই কিনে ফেরেন গোগোর জন্যে, সেটা বন্ধ করে দেন। মা-ও কম যান না। এমনি ছোটখাটো অন্যায়ে ততটা নয়। শুধু খুব বকেন গোগোকে। অন্যায় না করলেও, শুধু তাঁর মনে হলেই বকেন। কিন্তু বড় কোনো অন্যায় করে ফেললে গোগোর মুখের দিকে তাকিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন।

ভাবতে ভাবতে মনটা খারাপ হয়ে গেল গোগোর। না, আর নয়। যা করে ফেলেছে, ফেলেছে। ছোটকার উপর রাগ ক'রে, ছোটকার সঙ্গে পাল্লা দিতে এ-রকম কাজ আর সে কখনও করবে না। সোনার রাধারানীর ব্যাপারে এখানেই ইতি।

আর, ও-ব্যাপারে করবারও বোধহয় আর কিছু নেই। শ্যামচাঁদ যা ধরেছেন, সেটাই ঠিক। এটা কোনো গ্যাং-এরই কাজ। যেভাবে তালা ঝোলে মন্দিরে আর তার চাবিগুলি থাকে বৃন্দাবন ঠাকুর আর পতিতপাবনবাবুর কাছে তাতে তালাগুলি না-ভেঙে বিগ্রহ চুরি করবার অন্য কোনো উপায় গোগো অন্তত কল্পনা করতে পারছে না। ঐ অতি-সৎ চাকরটি সম্ভবত গ্যাং-এরই লোক। চাবি তৈরির এক্সপার্ট লোক কোনো।

পুলিশ যে বৃন্দাবন ঠাকুরকে সন্দেহ করছে, তার কারণও তাই। চাবি দিয়ে ছাড়া যে মন্দিরের তালা খোলা হয়নি, পুলিশও বুঝতে পেরেছে। আরতির পর সকলের সামনে মন্দির বন্ধ করে চাবিগুলি বৃন্দাবন ঠাকুর পতিতপাবনবাবুকে দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু সারাদিন তো চাবিগুলি তাঁর কাছেই থাকে। ইচ্ছে করলে সেগুলির নকল তৈরি করানো কিছুই নয়, বৃন্দাবন ঠাকুরের কাছে। পুলিশের সন্দেহটা বৃন্দাবন ঠাকুরের উপর, সেইজন্যেই।

গোগোর কিন্তু গোড়া থেকেই তেমন সন্দেহ হয়নি বৃন্দাবন ঠাকুরকে। চুরির পর প্রধান সন্দেহ তার উপরেই পড়বে জেনে যখন কেউ চুরি করে তখন আর সে বসে থাকে না, পালায়। খুব বুদ্ধিমান হয়তো পালায় না, কিন্তু বৃন্দাবন ঠাকুরকে তেমন চতুর লোক বলে মনে হয়নি গোগোর। অবশ্য গোগো ন-কার কাছে শুনেছে চেহারা দেখে অপরাধীকে ধরতে যাওয়াটা মস্ত ভুল। পৃথিবীর কয়েকজন কুখ্যাত খুনীকে নাকি দেখতে দেবদূতের মতন ছিল।

না, চেহারা দেখে নয়। বৃন্দাবন ঠাকুরের সম্বন্ধে গোগোর খটকাটা অন্য কারণে। প্রথমত কার জন্যে চুরি করবেন বৃন্দাবন ঠাকুর? কে আছে তাঁর সংসারে? এক যদি নিজে সুখে থাকবেন বলে করে থাকেন তো চুরির পর বসে থাকবেন কেন এখানে? এখানে বসে তো কিছু আর করতে পারবেন না। করলে কথা উঠবে, সন্দেহ জাগবে। পালিয়ে যাওয়াই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। একবার বিগ্রহ নিয়ে পালিয়ে এসেছেন যখন, আরেকবার পালাতেই পারবেন না কেন? তবে তার চেয়েও বড় কথা, সোনার বিগ্রহের উপর যদি তাঁর কোনো লোভ থাকতো তো বেমালুম গাপ করবার একটা সুযোগ তো তিনি পেয়েছিলেন বাংলাদেশ থেকে আসবার সময়। যেখানে খুশি তখন তিনি চলে যেতে পারতেন বিগ্রহ নিয়ে। কিম্বা যদি বলতেন পাকিস্তানী সৈন্যরা সেটা কেড়ে নিয়েছে তাঁর কাছ থেকে, তাহলেই বা কে কী বলতে পারতো?

একটা উল্টো খটকাও যে আবার নেই বৃন্দাবন ঠাকুর সম্বন্ধে, তাও নয়। সকালবেলা দরজার বাইরে ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বৃন্দাবন ঠাকুর সম্বন্ধে শোনা কথাগুলিও মনে গেঁথে রয়েছে গোগোর। মন্দিরে যারা আসতো তাদের কাছে ভীষণ পয়সা-পয়সা করতেন নাকি বৃন্দাবন ঠাকুর। যাক, ও-সব নিয়ে আর মাথা ঘামানোর দরকার নেই গোগোর। কিন্তু এ কোন্ দিকে চলে এসেছে গোগো?

থমকে দাঁড়াল গোগো। অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির দিকে মোড় না নিয়ে সোজা বেরিয়ে এসেছে অনেকখানি পথ।

ফিরে দাঁড়াল গোগো। একবার লক্ষ্য করে দেখল। না, সিপাইটা তো নয়ই, এর আগে পিছনে তাকিয়েও যাদের দেখেছিল গোগো তাদের মধ্যে বিশেষ কারুকে আর দেখা যাচ্ছে না। একজন বুড়ো মতন লোককে শুধু দেখা যাচ্ছে ভারী একটা থলি হাতে আসতে।

বাড়িমুখো হাঁটতে হাঁটতে আবার কতগুলি চিন্তা মাথায় আসছিল। কিন্তু না, ও সব চিন্তা আর করবে না গোগো স্থির করল। চিন্তাগুলিকে মাথা থেকে সরাবার জন্যে জোর করে স্কুলের কথা ভাবতে শুরু করল। কাল স্কুলে যাবে গোগো যতই না আজ অপমান হয়ে থাকুক। যতই বলুক গোগো দোষ তো তার নিজেরই। ছোটকার সঙ্গে না গেলেই পারতো সে সকালে। জোর করে তো আর ছোটকা তাকে নিয়ে যেতে পারতো না।

ভাবতে ভাবতে বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছিল গোগো। একটা মিষ্টির দোকান পেরিয়ে গিয়েই ক-টা বাজে দেখবার কথা মনে হল সেই দোকানের ঘড়িতে। আর, সেজন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই গোগো আবার দেখতে পেল থলিহাতে একটু আগে ভুল রাস্তায় তার পিছন-পিছন যাওয়া সেই বুড়োকে।

গোগো যেমন দেখেছে বুড়োকে, বুড়োও তেমনি বুঝি দেখেছে গোগোকে ঘুরে দাঁড়াতে। চট করে তাই সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে একটা পানের দোকানের সামনে এদিকে পিঠ করে।

বুড়ো কি ফলো করছে গোগোকে? না কি, গোগোর মতনই অন্যমনস্ক হয়ে অন্যদিকে চলে গিয়েছিল আর তারপর খেয়াল হতে তার মতনই ঘুরে এদিকে আসছে?

তেমন হওয়ার সম্ভাবনা যে খুবই কম, সেটা গোগো জানে। তবু নিশ্চিত হবার জন্যে হঠাৎ জোরে, হন হন করে হাঁটতে শুরু করল। তারপর একটা মোড় নেবার সময় আড় চোখে তাকিয়ে দেখল, ঠিক যতটা তার পিছনে ছিল বুড়ো ঠিক ততটাই রয়েছে। তার মতনই জোরে হন হন করে হেঁটে আসছে। দেখে এবার আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করল গোগো।

বুড়ো যে তার পিছু নিয়েছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। গোগো জোরে হাঁটলে জোরে হাঁটছে। আস্তে হাঁটলে, আস্তে। মোড় নিলে, মোড় নিচ্ছে।

কিন্তু বুড়োটা কে? কেন এ-রকম পিছু নিয়েছে লোকটা গোগোর?

এক হতে পারে, শ্যামচাঁদের পাঠানো চর। সেই পদ্মপুকুর থেকেই ফলো করে আসছে গোগোকে। তার কোনো কথাই বিশ্বাস করেননি শ্যামচাঁদ। আসল পরিচয় জানবার জন্যে তাই এই চরকে পাঠিয়েছেন। হয়তো যারা বিগ্রহ চুরি করেছে বলে তাঁর ধারণা, সেই গ্যাং-এর লোক বলেই সন্দেহ করছেন তাকে। ভেবেছেন, চুরির ব্যাপারে কতদূর কী জানতে পেরেছেন শ্যামচাঁদরা, সেটা বুঝতে গ্যাং থেকে গোগো এসেছিল।

আবার, সেই গ্যাং-এর লোকও হতে পারে বুড়ো। চুরির কতদূর কী জানতে পারল পুলিশ, খবর রাখছে হয়তো তারা। আর রাখতে গিয়ে হঠাৎ গোগোকে এসে তদন্ত করতে দেখে

জানতে চাইছে, এ ছোকরা আবার কে?

ঈস, ছোটকা যদি থাকতো এই সময় সঙ্গে। যে মতলবেই বুড়ো পিছু নিক গোগোর, যে গলিতে গোগো ঢুকতো পিছু-পিছু বুড়োও যেত সেই গলিতে। একটা নির্জন দেখে গলিতে তাহলে বুড়োকে টেনে নিয়ে যেত গোগো আর তারপর ছোটকা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। পড়ে এমন প্যাঁচ ঝাড়তো জুডো-র যে তখন যন্ত্রণায় কাতরাতে-কাতরাতে তার কী-কেন-কবে-কোথায় সব কথা না বলে আর উপায় থাকতো না বুড়োর।

বুড়োর চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়তে হবে এখন গোগোকে। খুব কঠিন কাজ সেটা হবে না একবার ট্রামরাস্তার ভীড়ের মধ্যে গিয়ে পড়তে পারলে। কিন্তু তার আগে জানতে হবে লোকটা কে, কী উদ্দেশ্যে সে পিছু নিয়েছে গোগোর?

হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তার মোড়ে এসে পড়ল গোগো। আর বড় রাস্তার ভীড়ের মধ্যে বাঁ দিকে মোড় নিয়েই ঢুকে পড়ল একটা চেনা বইয়ের দোকানে। মাঝে মাঝে এসে এখানে বই কেনে সে। কোনো কোনো দিন এসে বসে শুধু পড়েও।

আর দেখতে পেল বুড়োকে। মোড় ঘুরে গোগোকে দেখতে না পেয়ে বুড়ো যেন কেমন বোকা হয়ে গেল। দেখতে লাগল এদিকে-ওদিকে। দোকানের দিকেও একবার তাকালো। তাকাবে বুঝতে পেরে তার আগেই গোগো সরে এসেছে দোকানের দুটো দরজার মধ্যেখানে দেওয়ালের আড়ালে।

কোনো দিকে গোগোকে দেখতে না পেয়ে ব্যস্ত হয়ে বুড়ো সামনের দিকে এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গোগোও বেরিয়ে এল দোকান থেকে দোকানদারদের অবাক করে দিয়ে। বেরিয়ে সাবধানে, লোকজনের আড়ালে-আড়ালে পিছনে-পিছনে যেতে লাগল বুড়োর।

কিছুটা গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল বুড়ো। বারবার এদিক-ওদিক দেখতে লাগল। তারপর ঘুরে পিছন দিকে তাকালো। একটা থামের আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল গোগো। দেখতে পেল না বুড়ো।

ঘুরে এদিকেই আবার আসতে লাগল বুড়ো। কী মুস্কিল, থামের আড়াল থেকে বেরুতে গেলেই তো গোগোকে দেখে ফেলবে। আর না সরলেও—

বুড়োর উপর চোখ রেখে থামের গা ঘেঁষে আস্তে আস্তে সরতে লাগল গোগো। সব সময়ে বুড়ো আর নিজের মধ্যে আড়াল রেখে থামটার। কিন্তু একটু এগিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল বুড়ো। কী একটা ভাবল, তারপর আবার উল্টোদিকে ফিরে চলতে শুরু করল হন হন করে।

তার মানে, গোগোর আশা ছেড়ে দিয়ে এবার ফিরে যাচ্ছে বুড়ো। কোথায় যাচ্ছে সেটা দেখতে পেলেই লোকটা কে, হয়তো কিছুটা বুঝতে পারা যাবে। থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে গোগো আবার পিছু নিল বুড়োর।

কিছুটা গিয়েই থমকে দাঁড়াল গোগো। হেডমাস্টারমশাই আসছেন উল্টোদিক থেকে। তার মানে, স্কুলের ছুটি হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। বাড়ি ফিরছেন হেডমাস্টারমশাই।

আর এগনো হল না গোগোর। দাঁড়ানোও নয়। হেডমাস্টার-মশাই তাকে দেখে ফেলবার আগেই ঘুরে মাথা নিচু করে বাড়িমুখো হাঁটতে শুরু করে দিল হন হন করে।

৭

বাড়িতে ফিরে সকালের মতনই আবার একবার মায়ের মুখোমুখি হতে হল গোগোকে। বাড়ির সকলের বিকেলের জলখাবারের ব্যবস্থা করতে খাবার ঘরে ছিলেন মা, থাকবেন গোগো জানতোও আর একটা চেষ্টাও করেছিল মেজকার বৈঠকখানা থেকে বই-পত্তরগুলি নিয়ে পা টিপে টিপে উপরে উঠে যাবার। কিন্তু স্কুল থেকে তার ফিরতে দেরী দেখে মা যে কান রেখেছিলেন বাইরের দরজায়, সেটা আর গোগো কী করে জানবে?

পা টিপে টিপে সিঁড়ির আদ্ধেকও ওঠেনি গোগো, মা উঠে এসে দাঁড়ালেন খাবার ঘরের দরজায়। গম্ভীর হয়ে ডাকলেন—শুনে যাও!

গুটি গুটি নেমে এল গোগো, মিউ মিউ করে বলল—কী বলছো?

এতো দেরী হল কেন ফিরতে?

গোগো মাথা নিচু করে রইল।

কী, কথা কানে যাচ্ছে না আমার?

ঘাড় ঝুঁকিয়ে গোগো জানালো, যাচ্ছে। তারপর বলল—আমাকে ডিটেন করে রেখেছিলেন অঙ্কের স্যার। অঙ্ক করে নিয়ে যাইনি বলে।

কেন নিয়ে যাওনি?

খাতা ছিল না। ছোটকার কাছে পয়সা নিয়ে—

মনে পড়ে গেল গোগোর মার। গলাটাও নরম হয়ে এল। বললেন—যাও, হাত মুখ ধুয়ে এসে খেয়ে নাও। তারপর পয়সা দিচ্ছি, যাও খাতা কিনে আনো গে। খাতার কথাগুলি একটু আগে থেকে মনে কোরো এবার থেকে।

ঘাড় ঝুঁকিয়ে গোগো জানালো, তাই করবে। ব্যস, তারপর তিন লাফে উঠে এল উপরে। আর টেবিলের উপর বই খাতা রাখতে গিয়ে দেখল একটা কাগজ। একটা চিঠির মতন ভাঁজ করা কাগজ উঁকি মারছে সাজানো বইগুলির মধ্যে থেকে। সকালে স্কুলে যাবার সময় ওটা ছিল না। কে রেখে গেল এর মধ্যে?

তুলে নিয়ে ভাঁজটা খুলতেই দেখল, ছোটকার চিঠি।

গোগো,

ভেরী গুড নিউজ। আমার কথাবার্তা শুনে তরুণদা একেবারে ফ্ল্যাট। আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন, এই কেস-এ ওঁকে সাহায্য করবার জন্যে। খেয়ে দেয়ে তাই আবার এখনই তরুণদার আপিসে যাচ্ছি।

সকালে তোকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্যে ভেরী ভেরী সরি। কিন্তু তখন ভিতরে তদন্তের খুব জটিল একটা ব্যাপার চলছিল। তরুণদাকে তাই ডিসটার্ব করতে পারিনি। তাছাড়া, সে-সব তুই ঠিক বুঝতিসও না।

যাক, রাগ করিস না। বিকেলে ক্লাবে আসিস। সব শুনবি।

ছোটকা

ছোটকার উপর সকালের রাগটা একটু যদি বা পড়ে এসেছিল গোগোর মনে, চিঠিটা পড়তে শুরু করে আবার বেড়ে গেল। না, একটা ব্যবস্থা ছোটকার না করলেই নয়। আগে একটু-আধটু হামবড়াই করতো ছোটকা, ঠিক ছিল। কাকা বলে, একসঙ্গে থাকে বলে গোগো কিছু বলেনি কোনো দিন। কিন্তু বাড়তে বাড়তে এখন কোথায় চলে গেছে ছোটকা! এমনই বুদ্ধিমানের মতন নাকি কথা বলেছে ছোটকা যে তার সাহায্য ছাড়া পুলিশের চলছে না! ন-কার বন্ধু তরুণ সরকারকে রিকোয়েস্ট করতে হচ্ছে ছোটকাকে!

চিঠির প্রথম পাঁচ লাইন পড়ে রাগটাই শুধু বেড়েছিল গোগোর, পরের চার লাইনে গা জ্বলতে শুরু করল। নাঃ, একটা শিক্ষা ছোটকার হওয়া দরকার আর খুব শিগ্গীর। মানে, যদি একসঙ্গে গোগোকে থাকতে হয় ছোটকার সঙ্গে।

শেষের দু-লাইনে অবশ্য গা-জ্বলাটা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু রাগটা গেল না। ক্লাবে আসিস মানে বড় জোর একটা ডিম খাওয়াবে ছোটকা। আর, সব শুনবি মানে সেই ডিম খাওয়ার জন্যে ছোটকার হামবড়াইগুলি শুনতে হবে মুখ বুজে।

সমান-সমান যদি খাওয়াতো ছোটকা, তাহলে না হয় গোগো বুঝতো। মানে, দুটো ডিম। ছোটকা বলে আনন্দ পাচ্ছে ভেবে না হয় বসে শুনতোই হামবড়াইগুলি। এক কান দিয়ে শুনে বের করে দিত আরেক কান দিয়ে।

নাঃ, যাবে না গোগো ক্লাবে। চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিচে নেমে এল তাড়াতাড়ি। এমনিতেই এই

সময় ভীষণ খিদে পায় রোজ, আজ আবার তার উপর অত হেঁটেছে।

যা একদম ভালো লাগে না, খেতে পারে না, সেই চিঁড়ে-দুধ-কলার জলখাবার দেখে মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল গোগোর। অন্যদিন হলে ফেলে রাখতো আর বকুনি খেতো মা-র কাছে। আজ খিদের চোটে তবু কিছুটা খেতে পারল।

টেবিলে একটা টাকা চাপা দেওয়া ছিল। গোগো টেবিল থেকে উঠতেই মা বললেন—খাতার দাম তো আট আনা?

হ্যাঁ।

ঐ যে, নিয়ে যাও। সকালের পয়সাটা ফেরত দিয়ে দিও ছোটকাকে।

মুহূর্তে মেজাজটা ভালো হয়ে গেল গোগোর। খাতা একটা কিনে ফিরতেই হবে। কিন্তু বাকী আট আনা দিয়ে বেরিয়ে এখন যা খুশি তো খাওয়া যাবে।

হাত ধুয়ে এসে টাকাটা নিয়ে গোগো বেরিয়ে পড়ল।

৮

ভীষণ ব্যস্ত একটা ভাব নিয়ে ছোটকা যখন এসে ক্লাবে ঢুকল, তখনও গোগো ঘুগনিওয়ালার সামনে বসে। ভীড় ছিল ক্লাবে, প্রথমে ছোটকা দেখতে পায়নি। তারপর দেখে এগিয়ে এসে ভারিক্কী গলায় জিজ্ঞেস করল—কখন এসেছিস?

গোগো বলল—অনেকক্ষণ। তোমার এত দেরী হল কেন?

পাশে বসে পড়ে ছোটকা বলল—আসতেই পারছিলাম না। তোকে আসতে বলেছিলাম বলে আসতে হল। ছেলেমানুষ, এসে বসে থাকবি।

এ-রকম দু-চারটে কথা শুনবে বলে প্রস্তুত হয়েই গোগো এসেছে। তাই রাগ না করে জিজ্ঞেস করল—কেন, কী হয়েছে?

তরুণদা ছাড়তেই চাইছিলেন না। খুব ক্রুশিয়াল মোমেন্ট চলছে তো। তাই রাতে আবার যাবো বলে কোনোরকমে এসেছি।

ক্রুশিয়াল মোমেন্ট মানে?

রোশনলাল এখন কলকাতায় বলে জানা গেছে।

কে রোশনলাল?

কথা বলার আর শক্তি নেই। দাঁড়া, আগে একটু জিরিয়ে নেই।

খিদে পায়নি তোমার?

পাইনি আবার! অবিশ্যি তরুণদা খাইয়েছেন একবার। কিন্তু যা খাটনি তাতে ওটা নস্যি।

বলে ঘুগনিওয়ালার দিকে ফিরে ছোটকা অর্ডার করলো—ডিম দাও।

কীসের এত খাটনি, জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল গোগোর কিন্তু ঘুগনিওয়ালা যে-রকম একটা সেদ্ধ ডিম বের করে ছাড়াচ্ছে তাতে গোগোর পক্ষেও মোমেন্টটা খুব ক্রুশিয়াল এখন। ছোটকাকে প্রশ্নটা স্থগিত রেখে ঘুগনিওয়ালাকে বলল—দু-জায়গায় দাও।

ছোটকা জিরোতে জিরোতে সায় দিল—হ্যাঁ-হ্যাঁ, দু-জায়গায়।

ঘুগনিওয়ালা অবাক হয়ে তাকালো ছোটকার দিকে। কী একটা বলতে গেল, তারপর আর বলল না। হাঁড়ি থেকে চটপট আরেকটা ডিম বের করে ছাড়াতে লাগল।

যাক, ক্রুশিয়াল মোমেন্টটা কেটে গেছে গোগোর। আট আনা দিয়ে একটা ডিম আর এক পাতা ঘুগনি যে আগেই খাওয়া হয়ে গেছে গোগোর, সেটাই বলতে যাচ্ছিল ঘুগনিওয়ালা। একটা ডিমই যে রোজ গোগোকে দেওয়া হয় না ছেলেমানুষ আর পেটগরমের কথা বলে, সে-সবই তো ঘুগনিওয়ালার সামনে।

পাতা থেকে ডিমের একটা টুকরো মুখে দিতেই মেজাজটা অসম্ভব ভালো হয়ে গেল গোগোর। একসঙ্গে দুটো ডিম জীবনে তার এই প্রথম। শুধু তাই নয়, একটা শিক্ষারও ব্যবস্থা হয়ে রইল ছোটকার। ভবিষ্যতে কখনও কথা উঠলে, শুনিয়ে দিতে পারবে ছোটকাকে।

ডিমটা শেষ করে ছোটকা বলল—হ্যাঁ, রোশনলাল সম্বন্ধে কী জিজ্ঞেস করছিলি?

জিজ্ঞেস করছিলাম, লোকটা কে?

কিউরিও ডিলার। মস্ত বড় দোকান আছে দিল্লীতে।

কিউরিও ডিলার মানে পুরনো ফার্নিচার, ঘড়ি, স্ট্যাচু কেনাবেচা করে।

ঠিক ধরেছিস। আর তাতে পুলিশের বলারও কিছু নেই যদি জিনিসটা দাম দিয়ে প্রকৃত মালিকের কাছ থেকে রোশনলাল কিনে থাকে।

রোশনলাল বুঝি চোরাই জিনিসও বেচাকেনা করে?

পুলিশের কিছু দিন ধরেই সে-রকম সন্দেহ। লোকটা একদম লেখাপড়া জানে না, নামটা সই করতে পারে বোধ হয় কোনোরকমে। তবে যে-রকম ফরফর করে ইংরেজী বলে আর পোশাক-আসাক তাতে বোঝার নাকি উপায় নেই। মাত্র ক-বছর আগে দিল্লির চাঁদনি চকের একটা গলিতে ছিলতে একটা দোকান ছিল কাশ্মিরী জিনিসের আর সেই দোকানের ভাড়াই নিয়মিত দিতে পারত না রোশনলাল। আর এখন কনট সার্কাস মানে দিল্লির চৌরঙ্গীতে বিরাট কিউরিও সপ। সব সময়ে ভীড় লেগে রয়েছে সেখানে বিদেশী টুরিস্টদের। মানে, আঙুল ফুলে কলাগাছ।

সেই জন্যেই ওকে সন্দেহ পুলিশের? মানে, চোরাই জিনিস কেনাবেচা করে বলে?

শুধু তাই নয়। ইদানীংকালে যখনই যেখানে মন্দির-মিউজিয়ম থেকে বিগ্রহ বা মূর্তি চুরি গেছে, সেখানেই আগে একবার যেতে দেখা গেছে রোশনলালকে।

পুলিশ ধরেনি রোশনলালকে?

ধরেছিল একবার কিন্তু প্রমাণ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।

ডিম খাওয়া হয়ে গিয়েছিল তবু শালপাতাটা এতক্ষণ ধরেছিল ছোটকা। পাতাটা ফেলে দিয়ে এবার ঘুগনিওয়ালাকে বলল—দেখি, আরেকটা ডিম। এক জায়গায়।

ঘুগনিওয়ালা কাঁচুমাচু হয়ে বলল—শেষ হয়ে গেছে, বাবু।

অদ্ভুত একটা আনন্দ হল গোগোর কথাটা শুনে। উঃ, অনেক দিনের ১—০, ২—০, ২—১ ডিমের পরাজয়ের শোধ তুলেছে আজ সে। ২—১ ডিমে। শুধু ছোটকাকে সেটা জানানো যাবে না, এইটুকু যা আপশোষের।

ডিম নেই শুনে বিরক্ত হল ছোটকা। একটু ভেবে নিয়ে বলল—দাও তবে আলুর দমই দাও। এক জায়গায়।

আলুর দমও শেষ, বাবু।

ঘুগনি?

তাও শেষ।

তবে বসে আছো কেন এখানে?

আজ্ঞে, পয়সাটা দেবেন বলে।

রেগে পকেট থেকে পয়সাটা বের করে দিয়ে দিল ছোটকা। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে গোগোকে বলল—চল্, রেস্টুরেন্টে যাই।

দিনের মধ্যে আবার একবার মনে হল গোগোর, কার মুখ দেখে আজ সকালে উঠেছিল? দুটো ডিম তার উপর আবার রেস্টুরেন্ট! একা নিশ্চয়ই খাবে না ছোটকা। কিছু নিশ্চয়ই খাওয়াবে গোগোকেও। বিশেষ করে, মেজাজ যদি ভালো থাকে।

আর, ছোটকার মেজাজ ভালো করে দেওয়া তো এখন খুবই সোজা। ক্লাব থেকে বেরুতে বেরুতে গোগো জিজ্ঞেস করল—পতিতপাবন সাহার বাড়ি থেকে কখন ফিরলে তুমি?

অনেক দেরিতে। প্রায় একটা।

ভালো করেই সেটা অবশ্য জানে গোগো। তবু মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বলল—এ-ক-টা? কী করছিলে অতক্ষণ ওখানে?

তাও তো আমি জোর করে চলে এলাম। তরুণদা আসতে দিচ্ছিলেন না কিছুতেই।

তোমার উপর খুব বিশ্বাস হয়েছে ওঁর, না?

ভাবতে পারবি না, কী রকম। আর সে কি এমনি-এমনি?

তবে?

রাজমিস্ত্রিদের যখন ছেড়ে দিতে বলছেন পতিতপাবনবাবু আর তরুণদা রাজী হচ্ছেন না, তখন ওঁকে আমি আড়ালে ডেকে বললাম, এদের আপনি এখনি স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দিতে পারেন। ওরা নির্দোষ।

উনি কী বললেন?

বললেন, কীসে বুঝলে এরা নির্দোষ? আমি বললাম মন্দিরের এতগুলি তালা যেমন ছিল ঠিক তেমনি রেখে বিগ্রহ যদি এরা চুরি করতে পারতো তাহলে পরের দিন যথারীতি কাজে আসার বুদ্ধিটাও এদের থাকতো। না এসে অকারণ সন্দেহটা বাড়াতো না নিজেদের উপর। এক, পালিয়ে যেতে পারত কিন্তু সন্দেহ বাড়িয়ে কখনই বসে থাকত না।

শুনে কী বললেন?

আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, একেবারে ঠিক ধরেছো। আমি বললাম, তাহলে এদের এখনই ছেড়ে দিচ্ছেন তো? তরুণদা বললেন, না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তরুণদা বললেন, সেটা যদি বুঝতে পারো তবে বুঝবো তুমি সত্যিই বুদ্ধিমান। আমি তখন হেসে বললাম, যাতে পুলিশ কেমন বোকা আর মাথামোটা সেটা বুঝতে পারে আসল অপরাধী। ভাবতে পারে, এখন পুলিশের হাতে ধরাপড়ার কোনো সম্ভাবনাই আর তার নেই। আর তাই ভেবে যত নিশ্চিন্ত হবে, তত অসাবধান হবে। আর তাকে ধরারও তখন তত সুবিধে হবে পুলিশের।... শুনে তরুণদা তো একেবারে ফ্ল্যাট।

শুধু তরুণ সরকার নয়, ফ্ল্যাট তার সঙ্গে গোগোও। অনেক ভেবেও ছোটকার কোনো যুক্তিতেই কোনো খুঁত, কোনো ফাঁক খুঁজে পেল না। গোয়েন্দা বই পড়া বিদ্যে বটে ছোটকার তবে তার মধ্যে কখনো-সখনো ভালো দু-একটা বইও তো থাকে। আর তাই পড়ে সত্যিসত্যিই ফ্ল্যাট করে দিয়েছে ছোটকা তরুণ সরকারকে আজ সকালে। চিঠিতে যেটা হামবড়াই মনে হয়েছিল ছোটকার, সেটা সত্যিসত্যিই ঘটেছে।

চিঠির কথা মনে পড়তেই গোগো জিজ্ঞেস করল—সকালে কী জটিল তদন্ত চলছিল বলো তো?

ঠিক ধরতে পারল না ছোটকা। বলল—কোনটার কথা বলছিস?

ঐ যে ভিতরে ঢুকে যার জন্যে তোমার তরুণদাকে আর জানাতে পারলে না আমার বাইরে অপেক্ষা করার কথা।

মনে পড়ল ছোটকার। উত্তর দিতে গিয়ে গলাটাও একটু খাটো হয়ে গেল। বলল—ও, সেই ব্যাপারটা। সে তোকে বলে লাভ নেই, তুই বুঝতে পারবি না।

তুমি বুঝিয়ে দিলেও বুঝতে পারব না?

একটু যেন ভাবনায় পড়ল ছোটকা। বলল—তা পারবি তবে সময় লাগবে। পরে বরঞ্চ এক সময়ে বলব'খন।

আসলে কোনো বোঝাবুঝির ব্যাপারই যে 'সেই ব্যাপারটা' নয়, আরো নিঃসন্দেহ হয়ে গেল গোগো। ভিতরে ঢুকে গিয়ে তার কথা আর মনে ছিল না ছোটকার, এটাই হল আসল ব্যাপার। কিন্তু সেটা আর ছোটকা বলবে কী করে? নইলে, তেমন কিছু যদি তখন সত্যিই ঘটতো তো নিজে থেকেই এসে বলতো ছোটকা।

মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল নাকি ছোটকার? গোগো যে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গিয়েছে সেটা বুঝতে পেরে? ধরা পড়ে গিয়ে? আর একটু রাস্তা গেলেই রেস্টুরেন্টটা। আবার একটা ক্রুশিয়াল মোমেন্ট বুঝি উপস্থিত!

চট করে ভেবে নিয়ে গোগো জিজ্ঞেস করল—কাকে কাকে সন্দেহ করছে পুলিশ তুমি শুনেছো?

শুনে গলাটা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল ছোটকার। একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল—কী যে বলিস? আমি শুনবো না? দুপুরে তবে আপিসে যেতে বলেছিল কেন আমাকে তরুণদা? সে-সব কথা বলবে বলেই তো! আমার সঙ্গে আলোচনা, পরামর্শ করবে বলেই তো!

হ্যাঁ-হ্যাঁ। তা কী বললেন?

তরুণদা বললেন ওঁর ধারণা এটা ইনসাইড জব। মানে, ভিতরের কারুর কাজ।

মানে, বৃন্দাবন ঠাকুর, শ্যামচাঁদ বা কালাচাঁদের?

স্বয়ং পতিতপাবন সাহারও হতে পারে। কত লোক নিজের জিনিস চুরি করছে, গুদামে নিজেই আগুন দিচ্ছে ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করার জন্যে।

রাধারানীর বিগ্রহ ইনসিওরেন্স করা ছিল বুঝি?

না। একবার শ্যামচাঁদ করাতে চেয়েছিল কিন্তু মাসে মাসে সেজন্যে যে প্রিমিয়াম দিতে হবে, টাকার সেই অঙ্কটা শুনে পতিতপাবনবাবু রাজী হননি। হাড়কেপ্পন লোক তো!

তবে আর ওঁকে সন্দেহ কেন?

পতিতপাবন বাবুর ঠাকুর্দার আমলের বিগ্রহ সোনার রাধারানী। সোনার দাম যখন খুব সস্তা ছিল। যদি জ্ঞাতিভাই, ভাইপো কেউ থেকে থাকে তবে তাদেরও অংশ আছে বিগ্রহে। তাদের ফাঁকি দেবার দরকার হয়ে থাকলে চুরিটা পতিতপাবনবাবুও করে থাকতে পারেন। মানে, তরুণদা যা ভাবছেন।

হুঁ। তা তুমি কী বললে?

বললাম, আমার ধারণা তরুণদা, এটা আউটসাইড জব। অর্থাৎ, বাইরের কারুর কাজ। তবে সাহায্য করার জন্যে ভিতরে তার বা তাদের কোনো চর থাকতে পারে।

বাড়ির ভিতরের কোনো লোক?

হ্যাঁ। চুরির দিন বাইরের দরজার খিল খুলে দেবার জন্যে। তারও আগে মন্দিরের তালাগুলির চাবির ব্যবস্থা করার জন্যে।

বাড়ির কোনো ঝি-চাকর ?

ঝি এখন যে কাজ করছে, সে ঠিকে লোক। সকালে, বিকেলে এসে কাজ করে যায়। রাতে বাড়িতে থাকে না।

আর চাকর?

গত রোববার থেকে পতিতপাবনবাবুর বাড়িতে কোনো চাকর নেই। যে ছিল সে ঝগড়া করে চলে গেছে।

তারপরেই চুরি? খুবই সন্দেহজনক ব্যাপার!

সন্দেহজনক তবে খুব বোধহয় নয়। আর কোনো বাড়ি হলে তাই-ই হোত কিন্তু ওদের বাড়িতে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

কেন?

একদম চাকর টেঁকে না ওদের বাড়িতে। একে মাইনে কম, তার উপর একটা প্লেট ভাঙলে যদি আবার মাইনে কাটা যায় তাহলে আর কোন লোক কাজ করবে? সেইসঙ্গে বাজারে চুরি করেছে বলে যদি গালমন্দ খেতে হয় দু-বেলা?

তাই বুঝি?

গত চার-পাঁচ মাসের মধ্যে যারা কাজ করে গেছে, তাদের সকলকেই খুঁজে বের করেছেন তরুণদা। তারা সবাই ঐ এক কথাই বলছে। শুধু একজন ছাড়া।

তাদের সকলকেই ধরা হয়েছে বুঝি?

না। তবে নজর রাখা হয়েছে সকলের উপরেই।

যে লোকটা অন্য কথা বলছে ওদের মধ্যে, সে কী বলছে?

তার সম্বন্ধে বাজারে চুরির অভিযোগ যেমন পতিতপাবন-বাবুদের নেই, তারও তেমনি কোনো অভিযোগ নেই মাইনে কম ছিল বা কাটা হোত বলে। বেশীদিন দেশ থেকে আসেনি আর তাই বোধহয় একটু বোকাসোকা এখনো।

কেন ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কিছু বলছে?

বলেছে, সে বেশি খেতো বলে। চেহারাটা অবিশ্যি সেইরকমই।

কিন্তু পতিতপাবনবাবুরা তো সে কথা বলছেন না।

শুধু বলছেন না, নয়। শ্যামচাঁদবাবু কোনো গ্যাং-এর লোক বলে সন্দেহ সন্দেহ করছেন। আজ তাকে নিয়ে তরুণদার ওদের বাড়িতে যাবার কথা ছিল আবার বিকেলে। আমারও কথা ছিল

সঙ্গে সঙ্গে যাবার কিন্তু শেষ পর্যন্ত হল না।

কেন?

বেলা তিনটে নাগাদ তরুণদার আপিসে বসে যখন আমি আর তরুণদা খুব তর্ক করছি চুরিটা 'ইনসাইড জব', না, 'আউটসাইড জব' এই নিয়ে এমন সময় একটা উড়ো ফোন এল যাতে আমার ধারণাই যে ঠিক সেটা আরো প্রমাণ হল।

কী রকম?

দাঁড়া, গলাটা শুকিয়ে গেছে। চা খেয়ে নিই আগে।

কথা বলতে বলতে গ্র্যান্ড রেস্টুরেন্টের সামনে পেঁাছে গিয়েছিল দু-জনে। ছোটকার কথা শুনে দোকানের সামনেই বসে পড়তে ইচ্ছে করল গোগোর। শুধু চা খেতে এসেছে এখানে ছোটকা? কবিরাজী কাটলেট, মোগলাই পরোটা নয়?

ভিতরে ঢুকে একটা কেবিনের মধ্যে গিয়ে বসল ছোটকা। একটু যেন ভরসা পাওয়া গেল। গোগো চা খায়না। শুধু এক কাপ চায়ের খদ্দের হয়ে কি আর ছোটকা কেবিনের মধ্যে এসে বসবে? শুধু বসা নয়, সেইসঙ্গে পরদাটা টেনে দেবে কেবিনের?

ঠিকই ভেবেছিল গোগো। বেয়ারা আসতে ছোটকা বলল—চটপট চা দাও এক কাপ। এক জায়গায়। তারপর একটা করে পরোটা দু-জায়গায়। আর অর্ডার নিয়ে বেয়ারা চলে যেতে গোগোকে বলল—পরোটা খেতে না পারলে আমাকে দিস।

ঘাড় কাত করে সায় দিল গোগো। মনে মনে বলল, খেতে না পারলে তবেই তো! কথা বলতে বলতে কখন শেষ করে ফেলবো, তুমি টেরই পাবে না। তারপর মুখে বলল—ফোনের কথা কী বলছিলে?

দু গেলাস জল দিয়ে গিয়েছিল বেয়ারা। একটায় চুমুক দিয়ে ছোটকা বলল—হ্যাঁ, আমি আর তরুণদা দুজনেই নিজের নিজের পয়েন্ট প্রমাণ করার চেষ্টা করছি, এমন সময় উড়ো ফোনটা এল তরুণদার কাছে। নিজের নাম-ধাম কিছু বলল না, একজন শুধু জানালো যে দিল্লি-র সেই রোশনলাল এখন কলকাতায়। যেখানে উঠেছে, সেই হোটেলের নামও বলল কিন্তু তরুণদা অনেকবার জিজ্ঞেস করতেও নিজের পরিচয় দিল না। ফোনটা রেখে তরুণদা ব্যাপারটা বললেন আমায়। রোশনলাল কে বা কী, কিছুই আমি জানতাম না। তরুণদার কাছেই শুনলাম। তরুণদা বললেন, খবরটা যদি সত্যি হয় তাহলে তোমার অনুমানই ঠিক, এটা আউটসাইড জব। চলো, একবার দেখে আসি। আমি তরুণদাকে জিজ্ঞেস করলাম, এ-সব উড়ো খবর কি সত্যি হয়? তরুণদা বললেন, পুলিশ আপিসে যে উড়ো খবরগুলি আসে তার মধ্যে মিথ্যে খুব বেশী হয় না।

গেলে তোমরা সেই হোটেলে? ধরতে পারলে রোশনলালকে?

না। কিন্তু রোশনলাল যে এসে সেখানে বুধবার ভোর পর্যন্ত ছিল, সেটা জানতে পারলাম।

চুরিটা হয়েছে তো মঙ্গলবার রাতে।

কাজেই বুধবার ভোরের প্লেনে রোশনলালের দিল্লি ফিরে যাওয়া খুবই সন্দেহজনক। হোটেল থেকে বুধবার ভোরে চলে গিয়েছে শুনে তক্ষুনি এয়ার লাইনস আপিসে খোঁজ নিলেন। তারা দেখে বলল, হ্যাঁ, রোশনলাল গুপ্তা নামে একজন প্যাসেঞ্জার ছিল বুধবার দিন ভোরবেলা দিল্লির প্লেনে।

তার মানে বিগ্রহটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সরে পড়েছে কলকাতা থেকে।

বিগ্রহটা নাও নিয়ে যেতে পারে।

কেন?

হোটেলের ডেস্কে খোঁজ নিয়ে জানা গেল একজন বিদেশী জাহাজের ক্যাপটেন দু-দিন হোটেলে এসেছিল রোশনলালের কাছে। আরেক দিনও এসেছিল, দেখা পায়নি রোশনলালের।

চেহারা দেখে বিদেশী বোঝা যায় কিন্তু জাহাজের ক্যাপটেন সেটা বুঝল কী করে? ইউনিফর্ম পরে এসেছিল বুঝি?

নিশ্চয়ই তাই। হোটেলের ডেস্কে একজন কর্মচারীর স্মৃতিশক্তি খুবই প্রখর। যেদিন এসে রোশনলালকে পায়নি, সেদিন ক্যাপটেন সাহেব নিজের নাম বলে গিয়েছিল, ক্যাপটেন হার্ডি। তরুণদা ঐ হোটেলে বসেই সঙ্গে সঙ্গে আবার পোর্ট-পুলিশকে ফোন করলেন। খবর নিয়ে পোর্টপুলিশ পাঁচ মিনিটের মধ্যে জানিয়ে দিল, হ্যাঁ, ক্যাপটেন হার্ডি বলে একজন একটা আমেরিকান মালজাহাজ নিয়ে কলকাতায় এসেছিল বটে, তবে মঙ্গলবার শেষ রাতে জাহাজ নিয়ে সে বন্দর ছেড়ে চলে গিয়েছে।

তার মানে, তার হাত দিয়ে রোশনলাল একেবারে বিগ্রহটা বিদেশে পাচার করে দিয়ে তবে ফিরে গেছে দিল্লি-তে।

সেই রকমই একটা সন্দেহ করা যাচ্ছে।

তার মানে, দিল্লি-তে রোশনলালকে ধরলেও কোনো লাভ হবে না।

তরুণদা অবিশ্যি ফিরেই দিল্লি-তে খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেখানকার উত্তরের জন্যে বসেও আছেন এখন আপিসে। মাদ্রাজেও খবর দিয়েছেন।

মাদ্রাজে? কেন?

জাহাজ নিয়ে এখান থেকে ক্যাপটেন হার্ডি মাদ্রাজ গিয়েছে। পেঁাছে যাবার কথা কাল বিকেলেই।

বেয়ারা চা দিয়ে গিয়েছিল, শেষও হয়ে গিয়েছিল ছোটকার কথা বলতে বলতে। খাবারের জন্যে পরদার ফাঁক দিয়ে দেখতে দেখতে ছোটকা বলল—কী রকম ক্রুশিয়াল মোমেন্ট চলছে এখন বুঝতেই পারছিস। তরুণদা তাই আমাকে ছাড়তে চাইছি—

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে পরদার ফাঁকটা হাত দিয়ে বন্ধ করে দিল ছোটকা। ফিস ফিস করে বলল গোগোকে—পতিতপাবনবাবুর ছেলে কালাচাঁদ! আমাদের পাশের কেবিনে বসে খাচ্ছিল এতক্ষণ, উঠে যাচ্ছে। শুনছিল নাকি আমাদের কথা?

টনক নড়ল গোগোর। দেখেছে নাকি তাকে ঢুকতে? পাশ থেকে পরদাটা একটু সরিয়ে উঁকি মারল গোগো।

হাতে একটা কিট ব্যাগ নিয়ে হেলতে দুলতে কালাচাঁদকে দেখল ক্যাশ-টেবিলে গিয়ে দাঁড়াতে। ব্যাগটা বেশ ভারী। নামিয়ে রেখে মশলা খেল প্লেট থেকে।

ফিসফিস করে ছোটকা বলল—ঐ যে একটা কিট ব্যাগ হাতে। মশলা খাচ্ছে।

তার মানে ছোটকাও দেখছে আবার পরদার ফাঁক দিয়ে আর চেনাবার চেষ্টা করছে গোগোকে।

হুঁ।

কী আছে বল্ তো ব্যাগটায়? বিগ্রহটা কিন্তু স্বচ্ছন্দে ধরে যায় ঐ ব্যাগে।

ক্যাশের লোকটা ক্যাশ থেকে বের করে এক গোছা নোট দিল কালাচাঁদকে। ছোটকা দেখে বলল— অত টাকা ফেরত? কত টাকার নোট দিয়েছিল কালাচাঁদ যে অত টাকা ফেরত দিচ্ছে! একশো টাকার নাকি? কিন্তু দিলটা কখন? তুই দিতে দেখেছিস?

না। একশো টাকার নোট বলে হয়তো ভাঙানোর জন্যে আগে দিয়ে তারপর খেতে বসেছিল।

দেখলি, নোটগুলি পকেটে না রেখে ব্যাগের মধ্যে রাখছে?

হ্যাঁ। তার মানে ওটা টাকার ব্যাগ। কী রকম ভারী ব্যাগটা লক্ষ্য করেছিস?

হ্যাঁ।

যদি শুধু টাকা ভর্তি হয় তাহলে কত টাকা আছে ব্যাগে বুঝতে পারছিস?

অনেক টাকা। আর সব যদি একশো টাকার নোট হয়, তাহলে অনেক অনেক টাকা।

তাই-ই হবে। পাঁচ-দশ টাকার নোট থাকলে আর একশো টাকার নোট বের করবে কেন? এত টাকা কালাচাঁদ পেল কোথায়?

রাধারানীর সোনার বিগ্রহ বিক্রি করে পেতে পারে।

তবে আর কোনো ভুল নেই। হয় কালাচাঁদ বিগ্রহ চুরি করে রোশনলালকে বিক্রি করেছে—

তার মানে তোমার তরুণদার ইনসাইড জব।

হ্যাঁ। নয়তো চুরিতে সাহায্য করেছে রোশনলালকে।

তার মানে তোমার আউটসাইড জব-এর ইনসাইড চর।

ঐ বেরিয়ে যাচ্ছে কালাচাঁদ। চল্—

কোথায়?

ধরতে হবে কালাচাঁদকে।

কিন্তু—

কী?

মোগলাই পরোটা?

ধুত্তোর মোগলাই পরোটা। ওকে ধরতে পারলে, এই রহস্যের একটা কিনারা করতে পারলে কী কান্ডটা হবে বুঝতে পারছিস? আয়—

বলে ছোটকা একরকম ছিটকে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে। বাধ্য হয়ে পিছন-পিছন বেরিয়ে আসতে হল গোগোকেও। ক্যাশটেবিলের সামনে দিয়ে যাবার সময় পকেট থেকে একটা সিকি বের করে রেখে ছোটকা শুধু বলে গেল—চায়ের দাম।

রাস্তা ধরে জোরে পা চালিয়ে কিছুটা এগোতেই দেখতে পাওয়া গেল কালাচাঁদকে। ধীরে সুস্থে এগোচ্ছে। দেখে ছোটকাও স্পীড কমিয়ে দিল। বলল—আমাকে চেনে কালাচাঁদ। দেখতে পেলে সাবধান হয়ে যাবে। আমি একটু পিছিয়ে থাকি। তুই এগিয়ে যা। দেখিস, কিছুতেই যেন পালাতে না পারে।

চেনে তো কালাচাঁদ গোগোকেও। সেটা বলবে নাকি গোগো? কিন্তু বলতে গেলে এখন অনেক কথা বলতে হয়। চট করে ভেবে নিয়ে গোগো বলল—রেস্টুরেন্টে তোমাকে যদি দেখে থাকে তাহলে আমাকেও দেখেছে তোমার সঙ্গে।

কী করে দেখবে? আমরা তো পরদার আড়ালে ছিলাম।

সে তো কেবিনে ঢোকার পর। রেস্টুরেন্টে ঢোকার সময়?

ঈস, তাহলে তো আমাদের কথাবার্তাও শুনেছে। পুলিশের সিক্রেট খবর সব জেনে গেছে।

মনে হয় না। বাইরের টেবিলে ঐ কলেজের ছেলেগুলি যা চেঁচাচ্ছিল, তোমার কথা কাছে বসে আমিই ভালো করে শুনতে পাচ্ছিলাম না।

হুঁ, তাহলে যেন তোকেও দেখতে না পায়। দেখলে বুঝবে সঙ্গে আমিও আছি। কিন্তু দেখিস পালিয়ে না যায়। একটা ফাঁকা রাস্তায় পেলেই আমি ওকে চেপে ধরবো।

কিন্তু ফাঁকা রাস্তায় যাবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না কালাচাঁদের। ধীরে সুস্থে, আশেপাশের দোকানের শো কেসে জিনিস দেখতে দেখতে এগোতে লাগল। তারপর রাস্তা পার হয়ে ওপারের বড় একটা মনিহারী দোকানে গিয়ে ঢুকল।

তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে ওপারে এল ছোটকা আর গোগো। দোকানের ভিতরটা, কী করছে কালাচাঁদ ভিতরে, দেখার জন্যে যতটা কাছাকাছি যেতে হয়, সেইটুকুই গেল দু-জনে সাবধানে। আর দেখতে পেল কাউন্টারের ওধার থেকে একজন এক গোছা নোট দিচ্ছে কালাচাঁদকে।

ছোটকা জিজ্ঞেস করল—কিছু কিনলো মনে হল?

না।

কিছুটা এগিয়ে আবার রাস্তার ওপারে গেল কালাচাঁদ। এবার ঢুকল বড় একটা ডাক্তারখানায়। সেই একই ব্যাপার ঘটল আবার। এক গোছা নোট নিয়ে ব্যাগে ভরে বেরিয়ে এল কালাচাঁদ।

ছোটকা বলল—এখানেও কিছু কিনলো না, শুধু নোট ভাঙালো, সেটা লক্ষ্য করলি?

হ্যাঁ।

হাজরা মোড়ের কাছাকাছি গিয়ে আবার একবার রাস্তা পার হল কালাচাঁদ। পিছন-পিছন পার হতে হল ছোটকা আর গোগোকেও। তারপর মোড়টা পেরিয়ে একটু এগিয়েই কালাচাঁদ বাঁ দিকে একটা গেটের মধ্যে চট করে ঢুকে গেল।

দাঁড়িয়ে পড়ল ছোটকা। বলল—আমরা যে ফলো করছি, ও সেটা ধরতে পেরেছে।

যেভাবে হাঁটছিল কালাচাঁদ, তাতে কিছু বুঝতে পেরেছে বলে একবারও এর মধ্যে মনে হয়নি গোগোর। তাই জিজ্ঞেস করল—কী করে বুঝলে?

যেখানে ঢুকল, ওটা কাবুলীদের একটা আড্ডা। টাকা ধার করতে যায় ওখানে লোকেরা। ওখানে কী করতে যাবে কালাচাঁদ? অত টাকা রয়েছে ওর ব্যাগে। ও-ই তো এখন ধার দিতে পারে।

তাহলে গেল কেন?

ভিতরে যায়নি। ঢোকার জায়গাটা অন্ধকার। ঐখানে ঢুকে দাঁড়িয়ে আছে। দেখছে আমরা কী করি? খোঁজাখুঁজি করি, না, পেরিয়ে চলে যাই? একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলেই বুঝতে পারবি। দেখবি, বেরিয়ে এসে চারদিক দেখছে, কোথাও আমরা আছি কি না?

কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও তেমন বেরিয়ে আসার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না কালাচাঁদের। একটু যেন খটকায় পড়ে গেল ছোটকা। বলল—চল্, এগিয়ে দেখি। দরকার হলে ঐ অন্ধকার জায়গাটাতেই চেপে ধরব ওকে।

কিন্তু গেটে বা বাড়ির মধ্যে ঢোকার অন্ধকার জায়গার কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না কালাচাঁদকে। ধাঁধায় পড়ে গেল ছোটকা। জিজ্ঞেস করল—ঠিক এইখানেই ঢুকতে দেখেছিলি তো? না,—

মনে কোনো সন্দেহই ছিল না গোগোর। স্পষ্ট দেখেছে। বলল—হ্যাঁ, এখানেই ঢুকেছে।

আমিও তাই দেখলাম। দু-জনের তো আর ভুল হবে না। কিন্তু গেল কোথায়? উবে তো আর যেতে পারে না।

মাঝে মাঝে এমন বোকার মতন কথা বলে ছোটকা, অবাক লাগে গোগোর। বলল—বুঝতে পারছো না? বাইরে যখন নেই তখন নিশ্চয়ই বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে।

কাবুলীদের আড্ডায়? ওখানে কী করতে যাবে?

সেটাই হয়তো রহস্য। মানে, কী করতে গেছে জানতে পারলেই হয়তো সব রহস্যই পরিষ্কার হয়ে যাবে। হয়তো এই কাবুলীরাই আসলে একটা বিগ্রহচুরির, মূর্তিচুরির গ্যাং।

কথাটা মনঃপূত হল ছোটকার। চোখ দুটো ছোট ছোট করে কী যেন ভেবে নিল চটপট। তারপর গম্ভীরভাবে বলল—তাহলে আমাদেরও ভিতরে না ঢুকে উপায় নেই।

এই কাবুলীদের আড্ডায়?

হ্যাঁ। কাবুলীদের সঙ্গে কীসের এত দহরম-মহরম কালাচাঁদের, সেটা জানতে হবে। হয়তো হাতে-নাতে ধরেও ফেলা যাবে কিছু।

প্রস্তাবটা একেবারেই পছন্দ হল না গোগোর। বলল—উপরে ওরা কতজন আছে, কে জানে? আমরা তো মাত্র দু-জন।

তবু ঢুকতে হবে আমাদের। হাতে-নাতে ধরার এমন সুযোগ হয়তো আর পাবো না।

সত্যি যদি তেমন কিছু হয়, তুমি কি ভেবেছো একবার ঢুকলে, ঢুকে সব জানতে পারলে তারপর ভিতর থেকে আমরা আবার বেরিয়ে আসতে পারব? মুখ বন্ধ করার জন্যে ওরা আমাদের খুন করে ফেলবে না? অতগুলি কাবুলীর কাছে তোমার জুডোর প্যাঁচও খাটবে না। তা ছাড়া ক্রিমিনাল গ্যাং যদি হয় তো অস্ত্র-শস্ত্রও নিশ্চয়ই আছে।

ভয় নেই তোর। সে ব্যবস্থা না করেই কি ঢুকবো? এখানে দাঁড়িয়ে তুই একমিনিট শুধু একটু নজর রাখ্। যেন বেরিয়ে না যায় কালাচাঁদ। আমি এখনি আসছি।

যদি বেরিয়ে যায়? আমি কী করে আটকাবো?

চোর-চোর বলে চেঁচাবি। লোকজন জড়ো হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। পালাতে পারবে না।

বলে ছোটকা একটা মনিহারী দোকানে গিয়ে ঢুকল। নিশ্চয়ই ফোন করতে ছোটকার তরুণদাকে।

একবার গেট, একবার ভিতরের অন্ধকার আর সিঁড়ি, আর

একবার মনিহারী দোকানে চোখ ঘুরতে লাগল গোগোর। এত দেরী করছে কেন ছোটকা? কালাচাঁদই বা এতক্ষণ কী করছে উপরে? নেমে এলেই তো পারে। একটা 'সিন' তাহলে অবিশ্যি অভিনয় করতে হবে গোগোকে কিন্তু উপরে ঐ কাবুলীদের আড্ডায় তো আর যেতে হবে না।

দু-হাতে কী যেন দুটো নিয়ে ছোটকা বেরিয়ে এল দোকান থেকে। কাছে আসতে গোগো দেখল রবারের দুটো বল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল—বল! বল দিয়ে কী করবে?

প্যান্টের দু-পকেটে বল দুটো পুরতে পুরতে ছোটকা বলল—এখনই দেখতে পাবি। দ্যাখ্ তো বোঝা যাচ্ছে কি না বাইরে থেকে দেখে?

হুঁ, বেশ বোঝা যাচ্ছে। দুটো পকেটই উঁচু হয়ে আছে।

দেখে, কী মনে হচ্ছে?

বল রয়েছে পকেটে।

বাইরে থেকে দেখে বল কী করে বুঝলি? কমলালেবুও তো হতে পারে?

এই সময় কমলালেবু?

বেশ, না হয় আপেলই হোল।

হ্যাঁ, তা হতে পারে।

আর যদি বলি, বোমা? দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলি—খবরদার কেউ একটু নড়েছো কি উড়িয়ে দেবো বোমা দিয়ে, তাহলে অবিশ্বাস হবে কারুর?

ছোটকার প্ল্যানটা এতক্ষণে বুঝতে পারল গোগো। বুঝে মনে মনে তারিফও না করে পারল না। যে রকম বোমাবাজী চলেছে কলকাতায় এই সেদিন পর্যন্ত, তাতে ভরসা করে অবিশ্বাস করতে পারবে না কেউ। কিন্তু তবু কেমন সায় দিতে পারল না। বলল—কাবুলীদের বলা যায় না। অত বুঝবে কি?

প্যান্টের বেল্টটা আরো একটু এঁটে নিয়ে ছোটকা বলল—খুব বুঝবে। আয়, তুই আমার সঙ্গে।

বলে গেটের মধ্যে ঢুকতে গিয়ে আবার পিছিয়ে এল ছোটকা। ব্যাগ হাতে কালাচাঁদ নেমে আসছে সিঁড়ি দিয়ে।

গোগো জিজ্ঞেস করল—চোর, চোর বলে চেঁচাবো?

না। তুই কালাচাঁদের পিছন-পিছন যা। দ্যাখ্, আর কোথায় কোথায় যায়। আর যদি কেউ জড়িত থাকে, তাহলে সেটা জানা যাবে।

আর তুমি?

আমি ঐ আড্ডায় ঢুকবো।

একা? তরুণদা এলে তার সঙ্গে ঢুকলে হোত না?

তরুণদা আসছে কে বলল?

কেন, তুমি দোকানে গিয়ে ফোন করলে না তাকে?

ও দোকানে ফোনই নেই।

তাহলে চলো, দু-জনেই আমরা ফলো করি কালাচাঁদকে। এতক্ষণ যেমন করছিলাম।

শুনে ধমক দিয়ে উঠল ছোটকা—এ কী চোর-চোর খেলা পেয়েছিস তুই? যা তাড়াতাড়ি। ঐ যে বেরিয়ে যাচ্ছে কালাচাঁদ।

এক রকম ঠেলেই গোগোকে রওনা করিয়ে দিল ছোটকা। যেতে যেতে পিছন ফিরে একবার তাকালো গোগো। দেখল, ছোটকা নেই। ঢুকে গেছে কাবুলীদের আড্ডায়।

হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ব্যথা ধরে গেল গোগোর। হাজরা মোড় থেকে কালিঘাট, কালিঘাট থেকে চেতলা, চেতলা থেকে টালিগঞ্জ মার্কেট, সেখান থেকে লেক মার্কেট, সেখান থেকে গড়িয়াহাট। চলেছে তো চলেইছে কালাচাঁদ। মাঝে মাঝে শুধু এক একবার এক একটা দোকানে ঢুকছে, নোট ভাঙাচ্ছে আবার বেরিয়ে আসছে। গোড়ায় নোট দিতে অবিশ্যি কখনই দেখতে পাচ্ছে না গোগো গিয়ে।

হাঁটতে হাঁটতে অনেকবার গোগোর মনে হয়েছে, দূর! বাড়ি ফিরে যাই। পরে বললেই হবে ছোটকাকে যে হঠাৎ ট্যাকসিতে উঠে কালাচাঁদ পালিয়ে গেছে। টাকা তো আর নেই গোগোর কাছে যে আরেকটা ট্যাকসি নিয়ে ফলো করবে! কিন্তু যে রকম বীরের মতন ছোটকাকে ঢুকতে দেখেছে কাবুলীদের আড্ডায় তাতে সেটা করতে খুবই খারাপ লাগতে লাগল। এইটুকুও গোগো পারবে না?

একটু অসাবধান হতে একবার বোধহয় গোগোকে দেখেও ফেলল কালাচাঁদ। একটা দোকানে ঢুকে এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল যে পিছিয়ে সরে আসবার আর সময় পেল না গোগো। দোকানের মধ্যে কী করে কালাচাঁদ, সেটা যথারীতি এগিয়ে গিয়ে উঁকি মেরে দেখতে যাচ্ছিল, অত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসবে কালাচাঁদ, ভাবতে পারেনি। যাহোক, সময় মতন সরে আসতে না পারলেও মুখটা চট করে ঘুরিয়ে নিয়েছিল অন্যদিকে।

সাবধান হয়ে গেল গোগো। কিন্তু পরের দোকানে এত দেরী হতে লাগল কালাচাঁদের যে ভয় হল হয়তো পিছনে কোনো দরজা আছে দোকানটার আর তাই দিয়ে সরে পড়েছে। মনে হতেই রাস্তার এপারে চলে এল গোগো। একটা রিকসো-র আড়াল নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখল, না দোকানেই আছে কালাচাঁদ। ফোন করছে।

কিন্তু কাকে ফোন করছে? গোগোকে পিছু নিতে দেখে কাবুলীদের নাকি? ছোটকা কি এখনও কাবুলীদের আড্ডায় রয়েছে? যদি থাকে তবে বুঝতে হবে কাবুলীদের হাতে ধরা পড়েছে। বোমার ব্যাপারটা কাবুলীরা বোঝেনি। কী করেছে তাহলে কাবুলীরা ছোটকাকে কে জানে! খুন করে ফেলাও আশ্চর্য নয় যদি মুখ বন্ধ করতে চায় ছোটকার। ভীষণ একটা দুশ্চিন্তা হতে লাগল গোগোর ছোটকার কথা ভেবে।

কালাচাঁদ বেরিয়ে এল দোকান থেকে। এদিক-ওদিক একবার দেখে নিয়ে তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল। এবার যাক, তবু বাড়িমুখো। সন্ধে হয়ে আসছে, বেশীক্ষণ আর কালাচাঁদের পিছনে ঘুরতেও পারবে না গোগো। সন্ধের মধ্যে বাড়ি না ফিরলে শুধু মা নয়, বাবাও তার খোঁজ করতে থাকবেন। এই সময় বাবা একবার চারতলায় গোগোর ঘরে উঠে আসেন, পড়াশুনোর খবর নেন।

এখন আর ধীরে সুস্থে নয়, বেশ বড় বড় পা ফেলে কালাচাঁদ হাঁটছে। পাল্লা দিতে গোগোকে প্রায় ওয়াকিং রেস দিতে হচ্ছে। ট্রাম রাস্তা ছেড়ে ফাঁকা রাস্তা ধরল কালাচাঁদ। সন্ধে হয়ে এসেছে বলেই বাঁচোয়া, নইলে একবার পিছন ফিরলেই এখন পরিষ্কার তাকে দেখতে পেতো কালাচাঁদ।

হঠাৎ টনক নড়ল গোগোর। কোনো আলো না জ্বালিয়ে একটা কালো গাড়ি গোগোর পিছন-পিছন আসছে না? বেশ কিছুক্ষণ ধরে? হ্যাঁ। এককেবার কিছুটা এগিয়ে আসছে আর তারপর থেমে গিয়ে আবার অপেক্ষা করছে গোগোর এগিয়ে যাবার জন্যে। একবার তো তার প্রায় পাশেই এসে থামল। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল গোগোর, ধড়াস-ধড়াস করতে লাগল বুকের মধ্যে। তবু সাহস করে হাঁটতে লাগল।

ঐ যখন দোকান থেকে ফোন করছিল কালাচাঁদ, গোগো তার পিছু নিয়েছে বুঝে তখনই নিশ্চয়ই খবর দিয়েছে কারুকে ফোনে। ঐ জন্যেই ফোন। কোন্ পথ দিয়ে ফিরবে বলেও দিয়েছে সেটা। কালো গাড়িটা এসে তারপর পিছু নিয়েছে কালাচাঁদের পিছু নেওয়া গোগোর।

কী মতলব এদের? ধরে নিয়ে যাবে নাকি গোগোকে? নিয়ে গিয়ে কী করবে? তাদের ব্যাপার অনেকিছু গোগো জেনেছে বুঝতে পারলে হয়তো খুনই করে ফেলবে!

এভাবে ফাঁদে পড়বে, বুঝতেই পারেনি গোগো। এখন সামনে তার কালাচাঁদ আর পিছনে কালো গাড়ি।

এই ফাঁদ থেকে পালাবার, বাঁচবার একটা পথ বুঝি এখনো একটা রয়েছে গোগোর। একটা সরু গলি রয়েছে আরেকটু এগোতে পারলেই। সেটা দিয়ে গাড়ি ঢুকবে না। কালাচাঁদ পেরিয়ে যাবার পর একবার সেই গলিতে ঢুকতে পারলেই এমন

একটা দৌড় দেবে গোগো যে ঐ কালোগাড়িতে মিলখা সিং থাকলেও তাকে ধরতে পারবে না।

কিন্তু সে সুযোগ বুঝি আর পাওয়া গেল না। ঐ কালো গাড়িতে যারা আছে, গলিটার কথা তারা বোধহয় জানে। আর তাই সময় বুঝে এগিয়ে আসছে।

একেবারে পিছনে এসে পড়েছে গোগোর। এই বুঝি গাড়ি থেকে ষণ্ডামার্কা কয়েকটা লোক এসে চেপে ধরবে! শেষ একটা চেষ্টা করবে নাকি গোগো? দেবে নাকি একটা ছুট?

না, দিয়ে লাভ নেই। কালাচাঁদ এখনও পেরিয়ে যায়নি গলিটা। ধরে ফেলবে গোগোকে গলির মুখ আগলে।

হঠাৎ কালো গাড়িটা সোঁ করে এগিয়ে গেল। গোগোকে ফেলে রেখে কালাচাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দরজা খুলে কথা বলতে লাগল কালাচাঁদের সঙ্গে। তার মানে, কালাচাঁদের পিছু নেওয়া গোগো কে এবং কী দেখে নিয়ে এখন কালাচাঁদকে তুলে নিয়ে চলে যাবে।

কিন্তু ও কী? গাড়ি থেকে বেরুনো দুটো হাত ও-রকম শার্টের কলার ধরে টানছে কেন কালাচাঁদের? কালাচাঁদও চেষ্টা করছে, ছাড়িয়ে গাড়ির কাছ থেকে সরে যাবার কিন্তু পারছে না! হাত থেকে ব্যাগটা ফেলে দিল কালাচাঁদ, দু-হাত দিয়ে চেষ্টা করতে লাগল নিজেকে ছাড়াবার। একটু বুঝি পারলও কিন্তু গাড়ির সামনের সীট থেকে চট করে নেমে এসে একজন কী একটা মারল কালাচাঁদের মাথায়। আর, পারল না কালাচাঁদ। নেতিয়ে পড়ল। লোকটা ঠেলে কালাচাঁদকে ঢুকিয়ে দিল গাড়ির মধ্যে। দিয়ে বন্ধ করে দিল পিছনের দরজা। তারপর সে গিয়ে আবার সামনে উঠে বসতেই ছেড়ে দিল গাড়ি। হু-উ-শ করে বেরিয়ে সেই মোড়ে গিয়ে একবার একটু থামল। তারপর মোড় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সমস্ত ঘটনাটা ঘটে গেল চোখের সামনে। ছবির মতন। চেঁচাবে কি, চেঁচানোর কথা মনেই ছিল না গোগোর। মনে যদি থাকতও আর আওয়াজও যদি শেষ পর্যন্ত বের হোত গলা দিয়ে, তাতেও কোনো লাভ হোত না। একটা লোকও নেই রাস্তায় এই মুহূর্তে।

রাস্তাটা ফাঁকা পাবার জন্যেই যে কালো গাড়িটা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল, বুঝতে পারল গোগো। আর, এতক্ষণ যে তাকে নয়, কালাচাঁদকে ধরবার জন্যেই পিছু নিয়েছিল, বুঝতে পারল সেটাও।

কিন্তু এরা কারা? বিগ্রহচুরির ব্যাপারে কেউ, না, এমনি একটা ডাকাতের দল? নোটভর্তি ব্যাগ দেখেছে কালাচাঁদের হাতে আর তাই পিছু নিয়েছে। তারপর কালাচাঁদ এই ফাঁকা রাস্তায় ঢুকতেই সুযোগ পেয়ে—

কিন্তু তাহলে তো ব্যাগটাই নেবে! শুধু ব্যাগটাই ছিনিয়ে নেবে কালাচাঁদের হাত থেকে ছোরা বা পিস্তল একটা কিছু দেখিয়ে। কিন্তু তা তো নয়, ব্যাগটা তো ঐ পড়ে রয়েছে রাস্তায়!

নিশ্চয়ই বিগ্রহচুরির কেসের সঙ্গে এই ঘটনার যোগ আছে। কিম্বা পতিতপাবনবাবুর অনেক টাকা বলে কালাচাঁদকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল। এবার চিঠি লিখে মুক্তিপণ চাইবে।

পরিষ্কার করে কিছুই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। যাই হোক, এখনই একটা খবর দেওয়া দরকার পতিতপাবনবাবুদের। যাওয়া দরকার, পৌঁছে দেওয়া দরকার ঐ ব্যাগটা কালাচাঁদের।

সেখানে যাবে, না, বাড়ি ফিরবে আগে? ফিরে ছোটকাকে খুলে বলবে সব। তারপর পরামর্শ করে—

কিন্তু কাবুলীদের আড্ডা থেকে বেরুতে পেরেছে কি ছোটকা? সেটাই খবর নেওয়া দরকার আগে। দরকার হলে বাড়ি গিয়ে সব কথা খুলে বলবে গোগো বাবাকে। ছোটকার যদি কিছু একটা হয়ে যায়—

কালাচাঁদের ব্যাগটা রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে হনহন করে হাঁটতে শুরু করল গোগো।

ভয়ে ভয়ে দরজা ঠেলে বাড়িতে ঢুকল গোগো। সন্ধে অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে, কটা বাজে এখন কে জানে! যাই বাজুক, এর মধ্যে নিশ্চয়ই অনেকবার খোঁজ হয়ে গেছে তার। কিন্তু দেরী করে ফেরার জন্যে খুব একটা এখন ভাবছে না গোগো। ভাবছে ছোটকার জন্যে।

কিন্তু বাড়ি এত চুপচাপ কেন? শুধু রান্নাঘর থেকে ঠাকুরচাকরদের গলা শোনা যাচ্ছে। বাড়িতে কেউ নেই নাকি?

ব্যাগটা নিয়ে পা টিপে টিপে দোতলায় উঠল গোগো। বারান্দায় শুধু আলো জ্বলছে, ঘর সব অন্ধকার, তালা দেওয়া। কোথাও গিয়ে থাকবেন মেজকা-কাকীমা মেয়েদের নিয়ে।

তিনতলাতেও তাই। বাবা-মা, দিদি? কোথায় গেল সবাই?

চারতলায় উঠে একটু আশ্বস্ত হল গোগো। অন্ধকার হলেও ওর আর ছোটকার ঘরদুটো খোলা। নিজের ঘরে ঢুকে আলো জ্বালিয়ে কালাচাঁদের ব্যাগটা আগে ঢুকিয়ে রাখল খাটের তলায়। তারপর টেবিলের কাছে এসে খুঁজতে লাগল—কোথাও কোনো চিঠি গুঁজে রেখে গিয়েছে নাকি ছোটকা?

না, কোনো চিঠি নেই। তার মানে, ফেরেনি ছোটকা।

নিচে নেমে এল আবার গোগো। একতলায় খাবারঘরে ঢুকতেই রান্নাঘরের গল্প বন্ধ হয়ে গেল আর ভগীরথ বেরিয়ে এল।

কোথায় গিয়েছে সবাই?

নিমন্ত্রণে। সেজবাবুর শালীর মেয়ের বিয়ে না আজ?

নেমন্তন্নটার কথা শুনেছিল বটে গোগো, কিন্তু সেটা যে আজ, জানতো না।

ভগীরথ বলল—সবাই রওনা হয়ে গেলেন। শুধু বড়বাবু অপেক্ষা করছিলেন তোমার আর ছোটবাবুর জন্যে।

ছোটকা গিয়েছে?

হ্যাঁ, কিছুতেই যেতে চাইছিলেন না। বলছিলেন, ভীষণ কাজ আছে। বড়বাবু ধমক দিয়ে জোর করে নিয়ে গেলেন।

তাহলে ছোটকা ফিরেছে। বেরিয়ে আসতে পেরেছে অক্ষত অবস্থায় কাবুলীদের আড্ডা থেকে। তারপর গোগোর কাছ থেকে কালাচাঁদের খবর জানতে বাড়িতে এসেছিল কিন্তু ধরা পড়ে গেছে বাবার কাছে।

মন থেকে ভীষণ একটা ভার নেমে গেল গোগোর। সঙ্গে সঙ্গে ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠল বৈঠকখানায় আর তিনতলায়। সেইরকমই ব্যবস্থা, এক জায়গায় ধরলেই হয়। ধরবার জন্যে ছুটে গেল গোগো বৈঠকখানায়। বোধহয় ছোটকাই ফোন করছে নেমন্তন্নবাড়ি থেকে বা বেরিয়ে।

হ্যালো—

কখন ফিরেছো?

গলাটা বাবার। রীতিমতন গম্ভীর। ঢোঁক গিলে গোগো বলল—একটু আগে। হঠাৎ একটা—

বাধা দিয়ে বাবা বললেন—কাল সকালে শুনবো। আমাদের ফিরতে দেরী হতে পারে। সময়মতন খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো।

হুঁ।

বাবা ফোন রেখে দিলেন। গোগো ফিরেছে কিনা, জানবার জন্যেই ফোন করছিলেন বোঝা গেল। ঈস, একটু আগে ফিরতে পারলে গোগোও যেতে পারতো নেমন্তন্নে, খেতে পারতো যত খুশী ফ্রাই। কার মুখ দেখে উঠেছিল আজ? বিকেলে অমন মোগলাই পরোটা মিস হয়ে গেল, তারপর আবার এই নেমন্তন্ন! দুটো ডিম আর এক পাতা ঘুগনি খেয়েছে বটে গোগো কিন্তু সে কখন হজম হয়ে গেছে। যা হাঁটিয়েছে তাকে কালাচাঁদ!

কালাচাঁদের খবরটা পতিতপাবনবাবুদের দেওয়ার কথা মনে পড়ল গোগোর। কালাচাঁদের ব্যাগটা যে তার কাছে, সেটা এখনই অবশ্য বলবে না। ছোটকা ফিরলে দু-জনে মিলে আগে পরীক্ষা করবে। তারপর তেমন বুঝলে তরুণদার কাছে নিয়ে যাবে ছোটকা।

মনেই ছিল নম্বরটা। ডায়েল করতে প্রথমে এনগেজড হল। আবার করতে আবারও এনগেজড। আরো দুবার করার পর তবে রিং হল। আর, একবার রিং হতেই সাড়া ভেসে এল—হ্যালো?

মিঃ সাহা আছেন?

-কে বলছেন?

গলাটা মনে হল শ্যামচাঁদের। গোগো বলল—আমায় আপনি চিনতে পারবেন না। একটা খবর দেবার জন্যে—

বাধা দিয়ে শ্যামচাঁদ বলল—বিলক্ষণ চিনতে পারছি।

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমালটা বের করে রিসিভারের উপরে রেখে গোগো বলল—চিনতে পেরেছেন?

হ্যাঁ। বিরূপাক্ষ করঞ্জায়ীর পাঠানো যে ছোকরা দুপুরে এসেছিল এখানে, আগে সে কথা বলছিল। এখন কে, বুঝতে পারছি না। স্বয়ং মিঃ করঞ্জায়ী হলেও আশ্চর্য হবো না।

ঠিকই ধরেছেন। আমি বিরূপাক্ষ করঞ্জায়ী। আপনার বাবার কাছে আমার নাম শুনে থাকবেন।

পুলিশের কাছেও শুনেছি।

পুলিশ? কী শুনেছেন পুলিশের কাছে?

বিরূপাক্ষ করঞ্জায়ী নামে কোনো গোয়েন্দা কলকাতায় নেই। কষ্মিনকালে ছিল না।

হাসবার চেষ্টা করল গোগো—কে বলেছে? তরুণ সরকার বুঝি? দাঁড়ান, এখনই ফোন করছি তাকে, দেখি কেমন না চেনে!

চিনবে নিশ্চয়ই। গলা শুনেই চিনবে আপনার। তবে গোয়েন্দা হিসেবে নয়।

তার মানে?

দেখুন, যেভাবে, আপনার পাঠানো ঐ ছোকরা পুলিশের লোকের চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়েছে তাতে আপনারা যে খুবই পাকা আর ওস্তাদ লোক তাতে সন্দেহ নেই। আর, পুলিশের সঙ্গে যে আপনাদের সম্পর্কটাও মধুর নয়, সেটাও পরিষ্কার।

সেই বুড়োটা তাহলে পুলিশের লোক ছিল! আর গোগোর পিছু নিয়েছিল বিগ্রহচুরির ব্যাপারে সম্পর্ক রয়েছে সন্দেহ করে!

তাড়া দিয়ে উঠল শ্যামচাঁদ—কী চুপ করে রয়েছেন কেন?

গোগো হেসে বলল—না, কথাটা জিজ্ঞেস করছিলাম আমার অ্যাসিস্ট্যান্টকে। ও বলছে, হ্যাঁ, পুলিশের একটা লোক ওর পিছু নিয়েছিল বটে। কিন্তু তার খবর পুলিশ জানলো কী করে? আপনারা জানিয়েছিলেন?

বাবা জানিয়েছিলেন। একটা দুধের ছেলেকে গোয়েন্দাগিরি করতে পাঠালে কার বিশ্বাস হয়, বলুন? যাক, সেকথা। কাজের কথা বলা যাক। কত টাকা পেয়েছেন?

টাকা?

হ্যাঁ, টাকা। বলুন কত টাকা দিয়েছে আপনাকে রোশনলাল?

রোশনলাল! নামটা শুনে খাড়া হয়ে উঠল গোগোর কান। চট করে ভেবে নিয়ে বলল—কেন বলুন তো?

জানতে পারলে তার ডবল টাকা আমরা আপনাকে দিতে পারি কালাচাঁদকে ছেড়ে দেবার জন্যে।

তার মানে, কালাচাঁদের কিডন্যাপিং-এর খবরটা এর মধ্যেই পেয়ে গেছে শ্যামচাঁদ। আর সেইসঙ্গে সন্দেহ করছে কাজটা বিরূপাক্ষ করঞ্জায়ীর দলের।

আবার তাড়া দিয়ে উঠল শ্যামচাঁদ—কী, চুপ করে রয়েছেন কেন? প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখছেন?

গোগো হেসে বলল—না। খবরটা এত তাড়াতাড়ি আপনি পেলেন কী করে, তাই ভাবছি। কে দিল?

যে কালাচাঁদকে গুম করিয়েছে আপনাদের দিয়ে!

রোশনলাল?

হ্যাঁ। কাজেই অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই।

আমার নাম বলেছে সে?

বলার দরকার হয়নি। মন্দিরের পুরুত আর মিউজিয়মের কর্মচারীদের মোটা হাতে টাকা খাইয়ে কীভাবে রোশনলাল কাজ উদ্ধার করে আমি জানি। তার কোনো দল নেই, কোনো সাকরেদ নেই। একা কালাচাঁদকে গুম করা তার পক্ষে মুস্কিল।

মন্দির আর মিউজিয়ম থেকে রোশনলালের চুরির যে কথাটা বলছে শ্যামচাঁদ সেটা যে অনেকখানি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেও তাতে আর সন্দেহ নেই। তার মানে, শ্যামচাঁদকে হাত করে সোনার রাধারানী বিগ্রহটা রোশনলালই চুরি করেছে। কিন্তু চুরিই যদি করে থাকবে তাহলে তো সেটা নিয়ে চলে গিয়ে থাকবে দিল্লিতে। কিম্বা যেমন একটা সন্দেহ করা যাচ্ছে, ক্যাপটেন হার্ডির মারফৎ পাচার করে দিয়ে থাকবে বিদেশে। যাই করে থাকুক, দিল্লি থেকে ফিরে এসে গুম করবে কেন কালাচাঁদকে?

শুধু তাড়া নয়, ধমকে উঠল এবার শ্যামচাঁদ গোগোকে চুপ করে থাকতে দেখে। বলল—আবার চুপ করে আছেন কেন?

গোগো হেসে বলল—সবই ঠিক কিন্তু আপনার ভাইকে আমরা গুম করেছি, এটা ভাবছেন কেন?

ও, কী করে ধরা পড়লেন আমার কাছে, সেটা নিয়ে ভাবছেন?

বাঃ, ভাবতে হবে না? সাবধান হতে হবে না ভবিষ্যতে?

তবে শুনুন। গুম হবার ঠিক আগে একটা দোকান থেকে কালু ফোন করে জানিয়েছিল আপনার সেই ছোকরা তার পিছু নিয়েছে। সঙ্গে ব্যাগে কিস্তির অত টাকা—

কীসের টাকা?

কিস্তির। অনেক দোকানী-ব্যবসায়ী আমাদের কাছে টাকা নেয়। প্রতি সপ্তাহে কিস্তিতে সেটা শোধ করে।

যেটা নোট ভাঙানো বলে ভাবা গিয়েছিল, সেটা তাহলে এই ব্যাপার। গোড়ায় নোটটা কালাচাঁদকে দিতে না-দেখার কারণও সেটাই। কিন্তু কাবুলীদের আড্ডায় যাওয়ার কারণটা কী?

গোগো জিজ্ঞেস করল—কাবুলীরাও টাকা নেয় নাকি আপনাদের কাছ থেকে?

হ্যাঁ। কম সুদে নিয়ে বেশী সুদে খাটায়। ঐ কাবুলীদের আড্ডা থেকে বেরিয়েই কালু প্রথম আপনার ছোকরাটিকে দেখতে পায় পিছন-পিছন আসতে। ফলো করছে বুঝতে পেরে ফোন করে আমাদের জানায়। খুব বেশীক্ষণের কথা নয়। তারপর এইমাত্র রোশনলাল ফোন করে জানালো, কালু তার জিম্মায়। তার কথামতন কাজ না-করলে কালুকে সে কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে। ফলে, দুই আর দুই চার করে আপনারা কারা আর কার হয়ে কাজ করছেন সেটা ধরে ফেলতে আমার দেরী হয়নি। দুপুরে আপনার ঐ ছোকরা কী মতলবে এসেছিল সেটা বুঝতেও।

কী মতলব কল্পনা করছে শ্যামচাঁদ? গোগো হেসে জিজ্ঞেস করল—কী মতলব, শুনি?

মন্দিরের পুজারীর সঙ্গে কথা বলতে। আসল জিনিসটা কোথায়, সেটা তার কাছ থেকে বের করতে।

আসল জিনিস? চকিতে পতিতপাবনবাবুর বাড়ির দরজায় পাথরের ফলকদুটো ভেসে উঠল গোগোর চোখে। যে ফলকটা পুরনো অর্থাৎ সোনার রাধারানীর বিগ্রহ আসবার আগে লাগানো, সেটাতে লেখা রয়েছে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির। শুধু কৃষ্ণ নয়, রাধাকৃষ্ণ। তার মানে, কৃষ্ণের সঙ্গে রাধারও একটা বিগ্রহ ঐ মন্দিরে আগে ছিল। কৃষ্ণ যখন ধাতুর, রাধাও নিশ্চয়ই ধাতুরই ছিল। তাতে সোনার জল করে আসল সোনার বিগ্রহ বলে রোশনলালকে বিক্রি করেছে নাকি শ্যামচাঁদ? ডবল লাভের জন্যে? আর, আসলটাই যে দিয়েছে, সেটা বোঝানোর জন্যে সোনার বিগ্রহটা সরিয়ে রেখেছে মন্দির থেকে? তারপর দিল্লিতে ফিরে সেই জোচ্চুরি ধরতে পেরে রোশনলাল আবার ফিরে এসেছে? এসে শুধু কথায় কাজ হচ্ছে না দেখে গুম করেছে কালাচাঁদকে?

ওদিকে আবার ব্যস্ত হয়ে উঠল শ্যামচাঁদ—কী হল? আবার চুপ করে গেলেন কেন?

গোগো খুব বিরক্ত হয়ে বলল—না, একটু ধমকে দিচ্ছিলাম আমার অ্যাসিস্ট্যান্টটিকে। সত্যি। দিন দিন যেন আরো অপদার্থ হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আপনিই বলুন তো, ঐ বৃন্দাবন

ঠাকুর সত্যিই ভিতরের এতসব ব্যাপার জানেন না, না, আমার গবেট এই অ্যাসিস্ট্যান্টই কোনো কথা বের করতে পারেনি!

না। তিনি এত সব কিছুই জানেন না। অন্তত আমরা বলিনি। তবে যদি কিছু সন্দেহ করে থাকেন!

করেছেন বলে মনে হয়? মানে, তেমন কোনো কারণ ঘটেছে?

চুপ করে রইল কিছুক্ষণ শ্যামচাঁদ। গোগো বলল—এবার কিন্তু আপনি চুপ করে রয়েছেন, মিঃ সাহা!

শ্যামচাঁদ বলল—কিন্তু এত সব কথা আপনি জানতে চাইছেন কেন, বুঝতে পারছি না।

সন্দেহটা শেষ পর্যন্ত উঁকি দিয়েছে শ্যামচাঁদের মনে। অনেক আগেই দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু রোশনলালের কাছে কালাচাঁদের খবর পেয়ে এত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে যে ভালো করে কিছু বুঝি ভাবতেই পারছে না। পারলে, গোগো মানে বিরূপাক্ষ করঞ্জায়ী কী উদ্দেশ্যে ফোন করছে, সেটাই তো আগে জানবার চেষ্টা করত।

করলও। একবার সন্দেহটা মনে আসতেই। বলল—যদিও রোশনলালের ফোনটা রেখেই আমি আপনার কথা ভেবেছি কিন্তু সংগে সংগেই যে আপনি ফোন করবেন, সেটা ভাবতে পারিনি। কেন ফোন করছিলেন বলুন তো?

গোগো হেসে বলল—সোনার রাধারানী চুরির রহস্যটা জানতে পারার পর, মানে চুরি-যাওয়া রাধারানী কতখানি সোনার সেটা জানার পর মনে হয়েছিল হয়তো আমাকে আপনার দরকার হতে পারে। বিশেষ করে কালাচাঁদবাবুর গুম হবার খবরটা যদি আপনাকে দিতে পারি।

দাঁতে দাঁত চেপে শ্যামচাঁদ বলল—তার মানে, যতটা শয়তান আপনাদের ভেবেছিলাম, দেখছি তার চেয়েও বেশী।

অন্তত আপনার চেয়েও যে এক কাঠি বেশী, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন যা অবস্থা তাতে তেমন কেউই এক যদি বাঁচাতে পারে আপনাদের। তবে তার আগে তাকে জানতে হবে কতটা ঝুঁকি সে নিচ্ছে। আর সেটা বুঝতে হলে কিছু কিছু খবর তাকে জানতে হবে বৈকি! তা, আপনার যখন এত আপত্তি, তবে থাক। রাখছি ফোন, নমস্কার।

না-না, ছাড়বেন না। কী যেন জানতে চাইছিলেন? ও, হ্যাঁ। জ্যাঠামশায়ের মনে সন্দেহ জাগার মতন কোনো কারণ রয়েছে কি না?

হ্যাঁ।

দেখুন, মন্দিরের আয় ইদানীং ভীষণ কমে গিয়েছে। তাই রাগ করে বাবা মাঝে মাঝে জ্যাঠামশাইকে বলেন মন্দির বন্ধ করে দেবেন বলে। সোনার রাধারানী মন্দিরে সাজিয়ে না রেখে গালিয়ে বিক্রি করে দিলে যে টাকা পাবেন, সেটা সুদে খাটালে অনেক, অনেক বেশী টাকা আসবে। কিন্তু সেটা বুঝতেই পারছেন শুধু কথার কথা। তবে তা থেকে যদি জ্যাঠামশাই কিছু—

সকালে ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কানে আসা কথাগুলি সব মনে পড়তে লাগল গোগোর। মিলেও যেতে লাগল সব। আশ্চর্য মানুষ সত্যি পতিতপাবনবাবু। মন্দিরও তাঁর কাছে ব্যবসা।

শ্যামচাঁদ বলল—এবার বলুন, কত টাকা আপনারা চান কালুকে ছেড়ে দেবার জন্যে?

দশ হাজার।

বড্ড বেশী। কিছু কমান।

পুরস্কারই তো সাত হাজার ঘোষণা করেছেন। সেটা তো দিতে হচ্ছে না কারুকে।

দেবার প্রশ্নই কখনো ছিল না। ওটা হার্ডির জন্যে।

কী রকম?

বাড়িয়ে বাড়িয়ে ওটা পঞ্চাশ হাজার ঘোষণা করার কথা আর খবরের কাগজগুলি পাঠিয়ে দেবার কথা আমেরিকায় ক্যাপটেন হার্ডির কাছে। ঐগুলি দেখিয়ে যাতে ভালো দাম পেতে পারে সেখানে হার্ডি।

যে জিনিসটা দিয়েছেন, সেটা যে আসল নয়, সেটা কে ধরল? রোশনলাল, না, হার্ডি?

হার্ডি। অতটা পাকা লোক আমি ভাবিনি। একদিন রাতে বাড়িতে এনে আসলটা ওকে পরীক্ষা করতে দিয়েছিলাম। তারপর ওর জাহাজ ছাড়ার একঘণ্টা আগে রোশনলালের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম জাহাজ নিয়ে ও ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এখান থেকে যে মাদ্রাজে যাচ্ছে আর যেতে যেতে আবার পরীক্ষা করবে, ভাবিনি। একবার এ-দেশ থেকে জাহাজ নিয়ে চলে গেলে সহজে তো আর ফিরতে পারবে না। তারপর অত দিন পর এসে বললে রোশনলালই হয়তো বিশ্বাস করত না। করলেও এত জোর করে কখনও ধরতে পারত না আমায় তখন।

জাহাজ নিয়ে ফিরে এসেছে নাকি হার্ডি?

না। মাদ্রাজে পৌঁছেই ফোন করেছে দিল্লিতে রোশন লালকে। আর তারপর দু-জনে প্লেন ধরে চলে এসেছে এখানে।

তাহলে দেখছি খুবই একটা বিপদে পড়ে গিয়েছেন আপনি। টাকাটাও পুরো ফেরত দিতেও পারছেন না, খরচ করে ফেলেছেন এর মধ্যে কিছু—

না। পুরো টাকাটাই আমি ফেরত দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু ওরা রাজী নয়। ওদের আগেরটার বদলে আসলটা চাই। আর যাতে সেটা দিতে বাধ্য হই তাই কালুকে গুম করিয়েছে আপনাদের দিয়ে। তা আপনাদের তো টাকা নিয়ে কথা। দশ, দশই দেব, কালুকে আপনারা ছেড়ে দিন।

ছেড়ে তো আর দিতে পারব না। এখন শুধু ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করতে পারি।

আর্তনাদ করে উঠল শ্যামচাঁদ—সে কী? কেন, কালুকে কি এর মধ্যেই রোশনলালের হাতে তুলে দিয়েছেন?

নইলে লেনদেনটা হবে কী করে? যাক, কাজের কথা বলুন। রোশনলাল এসে কোথায় উঠেছে এবার?

আশ্চর্য হয়ে শ্যামচাঁদ বলল—কেন, আপনি জানেন না?

না। ফোনে অর্ডার দিয়েছিল আর অপেক্ষা করছিল লেকের ধারে। ক্যাশ পেমেন্ট করে মাল নিয়ে গেছে। যাক, তার জন্যে কিছু নয়, আপনি তো জানেন কোথায় এখন ধরতে পারব তাকে—

হতাশ স্বরে শ্যামচাঁদ বলল—না। জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলেনি।

সে কী? আসল জিনিসটা তাহলে কোথায় ডেলিভারী দেবেন?

ফোর্টের কাছে গঙ্গার ধারে রাত বারোটা থেকে একটার মধ্যে নিয়ে যেতে বলেছে। হার্ডিও থাকবে। হাতে হাতে বদলে নেবে। সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেবে কালুকে।

তার মানে, কালাচাঁদবাবুও সঙ্গে থাকবেন!

হ্যাঁ, তাই তো কথা।

ছাড়াতে হলে তাহলে সেখানেই ছাড়াতে হবে।

কালুকে? কেন, আগে খুঁজে বের করতে পারবেন না?

চেষ্টা করব। লোকজন সব চলে গেছে আমার। দেখি, কী করতে পারি—

পারি নয়, করতেই হবে।

আচ্ছা, একটু পরে জানাচ্ছি আপনাকে।

ঠিক জানাবেন তো? অ্যাডভান্স কিছু চান তো—

টাকা তো রয়েইছে আপনাদের আমার কাছে।

কী করে? ও কালুর ব্যাগের কিস্তির টাকাগুলি?

হ্যাঁ। রোশনলাল আপনার ভাইকে চেয়েছিল, ব্যাগটার কথা কিছু বলেনি।

ভালোই করেছেন না দিয়ে। তা, ঠিক জানাচ্ছেন তো?

যদি না জানাই তা হলে রোশনলালের কথামতন কাজ করবেন জানবেন, যা করার তা গঙ্গার ধারেই করব। গুড নাইট।

ফোনটা নামিয়ে রেখে হাঁপ ছাড়ল গোগো। প্রায় হাঁপানোর মতন জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিল কিছুক্ষণ। আর, আর পারছিল না গোগো। যতক্ষণ দরকার, ততক্ষণ অবশ্য পেরেছে। পারতে হয়েছে। কিন্তু এ-রকম কথার পিঠে কথা গুছিয়ে শ্যামচাঁদের মতন লোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কথা বলা? পারবে, পারতে পারে—গোগোও কি কোনো দিন ভাবতে পেরেছিল? ছোটকা তো শুনলে অজ্ঞান হয়ে যাবে।

যা ধকল গেছে এতক্ষণ ঐভাবে কথা বলতে, ক্লান্তিতে মনে হচ্ছে গোগোও অজ্ঞান হয়ে যাবে। চেয়ার থেকে উঠতে আর ইচ্ছে করছে না, পারছেও না।

দরকারও নেই। বিগ্রহ চুরির সব রহস্যই এখন গোগোর কাছে জল হয়ে গিয়েছে। ছোটকা এলে কথাগুলি শুধু একবার তাকে বলে দেওয়া। যাতে তরুণদা, পুলিশ সব জানতে পারে। সেইজন্যে শুধু বারোটার কিছু আগে ফেরা দরকার ছোটকার।

১০

ঢং ঢং করে দশটা বাজল। চমকে উঠে বসল গোগো পড়ার টেবিলে।

ভগীরথের তাড়ায় ন-টার আগেই খেয়ে নিয়েছিল। তারপর কাল স্কুলের কথা মনে পড়তে হোমটাস্ক-এর অঙ্কগুলি কষতে বসেছিল। তারপর ধাতুরূপ মুখস্থ করতে করতে শুরু করেছিল হাই তুলতে। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল, জানে না।

ঢুলু ঢুলু চোখে চেয়ার থেকে উঠে বিছানায় যাচ্ছিল গোগো, এমন সময় তিন তলায় ফোন বেজে উঠল। আর বাজছে তো বাজছেই। ঐ সঙ্গে একতলাতেও নিশ্চয়ই বাজছে কিন্তু কোথাও কেউ ধরছে না কেন? বাড়ির সবাই গেল কোথায়?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল সব। মনে পড়ল—সবাই নেমন্তন্নে গেছে। মনে পড়ল—কালাচাঁদ, শ্যামচাঁদ আর রোশনলালের কথা। ছোটকা এলে সব বলে জানাবার কথা তরুণদাকে।

নিচে নেমে এসে ফোনটা ধরল গোগো। সাড়া দিতেই মেজকা-র গলা ভেসে এল—কে রে, গোগো? ঘুমিয়ে পড়েছিলি?

হ্যাঁ।

শোন্। ফিরতে অনেক দেরী হবে আমাদের। এঁরাও বলছেন আর তোর কাকীমারাও বিয়ে দেখে যেতে চাইছে।

ছোটকা?

ছোট্টু চলে গেছে ট্যাকসি করে। বারান্দার দরজাগুলিতে তালা দিয়ে দিতে বলিস ওকে। ভীষণ চুরি হচ্ছে চারদিকে।

চাবি?

ঐ য্যা! দিতে ভুলে গেলাম যে ছোট্টুকে! শোন্, ওকে বলিস—বৈঠকখানায় আমার টেবিলের বাঁ দিকের একেবারে তলার দেরাজে ডুপ্লিকেট গোছাটা আছে।

আচ্ছা।

মেজকা ফোন ছেড়ে দিলেন। যাক, ছোটকা এসে পড়বে এখনই। চোখে জল দিয়ে এসে গোগো আবার পড়ার টেবিলে বসল। বইটা খোলাই ছিল, মুখস্থ করতে লাগল ধাতুরূপ।

মুখস্থ হয়ে গেল ধাতুরূপ। ঢং করে সাড়ে দশটা বাজল। কৈ, ছোটকা তো এল না এখনও। এতক্ষণ লাগে ট্যাকসিতে আসতে? নাকি বেরিয়ে তরুণদার কাছে গিয়েছে? নিশ্চয়ই একটা ফোন করবে তাহলে ছোটকা সেটা জানাতে। তখনই সব বলে দিতে পারবে গোগো তরুণদাকে বলার জন্যে।

• কিন্তু না ছোটকা, না কোনো ফোন। ঘড়ির কাঁটা যত এগোতে লাগল এগারোটার দিকে, চোখের ঘুম ছুটে গিয়ে তত ছটফট করতে লাগল গোগো। আর, তত রাগ হতে লাগল ছোটকার উপর। মস্ত বড় গোয়েন্দা হয়েছেন ছোটকা! ঘন ঘন ছুটছেন তরুণদাকে অ্যাডভাইস দিতে! আর, এদিকে গোগো যে সব রহস্যের কিনারা করে বসে রয়েছে, সেটা ভাবতেও পারছেন না একবার!

ঢং ঢং করে এগারোটা বাজল। না, আর তো অপেক্ষা করা যায় না ছোটকার জন্যে।

নেমে এসে ফোনের বইটা খুলে পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের নম্বর খুঁজে বের করতে খুব বেশী সময় লাগল না। তরুণদাকে এই নম্বরে পাওয়া না গেলেও কোন্ নম্বরে পাওয়া যাবে সেটা অন্তত জানা যাবে এই নম্বরে ফোন করলে।

ডায়েল করে সাড়া পেতেই গোগো বলল—হ্যালো, তরুণ সরকার আছেন?

তরুণ? না, নেই এখন টেবিলে।

কোথায় গেছেন, বলতে পারেন?

কে বলছেন?

বুদ্ধি করে গোগো বলল—আমি ওঁর বাড়ি থেকে বলছি।

ও, হ্যাঁ। তরুণ বলে দিতে বলে গেছে ওর ফিরতে দেরী হবে।

ও।

আচ্ছা।

ব্যস, গোগো আর কিছু বলার আগেই ফোনটা কেটে দিল ওদিক থেকে। তাতে আরো রাগটা বেড়ে গেল ছোটকার উপর।

সত্যি, কী আক্কেল ছোটকার? তোমার ছোট ভাইপো রাতে একা রয়েছে বাড়িতে আর তুমি তরুণদার সঙ্গে গোয়েন্দাগিরি করে বেড়াচ্ছো? বাঃ!

কিন্তু কী করবে এখন গোগো? শ্যামচাঁদ-রোশনলালকে গঙ্গার ধারে হাতে-নাতে ধরার সময়টা যে ক্রমশই এগিয়ে আসছে। সেই সঙ্গে হার্ডিকেও। আর দেরী করলে হার্ডি তো সরে পড়বেই, শ্যামচাঁদ, রোশনলালও স্রেফ অস্বীকার করবে। শুধু গোগোর কথায় তো কিছু প্রমাণ হবে না। এত জেনেও হাতে নাতে ধরতে পারছে না বলে রোশনলালকে যে কারণে কিছু করতে পারছে না পুলিশ!

এত রাত্তিরের ব্যাপার বলেই যা! নইলে, এতদূর পর্যন্ত যখন একাই সব করেছে গোগো, বাকিটাও একাই করত। দিনের বেলা হলে একাই চলে যেত তার ক্যামেরা নিয়ে। গিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে বসে থাকতো আগে থেকে আর যেই বিগ্রহ লেনদেন হোত, অমনি ছবি তুলে নিত একটা।

হ্যাঁ, শুধু রাত্তির বলেই এত ভাবছে। কিন্তু তাই বা ভাবছে কেন? শ্যামচাঁদের পেট থেকে কায়দা করে অত কথা বের করতে পারল গোগো আর একা ট্যাকসি নিয়ে একবার যেতে পারবে না গঙ্গার ধারে? ছোটকার ফ্ল্যাশ দেওয়া ক্যামেরাটা নিয়ে?

ট্যাকসি ভাড়া?

খাটের তলা থেকে কালাচাঁদের ব্যাগটা টেনে বের করল গোগো। তারপর চটপট স্কুলের এন-সি-সি ক্যাডেটের পোশাকটা পরে নিয়ে ছোটকার ঘরে ঢুকল। ফ্ল্যাশ ক্যামেরাটা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়ে কী ভেবে আবার একটু দাঁড়ালো।

পাঁচ মিনিট পরে ছোটকার ঘর থেকে বেরিয়ে পা টিপে টিপে নেমে এল নিচে। ভগীরথটা না দেখতে পায়, এত রাতে বেরুতে দেখে আবার না আটকে দেয়!

আর, ভাগ্যিস বুদ্ধি করে ঐ ক্যাডেটের পোশাকটা পরে এসেছিল! নইলে, এত রাতে ড্রাইভারটা বোধ হয় নিতই না ট্যাকসিতে। নিয়েও কেমন বার বার আয়নাটা দিয়ে দেখতে লাগল গাড়ি চালাতে চালাতে।

১১

এত নির্জন, এত অন্ধকার হবে যে গঙ্গার ধারটা এই সময়ে, ভাবতেই পারে নি গোগো। গঙ্গার ধারে নৌকোগুলি থেকে মাঝিদের অকটু-আধটু আওয়াজ ভেসে আসছিল, ক্রমশ তাও থেমে গেল। শুধু মাঝে মাঝে হেডলাইট জ্বালিয়ে এক-আধটা গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাবার সময় একটু যা আওয়াজ হচ্ছিল

আর-ফিকে হচ্ছিল অন্ধকার কয়েক সেকেন্ডের জন্যে।

বারোটা নিশ্চয়ই বেজে গিয়েছে অনেকক্ষণ। না কি একা-একা এই নির্জন অন্ধকারে বসে আছে বলে অনেকক্ষণ মনে হচ্ছে। ঐ দূরে একটা গাড়ি থামার আওয়াজ হল। ভেসে এল মিটারের ফ্ল্যাগ তোলার টুং টাং শব্দ। তার মানে ট্যাকসি। দূরে ট্যাকসি রেখে এইখানেই কেউ আসছে না কি? ট্যাকসিটা চলে যেতে তাড়াতাড়ি মুখ তুলে দেখবার চেষ্টা করল গোগো। কিন্তু দেখতে পেল না কাউকে।

ছপ ছপ আওয়াজ আসছে একটা জলের দিক থেকে। নৌকো করেও আসছে না কি কেউ?

কাদের কথার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে? ঐ যে এদিকেই আসছে দু-জন। ওরাই নেমেছে বোধ হয় ট্যাকসি থেকে। ক্রমশই কাছে এগিয়ে আসছে। বেরিয়ে যাওয়া একটা গাড়ির আলো এসে পড়তেই দু-জনেই মুখ ঘুরিয়ে নিল। তদের মধ্যে একজন যে সাহেব, কোনো সন্দেহ নেই। তার মানে, হার্ডি। হার্ডি আর রোশনলাল। রোশনলালের হাতে কিট ব্যাগ মতন একটা কী ঝুলছে। সোণার জলকরা বিগ্রহটা নিশ্চয়ই ওর মধ্যে। কিন্তু কালাচাঁদ? কালাচাঁদ কোথায়? তাকে আনেনি?

একবার থামল, পিছন ফিরে দেখল। তারপর আবার এগিয়ে এল। কী যেন বলছে সাহেবটা? নিচু গলায়, ইংরেজীতে। কিছুই শুনতে পেত না গোগো যদি না এগিয়ে এসে ঝোপের কাছাকাছি দাঁড়াতো। তাতেও খুব স্পষ্ট নয়। শুনে শুধু বুঝল যে সময় হয়ে গেছে আর শ্যামচাঁদ আদৌ আসবে কি না, সন্দেহ হচ্ছে হার্ডির। শ্যামচাঁদের সঙ্গে রোশনলালের ষড়যন্ত্র কি না সব ব্যাপারটা, সে-সম্বন্ধেও যেন যথেষ্ট সন্দেহ আছে হার্ডির।

রোশনলাল চুপ করে রয়েছে, একবার রাস্তার এদিকে আরেকবার ওদিকে দেখছে। তার মুখটা দেখতে পাচ্ছে না গোগো কিন্তু যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার ওদিকে যেতে শুরু করল দু-জনে। তারপরই থমকে দাঁড়ালো গঙ্গার দিক থেকে একটা আওয়াজে। তারপরই একটা গুলির আওয়াজ। চমকে উঠল গোগো। আবার আরেকটা। ধড়ফড় করতে লাগল গোগোর বুক। তারই মধ্যে দেখতে পেল রোশনলাল বুকে হাত দিয়ে টলছে আর হার্ডি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে রাস্তার দিকে। রাস্তায় পড়েও থামল না, ছুটতে লাগল। ততক্ষণে রোশনলাল পড়ে গেছে মাটিতে। আর, গঙ্গার দিকের ঝোপের আড়াল থেকে কে যেন বেরিয়ে আসছে পিস্তল হাতে নিয়ে!

এসে মাটিতে টর্চ ফেলে দেখছে রোশনলালকে। তারপর নিচু হয়ে কিটব্যাগটা তুলে নিল। নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দেখছে এদিক-ওদিক। তারপরই চমকে উঠল গোগোর ক্যামেরার ফ্ল্যাশের আলোয়।

কিন্তু এতো শ্যামচাঁদ নয়। অন্য লোক। হাতের পিস্তলটা নাচাতে নাচাতে হিংস্র গলায় ধমকে উঠল—কৌন হ্যায়?

কাঁপতে লাগল গোগো। বলল—আমি...আমি গোগো!

গোগো কৌন?

কেউ না। আপনাদের ব্যাপারের মধ্যে আমি কেউ না।

তব পিকচার লিয়া কিঁউ? জরুর পুলিশকা আদমী। তুমকো ভী খতম করনা চাহিয়ে।

বলতে বলতে পিস্তলটা গোগোর দিকে স্থির করে ধরল লোকটা। হাত-পা সব ঠান্ডা হয়ে এল গোগোর। ঝিম ঝিম করতে লাগল মাথা। চোখ বন্ধ হয়ে এল। তারপরই কান ফাটানো গুলির আওয়াজ।

গোগো লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

যখন জ্ঞান হল, চোখ মেলে গোগো দেখল ছোটকা এক দৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে তার মুখের দিকে। আর, তাকে তাকাতে দেখেই হেসে জিজ্ঞেস করল—কীরে, কী হয়েছিল?

গোগো বলল—গুলি করেছিল। কোথায় লেগেছে জানি না।

হাসতে হাসতে ছোটকা বলল—কোথাও লাগেনি। তোকে গুলি করার আগেই তরুণদা গুলি করেছেন ওর হাতে। কী অব্যর্থ লক্ষ্য! ছিটকে পড়ে গেল পিস্তলটা!

তরুণদা?

হ্যাঁ। ঐ যে টেবিলে বসে জেরা করছেন ওদের।

গোগো ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। ঘরের ওদিকে একটা টেবিলের সামনে হাতে একটা ব্যান্ডেজ নিয়ে বসে রয়েছে সেই লোকটা। তার পাশে শ্যামচাঁদ। তার পাশে হার্ডি। তারও হাতে ব্যান্ডেজ।

গোগো জিজ্ঞেস করল—ঐ লোকটা কে? আমায় যে গুলি করতে যাচ্ছিল।

ছোটকা বলল—রোশনলাল।

রোশনলাল? গঙ্গার পারে তবে মরল কে?

কালাচাঁদ।

কালাচাঁদ?

হ্যাঁ। শ্যামচাঁদ আবার কোনো চালাকি করতে পারে ভেবে কালাচাঁদকে হার্ডির সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিল রোশনলাল। যদি শ্যামচাঁদ আর কোনো গোলমাল না করে তবে তো সব ঠিকই আছে। আর, যদি করে, মানে না-আসে তা হলে কী করবে সেটাও ভেবে রেখেছিল। নৌকো করে এসে তাই অপেক্ষা করছিল। তারপর শ্যামচাঁদকে না আসতে দেখে তাকে শাস্তি দিতে গুলি করল কালাচাঁদকে। হার্ডিকেও খতম করতে চেয়েছিল সেইসঙ্গে—তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে। তোকেও খতম করে দিত—

গোগো বলল—ভাগ্যিস, ঠিক সময়েই এসে টেবিলে আমার চিঠিটা তুমি পেয়েছিলে!

ছোটকা মাথা নেড়ে বলল—তরুণদার আপিসে তরুণদার জন্যে বসে বসে তারপর বাড়ি ফিরে তোর চিঠি পেয়েছিলাম। তরুণদা নেই, একাই ছুটে এসেছিলাম। কিন্তু এসে দেখি রোশনলাল তোকে নিশানা করেছে। জুডোর একটা প্যাঁচ ঝাড়ব, সে-সময়টুকুও নেই। কী যে অবস্থা আমার তখন! তরুণদা যে আগেই এসে লুকিয়ে বসে রয়েছেন, তা তো জানি না।

আগে এসে বসে আছেন? তরুণদা?

হ্যাঁ। তোরও আগে। যেই মাদ্রাজ থেকে হার্ডির জাহাজ রেখে কলকাতায় আসার খবর পেয়েছেন তরুণদা, সেইসঙ্গে দিল্লি থেকে রোশনলালের কলকাতায় আসার খবর—সঙ্গে সঙ্গে শ্যামচাঁদের বাড়ির টেলিফোনে আড়ি পেতে রেখেছিলেন। তারপর বিরূপাক্ষ করঞ্জায়ীর সঙ্গে ফোনে শ্যামচাঁদের কথা শোনার পরই গিয়ে অ্যারেস্ট করেছিলেন শ্যামচাঁদকে। মানে, যে-কারণে শ্যামচাঁদ আসতে পারেনি। তারপর তরুণদা এসে গঙ্গার পারে লুকিয়ে ছিলেন।

শ্যামচাঁদ স্বীকার করেছে তা হলে সব?

একটা কথা কিছুতেই বলছে না এখনও।

কী?

পতিতপাবনবাবু এই ব্যাপারে ছিলেন বোঝা যাচ্ছে। বৃন্দাবন ঠাকুরের কাছ থেকে চাবি না নিয়ে কী করে খুলেছিল মন্দির।

গোগো হেসে বলল—সেটা আমি বলে দিচ্ছি। ডুপ্লিকেট দিয়ে। সব তালারই ডুপ্লিকেট চাবি থাকে। তোলা থাকে সেটা।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল ছোটকা তরুণদার কাছে। গিয়ে কানে কানে বুঝি কথাটা বলল। শুনে ফিরে তাকালেন তরুণদা গোগোর দিকে। হেসে হাত তুললেন। তারপর কী বললেন যেন ছোটকাকে। শুনে হাসতে হাসতে ছোটকা ফিরে এসে বলল—তরুণদা বললেন গোগো ইজ গ্রেট। সব রহস্যই এবার পরিষ্কার হয়ে গেল। শুধু একজনকেই ধরা গেল না।

গোগো বুঝতে না পেরে বলল—আবার কাকে?

বিরূপাক্ষ করঞ্জায়ীকে। বড় আশা ছিল তরুণদার আজ তাকেও ধরবেন বলে। কিন্তু রোশনলালের পিস্তল দেখে যে ভাবে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল বিরূপাক্ষ করঞ্জায়ী, আর কী করে ধরেন! নে, ওঠ্। তরুণদা গাড়ি রেডি করে রেখেছেন আমাদের জন্যে।

যে রকম একটা হুলস্থুল কাণ্ড হয়ে উঠেছে এই দু-বছরেই আনন্দমেলার এই প্রতিযোগিতা ব্যাপারটা, তাতে ভবিষ্যতের কথা ভেবে বেশ একটু ভাবনাই হচ্ছে। গত বছরের তুলনায় ঠিক দু-গুণ ছবি, ছড়া আর গল্প এসেছে এবার প্রতিযোগিতায়। কম তো নয়ই, বেশীই হবে দু-পাঁচশো। এইভাবে যদি প্রতিবছর দুগুণ হতে থাকে, তাহলে সম্পূর্ণ আনন্দবাজার পত্রিকার আপিস-টাকে আনন্দমেলার দপ্তর করলেও তো কুলনো যাবে না।

তা না হয় প্রয়োজন হলে ময়দানটাই ভাড়া নেওয়া যাবে। কিন্তু এত ছবি, এত গল্প, এত ছড়া দেখা আর পড়া, তারপর বিচার করা—এ কী সহজ কাজ! এক নজর দেখে সরিয়ে রাখার মতন তো একটিও নয়। এত ভালো ভালো সব ছবির কবি, ছড়ার শিল্পী আর গল্পের কথক যে আমাদের আনন্দমেলার পাঠক পঠিকাদের মধ্যে রয়েছে ভাবতেও গর্বে বুক ফুলে উঠছে।

এ-বছরও ছড়া ও গল্প বিভাগে একাধিক পুরস্কার দেওয়া হল। **শুধু দুশো টাকার একটি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হল ছবির জন্য আট বছরের কুমারী অস্মিতা ঘোষালকে। তার আঁকা ছবি দিয়েই তৈরী হল এবারের এই পুজাবার্ষিকীর প্রচ্ছদ।**

পুরস্কৃত গুলি ছাড়াও অনেক ছবি, ছড়া ও গল্প বাছাই করে রাখা হয়েছে। সেগুলি থেকে প্রতি সোমবার কিছু কিছু ছাপা হবে আনন্দমেলার পাতায়। ছবিগুলি দিয়ে তো একটা একজিবিশনই করা হচ্ছে খুব শিগগীর একাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারিতে।

ছবি

১ম পুরস্কার **দুশো টাকা**
শ্রীমান সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৫ বছর
২য় পুরস্কার **দেড়শো টাকা**
শ্রীমান গোরা সিংহরায় ॥ ৮ বছর
৩য় পুরস্কার **একশো টাকা**
শ্রীমতী উর্মিলা দে ॥ ৬ বছর

ছড়া ও কবিতা

১ম পুরস্কার **দুশো টাকা**
খাওয়া দাওয়া
শ্রীমতী শম্পা বিশ্বাস ॥ ৮ বছর ৬ মাস
২য় পুরস্কার **দেড়শো টাকা**
কোথায় গেলে
শ্রীমতী মুনমুন হালদার ॥ ৯ বছর
৩য় পুরস্কার **একশো টাকা**
ঘুম পাড়ানি ছড়া
শ্রীমান গোপাল বসু ॥ ৭ বছর ৪ মাস

বিশেষ পুরস্কার প্রত্যেকটি **পঞ্চাশ টাকা**
শ্রীমান দেবব্রত রায়চৌধুরী ॥ ৭ বছর
কী করি
কুশল মজুমদার ॥ ৬ বছর
মিষ্টি ছড়া
শ্রীমতী কবিতা দাস ॥ ১৩ বছর
জগা খিচুড়ি
শ্রীমান অভিজিৎ বিশ্বাস ॥ ৭ বছর ৬ মাস
ছড়া
দেবাশিস পুরকাইত ॥ ১১ বছর ৪ মাস
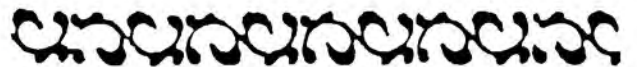
গল্প

১ম পুরস্কার **দুশো টাকা**
আড়ির পরে ভাব
শ্রীমতী মৌসুমী বসু ॥ ৯ বছর ৭ মাস
২য় পুরস্কার **দেড়শো টাকা**
দুইজন তৃণা
শ্রীমতী তৃণা চট্টোপাধ্যায় ॥ ৮ বছর
৩য় পুরস্কার **একশো টাকা**
দুষ্টু ছেলেটা
শ্রীমান দেবায়ন ঘোষ ॥ ৭ বছর ৩ মাস
বাবার কথা শুনি নি
শ্রীমতী দেবযানী নন্দী মজুমদার ॥ ১০ বছর

বিশেষ পুরস্কার **পঞ্চাশ টাকা**
আমার ছোটবোন
শর্মিলা দাশগুপ্ত ॥ ১৩ বছর

ছবি
১ম পুরস্কার
শ্রীমান সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৫ বছর

সুব্রত

আজকে রথযাত্রা

২য় পুরস্কার

শ্রীমান গোরা সিংহরায় ॥ ৮ বছর

গোরা সিংহ রায়
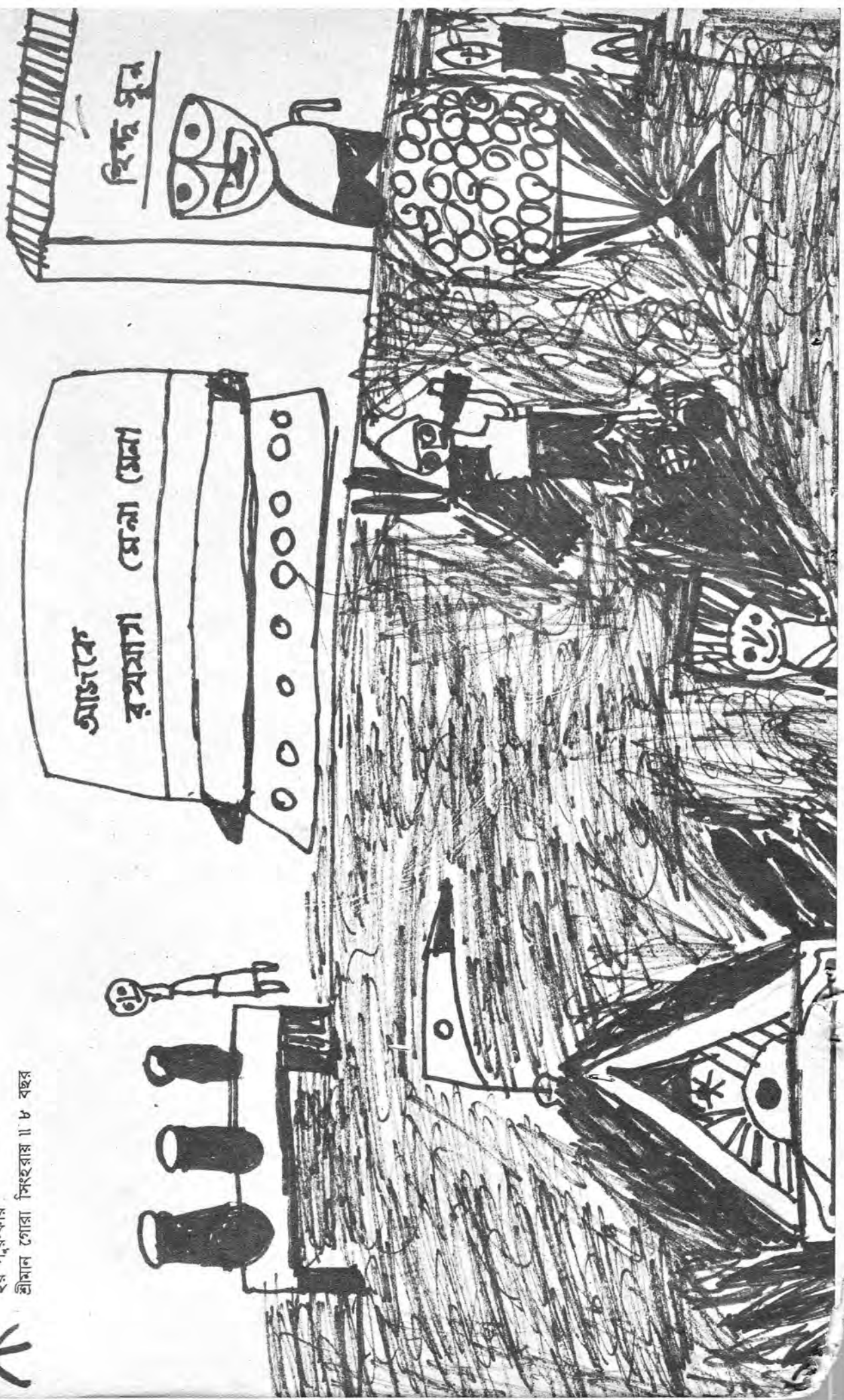
আমি
৩য় পুরস্কার
শ্রীমতী ঊর্মিলা দে ॥ ৬ বছর

খাওয়া দাওয়া

শম্পা বিশ্বাস

আমি খাই অম্বল
গায় দেই কম্বল।
মা খায় চিড়েদই
বাবা খায় ক্ষীরখই।
দিদি বেশ মোটাসোটা
কলা খায় গোটাগোটা।
ভাই কিছু খায় না
করে শুধু বায়না।

কোথায় গেলে

মুনমুন হালদার

নাকের মধ্যে মাছি,
পাচ্ছে আমার হাঁচি।
কোথায় গেলে বাঁচি,
দার্জিলিং না রাঁচি?

ঘুম পাড়ানি ছড়া

গোপাল বসু

রুম ঝুম রুম ঝুম
ঝুনুর ঝুনুর ঝুন
আয় ঘুম আয় ঘুম
ঠুনুর ঠুনুর ঠুন।
টিং টং টুং টাং
ধিনিক ধিনিক ধিন
আয় ঘুম আয় ঘুম
ঝিনিক ঝিনিক ঝিন।
কিং কং পিং পং
কিপিং পিকিং কিং
আয় ঘুম আয় ঘুম
রিনিক রিনিক রিং।

ছবি ॥ সুগত চট্টোপাধ্যায় ॥ ছয় বছর

ছড়া
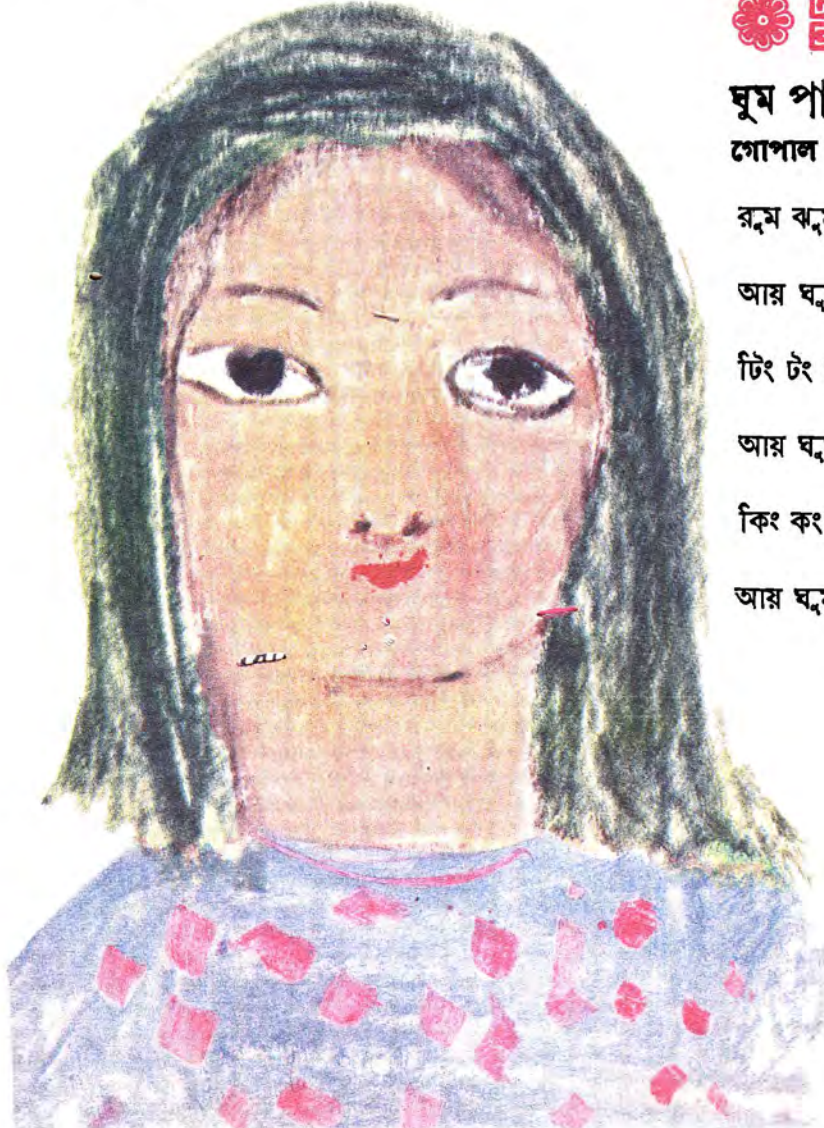
দেবাশিস পুরকাইত

ছেলেটি খুব আদুরে
বসে আছে মাদুরে।
মেয়েটি খুব লক্ষ্মী
নেই কোন ঝক্কি।
খোকা এবার ঘুমো
তোর গালে দেবো চুমো।

কী করি

কুশল মজুমদার

আমি ভাই তবলা বাজাই,
উল্টে পড়ে ডিগবাজী খাই।
যদি ভাই গাই গানটি,
বাবা তবে মারেন চাঁটি।
বিছানায় নাচতে গেলে,
মা দেন কানটি মুলে।
সারাদিন কি করি ভাই
ভেবেই না পাই।

পদ্য

দেবব্রত রায় চৌধুরী

লিখতে বসেছি আমি
ভাল এক পদ্য—
বাবা দেখে বললেন
হয়েছে এ গদ্য—
মনমরা হয়ে আমি
মাকে শুধালাম,
আনন্দমেলায় তবে
থাকবে না নাম?

মিষ্টি ছড়া

কবিতা দাস

মিষ্টি আকাশ মিষ্টি বাতাস
মিষ্টি গাছের ফল
মিষ্টি চাঁদের মিষ্টি আলো
মিষ্টি নদীর জল।
মিষ্টি ফুলের মিষ্টি সুবাস
মিষ্টি পাখীর গান
মিষ্টি মায়ের মিষ্টি আদর
মিষ্টি মুখের পান।
মিষ্টি মিষ্টি বৃষ্টি ঝরে
মিষ্টি ধরার বুকে
সব মিষ্টি মিলিয়ে আছে
আমার খুকুর মুখে।

ছবি ॥ মানিক দেব ॥ পাঁচ বছর

জগাখিচুড়ি

অভিজিৎ বিশ্বাস

পরীর মেয়ে মিমনি,—
উঠছে বেয়ে চিমনি;
ওপরে এক ব্যাঙ
ডাকছে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ।
বাতাবিলেবু গাছে—
শালিক পাখী নাচে।
ফুল ফুটছে কত—
ব্যাঙ বাবাজীর মত।
জগা খিচুড়ি শেষ,
কবিতা হ'ল বেশ।
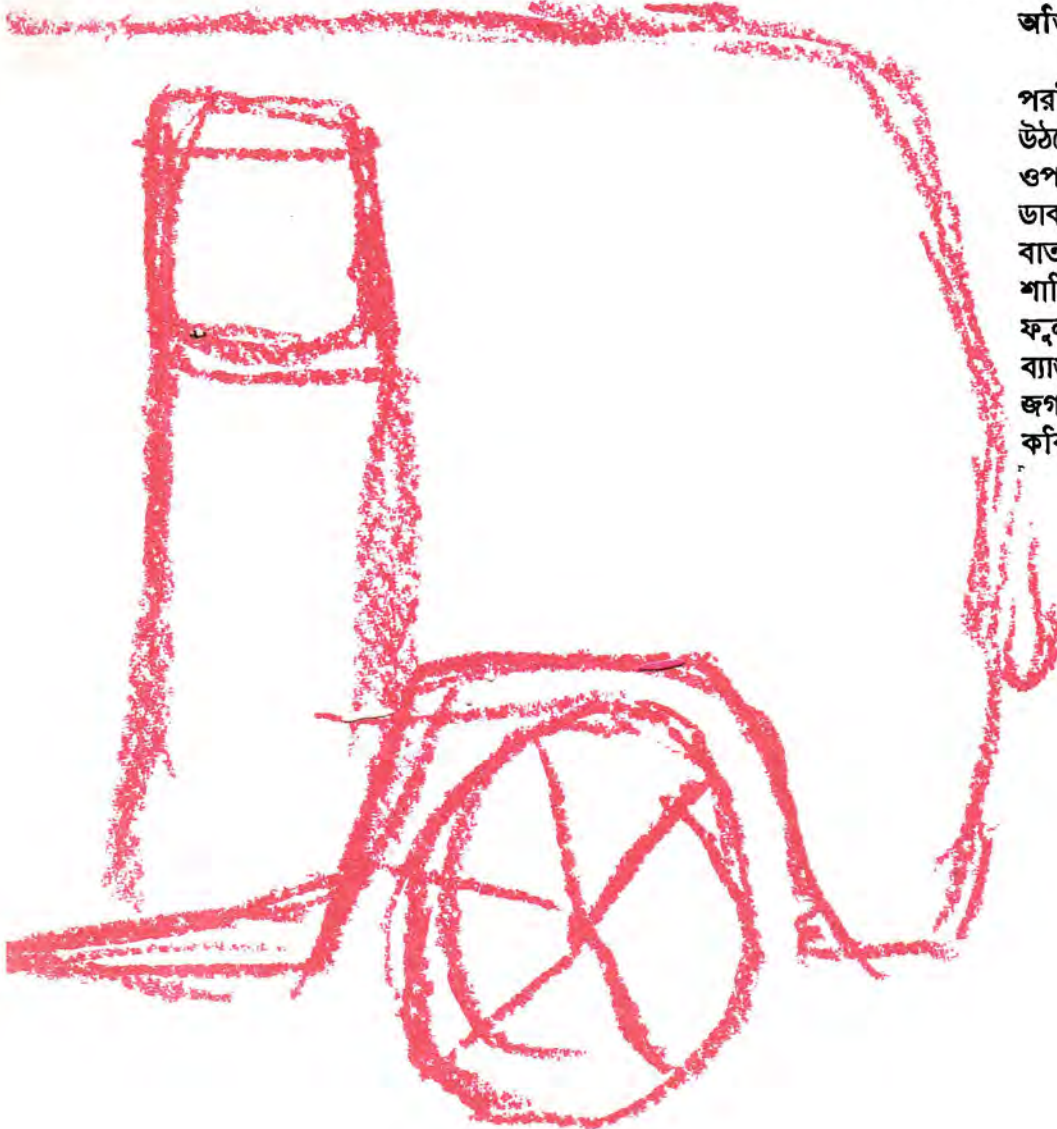
আড়ির পরে ভাব

মৌসুমী বসু

আজকে ছুটির দিন। কিন্তু কিছু ভাল লাগছে না। সকাল থেকে চুপ করে জানালায় দাঁড়িয়ে আছি। কেবলই মনে হচ্ছে সুমিতার সঙ্গে আমার আড়ি হয়ে গিয়েছে।

ক্লাশের মধ্যে সুমিতার সঙ্গেই আমার সব থেকে বেশী বন্ধুত্ব। যতক্ষণ স্কুলে থাকি, ওর সঙ্গেই আমার খেলা, গল্প করা সব কিছু। আর সেই সুমিতার সঙ্গেই আড়ি হয়ে গেল শুধু শুধু। কি করি?

হঠাৎ চোখে পড়ে গেল মাঠে যে দুটো ছেলে খেলা করছিল জানি না কি কারণে ঝগড়া করে নিজেদের মধ্যে আড়ি করে কাঁদতে কাঁদতে দুজনে দুদিকে চলে গেল। তাই দেখে আমি কেঁদে ফেললাম। আমিও তো সুমিতার সঙ্গে আড়ি করে দিয়েছি।

এমন সময় মা এসে বললেন, ''কি হয়েছে মুনমুন, কাঁদছ কেন? খিদে পেয়েছে?'' আমি ঘাড় নেড়ে বললুম, ''হ্যাঁ''। আমার কেমন যেন বলতে লজ্জা করল সুমিতার সঙ্গে আড়ি হয়ে গেছে। মা বললেন, ''চান করে এস, এসে খেয়ে নাও।'' চান করে এসে আবার আমি সেই জানালায় দাঁড়ালাম। দেখি ওমা সেই ছেলে দুটো আবার ভাব করে নিজেরা কেমন মিলে মিশে খেলছে। দেখে আমার এত ভাল লাগল, মনে হল আমিও তো সুমিতার সঙ্গে ভাব করে নিতে পারি। কালকে নিশ্চয় সুমিতার সঙ্গে ভাব করব।

পরের দিন স্কুলে গিয়ে আমি সুমিতাকে খুঁজতে লাগলাম, কিন্তু ও তখন স্কুলে আসেনি। আমি অন্য মেয়েদের সাথে খেলতে লাগলাম। খেলতে খেলতে হঠাৎ পড়ে গেলাম খুব জোরে। বাড়ি চলে আসতে হল আমায়। সারাদিন শুয়ে শুয়ে মনে হতে লাগল সুমিতার সঙ্গে ভাব করা হল না আমার।

বিকেলে দেখি সুমিতা এল আমাদের বাড়ীতে। আমি চুপ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছি। ও বলল, ''কিরে কথা বলবি না?'' আমি ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললাম। আমি সারাদিন যে শুধু ওর কথাই ভেবেছি। ও বলল, ''কাঁদছিস কেন? আর আমাদের আড়ি নেই, ভাব হয়ে গেছে।''

ছবি ॥ প্রীতম বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ আট বছর

দুইজন তৃণা

তৃণা চট্টোপাধ্যায়

একদিন দুপুরবেলা ঘুম ভেঙে গেল। কেন ভেঙে গেল? তখুনি বুঝতে পারলাম বেল বাজছে তাই। স্বপ্নটা ছিল কি অপূর্ব। কিন্তু বেলের জ্বালায় কিছু মনে করতে পারলাম না। বেল বেজেই চলেছে. বেজেই চলেছে। কে রে বাবা। দুপুরে কেউ আসে না তো। মা ওপাশ ফিরে শুল। আরো ঘুমিয়ে পড়ল। 'মা' 'মা' বলে আমি ফিস-ফিস করে দুবার ডাকলুম। এ-দিকে বেল বেজেই চলেছে। কি করি। কারুকে দরজা খুলতে আমি কখনো নিচে একা যাইনি। আজ কিন্তু একাই নিচে নেমে গেলুম। দরজা খুলেই—ও মা! এ কী! এ-যে তৃণা! তবে এখনকার এই ঠিক আমার মতন তৃণা নয়। ৩-বছর আগের আমার যে ছবিটা বাঁধানো আছে বাবার টেবিলের উপর, সেই তৃণা। সেইরকম শাদা ফ্রিল-দেওয়া ফ্রক। বুকে স্বাধীনতার ফ্ল্যাগ। মুখে ফিক্ ফিক্ হাসি।

ফিক্ ফিক্ ক'রে হেসে বলল, "কি লে?" আমার তো গালে হাত। আমি বল্লাম—" ও মা তুই কোথ্থেকে?" ছোট্টো তৃণা বলল—"আমি তো তৃণা।"

আমি বললুম, "আমিও তো তৃণা।"

ও বলল, "ও। তা আমাল হুকুহুকুটা কই?"

আমি বললুম, "কিসের হুকুহুকু?"

সে বলল, "আমাল তো একটা হুকুহুকু ছিল, সেটা কোথায় গেল বড় তৃণাদিদি?"

আমি বললুম, "ও! সেই লাল মুখো বাঁদরটা? সেটার পেট ফেটে তুলো বেরিয়ে পড়েছিল। সেটা তো মা কবেই ছুঁড়ে পুকুরে ফেলে দিয়েছে।" সে একটু ভেবে বলল, "ও। তা আমাল ব্যাঙ-তেলি-ফোনটা কই?" আমি বললুম, "সেটা ভেঙে গেছে।" সে বলল, "তা আমাল হামাগুলি পুতুলটা কই?" আমি বললুম, "সেটা আর হামা দিতে পারে না। ভেঙে কোথায় পড়ে আছে কে জানে।" সে বলল, "তা আমাল পিয়ানোটা কই?" আমি বললুম, "সেটার অনেক ধুলো জমে গেছে। তাছাড়া সেটা আর বাজেও না।"

সে বলল, "তা আমাল মা কই?"

আমি রেগে গিয়ে বললুম, "তোর মা না আরো কিছু। আমার মা।"

সে বলল, "না। আমাল মা।"

আমি তাকে এক ধাক্কা দিয়ে বললুম, "যা ভাগ।"

ছোট্টো তৃণা তখন "আমাল মা কই" ব'লে এমন কেঁদে উঠল যে মার ভাল ঘুমটা ভেঙে গেল। মা আমাকে বলল, "কিরে, এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছিস যে। মোটে তো চারটে বাজে।" তখন আমি মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

দুষ্টু ছেলেটা
দেবায়ন ঘোষ

তরুণ নামে একটা ছেলে ছিল। তার কাজ ছিল শুধু প্রজাপতি ধরা আর সুতোয় বেঁধে রাখা।

একদিন তাদের ফুল বাগানে একটা লাল ফুলের ওপর একটা ছোট্ট প্রজাপতি বসে গুন গুন করে গান গাইছিল। সে দেখতে পেয়ে সেই প্রজাপতিটাকে ধরে এনে শক্ত সুতোয় বেঁধে দিল।

বেচারি প্রজাপতি যতই ছটফট করছিল, ততই তরুণের আনন্দ যেন ধরে না। সে সবাইকে ডেকে বল্ল—"দেখ দেখ, প্রজাপতি কেমন নাচছে।"

তার দিদি এসে বল্ল—"তুই ওকে মিছিমিছি কষ্ট দিচ্ছিস। দেখিস, একদিন তুইও ওরই মত কষ্ট পাবি।" এই বলে তার দিদি চলে গেল। তরুণ তার দিদির কথা হেসে উড়িয়ে দিল।

সেদিন রাতে তার ঘুম হল না, বার বার তার দিদির কথা মনে হচ্ছিল। হঠাৎ সে শুনতে পেল কারা যেন তার ঘরে কথা বলছে। "শোন ভাই, একটা কথা শুনে যাও।" "কি বলবে তাড়াতাড়ি বল। ছেলেটা ঘুম থেকে উঠলে আর রক্ষে নেই।"

"শোন, একটা লাল ফুলের জন্যে আমার রেণু আনার কথা ছিল। সেই ফুলটাকে বোলো আমি তো আর বাঁচবো না। তাই আমি আর আসতে পারলাম না। তুমি গিয়ে সেই ফুলের রেণুটা ওকে দিয়ে দিও।" সকালে উঠে তরুণ খুব ঘাবড়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি প্রজাপতিটাকে খুলে দিল। প্রজাপতিটা কিন্তু নড়লো না। সে তার মাথায় জল দিল। তবুও সে নড়লো না। তরুণ বুঝল যে সে মারা গেছে। তার মনে এমন কষ্ট হল যে সে সারা দিন কারো সংগে কথা বলতে পারলো না। সেদিন তরুণ প্রতিজ্ঞা করলো যে আর কোনো দিন সে প্রজাপতি ধরবে না।

ছবি ॥ ধ্রুব ভট্টাচার্য ॥ ষোল বছর

বাবার কথা শুনি নি
দেবযানী নন্দীমজুমদার

এই লেখাটা দেখলে বাবা এবং মা বকবেন, তাই লুকিয়ে লুকিয়ে লিখছি। আমি সবসময় বাবা মার কথা শুনে চলি। কিন্তু একদিন আমি বাবার কথা শুনি নি। সেদিন বাবার কথা না শুনে আমি একটা কাজ করেছিলাম। বাবা বকবেন বলে সে কথাটা আমি কাউকে বলি নি। আজ তোমাদের চুপি চুপি বলছি। সেদিন স্কুলে যাবার সময় বন্ধুদের জন্যে বাবার কাছ থেকে এক প্যাকেট বিস্কিট চেয়ে নিয়েছিলাম। বাড়ীর গেটের সামনে স্কুল বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় একজন ভিখিরি মেয়ে একটি ছোট্ট বাচ্চাকে কোলে নিয়ে গেটের ভেতরে ঢুকছিল। বাচ্চাটা খুব চেঁচিয়ে কাঁদছিল। বাবা দেখতে পেয়ে আমাকে বললেন, "ওদের ঢুকতে দিও না, বেরিয়ে যেতে বল।" বাচ্চাটাকে দেখে আমার খুব কষ্ট হল। তাকিয়ে দেখলাম বাবা ভেতরে ঢুকে গেছেন, আমায় দেখতে পাচ্ছেন না। আমি বাচ্চাটাকে ডেকে চুপি চুপি আমার সুটকেস থেকে বিস্কিটের প্যাকেটটা বের করে দিয়ে দিলাম। বাচ্চাটা কান্না থামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে এক গাল হেসে ফেলল। এমন সময় স্কুল বাস এসে গেল। আমি উঠে পড়লাম। এই প্রথম আমি বাবার কথা শুনি নি। তবু সেদিন আমার খুব আনন্দ হয়েছিল।

আমার ছোট বোন
শর্মিলা দাশগুপ্ত

আমার ছোট বোনের নাম পাপিয়া। সে একটি সাত বছরের মেয়ে, কিন্তু দুষ্টুমিতে সে সাতটি বড় মেয়ের সমান।

পাপিয়া মডার্ন হাই স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে, ও আমি পড়ি সপ্তম শ্রেণীতে। পরীক্ষার আগের দিন একবার রিডিং পড়ে পরীক্ষা দেওয়া আমার চিরকালের অভ্যেস। তাই পরীক্ষায় পাপিয়া সব সময়ে প্রথম হয় যেখানে আমি পঞ্চম বা ষষ্ঠ হই। আমাদের স্কুলের রিপোর্ট যখন বাড়ি নিয়ে যাই, তখন মা খালি আমাকে বকেন, আর বলেন— "তুমি যত বড় হচ্ছ তত দুষ্টু হচ্ছ। কিছু পড়াশোনা কর না। পরীক্ষার আগের দিন পড়ে কখন ভাল করা যায় না। তোমার বোনকে দেখে শেখ কি ভাবে, পরীক্ষার পড়া তৈরী করতে হয়।" এই শুনে

পাপিয়া খালি হাসে আর বলে, ''আয় তোকে পড়তে শেখাই। 'এ' লেখে কেমন করে জানিস?''

পাপিয়ার সঙ্গে আমার দিনরাত ঝগড়া হয়, কিন্তু আমরা একজন অন্যজনকে ছাড়া থাকতে পারি না। তাই আড়ি হলে খুব তাড়াতাড়ি ভাব হয়ে যায়।

একদিন পাপিয়া বেশী ওস্তাদি করে আমার কলম দিয়ে লিখে নিবটা নষ্ট করে দিয়েছিল। আমাদের তখন মারামারি শুরু হল। সেই যুদ্ধে আমিই জিতলাম আর মা পাপিয়াকে বকলেন। সেদিন দুপুরে আমি যখন ঘুমিয়েছি, তখন পাপিয়া আমার একটা বিনুনি কাঁচি দিয়ে কেটে দিয়েছিল। বিকেলে আমি চুল আঁচড়াতে গিয়ে দেখি যে আমার একটা বিনুনি একেবারে কাটা। আমি তখনি বুঝলাম একাজ পাপিয়ার। আর যায় কোথায়! আমি গিয়ে পাপিয়াকে ঠাস্ করে একটা চড় মারলাম। আমাদের মারামারি শুরু হল। শেষে হেরে গিয়ে পাপিয়া ভ্যাঁ শুরু করল। তখন মা এসে পাপিয়াকেই বকলেন। তখন পাপিয়া বলল ''আমি ত দিদির একটা বিনুনি খালি কেটেছি, আর একটা ত আস্তই আছে।'' এই কথা শুনে আমরা না হেসে থাকতে পারলাম না।

পাপিয়ার জন্ম দিন ৪ঠা জুন। সে বারে সে সবে ছ' বছরে পড়ল। সে সেদিন হঠাৎ আমাকে মহুয়া (আমার ডাক নাম) বলে ডাকতে শুরু করল। আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন সে আমাকে নাম ধরে ডাকছে। ''বা! আমি ত বড় হয়ে গেছি।'' এই উত্তর পেলাম তার কাছ থেকে।

পাপিয়া কিন্তু ক্লাসে কখন দুষ্টুমি করে না। ওর বন্ধুদের জিজ্ঞেস করলে ওরা বলে যে ও কখন ক্লাসে কথাও বলে না। এতে আমি খুবই আশ্চর্য হই কারণ বাড়িতে পাপিয়া সারাক্ষণ কথা বলে। ঘরে কেউ না থাকলে ও দেয়ালের সাথে কথা বলে।

আমি পাপিয়াকে খুব ভালবাসি। ও আমার সব কাজের সঙ্গী। ছোট বোন না থাকলে আমার জীবন এত মধুর হত না।

ধর্ম-ভাষা-জাতির প্রশ্নে
বিরোধ কাদের মিটছে না?
দেশ সকলের-আমরা সবার
এই কথাটা বুঝছে না?